ট্র্যাজেডি অফ এররস্

পূর্ব পাকিস্তান সংকট ১৯৬৮-১৯৭১

লে. জে. (অব.) কামাল মতিনউদ্দীন

পরম করুণাময়

ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে।

www.pathagar.com

কায়েদ-ই আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ
(পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা)

www.pathagar.com

ট্র্যাজেডি অফ এররস

পূর্ব পাকিস্তান সংকট

১৯৬৮-১৯৭১

লে. জে. (অব.) কামাল মতিনউদ্দীন

www.pathagar.com

MAP 1

EAST PAKISTAN, 1947 - 1971

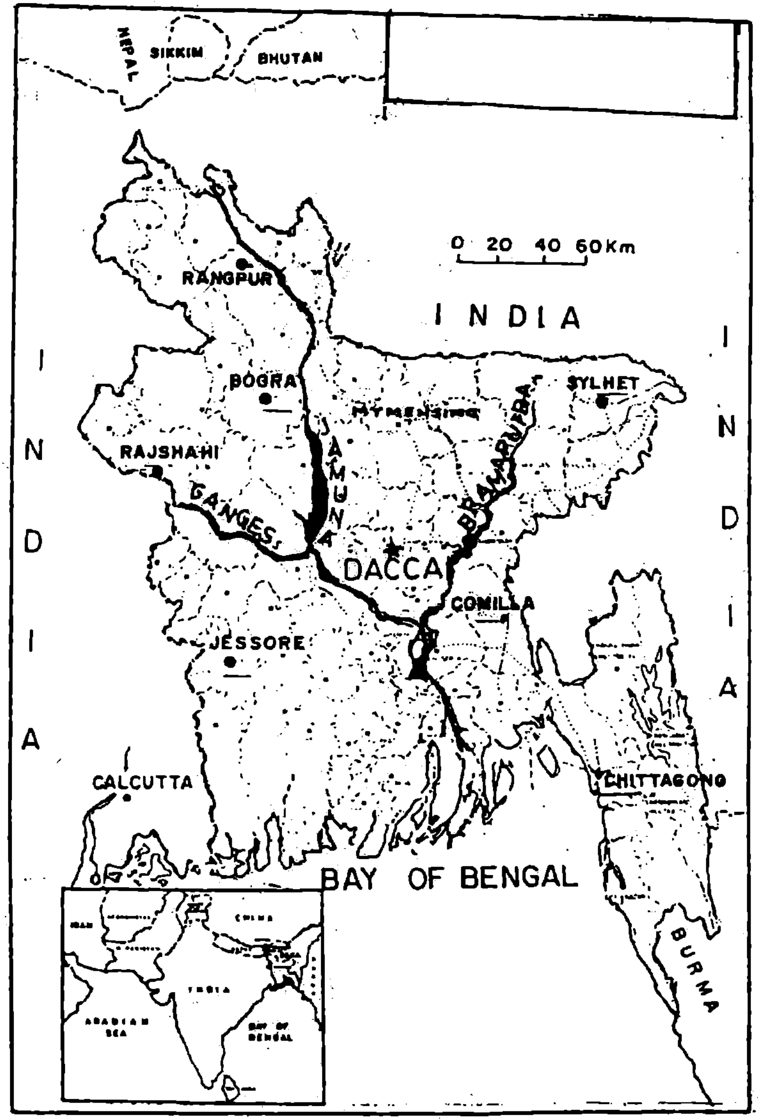

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: বিচ্ছিন্নতার কারণ	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : আঞ্চলিক বৈষম্য- প্রতিকার ব্যবস্থা	৫২
তৃতীয় অধ্যায়: রাজনীতির চোরাবালি	৭২
চতুর্থ অধ্যায়: মুক্তিবাহিনী	১৬৭
পঞ্চম অধ্যায়: সামরিক অভিযান	১৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: পাকিস্তানের ভাঙ্গনে ভারতের ভূমিকা	২১২
সপ্তম অধ্যায়: অন্যান্য দেশের ভূমিকা	২৩৫
অষ্টম অধ্যায়: পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৭১ : প্রাচ্যের নাটক	২৫৯
নবম অধ্যায়: নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অভিযান	৩৪৬
দশম অধ্যায়: জাতিসংঘে	৩৫০
একাদশ অধ্যায়: সামরিক পতনের কারণসমূহ (ইস্টার্ন থিয়েটার)	৩৬১
দ্বাদশ অধ্যায়: দেশ ভাঙ্গার কারণ	৩৭৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়: পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের উপর পাকিস্তানের ভাঙনের প্রভাব	৩৮৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান রাষ্ট্রটি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়; তা আজও রয়ে গেছে। এ ট্র্যাজেডির নেপথ্যে বিদ্যমান রয়েছে বহুবিধ কারণ। অনেকে বিশ্বাস করতে না চাইলেও, এ কথা স্বীকার করতেই হবে– এ ট্র্যাজেডি এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত, যারা ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন, অখণ্ড পাকিস্তানের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য তারা উপলব্ধি করতে পারেননি। দেশটির জনসংখ্যার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিলনা।

দেশের বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর পতনের কারণসমূহ এ পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়। লেখক পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

এ বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জেনারেল মতিনউদ্দীন বাংলাদেশ ও ভারত সফর করেন। ১৯৭১ সালে যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন লেখক তাঁদের সঙ্গে সরাসরি বিশদ আলাপ-আলোচনা করেছেন। মূল সূত্রগুলো থেকে পাওয়া তথ্য, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, দলিলপত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে তিনি এ পুস্তক রচনা করেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিষ্ঠিত দেশটি কেন ভেঙ্গে গেল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লেখকের অকপট ও নিরপেক্ষ মতামতের মধ্যদিয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।

সমসাময়িক ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের জন্য বইটি যেমন অপরিহার্য, তেমনি সাধারণ পাঠককেও নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

বিচ্ছিন্নতার কারণ

পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতার অন্যতম কারণ ছিল ভৌগলিক দূরত্ব। পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকদের সম্পর্কে বাঙালিরা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করত এবং এ ধারণার কারণ হিসেবে তারা নানান যুক্তি উপস্থাপন করেছে। অবশ্য কিছু কিছু যুক্তি অতিরঞ্জিত করা হয়েছিল নানাজনের ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে। কিছু কিছু যুক্তি একেবারেই বানোয়াট ছিল যা মিথ্যা প্রচারণার জন্য ব্যবহৃত হতো। তবে প্রাথমিক অবস্থায় এসব সমস্যার প্রতি নজর দেওয়া হলে সবগুলোকেই সমাধান করা সম্ভবপর ছিল।

প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের একমাত্র ভৌগলিক ও জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা। তাছাড়া দুই প্রদেশের জনগণের মন থেকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে দূর করবার জন্য প্রয়োজন ছিল আন্তরিকতার সাথে কিছু নীতি নির্ধারণ করা। এ দায়িত্ব ছিল রাজনীতিকদের, সামরিক নেতৃত্বের, আমলাদের এবং ব্যবসায়ীদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কারণে তারা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল এবং এসব ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে পুঁজি করে আঞ্চলিক কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং হতাশ বুদ্ধিজীবীরা ভুলগুলোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। ভুল ক্রমেই বাড়তে লাগল, সাথে সাথে মানুষের আবেগও বৃদ্ধি পেতে থাকলো। একদিকে যেমন দাবির আওয়াজ চারিদিকে ধ্বনিত হতে লাগলো, অন্যদিকে কঠোরভাবে দাবিদাওয়া দমন করা হচ্ছিল। পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটলো যে দেশকে ভাঙ্গনের হাত থেকে আর রক্ষা করার উপায় ছিল না। তাছাড়া, এ কাজে ইন্ধন দেওয়ার জন্য বৈরী প্রতিবেশীতো ছিলই।

www.pathagar.com

ভাষার ইস্যু

বাঙালিদেরকে অন্যান্য পাকিস্তানিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভাষা। মাতৃভাষার প্রতি বাঙালিদের যে কী গভীর বন্ধন ছিল, তা জাতীয় কর্তৃপক্ষ বুঝতেই পারে নি।

সংস্কৃত এবং পালি ভাষার সংমিশ্রনের ফলে বাঙলাভাষার উদ্ভব হয়। দূর অতীতে বাংলাদেশের বাসিন্দারা যে উপভাষায় কথা বলতেন, তার উৎস ছিল এ দুই ঐতিহাসিক ভাষা। তারপর যখন ইসলামের প্রভাব এ অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করতে থাকলো, তখন শহরের উচ্চবিত্ত গোষ্ঠির মধ্যে ফার্সি এবং উর্দু ভাষার প্রচলন চালু হয়। তবে গ্রামাঞ্চলে বাঙলাই ছিল মূল ভাষা। যুগে যুগে এ ভাষা মেধাবী বাঙালি পন্ডিতদের লালিত-পালিত হয়ে নিঃসন্দেহে এক সুন্দর সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়েছে।

এ. এম. কে মাসওয়ানী দীর্ঘ গবেষণা চালিয়েছেন প্রমাণ করার জন্য যে, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে উর্দু ছিল বাঙলার মুসলমানদের ভাষা এবং হিন্দুরা আধুনিক বাংলাভাষাকে চালু করেছিল। ফ্রিডম পার্টি অব বাংলাদেশ'র সভাপতি কর্ণেল (অব.) সৈয়দ ফারুক রহমানের মতে, ১৮৬২ সালে হিন্দু কলেজ বেনারস (ভারত)- এর অধ্যক্ষ রাম নিভাস বাংলা লেখার প্রচলন করেন। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশ্লেষক রওনক জাহান মেনে নিয়েছেন যে, ‘‘বাংলা ভাষার অসাম্প্রদায়িক রেনেসাঁর শুরু উনিশ ও বিশ শতকে ঘটেছে হিন্দুলেখকদের মাধ্যমে।’’ ভারতে বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আজিজুর রহমান মল্লিকের পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল ‘বাংলার মুসলমানদের জন্য বৃটিশ শিক্ষানীতি’। এতে তিনি বলেন যে, মোগল আমলে বাংলার আদালতি ভাষা (সরকারি ভাষা) ছিল ফার্সি।

এটাও সত্যি যে ১৯০৫ সালে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর প্রত্যেকটি অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা হয় ইংরেজি নয়তো উর্দুতে কথা বলতেন। তাঁরা কেউই বাংলায় বক্তব্য রাখতেন না। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, বাঙালিরা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে খুবই গর্ববোধ করেন, তা মুসলমান বা হিন্দুদের কলম থেকে আসুক না কেন।

লিখিত বাংলা অনেকটা হিন্দু বাঙালিদের দখলে ছিল। যেমন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, বঙ্কিম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যয় এবং বিশ্ব বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত লেখকদের। বাঙলা ভাষায় তারা অনেক উচুঁ স্থান লাভ করেছিল। বাংলার সাংস্কৃতিক আঙিনায়

www.pathagar.com

এসব মহান লেখকদের লেখায় আবেগ এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনা প্রকাশ পায়, যা অজান্তেই বাংলাদেশের মুসলমানদের চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছর পূর্ণ হবার পূর্বে, ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ইস্ট বেঙ্গল কংগ্রেস পার্টির এক হিন্দু সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাবিত সংবিধানের একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন। তাতে বলা হয় যে, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলাকেও গ্রহণ করা হোক। এ প্রস্তাবকে কোন রকম বিবেচনায় না নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর বিরোধীতা করে বলেন যে, উর্দু ভারতের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাই উর্দুই একমাত্র জাতীয় ভাষা হওয়ার যোগ্যতার দাবি রাখে। কংগ্রেস সদস্যের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তিনি প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে আঘাত করবার জন্য বাঙালি রাজনীতিকদের হাতে লাঠি তুলে দিলেন।

রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এবং উপমহাদেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আহমদ দানি পাকিস্তানে বাংলাভাষার অবস্থান বিষয়ে স্কুল এবং কলেজগুলোতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, উচ্চবিত্ত বাঙালিরা, বিশেষ করে যারা কলকাতা থেকে আগত, তারা প্রধানত উর্দুতে কথা বলতে, বাংলা চর্চা আপেক্ষিকভাবে কম ব্যবহার করতেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জনসাধারণ, যারা এখন শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন অধিক সংখ্যায়, তাদের বলিষ্ঠ দাবি ছিল যেন বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যেহেতু তারা বাংলা লিখতে বা পড়তে পারতো না, তারা দৃঢ়তার সাথে দাবি করেছে যেন বাংলা ভাষা পূর্ব বাংলায় যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং পাকিস্তান যেন দোভাষী রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান গ্রহণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান থেকে ভাষাতত্ত্বে পিএইচডি প্রাপ্ত বাঙালি নারী ড. আফিয়া দিল, বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন, যোগাযোগের সবক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা ছিল বাঙালিদের স্বাধীন চেতনার বহিঃপ্রকাশ। তার মতে, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি প্রাথমিকভাবে ছোট আকারের এক কমিউনিস্ট দল থেকে এসেছিল। যখন কমিউনিস্ট দলটিকে নিষিদ্ধ করা হলো, তখন বাংলা ভাষার আন্দোলন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ফজলুল হক হল) প্রবেশ করে, চারিদিক ছড়িয়ে যায় এবং অদম্য আকার ধারণ করে।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ গণপরিষদে এ মর্মে বক্তব্য রাখেন যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি মুসলমান রাষ্ট্র, যেহেতু উর্দু হবে দেশটির রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালে তাঁর পূর্ব বাংলা সফরকালে স্থির হয়েছিল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। ছাত্ররা পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবিটি পেশ করেন। তিনি জিন্নার কাছে এ দাবিটি পৌছান নাই, অথবা তাঁকে এ ব্যাপারে সম্মত করতে পারেন নি। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চে ঢাকায় ভাষণ দিতে গিয়ে যখন জিন্নাহ বলেন 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', ছাত্ররা নিশ্চয়ই তাতে খুব খুশী হতে পারেনি।

তবে কথাগুলো এসেছে জিন্নার মুখ থেকে, যিনি পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তার সততা ও আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল না। তাই তাৎক্ষণিক খুব জোরেশোরে কোন প্রতিবাদ করা হয় নি। তবে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ ও হতাশা মাথাচাড়া দিতে লাগলো। ফাটলের ইঙ্গিত দেখা যেতে শুরু করল। ঢাকার একজন নামকরা আইনজীবী এবং সক্রিয় রাজনীতিক খন্দকার মোশতাক আহমেদ, যিনি ১৯৪২ সালের কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের জন্য জেলও খেটেছিলেন, তিনি ভাষার বিষয়ে অন্যদের সাথে কায়েদ ই আযমের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তিনি কুমিল্লার দাউদকান্দির দেশপাড়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারের সদস্য। তিনি ইউনাইটেড পাকিস্তানের সমর্থক। তবুও তিনি মাতৃভাষার সমর্থনে আবার জেলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকায় অবস্থানকালে লিয়াকত আলী খান আবার বলে উঠলেন যে উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষোভ বেড়ে গেল। যখন জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সুপারিশ করা হলো যে, উর্দুই হবে একমাত্র জাতীয় ভাষা, তখন চারিদিকে দাঙ্গার উদ্ভব হলো। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহিত হবে, যাতে বাংলা হবে প্রদেশের সরকারি ভাষা। তিনি বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তাব পেশ করবেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেন নাই। কায়েদ -ই- আযম এবং লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর, পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। ততোদিনে নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠ হলেন এবং ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি বক্তব্য পেশ করেন যাতে আবার বলা হয় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। বলা হয় যে, তিনি বলেছিলেন ''হাতে গোনা

www.pathagar.com

কয়েকজন ছাড়া পূর্ব বাংলার কেউই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দাবি করে নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার পক্ষে পূর্ব বাংলায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়, যা পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারি কার্ফ্যু ঘোষণা করা হয়। তার পরের দিনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়। ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে হামলা চালানো হয়। জনতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। প্রফেসর দানি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। আহত ছাত্ররা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উনার বাসায় ঢুকে পড়ে । দুজন ছাত্র, যারা এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না, বেপরোয়া আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। এ দুর্ভাগা ছাত্ররা শহীদ হলেন। তাদের এ ত্যাগকে স্বীকৃতি দেবার জন্য গড়ে তোলা হয় শহীদ মিনার। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙালি প্রভাষক চৌধুরী নূরুল ইসলাম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপককে গ্রেফতার করে জেলে প্রেরণ করা হয়। তাদেরকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর থেকেই প্রত্যেক বছর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করার জন্য পালিত হয় ভাষা দিবস। এখন বাঙালি রাজনীতিবিদরা সুযোগ পেল, তারা পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের প্রচারণায় লিপ্ত হয়। তারা শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম পেয়ে গেল। শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি এর আগে তেমন পরিচিত ছিলেন না, বাংলা ভাষার আন্দোলনে নেমে গেলেন। এ আন্দোলনটি ছিল বাঙালিদের হৃদয়ের খুব কাছের। শেখ মুজিবুর রহমান নায়ক হয়ে গেলেন।

ভাষা আন্দোলনের সময়ে যে দুই ছাত্র নিহত হন তাদেরকে স্মরণ করা হয় বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রকাশিত ডাক টিকিটে। এতে ঘটনাটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব বোঝা যায়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)- এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার আব্দুল হাফিজের মতে, বাংলাভাষা আন্দোলনকে সমর্থন না দেয়াতে নাজিমুদ্দিন পূর্ববাংলায় ভীষণভাবে অপ্রিয় হয়ে পড়েন । তার প্রতি এ তিক্ততা অনেকের মধ্যে এখনও বিরাজ করছে, যার জন্য তারা বর্তমানেও দাবি জানাচ্ছে যেন তার দেহ, যা মৌলভী ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমাধিস্থলে সহ-অবস্থান করছে, সেখান থেকে তুলে নিয়ে যেন অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া মন্ত্রীসভার প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বিআইআইএসএস- এর সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক বলেন,

'পঞ্চাশ দশকে যখন ঘোষণা করা হলো যে উর্দু হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখনই বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা হয়।' বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগের পরিকল্পনা সচিব এনামুল হক চৌধুরীও এ ধারণা পোষণ করেন।

পাকিস্তানের পাগলাটে, অসুস্থ কিন্তু শক্তিশালী গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মুহম্মদ নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করলেন। কারণ, তার মতে, নাজিমুদ্দিন তার জনগণের প্রতি অতিরিক্ত আবেগপূর্ণ ছিলেন এবং পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনকে শক্ত হাতে দমন করতে ব্যর্থ ছিলেন। ভাষা বিষয়ে যে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল, তার উত্তরে গোলাম মালিক গুলি চালানো আদেশ দিয়েছিলেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার কাছে এ সমাধান খুবই সোজা ছিল। এতে বাঙালিরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানও এ সংকীর্ণ মনোভাবের উর্ধে উঠতে পারেন নি। তিনি বললেন, "আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দুই ভাষা নিয়ে আমরা এক জাতি হতে পারবো না।" সুইজারল্যান্ডের তিনটি ভাষা রয়েছে এবং কানাডার দুটো। এ দেশ দুটোতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য যার যার মাতৃভাষা যথাযথভাবে বজায় রাখে। আয়ুব খানের উচিৎ ছিল এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা।

দুই প্রদেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হবার পর, অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে বাঙালির এ দাবিটিকে যদি মেনে নেয়া হতো, তাহলে অসন্তুষ্ট বাঙালি রাজনীতিকদের অভিযোগের কারণ বিলীন হয়ে যেত।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি সাইন বোর্ড, নাম ফলক, বিলবোর্ড, দেয়াল লিখন, রাস্তার নাম ফলক এবং যানবাহনের নম্বর প্লেট বাংলায় লিখিত। এতে বাঙালি জীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বোঝা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে কিন্তু উর্দু সাইন বোর্ডের চাইতে ইংরেজি সাইন বোর্ড বেশি প্রাধান্য পায়।

বাংলাদেশের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা যিনি পরবর্তীকালে দেশটির রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, খন্দকার মোশতাক আহমেদের এক বক্তব্যে বোঝা যায়, বাঙালিদের জীবনে বাংলা ভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণা কাজে আমি যখন ঢাকায় তাঁর সাথে দেখা করি, তিনি আমাকে নিখুঁত উর্দু ভাষায় সম্ভাষণ জানান। পরে তিনি

www.pathagar.com

নিখুঁত ইংরেজিতে আমার সাথে কথা বলেন। আমি যখন দেখলাম উনি উর্দু এবং ইংরেজি দুই ভাষাই পারদর্শী, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কী ভাষায় কথা বলবো, উর্দুতে নাকি ইংরেজিতে? আমি বাংলা জানি না।' তিনি চট্ করে উত্তর দিলেন, উর্দুতে 'জনাব, ইসি ওয়াজহে সে পাকিস্তান টুট গায়া', অর্থাৎ 'জনাব, এ জন্যেই তো পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে।' ইনস্টিটিউট অব রিজিওনাল স্টাডিজ-এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আব্দুর কাইয়ুমের মতে- 'সবকিছুর মূলে ছিল ভাষার ব্যাপার'।

সংস্কৃতি

মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলো একত্রিত হয়ে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়, কিন্তু একটি সম্পূর্ণ এককজাতি সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। যে দেশ থেকে পাকিস্তান পৃথক হয়েছিল, সে দেশের ন্যায় পাকিস্তানও ছিল বহুজাতি এবং বহু নৃতাত্ত্বিকবিশিষ্ট। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান এবং তাদের মধ্যে ছিল অনেক সাদৃশ্য। কিন্তু ভারত থেকে পৃথক হবার পূর্বে, অর্থাৎ দেশ বিভাগের আগেই, যে সকল অঞ্চল পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের অংশ হয়, সেগুলোর পৃথক পৃথক চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল এবং তা রক্ষা করার অধিকার তাদের ছিল। কোন গোষ্ঠী অন্য কোন গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে নারাজ থাকাই স্বাভাবিক। যখনই এ ধরনের শাসনের প্রচেষ্টা চালানো হয়, ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে, তখনই তা বিভিন্ন গোষ্ঠিকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়।

পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশে এ ব্যাপারটি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাদের আদি পূর্ব পুরুষরা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেমনটি ছিল তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া এবং সামাজিক রীতিনীতি। তাদের নৃত্য, সঙ্গীত এবং কবিতার প্রতি ভালবাসার জন্য হিন্দু বাঙালির সাথে তাদের কিছু সামঞ্জস্য ছিল। এটা সত্যি যে অতীতে হিন্দু উচ্চবিত্ত শ্রেণী বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনধারার উপর কর্তৃত্ব করতো এবং এ প্রদেশে দুটি ধর্মগত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বেশি সংমিশ্রণ ছিল। তা হবারই কথা!

ভারতে যারা পশ্চিমের বাঙালি, তারা পূর্ব পাঞ্জাবীদের থেকে একেবারেই ভিন্ন এবং এর প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্ম। তাদের ধর্ম, শারিরীক গঠন, পোশাক- পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস সবই ভিন্ন। আবার উত্তর প্রদেশের হিন্দুদের সাথে মাদ্রাজিদের প্রচুর পার্থক্য তাদের জাতে, বর্ণে, ভাষায়, রীতিনীতিতে কিন্তু তারা সবাই ভারতীয়।

www.pathagar.com

তবে এ সকল ভিন্নতা বা পার্থক্যের কারণে পাকিস্তানের দুই প্রদেশ কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল?

পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি বাঙালিদের অধস্তন হিসেবে ব্যবহার না করতো, বাঙালিরা যদি তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হতো, তাহলে এ সকল জনগোষ্ঠির ভিন্নতা কোন প্রভাবই ফেলতে পারতো না। পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের আনুগত্য বজায় থাকতো।

এমনিতেই ভাষা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে কেন্দ্রের প্রতি তিক্ত মনোভাবের সৃষ্টি হয়। তাদের আবেগের উপর আবার আঘাত হানা হয়, যখন পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর আব্দুল মোনেম খান এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন, যিনি নিজেই বাঙালি উচ্চবিত্ত শহুরে শ্রেণীর সদস্য, রেডিও ঢাকা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য বেতার কেন্দ্রে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্প্রচার নিষিদ্ধ করেন। এটা ছিল নেহায়েত বোকামি। কারণ, ততোদিনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)- এর জন্ম পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়া জেলায়। এতে করে তার প্রতি পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের শ্রদ্ধা আরো বেড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে তার অতি গর্বের স্থান রয়েছে। তার গান শোনবার জন্য তখন বাঙালিরা কলকাতার রেডিও শুনতে আরম্ভ করল, যা পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ পরিহার করতে চেয়েছিল। তার কবিতায় হয়ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের আবেগ জাগ্রত হতে পারে, তবে সীমান্ত প্রদেশে খুশাল খান খাট্টাকের লেখাও একই প্রভাব বিস্তার করলেও, পশ্চিম পাকিস্তানে তার কবিতা তো নিষিদ্ধ হয়নি। সীমান্তের ওপারের সাহিত্যের সংস্পর্শে এনে 'বাঙালিদেরকে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল তাদের নেতারা' আমি মাস্‌ওয়ানির এ কথা মানতে নারাজ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি বাঙালিদের (হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই) যে কি আসক্তি, তা বোঝা যায় প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুমের কথায়। তিনি জন্মগত বাঙালি। স্বেচ্ছায় পাকিস্তানী। তিনি বলেন যে, যেবার তিনি প্রথম কা'বা শরীফ দেখেন, তখন যে কবিতা তার মনে জেগেছিল তা আল্লামা ইকবালের কোন কবিতা নয়, তা ছিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর কবিতা; যেখানে কবি তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন শক্তি দেয়ার জন্য যেন সে প্রভুর গলায় মালা দিতে পারে, ফুল শুকিয়ে যাবার আগে। কাইয়ুম নিজে উর্দুতে পারদর্শী। তিনি আরবীসহ নানান ভাষায় পারদর্শী, তারপরও তার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা গেঁথে ছিল। যেখানে কবি অপূর্ব ভাষায়

www.pathagar.com

স্রষ্টার প্রতি মানুষের অনুরক্তির বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা, 'আমার সোনার বাংলা' বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব চিত্র এবং এটাই আজকের মুসলমান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বাঙালিদের শ্রদ্ধার এটাই এক উদাহরণ।

পাকিস্তানের প্রতি গভীর দেশপ্রেম তাদের রবীন্দ্র আসক্তি দুর করতে পারেনি। একজন প্রখ্যাত বাঙালি লেখক বলেছিলেন, 'আমরা কিভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক কা'বা থেকে সরে যাব?'

চল্লিশের দশকে অবশ্য মুসলমান সমাজে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। মুসলমান সমাজে রাম-সীতার গল্পের পরিবর্তে শোনা যাচ্ছিল ইউসুফ- জুলেখার কাহিনী, তবে তা শিক্ষিত সমাজমাত্র। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৩-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে ইসলামি ভাব এনেছেন তার লেখায়।

দমননীতি দ্বারা পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনা অবশ্যই এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। উচিৎ ছিল মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের উৎসাহ প্রদান করা। আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। যাতে তারা উচ্চমানের সাহিত্য বই প্রকাশ করেন, যেগুলোতে ইসলামি আদর্শের ছোঁয়া থাকে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের তুলনায়। এ ধরনের সাহিত্য পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কাছে অতিমাত্রায় গ্রহণযোগ্য হতো। যাদুনাথ সরকারের 'হিস্টোরি অব বেঙ্গল- দি মুসলিম পিরিয়ড'-এর পরিবর্তে অন্য ইতিহাস বই প্রকাশ করা উচিৎ ছিল, যেখানে বাংলায় মোগল শাসনের প্রকৃত রূপ স্থান পেতো।

পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, সাধারণ বাঙালি মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানদের মতই তাদের ধর্মের প্রতি অটুট ঈমান পোষণ করে। যে কোন পাঠান বা পাঞ্জাবির মতোই, তারাও নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ পূর্ববাংলার সামাজিক রীতিনীতি পছন্দ করতেন না এবং এগুলোকে ইসলামবিরোধী হিসেবে গণ্য করতেন। প্রফেসর দানি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালিদেরকে কম ধার্মিক মনে করতেন। কারণ, বাঙালি নারী শাড়ি পড়তো এবং কপালে টিপ দিত। কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারি কর্মকর্তা যখন বক্তব্য রাখেন যে, বাঙালিরা বাঙালি হিন্দুদের সাথে একত্রিত হয়েছে, তখন খন্দকার এর জবাবে বলেন, ''আমরা যে ভাল মুসলমান, তা প্রমাণ করার জন্য কি আমাদেরকে সার্টিফিকেট দেখাতে হবে?''

www.pathagar.com

ড. আফিয়া দিল স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতির মধ্যে অনেক অমিল রয়েছে, তার মতে এ সত্যটাকে মেনে নেয় শ্রেয় ছিল। জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রাক্তন উপদেষ্টা জিডাব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন, 'তারা একটি ইসলামভিত্তিক সাধারণ সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল।'

বলা বাহুল্য, ভারতীয় লেখকগণ এ সাংস্কৃতিক ব্যবধানকে অনেক বড় করে প্রচার করে।

বাঙালি ব্রিগেডিয়ার হাফিজ ছিলেন হালকা-পাতলা, তাঁর দাঁড়িও ছিল হালকা-পাতলা। এক ঈদে তিনি তাঁর কুর্তা- পায়জামা পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে অবস্থিত ঈদগাহে নামাজ পড়তে যান। তার পোস্টিং ছিল শিয়ালকোটে। এ সময়ে তার জ্যেষ্ঠ অফিসার ব্রিগেডিয়ার আতা মুহম্মদ হাফিজকে বললেন, 'ইয়ে কিয়া মাসকিনো ওয়ালি শাকাল বানাই হুই হ্যায়!' অর্থাৎ এক মিসকিনের মত চেহারা বানায় রেখেছো? তার পোশাক সমন্ধে তার পাঞ্জাবি কর্মকর্তার এ মন্তব্য হাফিজ মোটেও পছন্দ করেনি।

বিখ্যাত লেখক খালেদ বিন সাঈদ সঠিকভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, যারা পশ্চিম পাকিস্তানের অর্ধ-শিক্ষিত ধর্মীয় নেতা ছিলেন, তাদেরই ধারণা ছিল বাঙালি মুসলমানদের 'বিশুদ্ধকরণ'বা পিউরিফিকেশন প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের এ সংকীর্ণমনা, অর্ধশিক্ষিত মোল্লারা সচেতন ছিলেন না যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামি দেশের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এক নয়। পোশাক পরিচ্ছদে, উৎসবের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের সাথে সৌদী আরবের মুসলমানদের অনেক তফাৎ। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় প্রতীক 'গারুদা', যা হিন্দু ধর্মের এক মিথিকার পাখি। তুর্কিরাও পাকিস্তানীদের মত মুসলমান, পাকিস্তানের মতই তাদের মধ্যেও আছে ভাল মুসলমান, খারাপ মুসলমান। তবে পোশাক পরিচ্ছদে পাশ্চাত্যেরর সাথে তাদের বেশি মিল। তারা কি পড়বে, কিভাবে অবসর সময় কাটাবে, অন্যের চাপিয়ে দেয়া আদেশ তারা কোনভাবেই মানবে না। এমনকি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' কথাটি যদিও প্রায় সব মুসলমান দেশে ব্যবহৃত হয়, অনেক ক্ষেত্রে অন্য সম্বোধন ব্যবহার হয়। যেমন আরব বিশ্বে বলা হয় 'আহলান ওয়া সাহলান' বা 'শাবা- আল- খেইর'।

প্রফেসর দানির মতে, 'বাঙালি সংস্কৃতি এবং রক্ষণশীল ইসলামের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়'। স্বাধীনতার পরে, পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে, বেঙ্গলি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জয়নুল আবেদীন তার রঙের তুলিতে

www.pathagar.com

বাংলার প্রকৃতি ও সংস্কৃতি তুলে ধরেন। পূর্ব বাংলার লালিত চারুকলা পুনরায় তুলে ধরে বুলবুল একাডেমি। 'বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, সাহিত্য ও চারুকলা বিষয়ক সেমিনার প্রত্যেক সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে থাকলো'- বলেন প্রফেসর দানি।

রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কাছে ইসলাম পরিপন্থী বলে মনে হলেও, নাচ গান ছিল বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। আমার মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি সৈয়দপুরে এক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বিভিন্ন রকমের নাচ গান পরিবেশন করা হচ্ছিল। সেখানকার মুসলমান জেলাপ্রশাসকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'আমার মেয়েও খুব ভালো ভারত নাট্যম নাচতে পারে।'

একটি হিন্দু- মুসলমান, উভয় ধর্মের বাঙালি মেয়ে সাধারণত যে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতো, তার সাথে যদি ক্লাসিকাল নাচও নাচতে পারতো, তাহলে তাকে আরো গুণী হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিয়ের ব্যাপারে এটি ইতিবাচক যোগ্যতা বলে মনে করা হয়। রক্ষণশীল মুসলমানদের কাছে তা নেতিবাচক মনে হলেও, তা ছিল বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতি- যা এখনও বিরাজমান।

জেনারেল রাও ফরমান আলী খান, যিনি বেশ কয়েকবছর পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। চাঁদপুরের এক ফেরিঘাট উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে বাঙালি মেয়েদের নাচ দেখে বিব্রত হন। মেজর জেনারেল ফাজি মুকিমও পূর্ব বাংলায় কর্মরত ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে না আনার জন্য তিনি পূর্ব বাংলার সরকারকে দোষারোপ করেন। এ ধরনের নীতি বাঙালিদেরকে আরো বিচ্ছিন্ন করে ফেলত এবং দেশ আরো আগেই ভেঙ্গে যেত।

জি ডাব্লিউ চৌধুরী নিজেই একজন বাঙালি ছিলেন, তিনি লিখেছেন, 'সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের খোঁজে পূর্ব পাকিস্তানীরা আরো বেশি করে পশ্চিম বাংলার দিকে তাকিয়ে থাকতে আরম্ভ করল।' তার মতে, ''বাঙালি বুদ্ধজীবীরা তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী নিজ দেশের জনগণের চেয়ে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের সাথে বেশি স্বস্তিবোধ করতেন।'' এটা শুধুমাত্র বাঙালিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভাষাভিত্তিক ঐক্য মাঝে মাঝে ভৌগলিক সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে তা সাংস্কৃতিক বিনিময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এতে কেউ নিজ দেশকে অস্বীকার করে না। আমি প্রবাসে দেখেছি যে অনেক পাঞ্জাবী তাদের নিজ দেশের উর্দুভাষী ব্যক্তিদের চেয়ে শিখদের সঙ্গ উপভোগ করে বেশি। কারণ, তারা একই ভাষায় কৌতুক ও আলাপ করতে মজা পায়।

www.pathagar.com

যখন জনাব মুহম্মদ খান জুনেজো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন থাইল্যান্ডে একজন সিন্ধি হিন্দু ব্যবসায়ী তা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। কারণ, একজন সিন্ধী প্রধান নির্বাহীর পদে অভিসিক্ত হলো, যেখানে তার নিজ দেশ ভারতে তখন পর্যন্ত তা সম্ভবপর হয়নি। এগুলো ক্ষণিকের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, যা জাতীয় ঐক্যের উপর কোন প্রভাব ফেলেনা।

পাকিস্তান যে সাংস্কৃতিকভাবে বিভক্ত ছিল, সে ব্যাপারে পাকিস্তান পিপ্‌লস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বেশ সচেতন ছিলেন। তিনি অনুভব করতেন যে, Unity was not flowing from the fountain head of a single nationality. অর্থাৎ এক জাতীয়তার উৎস থেকে ঐক্যের প্রবাহ ছিল না। তবে তিনি অনুভব করতেন যেন অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের উপর সাংস্কৃতিক বোঝা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছিল। তিনি লেখেন, "স্বেচ্ছায় গড়ে ওঠা ঐক্য এবং চাপিয়ে দেয়া ঐক্যের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।" বাঙালিদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিলানোভা ইউনিভার্সিটির পাকিস্তানী অধ্যাপক প্রফেসর হাফিজ মালিক বলেন, 'এটি ছিল একটি স্বতন্ত্র ইসলামী বাঙালি সাংস্কৃতি' এবং তারা এ সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করতে যথাযথ বদ্ধপরিকর। দুই প্রদেশের সংস্কৃতিকে একত্রিত করার কোন প্রচেষ্টা বাঙালি মুসলমানদেরকে কেবল আরো দূরে সরিয়ে দেবার সামিল।

পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে ভুল ধারনার প্রতিফলন পাওয়া যায় ঢাকার একটি রেষ্ট হাউজের এক কর্মচারির মন্তব্যে। ১৯৯২ সালে আমি যখন ঢাকায় যাই, টিভি দেখার সময়ে হঠাৎ মাগরিবের আযান প্রচারিত হয়। সে দিন ছিল শবে বরাত এবং শবে বরাতের তাৎপর্য সম্পর্কে বাংলা ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছিল। আমি বেশ খুশীও হলাম, চমৎকৃতও হলাম। আমি সেই কর্মচারিটিকে জিজ্ঞেস করলাম, আযান কি প্রত্যেকদিন প্রচারিত হয় নামাজের ওয়াক্তে? সে তিক্ততার সঙ্গে জবাব দিল, ' আব আপকো মালুম হুয়া কি হাম ভি মুসলমান হ্যায়, হামকো হিন্দু সামাঝ কার মার দিয়া', অর্থাৎ 'এতদিনে তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরাও মুসলমান, আমাদেরকে তো হিন্দু ভেবে মেরেই ফেলেছ।' একজন অর্ধশিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি যুবকের মুখে এ কথা শুনে , তাও দেশ ভাঙ্গার একুশ বছর পর, আমার ভিতর নাড়া দিয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারির প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অহঙ্কারী আচরণ সম্পর্কে যা শোনা যায়, তা সবই সত্য। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে পূর্ব বাংলার মুখ্য সচিব এম এ আজিজ যখন জনসভায় যেতেন, তিনি মশারির নীচে বসে জনগণের সাথে কথা বলতেন, যাতে মশা তাকে কামড়াতে না পারে। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত এসব পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের এরূপ আচরণের কারণে তাদের প্রতি, বিশেষ করে পাঞ্জাবি কর্মকর্তাদের প্রতি তিক্ততার সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত ভদ্রলোক একবার পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিনকে বলেছিলেন, ঠিক মত পোশাক পড়ে আসতে, কারণ তার পরিহিত শেরওয়ানি-পাজামা গ্রহণযোগ্য নয়। ব্রিগেডিয়ার হামিদ স্মরণ করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের পিন্ড দাদান খান এলাকার একজন পাঞ্জাবি নন কমিশন্ড অফিসার তার এক বাঙালি সেনাকে 'কালু' বলে সম্বোধন করত। কারণ, তার গায়ের রং ছিল কালো। 'মজার ব্যাপারটি ছিল', বলেন হাফিজ, 'এ এনসিও - এর গায়ের রং কিন্তু আরো কালো ছিল।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তালুকদার মুনরুজ্জামান বলেন যে, লাহোরে একবার এক দোকানী তাকে জিজ্ঞেস করল যে তার দেশ কোথায়। উনি জবাব দিলেন, পূর্ব বাংলা। দোকানদার বলে উঠলো, 'কিন্তু আপনাকে তো হিন্দুর মত দেখতে মনে হয়।' তালুকদার মুনিরুজ্জামান স্বভাবতই অপমান বোধ করলেন।

১ আগস্ট ১৯৪৭-এর এক ঘটনা স্মরণ করেন ড. দানি। তিনি ঢাকায় এসে রাজশাহী গেলেন। সেখানকার এক স্থানীয় বাসিন্দার সাথে তার পরিচয়। লোকটি তাকে বললো, 'ও, তোমরা আমাদেরকে শাসন করতে এসেছো?' দানি তাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে, তিনি একজন অধ্যাপক এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছেন। কিন্তু লোকটির কথা তাকে অবাক করল বটেই।

পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত সেনাবাহিনী বেশির ভাগ যারা পাঞ্জাবি ছিল এবং স্থানীয় জনগণ (সবাই বাঙালি)- এর সামাজিক মানসিকতার মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। এ ব্যবধানটি ছিল স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গের ছোট্ট এক শহর সৈয়দপুরে সেনাবাহিনীর একটিমাত্র ইউনিট ছিল। ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কোয়েটা স্টাফ কলেজে যেমন বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়, এখানেও তিনি সে ধরনের ব্যবস্থা করবেন। তার সেনা কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের জন্য তিনি যথারীতি প্রত্যেক শনিবার স্থানীয় সিনেমা হলে ডজনখানেক আসন রিজার্ভ করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি।তিনি আরো ব্যবস্থা করলেন যেন তাদের মেস ওয়েটার ইউনিফর্ম পড়ে বিরতির সময় এসে সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে হালকা নাস্তা পরিবেশন করে। পাকিস্তানের শুরুর দিকে এসব মিলিটারি কায়দা পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু গ্রহণযোগ্যই ছিল না, তা প্রশংসনীয়ও ছিল কিন্তু বাংলার ছোট একটি শহরে এসব রীতিনীতির প্রতি মানুষের বিদ্রূপ মনোভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

২৩ মার্চ ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন জারি করেন। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বিভিন্ন আর্মি ইউনিট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বেরিয়ে আসে। দিনাজপুরে সাময়িকভাবে অবস্থিত একটি সাব-ইউনিটের ব্যাটম্যান ভোর বেলায় সেখানকার জেলা প্রশাসকের বাসভবন কাম অফিসে গিয়ে গার্ডকে আদেশ করলো পতাকা নামাবার জন্য। কারণ, এখন থেকে পতাকার উড়বে মেজর সাহেবের মার্শাল ল হেড কোয়ার্টারে। সেনা সদস্যটির কাছে মনে হল সে শুধুমাত্র তার দায়িত্ব পালন করছে, কিন্তু বাঙালি জেলা প্রশাসক এবং তাঁর অধিনস্থ কর্মচারির কাছে এটি ছিল ‘পাঞ্জাবি’ প্রধান সেনাবাহিনীর ঔদ্বত্য বৈকি। বলা বাহুল্য, একই দিনেই পতাকাটি ফের জেলা প্রশাসকের বাসায় স্থান পায়।

অনেক ক্ষেত্রে বাঙালি সৈন্যদেরকে নাম ধরে না ডেকে ডাকা হতো ‘বাঙালি’ বলে। এগুলো হয়তোবা ইচ্ছাকৃত কিছু ছিল না, তবে এ ধরনের ছোটখাটো ব্যাপারগুলো থেকে স্পষ্ট হয় বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবজ্ঞা।

রাজনীতি

সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোর চেয়ে যে ব্যাপারটি পূর্ব পাকিস্তানীদের রাজনীতিকদের এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশি ক্ষোভের কারণ হয়ে দাড়ায়, তা হলো দেশের প্রশাসনে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণ না থাকা। ভারতের মুসলমান শাসনের সময়েও, বাংলা ছিল একটি প্রতিবাদী প্রদেশ, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে তাদের ছিল প্রতিরোধের প্রবণতা। খিলজির আমলে ইলিয়াস শাহ্ এবং তার উত্তরসূরীগণ দিল্লী থেকে পাওয়া আদেশ উপেক্ষা করত। পূর্ব পাকিস্তানীদের অংশগ্রহনের ঘাটতি নিয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করেন ঢাকার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম এবং তার মতে এটাই ছিল বাঙালিদের বিচ্ছিন্নতার প্রধান কারণ। বেশিরভাগ বাংলাদেশী

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তাগণ একই মত পোষণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রওনক জাহান মনে করেন যে, বাঙালিরা এ উপমহাদেশের 'সবচাইতে রাজনৈতিক জনগণ'। তার নিজ দেশের জনগণের সম্পর্কে তার এ মূল্যায়ন যথার্থ। বিশিষ্ট বাঙালি রাজনীতিবিদদের ঘনঘন বহিস্কার, বরখাস্ত এবং গ্রেফতার তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। অন্যান্য প্রদেশে যা কেবলমাত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে গণ্য ছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানে এক অশুভ আকার ধারণ করে।

খাজা নাজিমুদ্দিনকে পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। তিনি নিজে বাঙালি ছিলেন বলে ধরে নেয়া হয়েছিল যে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তিনি অতি শীঘ্রই অপ্রিয় হয়ে যান। কারণ, তিনি গ্রাম বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করেন না। পাকিস্তানের সৃষ্টির পর থেকে গ্রাম বাংলার কণ্ঠস্বর জোরালো হতে থাকে। ১৯৪৯ সালের বন্যায় ফসল ধ্বংস হওয়াতে তিনি আরো সমস্যায় পড়েন। বাজার দর ঊর্ধ্বমুখী হতে লাগলো, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হতে থাকলো এবং এ সবের ফলশ্রুতিতে নাজিমুদ্দিনের মুসলিম লীগ সরকারের অবস্থা করুন হতে থাকল। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের ন্যায্য দাবি নিয়ে বাঙালিরা আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে উঠে। প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় ব্যতীত, সব বিষয়ে পূর্ণ স্বাতন্ত্রের দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে লিয়াকত আলী খানের পেশকৃত বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটির রিপোর্ট- এর বিরুদ্ধে তারা আপত্তি জানায়। এই কমিটির রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন করা হবে। যেখানে পূর্ব পাকিস্তান পাবে ১৬৫ আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাকি চার প্রদেশ পাবে মাত্র ১৩৫ আসন। যদিও ব্যাপারটা বাঙালিদের অনুকূলে ছিল, তাদের আপত্তি ছিল উচ্চ কক্ষের ব্যাপারে। এতে প্রত্যেক প্রদেশ পাবে ২০টি করে আসন। তাদের কাছে এটি ছিল স্রেফ প্রতারণা। কারণ, দুই হাউসের যৌথ অধিবেশনে তারা সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়াবে।

পূর্ব বাংলার দুই উঠতি রাজনীতিবিদ কামরুদ্দিন এবং আতাউর রহমান খান বিপিসি- এর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে উসকিয়ে দিতে লাগল। ৪ নভেম্বর ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন থেকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়, শুধু মাত্র প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রাখাত ছাড়া। স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এটাই ছিল প্রথম বহিঃপ্রকাশ, যদিও এতো স্পষ্টভাবে তা হয়

www.pathagar.com

নাই। পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র তিনবছরের মাথায় এ দাবি করা হয়। যারা ভারতের মুসলমানদের আলাদা দেশের জন্য লড়াই করেছিল, তাদের মধ্যে এ ব্যাপারটি নিশ্চয়ই উত্তেজনার সৃষ্টি করে। লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পরে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে, বাঙালি অংশটি খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে এবং পাঞ্জাবি অংশটি গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহম্মদের সমর্থনে। নাজিমুদ্দিন আরেকটি বিপিসি রিপোর্ট উপস্থাপন করেন, যেখানে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তান উভয়কে সমানসংখ্যক আসন দেওয়া হয়, পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) তৃতীয় খসড়া প্রণয়ন করেন। পূর্ব বাংলা থেকে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের কাছেও এটা গ্রহণযোগ্য ছিল। তাদের নীতি ছিল যে বাঙালিরা ওদের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। কারণ, কিছু কিছু পশ্চিম পাকিস্তানী হয়তো 'প্ররোচিত' হয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করবে, যা সেই প্রদেশের পক্ষে যাবে।

দেশটির অখণ্ডতা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোলাম মুহম্মদের কারণে। তিনি পাকিস্তানকে নিজ জমিদারি হিসেবে শাসন করতেন। ভাগ্যের গুণে এ আমলা দেশের শীর্ষ পদে অভিষিক্ত হন। কারণ, তার চারপাশে ছিল নিম্নমানের লোকজন। তিনি দেশে নিজেকে সর্ব শক্তিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এটা আসলে তার ভাগ্য, না হলে কেন এ অসুস্থ গভর্নর জেনারেলকে গ্রহণ করা হবে, যার অস্পষ্ট কথাগুলো বোঝার উপায় ছিল না? রাগান্বিত হলে তিনি আশেপাশের লোকজনের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। তার অসাংবিধানিক কার্যকলাপের জন্য পাকিস্তানে প্রথম ফাটল ধরে। কেবলমাত্র একটি দুর্বল বিচার বিভাগ থাকাতে তিনি সংবিধানকে নিজ ইচ্ছায় সাজাতে পেরেছেন। অসুস্থতার কারণে তাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা উচিৎ ছিল। অথবা, সংবিধান লংঘনের জন্য তাকে ইমপিচ করা উচিৎ ছিল।

সে সময় খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে রাস্তায় কোন আন্দোলন গড়ে উঠে নাই। তবুও ১৭ এপ্রিল ১৯৫৩ সালে গোলাম মুহম্মদ তাকে বরখাস্ত করেন এবং একটি নেতিবাচক নজির স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশত, এটাই পরবর্তীতে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে থেমে থাকেননি। তিনি গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। পরবর্তীকালে তার উত্তরসূরীরা এ উদাহরণটি অবলম্বন করে। এটি খুবই দুঃখজনক। কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে দেবা শরীফের হাজী ওয়ারিস আলী শাহ- এর অনুসারী বলে দাবি করেন, তিনিই এ অসাংবিধানিক কাজটি করলেন। তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়ে অনুরোধ

www.pathagar.com

জানিয়েছেন, যেন মৃত্যুর পরে তাকে ভারতে হাজী সাহেবের পায়ের কাছে সমাধিস্থ করা হয়।

প্রখ্যাত ব্যারিস্টার এবং আওয়ামী লীগের প্রাক্তন চিফ হুইপ আমীর উল ইসলাম বলেন যে, ' যে মুহূর্তে গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়া হয়, সে মুহূর্তে পাকিস্তানকে ধ্বংস করা হয়।' তার মতে, পাকিস্তানের ভাঙ্গনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট দায়ি। তার এ কথাগুলো অবশ্য যুক্তির চেয়ে আবেগ দ্বারা তাড়িত। তবে মৌলভী তমিজউদ্দীন বনাম রাষ্ট্র মামলায় যখন উচ্চ আদালতের রায়কে সুপ্রিম কোর্ট উল্টিয়ে দেয়, এটি ভবিষ্যতের জন্য ল অব নিসেসিটির অধীন অসাংবিধানিক কার্যকলাপের নজির স্থাপন করে। খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মৌলভী তমিজউদ্দীনের অপ্রত্যাশিত বরখাস্ত বা পদচ্যুতি বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে সে প্রদেশে মুসলিম লীগের 'মৃত্যু' ঘটে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দিন ধরে সুপ্ত রাজনৈতিক এবং আর্থ- সামাজিক ইস্যুগুলো এখন সামনে চলে আসে।

ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে ওয়ান ইউনিট স্কীম অনুমোদন পায়। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশ, যথা- পাঞ্জাব, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এন ডব্লিউ এফ পি) , সিন্ধ ও বালুচিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান নামে একত্রিত করা হয়, যার রাজধানী লাহোর। পূর্ব পাকিস্তানকে চারটি প্রদেশে একত্রিত করার পরিকল্পনা ১৯৪৮ সালে উল্লিখিত হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালে মালিক ফিরোজ খান তা আবার গণপরিষদে উপস্থাপন করেন।

১৯৫৬ এর সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২ মার্চ পাস হয় এবং পাকিস্তানে দুইটি প্রশাসনিক প্রদেশ স্থাপিত হয়- একটি পূর্বে এবং অন্যটি পশ্চিমে এবং দুই প্রদেশের মধ্যে ছিল সমতা। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতা দুই প্রদেশের মধ্যে এ সমতা মেনে নিলেও, উগ্রবাদিরা ওয়ান ইউনিট স্কিমের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। কারণ, এ পরিকল্পনার কেন্দ্রে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমে যায়। পূর্ব বাংলার নাম বদল হয়ে পূর্ব পাকিস্তান হয়- এ পরিবর্তনও তাদের অপছন্দ। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতে, 'ওয়ান ইউনিট ব্যাপারটি পুর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মেরুকরণকে আরো জোরদার করে। এতে দুই প্রদেশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।' তিনি এ কথা বললেও এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নাই যে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মন্ত্রীসভার সদস্য থাকাকালীন সময়ে তিনি ওয়ান ইউনিট স্কিমের বিরোধীতা করেছেন।

www.pathagar.com

ওয়ান ইউনিট স্কিমটি ছিল একটি ত্রুটিপুর্ণ নীতি। এ পরিকল্পনা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কোন সুফল বয়ে আনে নি; পূর্ব পাকিস্তানীরাও তা পছন্দ করতে পারে নি। এটির মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালিদের কর্তৃত্বকে প্রতিহত করা, তাদের সমস্যার সমাধান করা নয়। বাস্তবে এতে দুটি পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়, একটি পূর্বে এবং অন্যটি পশ্চিমে।

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদ পুনরায় দাবি ব্যক্ত করে যেন কেন্দ্র মাত্র তিনটি বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে- প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং মুদ্রা। ততদিনে স্পষ্টত প্রতিয়মান হবার কথা ছিল যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপর পূর্ব বাংলার রাজনীতিকরা এবং বুদ্ধিজীবীরা আস্থা হারাচ্ছিল। কেন্দ্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব অতিনগন্য। তারা উপলব্ধি করলো যে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে তারা তাদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু করতে পারছিল না, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের চাইতে তাদের প্রয়োজন ছিল বেশি।

তারা দৃঢ়তার সাথে উপলব্ধি করলো যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ অতি জরুরি হয়ে উঠেছিল। কারণ, সাধারণ সমস্যা সমাধানে অত্যাধিক বিলম্ব হতে থাকে। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা থাকলে এ সব ব্যাপারে অতি শীঘ্রই সমাধান করা যেত। অবকাঠামো উন্নয়ন, পারমিট ও লাইসেন্স অনুমোদন করা ঋণের অনুমোদন দেয়া, শিক্ষানীতি, কর নিবৃদ্ধি করা, মোটামুটি সব কিছুই ছিল করাচিতে অবস্থিত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। তাদের জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা, সমস্যা সমাধান করা, প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কঠিন এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠে। রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে সরিয়ে আনা হলে অসন্তুষ্টি বেড়ে যেতে থাকে। কারণ এতে আরো এক হাজার মাইল দূরত্ব যোগ হয় কোন কাজের জন্য কেন্দ্রে যেতে হলে। তারা উপলব্ধি করল যে রাজধানী এভাবে আরো উত্তরে স্থানান্তর হওয়াতে পাঞ্জাবিদের প্রভাব আরো বেড়ে যাবে। সাক্ষাৎকারের সময় এ কথাটি উত্থাপন করা হলে খন্দকার মোশতাক বলেন, 'আমার সম্মতি কি নেয়া হয়েছিল?'

'রাজধানী হিসেবে ইসলামাবাদকে নির্বাচন করা বাঙালিরা ঠিক পছন্দ করেনি', বলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সাবেক মন্ত্রী শামসুল হক। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব এনাম চৌধুরীও বলেন যে, ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করাও বাঙ্গালিদের বিচ্ছিন্নতার একটি কারণ।

www.pathagar.com

পূর্ব বাংলার প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া উপায় ছিলনা। কারণ, এ অঞ্চলের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ছিল এমন- বড় বড় নদী, খাল, বিল যা দেশটিকে ছোট ছোট আলাদা আলাদা অঞ্চলে ভাগ করে। সমস্য সমাধানের জন্য স্থানীয় রাজনীতিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে যেতে এ অঞ্চলের জনগণ অভ্যস্থ ছিল। স্বাভাবিকভাবে এ প্রদেশের রাজনৈতিক নেতারা আরো ক্ষমতা দাবি করে তাদের জনগণের প্রয়োজন পূরণের জন্য।

কেন্দ্র ও পূর্ব বাংলার মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্নটি, বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে, খুঁটিয়ে দেখা প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান যেহেতু পাশাপাশি অবস্থিত ছিল না এবং দুই প্রদেশের মধ্যে যেহেতু যোগাযোগ ছিল কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ, পূর্ব প্রদেশকে স্বায়ত্বশাসন দেয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিৎ ছিল। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সাথে অন্য চারটি প্রদেশকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন ছিল না।

পূর্ব প্রদেশ এবং কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন সঠিকভাবে না হলে এর পরিণতি কি হবে, তা নিয়ে আরো স্পষ্ট দূরদৃষ্টি থাকা উচিৎ ছিল। দুই প্রদেশের নেতাদের দরকার ছিল আরো সহমর্মিতা ও সহিষ্ণুতা। আঞ্চলিক আনুগত্যের উর্ধ্বে উঠে আন্তরিকতার পরিচয় দেয়া দরকার ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে দেশটির সে রকম কোন নেতা ছিল না।

হোসেইন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দুই প্রদেশকে একত্রিত করে রাখতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে জোর করে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করানো হলো এবং তাতে তিনিও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

এরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা এবং জেনারেল মুহম্মদ আয়ুব খান পরিকল্পনা করতে থাকলেন, কিভাবে প্রশাসনকে তারা আরো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। এদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে থাকে। এর সমাধান নিশ্চয় ছিল না বল প্রয়োগ করা, বাকশক্তি রুদ্ধ করা, সামরিক আইন জারি করা, সংবিধান স্থগিত করা। অথবা, জনগণের আইনগত অধিকার ছিনিয়ে নেয়া। কিন্তু যে দুজনের হাতে সে সময়ে ক্ষমতা ছিল, তারা ঠিক তাই-ই করল। ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে, ইস্কান্দার মির্জার সম্মতিক্রমে, জেনারেল আয়ুব খান একটি সফল অভ্যুত্থান সম্পন্ন করেন। ইস্কান্দার মির্জা সংবিধান স্থগিত করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে বরখাস্ত করলেন। আইন পরিষদগুলো বিলুপ্ত করলেন । সব রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হলো এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত করলেন।

www.pathagar.com

এর তিন সপ্তাহ পর রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে ফেলেন এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। একই সঙ্গে কেন্দ্রকে আরো শক্তিশালী করেন। তার কাছে অবাধ গণতন্ত্র ছিল বিপদজনক কেননা জনগণ ছিল 'অশিক্ষিত এবং রাজনীতিকরা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ।' কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বিরোধীতা করে। তারা আরো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রের হাতকে আরো শক্তিশালী করা হল।

পূর্ব প্রদেশের নেতারা সামরিক শাসনের বিরোধীতা করে। কারণ, এ শাসনের অধীনে কেন্দ্রের শক্তি আরো বেড়ে যায়। আরো একটি শক্তিশালী সামরিক/বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা পায় যেখানে তাদের প্রতিনিধিত্ব অপ্রতুল। রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়াতে, তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে কাউকে আবার কারাগারে প্রেরণ করা হয় এবং এতে ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে সে সকল রাজনৈতিক সমস্যা দেশের উপর ভর করেছিল, সেগুলোকে সমাধান করবার জন্য আইয়ুব খানের ছিল যথেষ্ট সুযোগ। তার ছিল শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, সামরিক বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাথে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। কারণ, সেখানে তিনি জিওসি হিসেবে ছিলেন। কিন্তু তিনি এ কাজে ব্যর্থ প্রমাণিত হলেন। তার প্রায়োরিটি ছিল ভুল। তিনি দ্রুত শিল্পায়ন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার ধারণা ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে সব রাজনৈতিক কোলাহল বন্ধ হবে।

ফিল্ড মার্শাল তার নিজস্ব স্টাইলে গণতন্ত্রের সূচনা করলেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের প্রতিনিধি স্থির করবার অধিকার, জাতীয় এবং প্রাদেশিক পর্যায়ে ছিনিয়ে নিল। তারা শুধুমাত্র 'মৌলিক গণতন্ত্রী' নামক স্থানীয় সংগঠন নির্বাচন করার অধিকার পায়। জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের জন্য এই ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর সমন্বয়ে ইলেকটোরাল কলেজ গঠন করা হয়। এই মৌলিক গণতন্ত্র নামক ব্যবস্থাটি মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিশেষ করে যারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। এ ব্যবস্থায় তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়। কারণ, এ ব্যবস্থায় জনগণের উপর তাদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে না। তারা জনগণকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে না, অথবা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে না। । মৌলিক গণতন্ত্রীরা, অন্য পক্ষে আমলাদের দ্বারা সহজে পরিচালিত হতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কথামত চলে। মঈনুল হোসেন, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ছেলে বলেন,

www.pathagar.com

'মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি প্রহসন।' অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমেদ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা সংসদীয় ব্যবস্থা দাবি করে।

১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রতিজ্ঞা ছিল যে দুই প্রদেশের মধ্যে শীঘ্রই অসমতা দূর করা হবে। কিন্তু এভাবে আশা দিয়ে আশা ভঙ্গ করার ফলে তা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কে. বি সাঈদের মতে এটি দেশ ভাঙ্গার কারণ না হলেও, এতে প্রাদেশিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। মেজর জেনারেল ফজল মুকিম, যিনি পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করেছিলেন, তিনি বলেন- 'পূর্ব পাকিস্তানের সব চাইতে বড় অসন্তোষের কারণ ছিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে তারা ন্যায্য ভাগ থেকে বঞ্চিত ছিল, যার কারণে তারা ক্ষমতার ফলও ভোগ করতে পারে নাই।' এ কথাটি আংশিক সত্য। কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, প্রথম দশকে বাঙালি এবং অবাঙালি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ছিল সমান সংখ্যক।

রওনক জাহান একজন প্রখ্যাত বাঙালি গবেষক দাবি করেন যে, 'পূর্ব প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উঠে যখন বাঙালিরা দেখতে পেল যে ক্ষমতার কেন্দ্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব প্রায় শুন্যের কোঠায়।' জেনারেল মুকিমের ন্যায়, তার বক্তব্যে প্রকৃত কোন ভিত্তি নেই। তার বই `Failure of National integration in Pakistan'- এ তিনি ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি মেনে নেন যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ক্ষমতা দুই প্রদেশের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা ছিল।

সারনী ১

দুই প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার কাঠামো (১৯৪৭– ১৯৫৪)

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
রাষ্ট্রপ্রধান	২	২
প্রধানমন্ত্রী	৩	৪
গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা	২৭	২৭

সূত্র: জাহান, রওনক, পাকিস্তান: দি ফেইলিওর অব ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন ইন পাকিস্তান, কলামম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২৫

www.pathagar.com

তিনি মেনে নেন যে, "প্রথম দশকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক এলিট শ্রেণীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৫০% প্রতিনিধিত্ব ছিল।"

আয়ুব খানের প্রথম মন্ত্রী সভায় চারজন কর্মরত জেনারেল অফিসার ছাড়া, বাকি আটজন মন্ত্রী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানীরা সব বাঙালি ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে ছিল পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং মোহাজির (শরণার্থী)। ১৯৫৪ সালের মন্ত্রীসভা নিয়ে অসন্তুষ্টি থাকার কথা ছিল না বাঙালিদের মধ্যে। সুতরাং ক্ষমতায় প্রতিনিধিত্বের অভাবে যে স্বাধীনতার পরপরই বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়েছিল, তা পুরোপুরি ঠিক নয়।

তবে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত, এ সময়কালে ১৯৮ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের মধ্যে ১২০ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এবং ৭৮ জন ছিল ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল, এই সময়কালে মুসলিম লীগ, যা দুই-ই প্রদেশে বড় দল হিসেবে অবস্থান করে ক্ষমতায় আসীন ছিল। সে সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আরো পূর্ব পাকিস্তানীদের অন্তর্ভুক্ত না করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এ বৈষম্য এতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান না হতো, তাহলে জনসংখ্যা এবং জনপ্রিয়তার অনুপাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদারিত্বের অভাব এতো প্রকটভাবে উপলব্ধি হতো না; বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের অধিকতর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দাবি করার কৈফিয়ত থাকতো না।

১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত সামরিক সরকার ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু তারাও পরিস্থিতির প্রতিকার বা সংশোধনে ব্যর্থ ছিল।

প্রশাসন

পাকিস্তানে একটি টেক্সই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভাবে, বাঙালি রাজনীতিকরা অনিয়মিতভাবে মন্ত্রীসভায় স্থান পায় এবং এতে তারা তাদের নির্বাচনী এলাকার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থার জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতার চেয়ে বেশি দায়ি ছিল দেশের প্রশাসনের উপর সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কঠোর হস্তক্ষেপ। সংস্থাপনের ন্যায্য অংশীদারিত্ব না থাকায়, জনগণের সেই অংশটি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

www.pathagar.com

কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোতে সরকারি সকল উপরোস্থ্ চাকরিতে বেশি সুযোগ পায় পাঞ্জাবিরা এবং ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকা থেকে আগত শরণার্থীরা। পরবর্তী দশকগুলোতে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। তবে অন্যান্যদের জন্য বিশেষ করে বাঙালিদের জন্য পরিবর্তনটা সন্তুষ্টজনক ছিল না। তারা তাদের দাবি ব্যক্ত করতে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রতিবাদ আরো জোরালো হয়ে উঠে। তাদের প্রতিবাদের কারণ ছিল জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতি বৈষম্য ছিল। তারা যে সকল পরিসংখ্যান তুলে ধরে, দৃশ্যত সবই ছিল যৌক্তিক । কিন্তু বিকিনি'র মত, পরিসংখ্যানের আসল অংশগুলোকে লুকিয়ে রেখে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে প্রদর্শন করে। এভাবে বিভিন্ন তথ্য উদ্ধৃত করে নিজের দাবি প্রমাণ করা যায় ঠিকই। আবার একই তথ্য ব্যবহার করে অন্য চিত্রও তুলে ধরা যায়।

১৯৬৬ সালে স্বাধীনতার ১৯ বছর পর, কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে দুই প্রদেশের মধ্যে যে দূরত্ব ব্যবধান নিম্নের সারনীতে তুলে ধরা হয়েছে:

সারনী ২

কেন্দ্রের মন্ত্রণালয়গুলোতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব (১৯৬৬)

মন্ত্রণালয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	৮১%	১৯ %
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬৩.৬%	৩৬.৪ %
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৯১.৬%	৮.৪ %
শিল্প মন্ত্রণালয়	৭৪.৪%	২৫.৬ %
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৬.৭%	৩৩.৩ %
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	৮১.০%	১৯.০ %
কৃষি মন্ত্রণালয়	৭৯.৪%	২০.৬ %
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭৭.৮%	২২.২ %
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৮২.৮%	১৭.৮ %
অর্থ মন্ত্রণালয়	৭৫.৬%	২৪.৪ %

সূত্র: ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি ডিবেটস, ২৫ জুন, ১৯৬৬

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে অফিসার এবং নন গেজেটেড অফিসারদের বন্টন ও ইঙ্গিত করে যে ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে Outnumber করা হয়েছে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও।

সারনী ৩

গেজেটেড ও নন গেজেটেড অফিসারদের সংখ্যা ভিত্তিক বন্টন (১৯৬৬)

পশ্চিম পাকিস্তান		**পূর্ব পাকিস্তান**	
গেজেটেড	**নন গেজেটেড**	**গেজেটেড**	**নন গেজেটেড**
৩৭০৮	৮২৯৮৮	১৩৩৮	২৬৩১০

সূত্র: ফেল্ডম্যান. এইচ, ফ্রম ক্রাইসিস টু ক্রাইসিস: পাকিস্তান ১৯৬২-১৯৬৯, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২, পৃষ্ঠা- ১৬৯

এ সংখ্যাগুলো স্বত্বেও নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের অভিযোগ সমন্ধে আরো বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করা যায়।

প্রথমত: এ সংখ্যাগুলোকে তুলনা করতে হবে ১৯৪৭ সালের আগের অবস্থানের সঙ্গে। ১৯৪০ সালে খান বাহাদুর আব্দুল আলিম চৌধুরী ছিলেন একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সে সময়ে এটিই ছিল বেঙ্গলে একজন মুসলমানের জন্য সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভিস পদ। পাকিস্তানের যখন জন্ম হয়, তখন ভারতের সেন্ট্রাল সার্ভিসের ১০১ জন মুসলিম সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৮ জন ছিলেন বাংলা থেকে আগত। ৩৫ জন ছিল সে সব স্থান থেকে যা পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গণ্য হয়। বাকিরা ছিলেন ভারতের সংখ্যালঘু বিভিন্ন মুসলিম প্রদেশ থেকে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন যুক্ত প্রদেশ (ইউপি) থেকে। সুতরাং দেশ বিভাগের সময়ে বাঙালিরা ১৭.৯% সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটা আরো কমে যায়; তখন ৭৪১ জন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ৫১ জন ছিলেন বাঙালি। এটি ছিল শতকরা ৬ ভাগ মাত্র। পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে দৃশ্যত এই বৈষম্যের কারণ কী ছিল?

অবসরপ্রাপ্ত জজ বা সিভিল সার্ভেন্টের কর্তৃত্বে পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার ভিত্তিতে সেন্ট্রাল সার্ভিসে নিয়োগ দেওয়া হয়। লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষার মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা বা

www.pathagar.com

ইন্টারভিউ- এর সময়ে বৈষম্য থাকা অস্বাভাবিক ছিল না, তবে লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। যদিও উচ্চবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানরা বেশি সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে আসে, কেউ কেউ পূর্ব বাংলাকে তাদের নতুন ঠিকানা হিসেবে বেছে নেয়। ওদের শিক্ষার জন্য তারা সেন্ট্রাল সার্ভিস- এর পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে ভালো করে। এর ফলে ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলা থেকে নিয়োগকৃত ৩০ জনের মধ্যে ১৪ জন ছিল শরণার্থী। মাত্র ১৬ জন ছিল স্থানীয় বাঙালি।

যে ৪৬ জন মুসলমান আগে থেকে ভারতে আইসিএস- এ কর্মরত ছিলেন, তারা প্রায় সবাই পশ্চিম পাকিস্তানে এলেন এবং পশ্চিম প্রদেশের অংশ হয়ে যান। তারা বাঙালির চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বেশি সুনজরে দেখেন নাই। তারা পাকিস্তানী দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কর্ম পরিচালনা করেন, যদিও অন্যদের মতই, তারাও নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের ক্ষেত্র বিশেষে সুবিধা প্রদান করেন।

কম সংখ্যক বাঙালি নিয়োগ পাওয়ার কারণ হচ্ছে কম সংখ্যক বাঙালি সেন্ট্রাল সার্ভিসের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ পরীক্ষায় বসার জন্য অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না। কারণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পূর্ব বাঙলায় শিক্ষার সুযোগ ছিল অপ্রতুল।

সারনী ৪

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থী যারা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং মেধার ভিত্তিতে যারা সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান- এ নিয়োগ পানঃ

সাল	১৯৪৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬৩	১৯৬৮	১৯৭০
অংশগ্রহণ	পশ্চিম পূর্ব	পশ্চিম পূর্ব	পশ্চিম পূর্ব	পশ্চিম পূর্ব	পশ্চিম পূর্ব	পশ্চিম পূর্ব
	৩০১-২৫৪	এনএ-এনএ	এনএ-এনএ	৭৩৯-৫০৩	৭০৮-৩১১	৬৭০-৩২৩
চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ	৯০-৪০	৭৬- ৫৮	৭২- ৪৬	১৩৯ -১২৭	২৯৮- ১৯৩	২৪৫- ১২১
যোগদান	এনএ-এনএ	১৬-১৪	৫১-৩৭	৬১-৪৬	এনএ-এনএ	৯৯-৬৭
মেধার ভিত্তিতে বন্টন	এনএ-এনএ	৪-২	১৩-৩	১৯-২	এনএ-এনএ	২৭-৪

সূত্রঃ ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ইসলামাবাদ, পত্র নং ৩-৩/৯২, তারিখ:২এপ্রিল/১৯৯২। তথ্যেও জন্য লেখকের অনুরোধের জবাবে।

www.pathagar.com

বি. দ্রঃ

১. এনএ = নট এ্যাভেলাবেল,

২. প্রার্থীদের মধ্যে ২০% নেওয়া হয় মেধার ভিত্তিতে। অন্যরা প্রাদেশিক কোটা হিসেবে নিয়োগ পায়।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি, কিছু ক্ষেত্রে দ্বিগুণ।

৪. ১৯৭০ সালে মেধার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো প্রার্থীর সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল শূণ্য। তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তখন ৬৭ জনকে নেওয়া হয়।

৫. দেশ বিভাগের আগেই অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং ইউপি- তে অধিক সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। চল্লিশের দশকে ইউপিতে ছিল ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে ৪টি ছিল আবাসিক এবং ২টি ছিল অনাবাসিক। সে প্রদেশে, বিশেষ করে সিমলা, মৈসুর, নৈনিতাল এবং দেরাদুন হিল স্টেশনগুলোতে ছিল অনেক পাবলিক স্কুল। দুর্ভাগ্যবশত, দেশ বিভাগের সময়ে পূর্ব বাংলার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানেও, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুসলমানের চাইতে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল বেশি। এ জন্য সিএসএস পরীক্ষায় কম সংখ্যক মুসলমান বাঙালি দরখাস্ত করে এবং আরো কম সংখ্যক উত্তীর্ণ হয়।

৬. তাই পাকিস্তানের প্রথম দশকে স্বাভাবিকভাবেই সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় বেশি সংখ্যক পরীক্ষার্থী পাঞ্জাব থেকে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অনুন্নত প্রদেশের মতোই, পূর্ব বাংলা এদের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব পাওয়ার জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু হয়।

আসলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বেশিরভাগ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এ কথাটি ঠিক নয়। সিভিল সার্ভিসে বেশি নিয়োগ পায় পাঞ্জাব থেকে এবং সংখ্যালঘু প্রদেশের শরণার্থীরা। এটাও খেয়াল করা উচিৎ ছিল যে, সিভিল সার্ভিসে এনডব্লিও এফ পি, সিন্ধ এবং বালুচিস্তান থেকেও প্রতিনিধিত্ব কম ছিল (টেবিল ৫)। এর কারণও ছিল যে, এ অঞ্চলের জনগণের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব। এটি কোন বিশেষ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বৈষম্য ছিল না।

www.pathagar.com

সারণী- ৫

প্রভাবশালী অবস্থানে সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ (১৯৬৫-১৯৭০)

	এনডব্লিউ এফপি	সিন্ধ	বালুচিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	উর্দু ভাষী	পাঞ্জাব	অন্যান্য
১৯৬৫	-	-	-	-	৪	৯	১
১৯৬৬	-	-	-	-	৩	৯	১
১৯৬৭	১	-	-	-	৩	৮	-
১৯৬৮	১	-	-	-	২	৭	-
১৯৬৯	১	-	-	১	২	৭	-
১৯৭০	১	১	-	২	-	৫	১
	৪	১	শূণ্য	৩	১৪	৪৫	৩

সূত্র: সৈয়দ কেবি, পলিটিক্স ইন পাকিস্তান, দি নেচার এণ্ড ডিউরেশন অব চেঞ্জ, প্রেজার পাবলিকেশন্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৭

আসলে যে ভুলটি করা হচ্ছিল এ বিতর্কে , তা ছিল এক প্রদেশের সাথে অন্য ৪টি প্রদেশের তুলনা করা। যদি প্রত্যেক প্রদেশকে আলাদা আলাদা দেখা হতো, তা হলে পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের শিকার বলে মনে হতো না। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা বেশি ছিল বলে সরকারি বিভাগে তাদেও বেশি অংশ দেওয়া উচিৎ ছিল। এ বিতর্ক ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ ১৯৪৭ সালে ক্লাস ওয়ান অফিসারদের বেলায় দুই প্রদেশের মধ্যে তখন বড় রকমের পার্থক্য ছিল। এ পার্থক্য পরিবর্তনের জন্য সময় ছিল।

১ জুলাই ১৯৬২ সালে ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টন সারনী- ৬ এ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সারনী- ৬

দশ মন্ত্রণালয়ে উচ্চপদের বিন্যাস ১৯৬২

	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সচিব	৯	-
যুগ্ম সচিব	১৫	৩
উপ সচিব	৫৪	১৭
সেকশন অফিসার	২২৬	৩৪

সূত্র: সিভিল লিস্ট অব ক্লাস ওয়ান অফিসার্স, ১ জুলাই, ১৯৬২

এ ছক থেকে মনে হতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা আসলে বৈষম্যের শিকার, কেননা জুলাই ১৯৬২ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা থেকে কোন সচিব ছিল না। এ তথ্য ব্যবহার করেছেন পাশ্চাত্যের লেখক, ভারতের বুদ্ধিজীবীগণ এবং বাঙালি নেতাগণ। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যেহেতু ১৯৪৭ সালে পূর্ব বঙ্গের কোন বাঙালি উপসচিব পদে ছিলেন না, মাত্র ১৫ বছরে কিভাবে একজন বাঙালি কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব পর্যায়ে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হবেন? একজন নিরপেক্ষ পর্যালোচক খেয়াল করবেন যে, যেখানে স্বাধীনতার কালে একজনও ছিলেন না, সেখানে ১৯৬২ সালের মধ্যে ৩ জন যুগ্মসচিব এবং ১৭ জন উপসচিব হয়েছেন।

১৯৬৫-১৯৭০ সময়কালে যে শুধুমাত্র বাঙালিরা প্রভাবশালী পদে স্থান পায় নাই, তা নয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সিন্ধিরা ওইসব উচ্চ পদে উত্তীর্ণ হতে পারে নাই এবং বালুচরাও এ সম্মানজনক তালিকায় স্থান পায় নি। এ তারকাদের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র একজন পাঠান এবং দুইজন বাঙালি। বড় অংশ চলে যায় পাঞ্জাব এবং মোহাজিরদের দখলে।

ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, সিভিল সার্ভিসে শুধু জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিয়োগ প্রদান কোন দিন একটি দক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। যারা শিক্ষাগত যোগ্যতায় পিছিয়ে আছে, তাদেরকে অবশ্যই সমান সুযোগ দেওয়া উচিৎ, তবে তা সময় সাপেক্ষ। তাড়াহুড়ো করতে গেলে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটাই ওলট-পালট হয়ে যাবে। একটি প্রদেশে কয়জনকে খাদ্য প্রদান করতে হয়, সেটা মানদণ্ড নয়,

www.pathagar.com

মানদণ্ড হচ্ছে সে প্রদেশ বছরে কজন স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যক্তি সৃষ্টি করে এবং এদের কয়জন সুপিরিয়র সার্ভিস পরক্ষিায় অংশগ্রহণ করে এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬৫-১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমে ম্যাট্রিকুলেটদের সংখ্যা শতকরা ১৪৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩%। নিম্নের ছক অনুযায়ী, পূর্ব বাঙলায় প্রাথমিক স্কুল নির্মাণও ছিল কম।

সারনী ৭

দুই প্রদেশে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	
	১৯৪৭/৪৮	১৯৬৮/৬৯	১৯৪৭/৪৮	১৯৬৮/৬৯
প্রাথমিক স্কুল	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮	২৯,৬৬৩	২৮,৩০৮
মাধ্যমিক স্কুল	২,৫৯৮	৪,৪৭২	৩,৪৮১	৩,৯৬৪
কলেজ মেডিকেল/ ইঞ্জিনিয়ারিং	৪০	২৭১	৫০	১৬২
কৃষি কলেজ	৪	১৭	৩	৯
বিশ্ববিদ্যালয়	২	৬	১	৪

সূত্র: ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি ডিবেট ১৯৬৮, ভলিউম ১ নং ৩২, ১৮ জুন ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ২৩৯৫

উপরোক্ত সংখ্যা পরীক্ষা করে দেখলে, দেখা যায় যে যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় বেশি সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ ছিল, এর ফল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের পক্ষে যায় নাই। নিজেদের প্রদেশে বাঙালি মুসলমানরা পিছিয়ে থাকে। তারা সংখ্যা গরিষ্ঠ হলেও, শিক্ষার প্রতি যথার্থ নজর দেয় নাই। বাঙালি হিন্দুরা শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে বেশি লাভবান হয়। দেশ বিভাগের পড়ে যখন হিন্দুরা চলে যায়, তখনও পূর্ব বঙ্গের বাঙালিদের

www.pathagar.com

মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রতিয়মান থাকে। এমনকি, প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যাও হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা নামমাত্র বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ের শিক্ষা ছিল প্রাদেশিক বিষয়।

সামরিক বাহিনী

স্বাধীনতার পূর্বেও পূর্ব বাঙলার মুসলমানগণ সামরিক বাহিনীতে যোগদানে উৎসুক ছিল না। কিছু সংখ্যক বাঙালি এবং বালুচকে নিয়োগ করা হয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় যখন বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তাদানে বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিকে আরো প্রসারিত করা হয়। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৫ সালে বেশির ভাগ নিয়োগ ছিল ট্রেডিশনাল রিক্রুটিং স্থানগুলো থেকে, পাঞ্জাব থেকে ৩৪৯,৬৮৮; সীমান্ত (ফ্রন্টিয়ার) প্রদেশ ৩২,১৮১; বেঙ্গল থেকে ৭,১১৭ এবং বালুচিস্তান থেকে ২ হাজারেরও কম। যুদ্ধের শেষের দিকে বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মির মধ্যে বাঙালিদের আনুপাতিক হার বাড়লো মাত্র ২%। কিন্তু যুদ্ধের শেষে দেখা যায় আর্মির অর্ধেকের বেশি সংখ্যক ছিল পাঞ্জাবি ও পাঠান।

দেরাদুনস্থ ভারতীয় মিলিটারি একাডেমির যুদ্ধ পরবর্তী দ্বিতীয় নিয়মিত কোর্সের ৪৫ মুসলমান ক্যাডেটের মধ্যে মাত্র ৪ জন বাঙালি, যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অক্টোবর ১৯৪৭ সালে কমিশন প্রাপ্ত হয়। আইএমএ/ পিএমএ নামক তৃতীয় কোর্সে একজন বাঙালি মুসলমানও ছিল না। এখানে কোন বৈষম্যের প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ, এদের নির্বাচনের সময়ে পাকিস্তানের জন্ম হয় নাই।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মাত্র শতকরা একভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করা হয় ২,৭০৮ জন, আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় ৮৭ জন। পরবর্তীতে এ অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয় নাই। ১৯৫৪ সালের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে দুই প্রদেশের মধ্যে এ বিশাল ব্যবধান বহাল থাকে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানী রিক্রুটদের সংখ্যা ছিল ১৬৫ আর যোদ্ধার জন্য পরিচিত অঞ্চল পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার থেকে রিক্রুট হয় ৩,২০৪ জন।

১৯৫২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত নতুন ক্যাডেট স্কুল মাত্র ১৫ জন ছাত্রকে ভর্তি হতে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। কেন? মোগল আমলে সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ ছিল পাঠান, মোগল এবং পাঞ্জাবি। যারা বাংলায় পোস্টিং পায়, তারাও বেশিরভাগ

www.pathagar.com

প্রদেশের বাইরে থেকে আগত। স্বাধীনতা যুদ্ধেও পরে বৃটিশরা বাঙালিদের এবং হিন্দুস্থানী মুসলমানদের (পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স এবং বালুচ ব্যতীত মুসলমান) রিক্রুটমেন্ট সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে। রিক্রুটমেন্ট এলাকাগুলো পাঞ্জাবের চার জেলা (কাম্বেলপুর, রাওয়ালপিন্ডি, ঝিলাম ও গুজরাট) এবং এনডাব্লিউএফপি (নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স)- এর দুই জেলা কোহাত ও পেশোওয়ার- এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাইমন কমিশন সুপারিশ করে পাঞ্জাব থেকে ৮৬,০০০, ফ্রন্টিয়ার থেকে ৫৬০০, বালুচিস্তান থেকে মাত্র ৩০০ এবং বেঙ্গল ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে একজনও নয়। এ বৈষম্যের কি কারণ ছিল? রওনক জাহান সঠিকভাবে বলেন, 'এ অসামঞ্জস্যের পিছনে কিছু ঐতিহাসিক কারণ ছিল।' বৃটিশরা পাঞ্জাবী এবং পাঠানদের সৈন্য হিসেবে আরো গ্রহনযোগ্য কারণ তাদের কাছে মনে হয় যে এরা আরো অনুগত, তারা শারিরীকভাবে শক্তিশালী, এ পেশা তাদের ঐতিহ্যগত এবং খরা দুর্গত এলাকায়, এছাড়া তাদের অন্য কোন জীবিকার উপায় ছিল না। তারা বাঙালিদের এবং হিন্দুস্তানী মুসলমানদের বিশ্বাস করত না। কারণ ১৮৫৭ সালে 'বিদ্রোহ' করেছিল।

১৯৬৩ সাল নাগাদ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে এবং সামরিক বাহিনীতে বাঙালি এবং অবাঙালির মধ্যকার ব্যবধান কমতে থাকে। সেনাবাহিনীতে অন্য পদে ৭% ছিল পূর্ব পাকিস্তানী, আর নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। অবশ্য অফিসার পর্যায়ে ব্যবধানটি তখনও প্রকট ছিল, কারণ বাঙালিদের মধ্যে মাত্র একজন ব্রিগেডিয়ার, একজন কর্ণেল এবং দুইজন লে. কর্ণেল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে এ পদসমূহে ছিলেন ৩০৮ জন। এ সংখ্যাগুলো থেকে বৈষম্যের একটি ভুল চিত্র পাওয়া যায়। ঠান্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করে দেখলে, পঞ্চাশ ও ষাট দশকের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় কেন বাঙালির চাইতে অবাঙালিরা বেশি সংখ্যায় এসব পদে অধিষ্ঠিত ছিল। কাউকে শুরুতেই লে. কর্ণেল বা ব্রিগেডিয়ার পদে নিয়োগ দেওয়া যায় না। প্রাথমিক পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে এই উচ্চ পর্যায়ে আসতে হয়। যেহেতু ১৯৪৭ সালে কম সংখ্যক জুনিয়র বাঙালি অফিসার ছিল, সে অনুপাতে স্বাভাবিকভাবেই সিনিয়র পর্যায়ে তাদের আসতে সময়ের ব্যাপার ছিল।

সারনী- ৮ এ দেখা যায় বিভিন্ন বছরগুলোতে দুই প্রদেশ থেকে ক'জন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং ইন্টার সার্ভিস সেলেকশন বোর্ড শতকরা কতজনকে বেছে নেয় বা নির্বাচন করে।

www.pathagar.com

সারনী ৮

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে নিয়মিত কোর্সে কমিশন- এর জন্য বাছাইকৃত প্রার্থী

বছর	প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত		আইএসএসবি কর্তৃক সুপারিশ		সুপারিশের হার		নিয়োগ		উত্তীর্ণ	
১	২		৩		৪		৫		৬	
	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব	পশ্চিম	পূর্ব
১৯৬৬	৫৩৮	১০৬	১৭৯	২৯	৩৩%	২৮%	২১৯	২৯	১৫৬	২৩
১৯৬৭	১১৮৭	১৬৩	৩২১	৫০	২৭%	৩১%	৩০৭	৪৬	২৬৪	৩৬
১৯৬৮	১২১৫	১২২	২০৯	৩৩	১৭%	২৭%	২০৯	২৬	১৮৪	২৬
১৯৬৯	১১৩২	৮২	২৮৭	৪০	২৫%	৫০%	২৮৫	৪৯	২৪১	৩৭
মোট	৪০৭২	৪৭৩	৯৯৬	১৫২	২২.৪%	৩২.১%	১০২০	১৫০	৮২৭	১২২

সূত্র: এডজুট্যান্ট জেনারেলস ব্রাঞ্চ, জিএইচকিউ,পাকিস্তান, পত্র নম্বর-০৫/৭৯৫/পিএ-৩(এ), তারিখ: ৩ জুন ১৯৬২। লেখকের অনুরোধে পত্রের জবাব

বি. দ্র

পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক কম সংখ্যক প্রার্থী সেনাবাহিনীর কমিশন র‍্যাঙ্কের জন্য দরখাস্ত করে।

শতকরা হিসেবে দেখলে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের চাইতে আইএসএসবি পূর্ব পাকিস্তানীদের বেশি সুপারিশ করে।

শেখ মুজিবুর রহমানের বহুল পরিচিত ছয়দফার একটি দাবি ছিল যে, প্রতিরক্ষা বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ হওয়া উচিত সেনা বাহিনীতে তাদের শক্তির আনুপাতিক হারে। এখানে স্মরণ করা উচিত প্রাক স্বাধীনতার পরিস্থিতি কেমন ছিল ভারতে। ১৯৪৪ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব ছিল ১২১ কেটি রূপি। এর মধ্য থেকে ৫১ কোটি রূপি খরচ হয় সামরিক বাহিনীর খাতে। এ রাজস্বের সিংহভাগ আসে সে সকল প্রদেশ থেকে, যে সকল প্রদেশ থেকে সেনা বাহিনীতে লোকবল প্রদান করা হয় না। নিম্নে ছকে তা দেখানো হয়েছেঃ

www.pathagar.com

সারনী- ৯

কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তর থেকে প্রদানকৃত অর্থের পরিমাণ (১৯৪৩)

এনডব্লিউএফপি	৯,২৮,২৯৪ রূপি
পাঞ্জাব	১,১৮,০১,৩৮৫ রূপি
সিন্ধ	৫,৮৬,৪৫,৯১৫ রূপি
বেঙ্গল	১২,০০,০০,০০০ রূপি

সূত্র: আম্বেকর,বিআর, থটস অন পাকিস্তান, থাচার এন্ড কোং, বোম্বে, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ৮৭

বি. দ্রঃ মাত্র ২% প্রতিনিধিত্ব থাকলেও বাংলার প্রদত্ত রাজস্বের অংশ ছিল ৬০%

সেনা বাহিনীতে কম বাঙালি থাকার পেছনে কোন বৈষম্য ছিল না; আসলে খুব কম সংখ্যক বাঙালি সেনা বাহিনীতে যোগদানে উৎসুক ছিল। তাছাড়া, তারা সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে চায় নাই, কারণ এতে তাদেরকে নিজ অঞ্চল থেকে অনেক দূরে অপরিচিত স্থানে যেতে হতো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সেনা প্রধান লে. জেনারেল আতিকুর রহমান স্বীকার করেন যে, তার দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে, খুব কম সংখ্যক বাঙালি সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য উৎসাহী ছিল। তার নিজেরই নবম পিএমএ লং কোর্স (১৯৫২-১৯৫৪)- এ ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জন বাঙালি ক্যাডেট ছিল। তার পরের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পিএমএ লং কোর্সগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১১জনের বেশি ক্যাডেট ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রি-ক্যাডেট প্রশিক্ষণ স্কুল থাকলেও, তেমন কেউই সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য দরখাস্ত করে নাই। যারা সামরিক বাহিনীর প্রতি উৎসাহ ব্যক্ত করতো, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীতে যোগদানে উৎসুক ছিল, যেখানে তুলনামূলকভাবে আরামে থাকা যায়। সিন্ধেও একই পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। সিন্ধ রেজিমেন্ট গঠিত হলেও, খুব কম সংখ্যক সিন্ধ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করতে চাইতো। হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, মেধা যাই থাকুক না কেন, গ্রামে বসবাস করা সিন্ধিদেরকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও, সিন্ধ থেকে সাড়া পাওয়া আশাব্যঞ্জক ছিল না (জিএইচকিউ পত্র নং ৪৩১৬/২৬৩৭/পিএ-৩[এ], ১৮ নভেম্বও ১৯৯১) ।

www.pathagar.com

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এ বিষয়টিকে ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙ্গালিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান- ভারত যুদ্ধের সময় বাঙালিদের নিরাপত্তাহীনতার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ভারতের আক্রমণকে প্রতিহত করার মত পূর্ব পাকিস্তানে পর্যাপ্ত বাহিনী ছিল না। ভুট্টো বলেছিলেন যে চীন পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছিল, কিন্তু বাঙালিরা এ বক্তব্যে খুব একটা খুশী হতে পারে নাই। নিউ ইয়র্ক টাইমস একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে উদ্ধৃতি দেয়, 'যদি চীন আমাদেরকে বাঁচিয়েই রাখে, তাহলে আমাদের পাকিস্তানের কি দরকার?' কাশ্মীরের যুদ্ধ দেখে বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারত তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে যে কোন অজুহাতে।

অর্থনীতি

পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিকদের সবচাইতে জোরালো অভিযোগ ছিল, তাদের প্রদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ। ভারতীয় লেখকগণ, যেমন আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত প্রতিরক্ষা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক কে. সুব্রামানিয়াম এবং মেজর জেনারেল ডে. কে পালিত এ বিষয়টিকে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিকতা' বলে আখ্যায়িত করেন। পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে ধরা হতো। আর পাশ্চাত্যের লেখকরা এ মতবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করে। বাঙালি অর্থনীতিবিদরা বিস্তারিতভাবে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্যিক ঘাটতি, পূর্ব থেকে পশ্চিমে পুঁজি স্থানান্তর, মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান, পূর্ব পাকিস্তানের মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এসব ব্যাপারে প্রচার করতে থাকে।

একজন উচ্চ পদস্থ বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, জি ডব্লিউ চৌধুরী, যিনি বিভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তিনি মনে করেন যে পাকিস্তানের ঐক্যের সব চাইতে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অর্থনৈতিক অসমতা। তার মতে, 'পূর্ব পাকিস্তানীরা উপলব্ধি করে যে, অর্থনৈতিক সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, তাদের স্বার্থ নিরাপদ ছিল না।' রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন তত্ত্ব প্রদান করে এবং দাবি করে যে, পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতি বাঞ্ছনীয়।

বেশিরভাগ তত্ত্ব ছিল সঠিক। তবে পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলার মধ্যে জীবনযাত্রার মান এবং শিল্প উন্নয়নের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা স্বাধীনতার পূর্ব থেকে বিরাজমান

www.pathagar.com

ছিল। এ ব্যবধান থেকেই যায় এবং আরো বাড়তে থাকে অখণ্ড পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে। বাংলাদেশের দুদশক স্বাধীনতার পরেও তা এখনও বিরাজমান।

প্রশ্নটি হচ্ছে, পরিস্থিতি এভাবে কেন ছিল? কেন্দ্রীয় প্রশাসন কি ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে? মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে কি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়?

অন্যান্য দেশের পক্ষে কি সম্ভব হয়েছে তাদের অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোকে উন্নয়ন করা এবং একটি আদর্শ সমান উন্নয়ন সাধন করা?

রওনক জাহান স্বীকার করেন যে, এ সবের পিছনে ঐতিহাসিক কারণ ছিল। পূর্ব বাংলা ছিল অনুন্নত, কলকাতার পশ্চাদ ভূমি। পশ্চিম বাংলার শিল্পকারখানার জন্য জন্য পূর্ব বাংলা মাত্র কাঁচামাল সরবরাহ করতে সক্ষম ছিল। বাংলার শেষ বৃটিশ গভর্ণর স্যার ফ্রেডরিক বারো বলেন, 'ভারত হয়ে বিভক্তির পরে পূর্ব বাংলা হবে ইতিহাসের সব চাইতে বড় বস্তি, যে দেশ রক্ষা এবং ঝড়জনিত বন্যায় কবলিত থাকবে।' তার এ ভবিষ্যৎ বাণী সত্য ছিল না। কারণ, ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান উঠে আসে এবং উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকে, যদিও তা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় কম।

দেশ বিভাগের সময়ে যুক্ত বাংলার ১৪১৪টি কলকারখানার মধ্যে মাত্র ৩১৪টি ছিল পূর্ব বাংলায়। তথাপি, এগুলোর মালিক ছিল টাটা, বিড়লা এবং ডালমিয়া, সব হিন্দু শিল্পপতি- যারা তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয় পাকিস্তানের অস্তিত্বের পর।

১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের কোন পাটকল ছিল না। যদিও কলকাতার পাট কারখানাগুলোর পাট পূর্ব পাকিস্তানে চাষ হতো। এ অঞ্চলে যে ৮টি সূতা কল এবং ৪টি চিনি কল ছিল, তাদের মালিক ছিল সব হিন্দু। ওরাই বড় বড় বাড়িতে থাকতেন, দোকানের মালিক ছিলেন, স্কুল পরিচালনা করতেন। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতেন এবং টাকা ঋণ দিতেন। বাঙালি মুসলমানদের এ সব ছিল না। এ জন্য তাদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিক, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং পুঁজির অভাব ছিল। হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান জমিদার ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং স্যার ফজলে রাব্বি। বাঙালিরা যে ভাত খেতেন, সে ভাতের চাল আসত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তারা খাদ্যশস্য কম পরিমাণে চাষ করত। মূলত অর্থনৈতিক কারণে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য ভোট দেয়। মুসলমানরা ছিল দরজি, নাপিত, মুচি এবং হিন্দুদের অর্থনৈতিক শোষণ তাদের সহ্য হচ্ছিল না। কলকাতার উপর তাদের নির্ভরশীলতা আর সহ্য হচ্ছিল না।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে বাঙালিদের একটিও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু ১৯৫৯ সাল নাগাদ, সব শিল্প সম্পদের ১১% -এর মালিক হয়েছিল তারা। নিম্নের ছকে ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের শিল্প সম্পদের বন্টন দেখানো হয়েছে:

সারনী- ১০

পাকিস্তানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্প সম্পদ বন্টন (১৯৫৯)

মেমন (খোজা ও বোরা)	২৯%
শেখ ও সাঈদ	১২%
বাঙালি	১১%
বৃটিশ	৭.৫%
চিনিওটিজ	৬%
পাখতুন	৫.৫%
অন্যান্য	১৭% (আনুমানিক)
পাবলিক সেক্টর	১২%

বি. দ্র. মেমন (এরা একটি সংঘবদ্ধ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং অন্য কোন সম্প্রদায় থেকে আলাদা) এবং সাঈদ ও শেখদের ব্যতীত, বাঙালিদের ভাগ ছিল সব চাইতে বেশি (সাঈদ ও শেখদের থেকে মাত্র ১% কম)।

সূত্র: সৈয়দ কে বি , পলিটিক্স ইন পাকিস্তান: দি নেচার এন্ড ডিউরেশন অব চেঞ্জ, প্রেজার পাব্লিশার্স, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৪৭

পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন নিঃসন্দেহে আরো দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। সেখানে আগে থেকেই শিল্প অবকাঠামোর অস্তিত্ব থাকাতে, লাভও সেই হারে দ্রুত ও অধিক হতে থাকে। দেশ ভাগের পরে শিল্প কাঠামোতে পরিবর্তনও সাধিত হয়। শিল্পোন্নয়ন সেই সকল খাতে হতে থাকে, যে সকল খাতে পূর্ব পাকিস্তান সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম নয়, যেমন- বস্ত্র, চামড়া, রাসয়নিক পদার্থ, খাদ্য, সিমেন্ট এবং সার। এ জন্য পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি বিনিয়োগ হতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে সরকারের মোট ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি হয়। পাকিস্তানের প্রথম সাত বছরের মধ্যে পশ্চিম প্রদেশ পায় ৮,০১৭ রূপি মিলিয়ন, আর পূর্ব প্রদেশ পায় ২,৭৫০ রূপি মিলিয়ন মাত্র।

কে সুব্রামানিয়াম, যিনি সব সময় প্রমাণ করতে চান যে পাকিস্তান তার পূর্ব প্রদেশকে কলোনি বা উপনিবেশ হিসেবে দেখতো। তিনি বলেন, ২০ বছর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একত্রিত ছিল, সে সময়ে পূর্বভাগ থেকে মোট ২.৬ বিলিয়ন ডলার পশ্চিমভাগে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তানের প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রী মাহবুবুল হকের দেওয়া তথ্য এ দাবিকে সমর্থণ করে। তিনি স্বীকার করেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বছরে আনুমানিক ২১০ মিলিয়ন রূপি স্থানান্তরিত হয় প্রাক পরিকল্পনার সময়ে। আর পরিকল্পনা কালে এটি ছিল বছরে ১০০ মিলিয়ন রূপি।

পূর্ব পাকিস্তান তাদের রফতানি আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল বলে যে অভিযোগটি করা হয়, তা সারনী- ১১ কে সমর্থন করে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, কোন দেশের কোন একটি অঞ্চলে আয় যে সেই অঞ্চলে শুধুমাত্র খরচ হবে, তাতো নয়। এটি এমন সব স্থানে বিনিয়োগ হয় যেখানে বেশি লাভজনক হবার সম্ভাবনা থাকে। এ নীতির অবশ্যই অপব্যবহার হতে পারে। উন্নত এলাকায় যেখানে নেতারা ব্যক্তি বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখে।

সারনী-১১

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রফতানি আয় ১৯৪৭-১৯৬৭

	রফতানি	আমদানি
পূর্ব পাকিস্তান	২০,৯৮২,৩৯১,০০০ রুপি	১৫,১৮৩,৭৯৬,০০০ রুপি
পশ্চিম পাকিস্তান	১৫,৭০৪,৭১৪,০০০ রুপি	৩৪,৩৮৮,২১১,০০০ রুপি

সূত্রঃ মান্থলি ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক অব পাকিস্তান, জুন ১৯৬৭, সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস, করাচি (তারিক আলী পৃষ্ঠা-৮৫)

আরেকটি বিষয়ে বাঙালিদের ক্ষোভ প্ররোচিত করা সম্ভব ছিল , তা হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য। চাল বাঙালিদের প্রধান খাদ্য এবং বলা হয় পূর্ব পাকিস্তানে চালের দাম বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানে ভোজ্য তেলের দাম ছিল ২.৫০ রূপি প্রতি সের; পূর্ব পাকিস্তানে তা ছিল ৫ টাকা।

www.pathagar.com

দুই প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানের বিপক্ষে ছিল না, এটি 'অযৌক্তিক'ও ছিল বটে। প্রথমে ফার ইস্ট থেকে করাচিতে রাবার আমদানি হতো, তারপর সেটাকে আবার চট্টগ্রামে পাঠানো হতো। তাতে রাবারের দাম বেড়ে যায়। এই জটিল প্রক্রিয়ার পেছনে কোন টেকনিক্যাল কারণ থাকলেও, তা দূর করা উচিৎ ছিল। একইভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পাট দিয়ে জুট নেট তৈরি হতো। সেগুলোকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয় রং করার জন্য। রং হবার পর সেগুলোকে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। পাট দ্রব্য রং করানো এমন কোন জটিল কাজ ছিল না। বরং যেখানে নেট তৈরির উপকরণ হতো, সে স্থানেই রং করার ব্যবস্থা করাটা মোটেও অসম্ভব ছিল না।

ভারতের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের কারণে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা- বাণিজ্য সব সময় কিছুটা কঠিন ব্যাপার ছিল। সমস্যাটি ছিল আবেগের এবং অর্থনীতির। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিশেষ করে সব সময় ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করত। পাকিস্তানের নতুন নতুন শিল্প কারখানা রক্ষার্থে, সরকার এবং বেসরকারি খাত উভয়ই ভারতের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছুটা সংশয়/ দ্বিধা বোধ করে। পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে ভারতীয় পণ্য সাধারণত দাম কমদামী ছিল। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মত উদারমনা বুদ্ধিজীবীও তার ভারত বিরোধী অবস্থান ছাড়তে পারেন নাই এবং ভারতের সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় তিনি অনেক ঝুঁকি দেখেন। তিনি মনে করেন যে, এ সহযোগিতার ফলে বিভিন্ন যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যৌথ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে, কৃষি এবং শিল্পখাতে সহযোগিতা হবে। তিনি ভারত তুষ্টির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন, তাই তার কাছে এসব সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল।

যেহেতু কাশ্মীর ব্যাপারটা তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই, তাই ভারতের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানীদের এতটা তিক্ত মনোভাব ছিল না। ওদের আবেগ এতোটা জড়িত ছিল না যে, তারা ভারতের সাথে বাণিজ্যের লাভজনক ফলাফল থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করবে। পূর্ব বাংলা তাদের প্রতিবেশীর সাথে বাণিজ্যের দ্বার খুলে দিতে চেয়েছে। তারা মনে করে যে চীন থেকে টনপ্রতি ১৭২ রূপিতে কয়লা না কিনে, ভারত থেকে টনপ্রতি ৫৩ রূপি দরে কিনলে, তা অনেকটা লাভজনক। একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিমেন্ট কিনলে দাম পড়ে ব্যাগ প্রতি ১৬ রূপি, আসাম থেকে তা ক্রয় করলে দাম পড়ে ব্যাগ প্রতি ৮ রূপি।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাটের উপকার ভোগ করে পশ্চিম পাকিস্তান, এ নিয়ে বাঙালিরা অনেক দিন ধরে অসন্তুষ্ট ছিল। তাদেরকে বলা হয় যে বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের ৭০ % আসে চা এবং পাট থেকে, কিন্তু বাঙালিরা এ আয়ের মাত্র ২৫% ভোগ করতে পারে। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের পাট উৎপাদনকে পাকিস্তানী রুপিতে পরিশোধ করা হতো, যেখানে ডলারের মূল্য ছিল অনেক বেশি, তাতে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করে। তাদের মতে, 'গুজরাটি ও পাঞ্জাবি ব্যবসায়িরা বেশি উপকৃত হয়। কারণ, তারা এক ডলার মূল্যের রফতানিকৃত পাটের বিপরীতে পায় ৮.৬১ রুপি।

এটাও সত্য যে, আয়ুব আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে যতটা শিল্পায়ন হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানে তার চেয়ে শিল্পায়ন অনেক কম হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমাজউদ্দীন বলেন যে এর প্রভাব পূর্ব পাকিস্তানে ছিল না। তাই যখন আয়ুব খান 'উন্নয়নের দশক' ঘোষণা করলেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা ঢাকার শহীদ মিনারে কঙ্কাল প্রদর্শন করে।

বৈদেশিক সাহায্য ছিল আরেকটি বিতর্কের ক্ষেত্র। কারণ বেশির ভাগ সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মনিরুল হোসেনের প্রধান অভিযোগ ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানে অধিক শিল্প উন্নয়ন সাধিত হয়। তার প্রদেশকে উপনিবেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় পাশ্চাত্যের এবং বাঙালি লেখকদের মধ্যে, অনেকে 'উপনিবেশিক শোষণ' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'উপনিবেশিক শোষণ' বলতে বুঝায় একটি দেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানি করে আবার উৎপাদিত পন্য সেই দেশেই রফতানি করা। এটি পশ্চিম পাকিস্তান/ পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় প্রযোজ্য নয়। এমনকি, কাঁচা মাল হিসেবে তুলা পূর্ব বাংলায় পাঠানো হয় ময়মনসিংহের কল কারখানায়, তা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়।

সামরিক সাহায্য থেকে উপকৃত হয় সামরিক বাহিনী এবং প্রতিরক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানাগুলো। এগুলো প্রায় সবই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। মনে রাখতে হবে যে, বৈদেশিক সাহায্যের সাথে নানান শর্ত জড়িত ছিল। এ সাহায্য বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে জড়িত ছিল। যে সকল স্থানে অবকাঠামো এবং দক্ষতা ছিল, শুধুমাত্র সে সকল স্থানে বিদেশীরা তাদের সাহায্য প্রদান করে এবং এ সব পূর্বের চাইতে পশ্চিমে বেশি ছিল। সে জন্য ব্যাপারটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটা 'বিদ্বেষপূর্ণ চক্রে' পরিণত হয়। বৈদেশিক সাহায্যের অভাবে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছিল না। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাবের কারণে বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করাও হচ্ছিল না।

www.pathagar.com

এ সবের ফলে, জাতীয় শিল্পের দুই-তৃতীয়াংশ এবং ব্যাংকিং খাতের পাঁচ ভাগের চারভাগ থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে। স্বাধীনতার আগে শিল্পখাতে হিন্দুদের আধিপত্য ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে হিন্দুদের স্থানে আসে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। ১৯৪৭ সালে আগস্টের প্রথম দিকে ড. দানি রেল গাড়িতে ছিলেন। তার সাথে ছিলেন একজন হিন্দু বাঙালি । যখন দানী বললেন যে, তিনি ইতিহাস পড়ানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, হিন্দু ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, 'ও, আপনারা আমাদেরকে রিপ্লেস করছেন।'

আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স- এর প্রধান রেহমান সোবহান বিশ্বাস করতেন যে দুই দেশের মধ্যে সম্পদের বন্টন ছিল অসম। তার মতে, অসমতা বাড়তেই থাকে। যখন লেখক তাকে জিজ্ঞেস করলেন সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে কি মানদণ্ড গুরুত্বপূর্ণ, তিনি জবাব দেন যে সংখ্যা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ব পাকিস্তানের মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণসমূহ

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রশীদ আমজাদ স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ আঞ্চলিক বৈষম্যের সমস্যার মুখোমুখি। প্রবৃদ্ধির লাভ এবং গতি বিশেষ কিছু স্থানে কেন্দ্রীভূত হবার প্রবণতা থাকে। পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে অর্থনৈতিক অসমতা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বাঞ্ছনীয়। পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি এবং লাহোরের চারপাশে শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে থাকে। বেসরকারি খাতকে এ দু'স্থান থেকে সরানোই মুশকিল ছিল।

এ কেন্দ্রিভূত হবার প্রবণতার পিছনে যে সকল কারণ ছিল, তা হচ্ছে, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ. বাজারের নৈকট্য কাঁচামালের সরবরাহ, ক্ষমতার কেন্দ্র স্থলের নৈকট্য ইত্যাদি। ধীরে ধীরে আরো শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠে। এ সকল শহরের মধ্যে ছিল ফয়সলাবাদ, হায়দ্রাবাদ, ওয়াহ্ এবং নওশেরা। এখন পর্যন্ত বালুচিস্তানের অনেক স্থান, সিন্ধের অভ্যন্তরীণ স্থানে, পুরো মাকরান উপকূল এবং আল মরুভূমিতে কোন শিল্প কারখানা নাই। এমন নয় যে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানই শিল্প উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ছিল। ভৌগলিক দূরত্বের কারণ এর প্রভাব বেশি তীব্রভাবে অনুভব করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের তুলনামূলক মন্থর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণ ছিল: ১. ভুল অর্থনৈতিক নীতি যেখানে integrated economic approach গ্রহণ করা হয় ঠিকই

www.pathagar.com

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় আনা হয়নি; ২. অবকাঠামোর অভাব, বিশেষ করে যোগাযোগ ও জ্বালানী খাতে; ৩. প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র থেকে অপর্যাপ্ত অর্থের বন্টন; ১৯৬২ সালের সংবিধানে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়না; ৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করার ক্ষমতার অভাব ছিল পূর্ব পাকিস্তানে; ৫. শিক্ষার হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম এবং ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাব ছিল; ৬. ব্যবসার বিভিন্ন জটিলতা সম্বন্ধে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর ধারণা কম ছিল; ৭. অবিভক্ত ভারতের বেশির ভাগ মুসলমান ব্যবসায়ীরা পশ্চিম পাকিস্তানে আসে; মাত্র অল্প সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানে যায়; ৮. সরকারি খাতে ব্যয় খুব অপর্যাপ্ত না হলেও, বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পূর্ব পাকিস্তানে ততোটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিকূল পরিবেশ ছিল; দ্রুত এবং অধিক লাভ করার সম্ভাবনা কম ছিল; যথেষ্ঠ হিন্দু প্রভাব, যা উদ্যোমী পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলমান ব্যবসায়ীদের বিপক্ষে কাজ করে। কাঁচামালের সীমাবদ্ধতা; আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের হেড অফিসগুলো ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে, যেমন- PICIC, IDBP, HBFC, ADB, NIT এবং ICP. তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে এক অস্বস্তিকর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল; ৯. অনিয়ন্ত্রিত মুক্তবাজার শক্তি; ১০. পূর্ব পাকিস্তানে বড় বড় শিল্প পরিবারের অভাবে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বিনিয়োগের ক্ষমতা ছিল কম। ১১. পশ্চিম পাকিস্তানে আগে থেকে শিল্প অবকাঠামো থাকাতে, পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানে সাহায্য দেওয়ার জন্য বিদেশীরা বেশি আগ্রহী ছিল; ১২. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা খাত এবং অর্থনীতি খাতকে শক্তিশালী করবার আগ্রহ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে অবস্থিত ছিল এবং এতে তারা সোভিয়েত ইউরিয়নকে কিছুটা হলেও কনটেইন করতে পারবে। (পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চীনকে কনটেইন করাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিবেচিত হতে পারত। তবে ১৯৬২ সালের পরে তারা ভারতকে একাজে ব্যবহার করে।) মার্চ ১৯৬১ সালের প্রতিবেদনে House of foreign affairs Committee উল্লেখ করে, 'Defence of the borders of west Pakistan against Soviet aggression is a major purpose of US military assistance to Pakistan," "অর্থাৎ পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রধান কারণ হচ্ছে সোভিয়েত আগ্রাসনের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত রক্ষা করা।" ১৩. পাট পণ্যের বাজার সিনথেটিক পণ্য দ্বারা দখল করা হয়, যার ফলে পাট থেকে বৈদেশিক আয় কমতে থাকে। ১৪. রাজধানী

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাতে, শিল্প উদ্যোক্তারা সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়, ক্ষমতার কেন্দ্রের সান্নিধ্যে থাকবার জন্য , এতে তাদের ঋণ, লাইসেন্স, পারমিট পেতে সুবিধা হয়, ১৫. পূর্ব পাকিস্তানে পাঞ্জাবিদের (সকল পশ্চিম পাকিস্তানীদের 'পাঞ্জাবি' বলে আখ্যায়িত করা হতো) বিরুদ্ধে তিক্ততা বাড়তে থাকায়, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সেখানে যেতে দ্বিধা বোধ করত। W. Wilcox বলেন, ''অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় নাই; দ্বন্দ্বের জন্যই অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।' ১৬. পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ স্থানান্তর; ১৭. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিল না। ১৮.পূর্ব পাঞ্জাব এবং অন্য মুসলিম সংখ্যালঘু, অঞ্চল থেকে ভারতীয় শরণার্থীরা পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় বেশির ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে আসে। (পশ্চিম পাকিস্তানে ৬.৫ মিলিয়ন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ০,৭ মিলিয়ন)। এরা , বিশেষ করে শিক্ষিতরা, বেশির ভাগ পাঞ্জাব এবং সিন্ধিরা শহরে বসবাস করতে থাকে। এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। আফ্রিকা এবং ভারত থেকে আগত শিল্পপতিরা দুই-ই প্রদেশে আসে, কিন্তু পূর্ব প্রদেশের তুলনায় পশ্চিম প্রদেশে তাদেরকে বেশি গ্রহণ করে। তাই তারা পশ্চিম প্রদেশেই তাদের প্রধান কার্যালয়সমূহ স্থাপন করে এবং এতে করে তাদের আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর হয়। ১৯. বন্যা এবং ঝড়ের কারণে ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে।

আন্দোলন, বিশৃঙ্খলা, ধর্মঘট, লুটপাট, আগুন , যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়া, বন্দরের ক্ষয়ক্ষতি, নৌ পরিবহন ডুবি, রাস্তায় রাজনৈতিক কলহ, কল কারখানায় বিশৃঙ্খলা, ১৯৬৯-১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এসব সমস্যা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যায়। এ তিন বছরে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে । তা ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও ঘটে এবং রাজনৈতিক নেতারা এটিকে একটি ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

এ লেখক ১৯৬৯ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বাঙালি নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সঙ্গে ভ্রমণকালে জিজ্ঞেস করেছিলেন তার শ্লোগানের তাৎপর্য। শ্লোগানটি ছিল, 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো।' তাকে বলা হয় যে এতে নিজ প্রদেশেরই সম্পত্তির ক্ষতি হচ্ছে। তিনি জবাব দিলেন, 'কৃষকদের প্রাণ হচ্ছে ফসল এবং আমরা ফসল ধ্বংস করছি না। আমরা যা ধ্বংস করছি, তা হলো বড় বড় শহরগুলোর লাইট, দোকানের মালামাল, যা সব গরবিদের নাগালের বাইরে।' তার মানসিকতা হচ্ছে পুরোপুরি একজন কমিউনিস্টের। অল্পজনের হাতে ধন

www.pathagar.com

সম্পদ থাকার চাইতে দারিদ্র্য ভাগাভাগি করাই শ্রেয়। কিন্তু নিজ প্রদেশের সম্পত্তি ধ্বংস করে তিনি দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।

এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠে- আর্থিক সম্পদ কি জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিতরণ করা উচিৎ? নাকি সম্পদ উৎপাদনের ভিত্তিতে? নাকি সম্পদ উৎপাদন এবং ভৌগলিক আয়তনের ভিত্তিতে? এর পরের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা ব্যয়

প্রতিরক্ষা খাতে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যয় হওয়াতে বাঙালিরা আপত্তি জানালো। কারণ, তারা ভারতের হুমকির সম্মুখীন ছিল না। কাশ্মীর ব্যাপারটি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নাই। তারা চেয়েছে হয় সেনাবাহিনীতে full share অথবা, তাদের ভাগের বেশি কোন অর্থ ব্যয় না করা।

টাকা খরচ হচ্ছিল একটি বিরাট সেনাবাহিনীর জন্য, যেখানে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অপ্রতুল। আর প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ শিল্প কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হতো। এ সব কল কারখানায় স্বাভাবিকভাবে অবাঙালিরা চাকরি পায়। এ সবের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা উপকৃত এবং লাভবান হয়।

পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, তা চলে যায় প্রতিরক্ষা ক্রয় খাতে। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা বিভিন্ন কোম্পানি, যারা পাকিস্তানে মিলিটারি হার্ডওয়্যার সরবরাহ করে এবং এ থেকে মোটা অংকের কমিশন পায়।

পাকিস্তানের প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রী জনাব সারতাজ আজিজি টেলিভিশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের যে যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৬৫ সালে, তাতে বৈষম্য কমানোর জন্য যে তহবিল প্রয়োজন, তা আর রইল না। তিনি বলেন, 'সে যুদ্ধটি যদি না ঘটতো, তা হলে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান উভয়েই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতো। তা ছাড়া, বৈষম্যের কারণও দূর হতো।'

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক বৈষম্য- প্রতিকার ব্যবস্থা

পূর্ব অধ্যায় থেকে পাঠক এ ধারণা পেতে পারে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার হয়েছিল এবং দেশের রাজনৈতিক- সামাজিক ক্ষেত্রে এ প্রদেশকে যথার্থ ভাগ দেওয়া হয় নাই। দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। কিন্তু যদি বলা হয় যে, দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যকে কমানোর জন্য কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয় নাই, তা ভুল হবে। যদি বলা হয় যে পূর্ব প্রদেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করা হচ্ছিল, তাও ভুল হবে।

মাহবুবুল হকের মতে, ''অনুন্নত দেশসমূহ সম্পদের সমান বণ্টন এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্র- এ সব ধারণাকে এক পাশে সরিয়ে রাখে।'' এর কারণ হচ্ছে যে, সম্পদকে এমন সব জায়গায় বণ্টন করা হয়, যেখান থেকে সর্বাধিক এবং দ্রুত লাভ আসে। গুস্তাভ্ পাপানেক বলেন, ''অনেক দেশেই বৈষম্য রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে।'' বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস এবং হেনরি জনসন 'Tolerance of inequality' অর্থাৎ 'বৈষম্যের প্রতি সহনশীলতা' -এ নীতিতে বিশ্বাস করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানেও চার প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমান ছিল না। শিল্পায়নে বালুচিস্তান এবং গ্রামীণ সিন্ধ ছিল পাঞ্জাব এবং করাচি থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া। বালুচিস্তানের সারানান এবং দালবানদিন- এর গ্রামবাসীরা বলতে গেলে মধ্যযুগে বসবাস করে, অথচ যারা শিয়ালকোটের আশেপাশে থাকে, তাদের রয়েছে টিভি, ফ্রিজ এবং বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি। উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহে আঞ্চলিক বৈষম্য থাকে, তবে অনুন্নত দেশে তা বেশি প্রকট। ওয়াশিংটন এবং নিউ ইয়র্কের তুলনায়, টেক্সাস এবং আরিজোনা তথোটা সমৃদ্ধশালী নয়। কানাডার পূর্ব অঞ্চলের অন্টারিও এবং কুইবেকের তুলনায় উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে নীচু। মুক্ত অর্থনীতিতে, যেখানে লাভের সম্ভাবনা বেশি, সেখানে আর্থিক সম্পদ বেশি পরিমাণে এবং দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট, শিল্পের নিজস্ব একটা সংস্কৃতিও দরকার। পাটের রফতানি থেকে অর্জিত বেদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের মোট রফতানির ৫০%- এর বেশি ছিল বটে, কিন্তু সেটা দিয়ে তো বাঙালিরর জীবন যাত্রার মানকে পাঞ্জাবিদের সমপর্যায়ে আনা সম্ভব ছিল না। তাই-ই যদি হতো, তাহলে সাতচল্লিশের দেশভাগের আগে পূর্ব বাঙলার এতো খারাপ অবস্থা থাকার কথা ছিল না, যেখানে কলকাতা ছিল এত সমৃদ্ধশালী। পশ্চিম জার্মানীরও খুব সমস্যা হচ্ছে পূর্ব জার্মানীকে সমপর্যায়ে টেনে তুলে আনার জন্য। বন পূর্ব জার্মানীতে অনেক অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি, কিন্তু তা যথার্থভাবে কাজে লাগানোর জন্য পূর্ব জার্মানদের সেই ক্ষমতা নেই।

মোট প্রয়োজনের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ সামান্য একটি অংশমাত্র। যাতায়াত অবকাঠামো, বিদ্যুৎ উৎপাদন, দক্ষ শ্রম, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, দক্ষ উদ্যোক্তা, ঝুঁকি নেওয়ার প্রস্তুতি- এসব ছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেখানে বিনিয়োগ পরিবেশ ইতিবাচক নয়, সেখানে বৈদেশিক সাহায্যও কম অসে। এসব রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না।

অন্য প্রদেশের সম পর্যায়ে আসবার জন্য সময়ের প্রয়োজন, বিশেষ করে যদি কোন দেশ ভৌগলিকভাবে বিভক্ত থাকে।

কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন, যেমন- পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগগুলোর ব্যাপারে পাকিস্তানের নেতৃত্ব কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন? এ ব্যাপারে তাদের সাফল্য কতটুকু? বাঙালিদের সাথে জাতীয় পর্যায়ে একাত্ম হতে সক্ষম হয়নি নাই কেন?

ভাষার সমস্যা সমাধান

ভাষা বিষয়ে বাঙালিদের আবেগ প্রশমিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তা ১৯৫৬ সালের সংবিধানে অন্তর্ভক্ত করা হয়। তখন মুদ্রায়, ডাক টিকিটে, সরকারি দলিলে এবং কিছু কিছু স্থানে বাংলা লেখা সংযুক্ত হয়। গণ-পরিষদে বাঙালি সদস্যদেরকে বাংলায় কথা বলবার অনুমতি দেওয়া হয়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান একটি প্রচেষ্টাও হাতে নিয়ে ছিলেন বাংলা এবং উর্দুর জন্য একটি সমন্বিত স্ক্রিপ্ট উদ্ভাবন করা। এটি অবশ্য প্রায় অসম্ভব প্রচেষ্টা ছিল, যা শুরুতেই ব্যর্থ হয়। যে সকল সরকারি কর্মকর্তা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানে পোস্টিং পায়, তাদেরকে বাংলা শেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়, যদিও তা বাধ্যতামূলক ছিল না।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সমাধান

আগেই বলা হয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাঙালিদের বিচ্ছিন্নতার একটি বড় কারণ ছিল, তাদের বিশ্বাস মতে, তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব পায় নাই। রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় যাতে বাঙালিরা দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং তারা অদক্ষ ছিল না, যেভাবে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল।

দেশের সংবিধান রচনার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল ১৯৫০ সালের Basic principels report । এই রিপোর্টে সুপারিশ করা হয় দুইকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের জন্য। সুপারিশ অনুযায়ী নিম্ন কক্ষে থাকবে দুই প্রদেশের প্রতিনিধি- জনসংখ্যার ভিত্তিতে। এতে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত থাকতো। আর উচ্চ কক্ষে প্রত্যেক Federating unit থেকে সমান সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে, ইউনিটগুলোর আয়তন বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নয়। এটি পার্লামেন্টের আদর্শ মডেল থেকে গৃহিত হয়। ভারতের রাজ্যসভা এভাবে গঠিত, যেখানে প্রত্যেক রাজ্যকে সমান সংখ্যক আসন দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা সবচাইতে বেশি এবং রাজস্থানের অনেক কম জনসংখ্যা, কিন্তু রাজ্যসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব সমান।

প্রথম কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলিতে ৭৪ সদস্যের মধ্যে ৪৪ জন ছিলেন বাঙালি। আবার, ১৯৫৪ সালে নতুন গণপরিষদে বাঙালিদেরকে আরো আসন দেওয়া হয়। মোট ৭৯ আসনের মধ্যে পূর্ব প্রদেশের ৪৪ জন সদস্য ছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সন্তুষ্ট হবার কথা।

দেশের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর এবং লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর, দেশের শীর্ষ দুই পদে যথা- গভর্নর জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রী পদে বাঙালি নিযুক্ত হন। কায়েদে আযমের পর খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং লিয়াকত আলী খানের পর মুহম্মদ আলী (বগুড়া) প্রধান নির্বাহী হন। যেহেতু খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন উর্দু ভাষী এবং তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য ছিলেন, সেহেতু হয়তো অনেকে তাকে শতভাগ বাঙালি হিসেবে মেনে নিতেন না, কিন্তু তা পশ্চিম পাকিস্তানীদের দোষ ছিল না। তিনি শেষদিকে বেশ দুর্বল এবং সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম প্রমাণিত

www.pathagar.com

হলেন, যদিও তিনি ছিলেন সৎ এবং আন্তরিক। এটাও বাঙালিদেরকে নিয়ন্ত্রণ রাখার কোন পরিকল্পনা ছিল না।

১৯৪৮ সালে অন্য কোন বাঙালি ছিল না দেশটির অন্যতম পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য। যুক্ত বঙ্গে ধারণা পোষন করবার জন্য মৌলভী ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে বিবেচনায় আনা যায় নি। অন্য বাঙালি রাজনীতিকরা তখন সেই পর্যায়ে পৌছান নাই। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে অবশ্য সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য মন্ত্রীরা সবাই ছিলেন স্থানীয় ; তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয় নাই। ১৪ আগষ্ট ১৯৪৭ থেকে সেপ্টেম্বও ১৯৪৮ পর্যন্ত খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন মূখ্য মন্ত্রী। তারপরে আসেন নূরুল আমিন, মৌলভী একে ফজলুল হক এবং আতাউর রহমান খান, তারপর ১৯৫৮ সালে আসে আয়ুব খানের সামরিক শাসন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান, যা ছিল দেশের প্রথম সংবিধান, দুই প্রদেশের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করে। কেন্দ্রে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব কিছুটা কমলেও, পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে আধিপত্য দেওয়া হয় নাই। এ সমতার মাঝেও বাঙালিদের সুবিধাজনক জায়গায় ছিল কেননা তারা রাজনৈতিকভাবে আরো সমগোত্রীয় ছিল, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল বহুদল ও মত, পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিল একদিকে চরম বামপন্থী- আরেক দিকে ছিল চরম রক্ষণশীল দল। সিন্ধ, পাঞ্জাবি, পাঠান এবং বালুচরা যার যার স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত ছিল এবং বাঙালিদের সুযোগ ছিল এসব বিষয়ে রাজনৈতিক দলের সান্নিধ্যে আসা। পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন।

পূর্ব বাংলার আরো দুটো দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বাঙালিদের অধিকার থাকে যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে তাদের প্রতিনিধি পছন্দ করবার। ওদের মধ্যে অনেকে হিন্দু বাঙালি ভোটের নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য। বাঙালিদের তরুণ মনে রাখা উচিৎ ছিল যে তারা পৃথক নির্বাচনের জন্য সংগ্রাম করেছিল, যা ভারতের তৎকালীন Secretary of state E.S Montague এবং Viceroy of India Lord Chelmsford ১৯১৯ সালে মেনে নেয়। চল্লিশ বছর পরে পূর্ব বাঙলার মুসলমানগণ তাদের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করে রাজনৈতিক স্বার্থে।

www.pathagar.com

তৃতীয় দাবি ছিল পূর্ব বাংলাকে আরো স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার। সোহ্‌রাওয়ার্দী, যিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালি যার ছিল একটি জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী, ১৯৬২ সালের সংবিধান সমন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৮% স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা হয়েছে।'

আগেই বলা হয়েছে, যখন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান তার মন্ত্রীসভা গঠন করেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চারজন করে সদস্য নেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান কেন্দ্রে দুই প্রদেশ থেকে সমান সংখ্যক মন্ত্রী ও সচিব বেছে নেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তিনি শফিউল আযম নামে একজন বাঙালি সরকারি কর্মকর্তাকে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

দুই প্রদেশের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য পদক্ষেপ

অবিভক্ত ভারতে বাংলা প্রদেশ সব চাইতে দরিদ্র অংশ ছিল, এখানে নগরায়নের হার ছিল সবচাইতে কম, যেমনটি ছিল শিল্পায়ন, শিক্ষার হার, বিদ্যুৎ এবং মাথাপিছু আয়। বৃটিশ আমলে এমনটি হবার কথা ছিল, কারণ পূর্ব বাংলাদেশ উন্নয়ন করার কোন কৌশলগত কারণ ছিল না শাসকদের। তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে নজর দেয় । কারণ তাদের রাজ্যের প্রতি হুমকি সেদিক থেকে আসার সম্ভাবনা ছিল বেশি। স্বাধীনতার আগে যে সকল শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল, তা সবই ছিল হিন্দুদের হাতে। তারাই নিয়ন্ত্রণ করতো পাট বাণিজ্য এবং ৯০০ মিলিয়ন মূল্যের পাট থেকে তাদের আয় ভারতে স্থানান্তরিত হয়। মেজর জেনারেল আয়ুব খান তখন পূর্ব বাঙলায় একটি ডিভিশনের কমান্ডে ছিলেন। তার কাছে অঞ্চলটিকে অত্যন্ত অনুন্নত মনে হযেছিল। তার মতে মাত্র অল্প কিছু রাস্তাঘাট ভাল ছিল- "পাবনার ৩০ মাইল সড়কের অংশ, ঢাকা এবং যশোরের কাছে কিছু রাস্তা, আর কোথাও নয়।" পূর্ব বাংলার এ অবস্থার জন্য তিনি দায়ী করেন মৌলভী ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে, যারা দেশভাগের আগে মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং পূর্ব বাংলার অবকাঠামো উন্নয়নে কোন অবদান রাখেন নাই। আয়ুব খান লিখেছেন, "তারা সেখানকার মুসলমানদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কিছুই করেন নাই।"

প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫- ১৯৬০) কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে পূর্ব বাংলার দ্রুত উন্নয়ন তাদের লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালে যখন আয়ুব

www.pathagar.com

খান ক্ষমতায় আসেন, তিনি শিল্পায়নকে পূর্ব পাকিস্তানে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। খালেদ বিন সাঈদ বলেন যে, " দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া বুর্জোয়া শ্রেণীতে যোগ দেওয়ার জন্য বাঙালি বণিক ও ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়।"

ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান উল্লেখ করেন যে বাঙালিদের নতুন প্রজন্ম দাবি করতে থাকে যে যতক্ষণ তাদের প্রদেশের উন্নয়ন সমপর্যায়ে না আসে, ততক্ষণ যেন অন্য অঞ্চলের উন্নয়ন বন্ধ রাখা হয়। বলা বাহুল্য, তিনি এতে রাজী হন নাই। তার নীতি ছিল অন্য অঞ্চলের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলাকালীন কম উন্নত অঞ্চলে বেশি করে উৎসাহ প্রদান করা।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আশ্বাস দেন যে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দ্রুত দূর করা হবে। তার দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬০- ১৯৬৫) পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ ২৫% থেকে ৩২%- এ বৃদ্ধি করা হয় এবং আবারও বলা হয় যে অনুন্নত অঞ্চলে উন্নয়নের গতিকে তড়ান্বিত করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দুই ফসল পাট এবং চা- এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হয়।

১৯৬২ সালের সংবিধানের ১৪৫ ধারায় বলা হয় যে, দুই প্রদেশের মধ্যকার বৈষম্যকে দূর করতে করতে হবে। ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল (এনইসি)- এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দুই প্রদেশের মাথা পিছু আয়ের পার্থক্যকে দূর করা। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি ছয় বছরের ট্যাক্স হলিডে ঘোষণা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশের উপর কাস্টমস ডিউটি ১২.৫% থেকে ৭.৫%- এ কমিয়ে আনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভর্তুকিতে সিমেন্ট পাঠানো হয়। ফাইনান্স কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সম্পদ বণ্টন পুনরায় স্থির করা। তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৬৫-১৯৭০) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬০০ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৪০০ কোটি রুপি। উন্নয়ন ব্যয়ের বেশির ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনপ(১৯৭০-১৯৭৫), যা ২ জুন ১৯৭০ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক বিভাগ দ্বারা অনুমোদিত হয়, উন্নয়ন কর্মসূচির মোট ৭,৫০০ কোটি রুপি থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ৩,৯০০ কোটি দেয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয় ৩,৫৬০ কোটি রুপি। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬০% বৃদ্ধি , আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাত্র ৪৩% বৃদ্ধি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পরিকল্পিত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬৯/৭০ সালের জন্য ছিল ৭.৫%, আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ছিল ৫.৫%। এতে বৈষম্য দূর হবার কথা ছিল।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে বেশ কটি কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেশ কটি প্রকল্পও স্থির করা হয়। প্রদেশে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, সেগুলো ছিল কর্ণফুলি পেপার মিলস্, যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল বার্ষিক ৩৩,০০০ টন কাগজ এবং তা ১৯৫৩ সালে চালু হয়; ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় খুলনা শিপইয়ার্ডস। এটি প্রতিষ্ঠা করে ইপিআইডিসি; ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করে চিটাগাং ড্রাই ডক; ১৯৫৯ সালে খুলনায় একটি নিউজ প্রিন্ট কল প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯৬০ সালে ফেঞ্চুগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি সার কারখানা; ১৯৬৭ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রামে একটি লোহা ও ইস্পাত কারখানা উৎপাদন শুরু করে; এরপর আরো ছোট ছোট ইস্পাত কারখানা বিভিন্ন স্থানে চালু হয় এবং একটি পেট্রোলিয়াম রিফাইনারিও চালু হয়। ফৌজদারহাটে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ক্ষুদ্র অস্ত্র কারখানা। ৮৪টি পাট কল কারখানা হয়, যার মধ্যে ৫৬ টি ছিল স্থানীয় মুসলিমদের মালিকানায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ৩০টি ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ২০টি চিনি কল এবং ৫২টি সুতাকল এবং এর মধ্যে ৩০টির মালিকানা ছিল পূর্ব পাকিস্তানীদের; পূর্ব পাকিস্তানের উদীয়মান শিল্পাঙ্গনে আরো যুক্ত ১৫টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান, ৩০টি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান এবং ৬টি তেল ও গ্যাস রিফাইনারি।

তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় (জুলাই ১৯৬৫- ডিসেম্বও ১৯৬৯) প্রতিষ্ঠিত হয় ২৭টি কারখানা মোট ৪৯ কোটি রুপি ব্যয়ে। এ সব কারখানার মধ্যে ছিল চিনি, সার, পাটজাত দ্রব্য, ইস্পাত দ্রব্য, হার্ডবোর্ড, নিউজপ্রিন্ট এবং্ ঔষধ কারখানা। ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (ইপিআইডিসি) ৬৯/৭০ (জুলাই- মার্চি)- এ পাঁচটি প্রকল্প সম্পন্ন করে, যার মোট ব্যয় ছিল ৮.৬৮ কোটি রুপি। এরমধ্যে ছিল দুটি পাটকর, দুইটি সার কারখানা এবং একটি চিনি কল। ইপিআইডিসি -এর বাণিজ্যিকভাবে চালু ১৯টি প্রকল্পের স্থায়ী সম্পদের মোট মূল্য ছিল ৯৬.১৬ কোটি রুপি। ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ৩.১৪ কোটি রুপি ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করে ১৮টি শিল্প এলাকা । ১৯৭০ সালে ইপিআইডিসি -এর অধীনে ২২টি চলমান প্রকল্প ছিল।

চব্বিশ বছরে আনুমানিক ৬০০ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে ২টি শিল্প ইউনিট। স্বাধীনতার সময় পূর্ব বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৭০ সাল নাগাদ তা সেমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থনীতিতে পরিণত হয়। এসব কারখানা ছাড়াও, কাপ্তাইতে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয় পাকিস্তান কাউন্সিল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ল্যাবরেটোরিজ; আর ছিল গঙ্গা কপোতাক্ষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প; তিস্তা বাঁধ প্রকল্প; ত্রিপুরা- চট্টগ্রাম প্রকল্প; ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ প্রকল্প এবং আরো কটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প।

নরসিংদী- মান্দিগঞ্জ নতুন রেল লাইন বসানোর জন্য এবং রূপসা- বাগেরহাট লাইনকে ন্যারো গেজ থেকে ব্রডগেজ- এ রূপান্তরিত করবার জন্য পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে ৪০.০২ কোটি রূপি ব্যয় করে; অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন উন্নত করার জন্য ব্যয় করা হয় ১১.৫ কোটি রুপি; ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁপুর, বরিশাল ও খুলনায় পাঁচটি নদীবন্দর, যাত্রী এবং মালামালের জন্য চালু করা হয় ১৯৬৫-৭-সালে ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরের যোগাযোগ স্থাপনের জন্যসড়ক নেটওয়ার্ক বসানো হয়। নির্মাণ করা হয় জাতীয় সংসদ ভবন। এমএনএ, এমপিএ হোস্টেল, হাইকোর্ট ভবন, বায়তুল মোকাররম মসজিদ, গুলশান, ধানমন্ডি ও বনানীর মত অভিজাত আবাসিক এলাকা। প্রতিষ্ঠিত হয় তেজগাঁও এলাকায় একটি আধুনিক বিমান বন্দর, ৬৪ হাজার টিউবওয়েল এবং হ্যান্ড পাম্প বসানো হয়; পূর্ব পাকিস্তানে সেচ পানির সরবরাহ ৪০০% বৃদ্ধি করা হয়, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় মাত্র ২০%; হাজার হাজার ছোট সেতু নির্মাণ করা হয়। ৪৬০টি থানার প্রত্যেকটিতে স্থাপিত হয় কমিউনিটি ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র; পূর্ব পাকিস্তানে তখন দেখা যায় নতুন নতুন শপিং সেন্টার, হোটেল, ব্যাংক, বহুজাতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। অথচ ১৯৪৭ সালে সেখানে একটি ভাল জেনারেল স্টোরও বলতে তেমন কিছু ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তার মধ্যে ছিল- ১. ওয়াপদাকে দুই ভাগ করা; ২. রেলওয়ের প্রাদেশিককরণ; ৩. পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প উন্নয়ন ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় স্থানান্তরিত করা; ৪. ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব পাকিস্তান; ৫. ঢাকাকে দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এখানে স্থায়ী আইনসভা থাকবে; ৬. একটি ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করা; ৭. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা, ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস এবং আনসার গঠন করা এবং পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্য থেকে এসব বাহিনীগুলোতে বেশি সংখ্যক নিয়োগ দেওয়া; ৮. উদ্ভিদ জেনেটিকস্ এর জন্য ময়মনসিংহে আনবিক শক্তি কেন্দ্র

www.pathagar.com

স্থাপন করা; ৯. চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আনবিক মেডিকেল কেন্দ্র স্থাপন; এবং ১০. ঢাকায় আনবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা।

আন্ত-প্রদেশ বাণিজ্য

আন্ত-প্রদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল তথ্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদগণ এবং আওয়ামী লীগ রাজনীতিকগণের অভিযোগ ছিল যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্যিক বৈষম্য ছিল, কিন্তু ছকে দেখা যায় যে, এ ধারণাটি ভুলঃ

সারনী ১২

আন্ত- প্রাদেশিক বাণিজ্য ১৯৬৪/৬৫ এবং ১৯৬৮/৬৯

রফতানি	১৯৬৪/৬৫	১৯৬৮/৬৯
পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে		
তৈরি (উৎপাদিত) পণ্য	৪৮.৭৯ কোটি রুপি	৭৬.০ কোটি রুপি
প্রাথমিক পণ্য	৪.৮১ কোটি রুপি	১০.৮ কোটি রুপি
পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে		
তৈরি (উৎপাদিত) পণ্য	৫৯.১৭ কোটি রুপি	৭১.৫৩ কোটি রুপি*
প্রাথমিক পণ্য	২৬.৫১ কোটি রুপি	৬২.৭২ কোটি রুপি

সূত্রঃ অর্থনৈতিক জরিপ, পাকিস্তান ১৯৬৯/১৯৭০, পৃষ্ঠা- xxvii

* যদিও মোট আন্তপ্রাদেশিক বাণিজ্য পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে, সারনী ১২ থেকে দেখা যায় যে, তৈরি বা উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায় এবং তাতে বোঝা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন সেক্টর যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে থাকে।

আন্ত প্রাদেশিক বাণিজ্যের বৈষম্য কমিয়ে আনবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। সারনী ১৩ এ ১৯৪৮/৪৯ থেকে ১৯৬৯/৭০ এর কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সারনী ১৩

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক বাণিজ্য

১৯৪৮/৪৯- ১৯৬৯/৭০

	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি	পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রফতানি	অনুপাত
১৯৪৮/৪৯	১.৯৮ কোটি রুপি	১৪.০৩ কোটি রুপি	১৩:১
১৯৪৯/৫০	৩.২৩ কোটি রুপি	২৩.৫৬ কোটি রুপি	৭:১
১৯৫০/৫১	৪.৬০ কোটি রুপি	২৭.২৫ কোটি রুপি	৬:১
১৯৫১/৫২	৩.৬৪ কোটি রুপি	২১.৮৪ কোটি রুপি	৭:১
১৯৫২/৫৩	১০.১১ কোটি রুপি	৩৮.৬৯ কোটি রুপি	৪:১
১৯৫৩/৫৪	১৩.০৭ কোটি রুপি	৩০.৫০ কোটি রুপি	৩:১
১৯৫৪/৫৫	১৮.০৭ কোটি রুপি	৩৩.৩৮ কোটি রুপি	২:১
১৯৫৫/৫৬	২২.০৭ কোটি রুপি	৫৩.১৭ কোটি রুপি	২:১
১৯৫৬/৫৭	২৩.৫৭ কোটি রুপি	৭০.১৪ কোটি রুপি	২:১
১৯৬৮/৬৯	৮৬.৮৫ কোটি রুপি	১৩৮.৫৩ কোটি রুপি	১.৫:১
১৯৬৯/৭০ (জুলাই-ডিসেম্বর)	৫১.০৮ কোটি রুপি	৮৮.৯৩ কোটি রুপি	১.৫:১

বি. দ্রঃ বাণিজ্য বৈষম্য হ্রাস পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে যেতে থাকে।

সূত্রঃ অর্থনৈতিক জরিপ, পাকিস্তান, ১৯৬৯/৭০। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস, সারনী ৪১, পৃষ্ঠা- ৪১

মাথা পিছু আয়

পূর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে কম, কিন্তু পৃথক হওয়ার ২২ বছার পরেও তা কম। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির হার পূর্ব পাকিস্তানের ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। এ চিত্রটি সারনী -১৪ তে স্পষ্ট বোঝা যায়।

www.pathagar.com

সারনী -১৪

মাথা পিছু আয়: পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান

সাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬৯/৬০	২৫১ রুপি	৩৩১ রুপি
১৯৬০/৬১	২৫৯ রুপি	৩৩৪ রুপি
১৯৬১/৬২	২৬৮ রুপি	৩৪৩ রুপি
১৯৬২/৬৩	২৬২ রুপি	৩৫৬ রুপি
১৯৬৩/৬৪	২৮৪ রুপি	৩৬১ রুপি
বৃদ্ধির হার	১৪%	০৯%

সূত্র: কুরেশী, আনোয়ার ইকবাল, পাকিস্তান মার্চেস অন রোড টু প্রোসপেরিটি, পৃষ্ঠা -১৪৭

Net National Product-এর বেলায় একই চিত্র দেখা যায়। ১৯৬৯- ১৯৬৪ সময় কালে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এর বৃদ্ধির হার ছিল ২৫%, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ২০%। সারনী ১৫ তেও তা দেখা যায়:

সারনী ১৫

নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট: পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬৯/৬০	১৩৫২.১ রুপি	১৪৯১.১ রুপি
১৯৬০/৬১	১৪২৯.৫ রুপি	১৫৪৩.৬ রুপি
১৯৬১/৬২	১৫২১.৬ রুপি	১৬২৪.৮ রুপি
১৯৬২/৬৩	১৫২১.৭ রুপি	১৭৩০.৪ রুপি
১৯৬৩/৬৪	১৭০০.০ রুপি	১৮০০.০ রুপি
বৃদ্ধি হার	২৫%	২০%

বি.দ্র: বৈষম্য নেমেছে ১০% থেকে ৬%

সারনী-১৬ তে দেয়া হয়েছে১৯৫৫/৫৬ এবং ১৯৬৬/৬৭ সালে পাকিস্তানে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের হার। এটি ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ দশ বছরে তা ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

সারনী -১৬

পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য

	১৯৫৫/৫৬	১৯৬৬/৬৭	বৃদ্ধি
পাটজাত পণ্য	৪৮,৫০০ টন	৪০৭,৭০০ টন	৯০০%
কাগজ	২১,১৩৩ টন	৭০,৫১৭ টন	৩০০%
সিগারেট	৩৯৯ মিলিয়ন	১৩,১৩৪ মিলিয়ন	৩০০%
সিল্ক/ রেশমী বস্ত্র	১৬১,০০০ গজ	১১১,০০০ গজ	৭০০%
চিনি	২৫,০০০ টন	১১২,০০০ টন	৪০০%
সবজি	২২৭,০০০ টন	৪,৭০৯ টন	২০০০%

সূত্র: পাকিস্তানের ২০ বছর ১৯৪৭/১৯৬৭, পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান প্রধান পণ্যেও উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চাল, পাট, মাছ, চা এবং তামাকের উৎপাদন দ্বিগুন বেড়ে যায়।

এটা কি তুচ্ছ অর্জন? মেজর জেনারেল ফজল মুকিম, প্রাক্তন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং; ইস্ট পাকিস্তান ডিভিশন লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের দ্রুত উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মান দেখে ভারত চিন্তিত হয়ে পড়ে।' আয়ুব খান আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বাঙালিদেরকে সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়া, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে সে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা ছিল না।

১৯৫০ সালে লে. কর্নেল (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) এস, এ কিরমানী ছিলেন ইস্ট বেঙ্গলের ১৪ ইনফেন্ট্রি ডিভিশন -এর Royal Pakistan Service Corps- এর কমান্ডার । তিনি তার বাহিনীকে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য একটি স্থানীয় ঠিকাদার নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনেক খোঁজার পরেও কোন বাঙালি ঠিকাদার পান নাই, যার সামর্থ ছিল নিজের অর্থ বিনিয়োগ করে পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনীকে পণ্য সরবরাহ করবে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কর্ণেল কিরমানী এ লাভজনক ব্যবসায় একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে নিয়োগ দিলেন।

সাফদার মাহমুদ স্বীকার করেন যে আয়ুবের নীতিসমূহ পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পপতিদের জন্য সুফল বয়ে আনে, কিন্তু তাতে সাধারণ জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় নাই। রওনক জাহান, যিনি সাধারণত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের নীতি

www.pathagar.com

নির্ধারণের কঠোর সমালোচক, বলেন যে, 'আইয়ুবের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ সফলতা লাভ করে, তবে মানুষের আশা- আকাঙ্খার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়াতে ক্ষোভ বাড়তে থাকে।'

দুই প্রদেশের মাঝে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও নির্দেশ দেন, তিনি এবং আয়ুব খান কখনও চান নাই যে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি কমে যাক। ইয়াহিয়ার শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানে Net capital inflow বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়- ৪০% থেকে ৭৫% হয়। বিনিয়োগও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিয়োগ ৩৯% থেকে ৫৪% বেড়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল বলে, চর্তর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭০- ১৯৭৫) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরো সম্পদ বন্টন করা হয়। কিন্তু এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবার আগেই পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আলাদা পথে যাবার। সারনী -১৭ তে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, তা দেখানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট বরাদ্দের ৫২.৫% আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৪৭.৫%।

সারনী ১৭

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অর্থ বরাদ্দ

(৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৭০-১৯৭৫)

সেক্টর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
পাবলিক সেক্টর	২,৯৪০ মিলিয়ন রুপি, ৬০%	১,৯৬০ মিলিয়ন রুপি, ৪০%
প্রাইভেট সেক্টর	১,০০০ মিলিয়ন রুপি, ৩৯%	১,৬০০ মিলিয়ন রুপি, ৬১%
মোট	৩,৯৪০ মিলিয়ন রুপি, ৫২.৫%	৩,৫৬০ মিলিয়ন রুপি, ৪৭.৫%

সূত্র: চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পশ্চিম পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিণ ৪৫,৩৮৩ মিলিয়ন রুপি, যেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল ৬২,৬০৪ রুপি, ১৯৬৮-১৯৭০ সময়কালে। এ খাত ছিল 'প্রাদেশিক সরকারের জন্য উন্নয়ন বাজেট।' (Budget in beief, Table XIII, section II, Page-36)

www.pathagar.com

বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যবহার

এটা অনস্বীকার্য যে পাট রফতানি থেকে যে আয় হতো, তা সব কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হতো না। বাঙালি কৃষকের কঠিন শ্রম দ্বারা অর্জিত টাকার কিছু অংশ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।কিন্তু এটি আসলে অর্ধ সত্য, কারণ বৈদেশিক মুদ্রার রুপিতে যা মূল্য ছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ডাকাতি' বলা চলবে না।

পাট রফতানির মোট আয় পূর্ব পাকিস্তানে পুরোপুরি ব্যবহার না করার কারণ ছিল প্রদেশটির ব্যবহারের ক্ষমতার অভাব। আগে বলা হয়েছিল, একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্রেফ টাকাই যথেষ্ট নয়। আরো অনেক কিছু প্রয়োজন যা অনুন্নত অঞ্চলে ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়।

সারনী ১৮ তে দেখানো হয়েছে ১৯৬৫/৬৬ থেকে ১৯৬৭/৬৮ পর্যন্ত দুই প্রদেশের জন্য সম্পদ বন্টন এবং দুই প্রদেশের সরকারের সম্পদের ব্যবহার। পূর্ব পাকিস্তান মোট অর্থের মাত্র ৪১% ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করে ৪৯%। বন্টন প্রায় সমান ছিল।

সারনী ১৮

বিস্তৃত শিল্প বিনিয়োগ সিডিউলের অধীনে বরাদ্দের আঞ্চলিক বন্টন (মিলিয়ন রুপি)

বছর	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	মোট	বন্টনের হার প. পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১৯৬৫/৬৬ থেকে ১৯৬৬/৬৮ (মোট)	৩,১১৮	১,১১৩	৪,২৩১	৭৪%	২৬%
মোট সরবরাহ	৫,৮৬১	৫,০২৪	১০,৮৬৫	৫৪%	৪৬%
অব্যবহৃত ফান্ড	২,৭৪৩	৩,৯১১	৬,৬৫৪	৪১%	৫৯%

লক্ষ্য করা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে দুই প্রদেশের রফতানি আয়ের অনুপাতও বদলে যায় এবং ১৯৬৭/৬৮ সালে পূর্ব

পাকিস্তানের রফতানি আয় ৭০% থেকে ৪৭%- এ নেমে আসে, যা সারনী- ১৯ এ দেখা যায়।

সারনী -১৯

প্রদেশভিত্তিক রফতানি
(মিলিয়ন রুপি)

বছর	পশ্চিম	পূর্ব	মোট রফতানির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ
১৯৬০-৬১	৫৪০	১২৪৯	৭০%
১৯৬১-৬২	৫৪৩	১৩০১	৭০%
১৯৬২-৬৩	৯৯৮	১২৪৯	৫৫%
১৯৬৩-৬৪	১০৭০	১২২৪	৫৪%
১৯৬৪-৬৫	১১৪০	১২৬৮	৫৩%
১৯৬৫-৬৬	১২০৪	১৫১৪	৫৫%
১৯৬৬-৬৭	১২৯৭	১৫৬৫	৫৫%
১৯৬৭-৬৮	১৬৪৫	১৪৮০	৪৭%
মোট	৮৪৩৭	১০৮৬০	

সূত্র: দি বাজেট ইন ব্রিফ, ১৯৬৭-৭০, পৃষ্ঠা- ৪৭

১৯৬৯/ ৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ (২৩১ কোটির রুপি) পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দের (১৯০ কোটি রুপি) চেয়ে বেশি। দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'এ বৈষম্যকে কমিয়ে আনতেই হবে।" দুর্ভাগ্যবশত যে সকল নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধিকে তরান্বিত করার জন্য এবং দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যকে কমিয়ে আনার জন্য, সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় নাই। এর কারণ ছিল সম্পদের সঙ্গতিহীন উৎপাদন, স্বজনপ্রীতি, অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং আন্তরিকতার অভাব। তা সত্ত্বেও , পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

মূল্যের তারতম্য

আওয়ামী লীগ বার বার উল্লেখ করে যে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বেশি ছিল এবং এ ব্যাপারটিকে অনেকে খুব বড় করে দেখেছে।

কথিত আছে যে, সৈয়দপুরের একজন শিক্ষক অংক শিখাতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি পেন্সিলের পার্থক্য। তিনি ছাত্রদেরকে প্রশ্নকে করেছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানে যদি একটি পেন্সিলের দাম ১০ পয়সা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে তা যদি ১৫ পয়সা হয়, তা হলে ৫০০০টি পেন্সিল যদি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানে তার জন্য কতটা বেশি মূল্য দিতে হবে?" এ ধরনের উদাহরণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তিক্ততার বীজ বোনা হয়।

সারনী ২০ এ দেওয়া হয়েছে ১৯৭০ সালের মার্চে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার কিছু দ্রব্যের মূল্য। দেখা যায়, একস্থান থেকে আরেক স্থানে কোন পণ্য স্থানান্তরিত হলে, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তা যে পশ্চিম থেকে পূর্বে বা পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেলে, উভয় ক্ষেত্রে।

সারনী -২০

নির্দিষ্ট পণ্যের গড় পাইকারি মূল্য
(১৯৬৯-৭০, মার্চ)

পণ্য	পূর্ব	পশ্চিম
চা	চট্টগ্রাম- ৩.৬৫ রুপি পাউন্ড প্রতি	করাচি- ৫.৭৫ রুপি পাউন্ড প্রতি
নারিকল তেল	ঢাকা- ১২১.০২ রুপি	করাচি- ২১১.৫০ রুপি
মুগ ডাল/ মনপ্রতি	ঢাকা- ৪৭.০০রুপি	করাচি- ৫০.০০ রুপি
গম/ মনপ্রতি	ঢাকা- ১৯.৬২ রুপি	করাচি- ২২.০০ রুপি
চাল/ মনপ্রতি	ঢাকা- ৪২.৩৭ রুপি	করাচি- ২৭.৫০ রুপি
চিনি মনপ্রতি	ঢাকা ৮৩.০০ রুপি	লাহোর- ৬৭.০০ রুপি
মসুর ডলি/ মনপ্রতি	ঢাকা ২২.০০ রুপি	লায়ালপুর- ৩৩.০০ রুপি
বিড়ি	ঢাকা- ৭.৯৩ রুপি প্রতি হাজার	করাচি- ১৫.৫০ রুপি প্রতি হাজার
সিগারেট	ঢাকা- ৩২.০৫ রুপি	করাচি- ৩২.৪০ রুপি
পপলিন কাপড়/গজপ্রতি	ঢাকা- ১.১৬ রুপি	লায়ালপুর- ২.১০ রুপি

www.pathagar.com

বি.দ্র: যখন শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের একই সমস্যার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দায়ী করেন, তখন সেই ১৯৭০ সালেই চাল ও চিনি ব্যবতীত পূর্ব পাকিস্তানে সব দ্রব্যের মূল্য পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে কম ছিল।

সূত্র: অর্থনৈতিক জরিপ,পাকিস্তান ১৯৬৯/৭০, টেবিল নম্বর ৩৮, সেন্ট্রাল পরিসংখ্যান দপ্তর পৃষ্ঠা নং ৮০ ও ৮১

বাঙালি নেতারা বদ্ধপরিকর ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বৈরী মানসিকতা গড়ে তোলা। তারা বলতো যে মোট প্রবৃদ্ধির দিকে না তাকিয়ে যা দেখতে হবে তা ছিল প্রসারমাণ বৈষম্য। কেউ বোঝায় নাই যে, অর্থনীতির মৌলিক নীতি অনুযায়ী একটি অঞ্চলের শুরুটা যদি ধীর গতিতে হয় এবং এর সম্পদ যদি খুবই নগন্য থাকে, তবে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই একটি তুলনামূলক উন্নত অঞ্চলের চাইতে কম হবে। বেশি টাকা বিনিয়োগ করলেও উন্নত অঞ্চলের কাছে পৌছাতে কিছু সময় লাগবে বৈকি।

এটা ঠিক যে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। যে উন্নয়নশীল দেশে নিরাপত্তার সমস্যা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা, প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব, দক্ষ পরিকল্পনাবিদদের অভাব, দুর্নীতি, অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি এবং অলসতা বিরাজ করে, সে সকল অঞ্চলে লক্ষ্য মাত্রায় পৌছানো সম্ভব হয়ে উঠে না।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বিশ বছর সময়ে দেখা যায় প্রবৃদ্ধির হার এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে কম। সেখানে এখনও জনসংখ্যার আধিক্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্তরায়। স্বাধীনতার ২০ বছর পর একটি আলোক চিত্রে দেখা যায়, ১৯৯২ সালে বাঙালি একটি পরিবার ছিন্ন কাপড় পড়ে কলা গাছ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, চালের অভাবে।

এখনও হাজার হাজার বাঙালি নর-নারী পাকিস্তানে আসে করাচি শহরে চাকরির খোঁজে। তারা তাদের উপার্জিত টাকা দেশে তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখন যদি তারা এটা করতে পারে, তবে পাকিস্তান আমলে তারা আরো বেশি সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল ভোগ করতে পারতো।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতাকে দূরীকরণের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ

আয়ুব খানের আমলে এবং ইয়াহিয়ার সল্প সময়ের আমলে বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ গৃহিত হয়, পূর্ব পাকিস্তানীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রদানের সুযোগ দেওয়া। ১. সিভিল সার্ভিসে ৪০% চাকরি পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় এবং তার উপরে ২০% ছিল মেধা ভিত্তিক; ২. পাঞ্জাবীদের বেলায় একজন প্রার্থীকে ২০তম স্থান পর্যন্ত থাকলে চাকরির জন্য বিবেচনায় আনা হয়, কিন্তু বাঙালির বেলায় ৮০ তম স্থান লাভ করলেও তাকে বিবেচনায় আনা হয়; ৩. ১৯৬৬ সালে সকল সরকারি চাকরির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬০% বরাদ্দ করা হয়। ৪. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কেন্দ্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান সংখ্যক সচিব নিয়োগ দেন এবং ৫. সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য মান কমিয়ে আনা হয়েছিল বাঙালিদের নিয়োগের সুবিধার্থে। এমনকি পাকিস্তানের শক্ত সমালোচক কে সুব্রামানিয়াম স্বীকার করেন যে ১৯৬৮ সালে এসে সকল সরকারি চাকরিতে বাঙালির ৩৬% প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৯৪৭ সালে তা ছিল মাত্র ১%।

ফিল্ড মার্শাল আয়ুবের সামরিক সচিব মে. জে. মুহম্মদ রাফি খান বলেন যে, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সার্ভিস- এ ২২টি পদ খালি ছিল। যারা সিএসএস পরীক্ষা দেন, প্রথম ২২জনই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। কিন্তু বাঙালিদেরকে তবুও কোটা হিসেবে নেয়া হয়, যদিও তাদের মধ্যে প্রথম স্থান যে লাভ করেছে, সম্মিলিত তালিকায় তার স্থান ছিল ৬০তম। যেহেতু সে বছর মাত্র ২২ জনের নিয়োগ দেওয়া হবে, সেহেতু মেধা থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়। একজন রাষ্ট্রদূতের ছেলের নামও সে তালিকায় ছিল। সফল প্রার্থীর সংখ্যাকে ২৩ -এ উত্তীর্ণ করে তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়োগ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদূতের ছেলেকে স্থান দেবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কোটা কমানো হয়নি।

যদি মান ও দক্ষতা লক্ষ্য হয়ে থাকে, তবে মেধা হওয়া উচিৎ সরকারি চাকরির একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে সন্তুষ্ট করার জন্য কোটা রীতির উদ্ভব হয়। কিন্তু তা প্রশাসনের জন্য লজ্জনজনক নয়। বৈষম্যকে উপেক্ষা করার জন্য মানকে (কোয়ালিটি) বলি দেওয়া হয়। কিন্তু যারা আসলে মেধাবী ও দক্ষতা সম্পন্ন, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা জানে যে, তাদের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু তারা একটি বিশেষ অঞ্চলে জন্ম লাভ করে নাই। বহু দশক ধরে করাচির জন্য কোন কোটা ছিল না। কিন্তু একজন

www.pathagar.com

বালুচ, পাঠান বা বাঙালি পড়ালেখায় দুর্বল হলেও সে সুযোগটি পায়, কোটা ব্যবস্থার সুবাদে।

১৯৬৩ সালে এসে মাত্র ২০% প্রার্থীকে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। বাঙালির জন্য ৪০% আসন সংরক্ষিত ছিল। বাকি ৪০% সংরক্ষিত ছিল বালুচিস্তান, সিন্ধ এবং সীমান্ত এলাকার জন্য। এর ফলে সিভিল সার্ভিসে বাঙালি কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। ১৯৬৫ সালে এসে এ সংখ্যা ৪০% বেড়ে যায় এবং ১৯৬৯ সালে এসে এর সংখ্যা ৪০.৯% বৃদ্ধি পায়। আর ১৯৬৬ তে এসে মোট আসনের ৬০% বাঙালির জন্য সংরক্ষিত ছিল।

সারনী ২১ এ দেওয়া হয়েছে ১ জুলাই ১৯৭১ সালে গ্রেড ১৭ এবং এর উর্ধ্বেও কর্মকর্তার সংখ্যা। যেখানে ১৯৪৭ সালে মাত্র একজন প্রথম শ্রেণীল বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন, ১৯৭১ সালে এসে তা ১৯৬ জনে দাঁড়ায়, যা পঞ্জাবের থেকে মাত্র তিনজন কম। দেখা যায় যে, রটনা যা-ই থাকুক না কেন, পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের চাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

সারনী -২১

গ্রেড- ১৭ এবং এর উর্ধ্বে কর্মকর্তাদের প্রদেশভিত্তিক তালিকা (১ জুলাই ১৯৭১)

পাঞ্জাব	১৯৯
পূর্ব পাকিস্তান	১৯৬
সিন্ধ	৬২
এনডব্লিউএফপি	৪০
বালুচিস্তান	০৬
মোট	৫০৩

সূত্র: কম্পাইল্ড ফ্রম সিভিল লিস্ট, ১ জুলাই ১৯৭১,ক্লাস ওয়ান অফিসার্স, গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, কেবিনেট সেক্রেটারিয়েট, এস্টাবলিসমেন্ট ডিভিশন, পৃষ্ঠা ৩৮১- ৪২৪

www.pathagar.com

বি. দ্রঃ যদিও কেকের বড় অংশ পাঞ্জাবীদের কাছে যায়। বাঙালিদের ভাগ্যে নগণ্যও ছিল না। পাকিস্তানের অন্যান্য ছোট ছোট প্রদেশের বরঞ্চ প্রতিবাদ জানালে ,তা যৌক্তিক ছিল। কারণ তাদের জনসংখ্যার তুলনায় তাদের ভাগ অনেক কম ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে যেমন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ, অর্থনৈতিক সমন্বয় ও বৈদেশিক সাহায্য, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালি সংখ্যা হয় বেশি ছিল অথবা পাঞ্জাবীদের থেকে অল্প সংখ্যক কম। 'দ্য স্টেট অব মার্শাল ল' বইটিতে লেখিকা আয়েশা জালাল জুট বোর্ড নিয়ে অনেক অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু এ বোর্ডের নয়জন পরিচালকের মধ্যে সবাই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের। *(সূত্রঃ সিভিল লিস্ট, জুলাই ১, ১৯৭১, ক্লাস ওয়ান অফিসার্স, গভর্নমেন্ট অব পাকিস্তান, এস্টাবলিসমেন্ট ডিভিশন)*

জাতীয় সংহতির জন্য পদক্ষেপ

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৬৭,০০০ স্কুল, ২২৫টি কলেজ এবং ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তারপর স্থাপিত হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১ সালে। ১৯৬৪ সালে ঢাকার উত্তরে স্থাপিত হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৬ সালে স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্তঃপ্রদেশ নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়। ঘন ঘন সাংস্কৃতিক বিনিময়- এর ব্যবস্থা করা হয় এবং ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান একটি সংহতি পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালে এসে যদিও দুই প্রদেশের মধ্যে সব বৈষম্যকে সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয় নাই। পূর্ব পাকিস্তানকে কোনভাবে উপনিবেশ হিসেবে গণ্য করা হতো না । এটা ঠিক নয় যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও সম্পদকে পশ্চিম পাকিস্তানের সুবিধার জন্য শোষণ করা হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতির চোরাবালি

২৯ জানুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তিনি দশদিনের জন্য গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দেড় মাস অফিসের বাইরে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী সে সময় স্পিকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা, তা করা হয় নাই। কারণ আইয়ুব তাকে বিশ্বাস করতেন না। এ ইচ্ছাকৃত সংবিধান লংঙ্ঘনে বাঙালিরা রেগে যায়। জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট ইংল্যান্ডে যান চিকিৎসার জন্য। তিনি ক্ষমতা আব্দুর জব্বার খানের কাছে হস্তান্তর না করে আবার সংবিধান লংঘন করেন। তার বিরোধীরা তাকে ক্ষমতা ছাড়বার জন্য আরো চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে জুলফিকার আলী ভট্টোর আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। তার সাথে যোগ দেয় ছাত্র শিক্ষক আইনজীবী এবং সাধারণ জনগণ। নভেম্বর ৭, ১৯৬৪ তারিখে, রাওয়ালপিন্ডির কাছে অবস্থিত পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্ররা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আব্দুল হামিদ নামে একজন ছাত্র মৃত্যুবরণ করে। এ সুযোগে পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো ছেলেটির জানাজাকে রাজনৈতিক কর্মসূচীতে পরিণত করে।

তারপর থেকে শুরু হয় দৈনিক প্রতিবাদ কর্মসূচী, ধর্মঘট, ঘেরাও, জ্বালাও-পোড়াও, লুট, লাঠিচার্জ ইটপাটকেল ছোড়া ইত্যাদি। কার্ফ্যু ভঙ্গ করা হয় এবং সেনাবাহিনী বারবার মোতায়েন করা হয়। নভেম্বর ১১ তারিখে যখন প্রেসিডেন্ট পেশওয়ার সফরে আসেন, হাসেম নামে একজন অপরিচিত লোক তার দিকে গুলি ছুড়ে মারেন। এর পরে ভুট্টো এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা খান আব্দুল ওয়ালী খানকে গ্রেফতার করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৯৬৯ তারিখে আইয়ুব খান একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আয়োজন করে এতে যোগদান করবার জন্য ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন কমিটির

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানকে আহ্বান জানান। তিনি তিনটি শর্ত সাপেক্ষে যোগ দিতে রাজি হন: ১. জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা; ২. ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা; ৩. সব রাজনৈতিক কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়া। আয়ুব প্রত্যেকটি শর্তে রাজি হন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়, অল্প সময়ের জন্য এবং এর পরের তারিখ ধার্য করা হয় ১০ মার্চ। পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট রাজি হন। তিনি রাজি হন তার প্রণীত ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করে নতুন করে সংবিধান প্রণনয়ন করা যাবে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নেয়া হবে। তারপরও ভুট্টো এবং ভাসানী রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে রাজি হন নি।

কনফারেন্সটি আবার ১০ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এতে নওয়াব নাসরুল্লরাহ একটি দু'দফা প্রস্তাব পেশ করেন:

১. আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ একটি ফেডারেশনের সংসদীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. প্রত্যক্ষ বয়স্ক ভোটে আইন সভা গঠিত হবে।

ফেডারেল পার্লামেন্টারি সিস্টেমের সংজ্ঞা নিয়ে কিছু বিতর্ক ছিল এবং প্রদেশগুলোকে কতটুকু স্বায়ত্তশাসন দেয়ে যেতে পারে- এ নিয়েও বিতর্ক ছিল। মুজিব তখন তার বিখ্যাত ৬ দফা উপস্থাপন করেন এবং তার সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফাও যুক্ত হয়। তাকে সমর্থন করে বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ এবং প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ। তারা দুজনই পূর্ব পাকিস্তানের ছিলেন।

ততোদিনে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আওয়ামী লীগের ইশতেহারের অংশে পরিণত হল। এই ১১ দফার মধ্যে কয়েকটি দাবি ছিল:

১. ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করা;
২. সিলেবাস থেকে 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামক বইটি বাতিল করা;
৩. বিজ্ঞানাগারের উন্নয়ন;
৪. ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা;
৫. কাগজের দাম কমানো;
৬. বন্দী ছাত্র নেতাদের মুক্তি দেয়া এবং
৭. পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' নামকরণ করা।

মুজিব বারবার বলেন যে, "এ দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এই ছয়দফাই হচ্ছে একমাত্র রক্ষাকবজ।" আইয়ুব সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন, "এ দেশ" বলতে কোন

www.pathagar.com

দেশকে বোঝানো হচ্ছে?" এটা স্পষ্ট হলো যে তিনি মুজিবের ছয় দফা নিয়ে মোটেও খুশী ছিলে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ছয় দফার ফলে দেশ ভেঙ্গে যাবে। তিনি বলেন, "আমি যদি ছয় দফায় রাজি হই, কায়েদ ই আযমের সব অর্জন শেষ হয়ে যাবে।" আইয়ুব অখুশী ছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা খান আব্দুল ওয়ালী খান বলেন যে, ওয়ান ইউনিট এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা উচিৎ, জামায়াত ই উলেমা ইসলামের মাওলানা মুফতি মাহমুদের একমাত্র দাবি ছিল সংবিধানে যেন ইসলামি আদর্শ যুক্ত থাকে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির মাহমুদ আলী বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ধারণা লিয়াকত আলী খানের সময়ে সমর্থিত হয় এবং তা খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় সমর্থন করেন। আবার সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে এটা পুনরায় গণপরিষদে সমর্থন লাভ করে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মাধ্যমে। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে কিছুই অর্জিত হল না।

মুজিব অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর মহাসচিব এল. এইচ. কামারুজ্জামানকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠালেন একটি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে। তিনি ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধন প্রস্তাব করেন, যাতে সংবিধান আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবির সমর্থন করে। এ প্রস্তাব গৃহিত হলে বাংলাদেশের সাথে একটি কনফেডারেশন সৃষ্টি হতো এবং এটি পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের একটি নামমাত্র অংশে পরিণত হতো। আইয়ুব এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না, কারণ এতে দেশটি বিভক্ত হয়ে যেত। কিন্তু ততোদিনে ঘটনাগুলো এমনভাবে গড়িয়ে গেল যে আবার সামরিক শাসন সামনে এসে গেল।

১৯৬৯ এর প্রথম থেকে আইয়ুব খান তার ইতিবাচক গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকেন। একদিকে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে, অপর দিকে তার জনপ্রিয়তাও হ্রাস পেতে থাকে। দেশের সব রাজনৈতিক দল নিয়ে যে রাউন্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সটি হয়, তা পুরোপুরি ব্যর্থ ছিল। তার পরিনতিতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরী হয়, তা নিয়ন্ত্রণে আনা আইয়ুব খানের পক্ষে কঠিন ছিল। সামরিক ও বেসামরিক অঙ্গনে তার ক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তার নিকটতম সহকারীগণ, যেমন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মুহম্মদ রাফি, তথ্য সচিব আলতাফ গহওর এবং রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ ফিদা হাসান, তাকে পূর্ণ সমর্থন দিলেও, রাজনৈতিক ও সামরিক মহল থেকে তার উপর চাপ প্রয়োগ হয়।

www.pathagar.com

স্বরাষ্ট্র সচিব এ. বি আওয়ান মার্চ ১৯৬৯ প্রাদেশিক রাজধানীসমূহ পরিদর্শন করেন এবং কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ পর্যবেক্ষণ করেন, বিশেষ করে ঢাকায় এবং করাচীতে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত পার্বতীপুরে এক হাজার ঘরবাড়ী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পার্বতীপুর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন। ঢাকায় ৩৯ জন মৃত্যুবরণ করে। কার্ফ্যু ঘোষণা করা হয় এবং বেশ কয়েক জায়গায় কার্ফ্যু ভঙ্গ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে সচিবালয় ঘেরাও করা হয়, প্রায় প্রত্যেকদিন হরতাল কর্মসূচী পালিত হয়, এমনকি ঝাড়ুদাররাও প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। অনেক শহরে বিক্ষুব্ধ সরকারি কর্মচারীরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। শ্রমিকরা আদমজী জুট মিলস এবং পাকিস্তান ট্যোবাকো কোম্পানী দখল করে। সবখানে লেখা দেখা যায় "আইয়ুব কুত্তা হ্যায়", 'আইয়ুব কুকুর'। নবগঠিত জাষ্টিস পার্টির নেতা এয়ার মার্শাল এম আজগর আলী সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তীব্রভাবে আইয়ুবের সমালোচনা করেন এবং তার পদত্যাগ দাবী করেন।

মাত্র ৩২ বছর বয়সে ভুট্টো ছিলেন আইয়ুব খানের বাণিজ্যমন্ত্রী। ১৯৬৫-এর পাকিস্তান যুদ্ধের পরে, আইয়ুব এবং ভুট্টোর মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।ভুট্টো আইয়ুব খানের সাথে তাসখন্দে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে বৈঠকের জন্য এবং তাসখন্দ ঘোষণা ভুট্টোই রচনা করেন, তা সত্বেও এ বৈঠকের ব্যর্থতার জন্য তিনি আইয়ুব খানকে দায়ী করেন। এক সময় ভুট্টো আইয়ুব খানকে চেয়ারম্যান মাও বা ফ্রান্সের দ্য গলের সাথে তুলনা করেন, কিন্তু যখন তাকে সরিয়ে ফেলা হয়, তখন তিনি রাষ্ট্রপতির তিক্ত শত্রু হয়ে যান। সিন্ধিরা কোন সময় অপমান ভুলে না, বিশেষ করে তারা যদি জামিদার শ্রেণীভুক্ত হয়।

দেশকে রাজনৈতিক কলহ থেকে বাঁচানোর জন্য আইয়ুব খান অবশেষে রাজী হলেন, এক ব্যাক্তি এক ভোট ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দেয়া। তিনি রাজী হলেন যে ভবিষ্যতে দেশটি ফেডারেল পার্লামেন্টারী সিস্টেম-এ চলবে। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত অনেক দেরীতে হলো। মার্চ ১০, ১৯৭১ যে সকল নেতারা দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে এসেছিলেন এবং যারা আসেন নাই, তারা এখন অনেক বেশি কিছু চাচ্ছিলেন। তারা আইয়ুব খানের পতন সহ একটি সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা চাচ্ছিল।

তিন বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফদের সাথে আইয়ুব আলোচনায় বসেন দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তার পক্ষে আর রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধাননির্বাহী থাকা সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানের কঠোর অবস্থান এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর বর্জনের কারণে, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক অবস্থার সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিক থাকা সত্বেও আইয়ুব খান রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের দাবীর ব্যাপারে, কেননা তিনি বিশ্বাস করেন এতে দেশ ভেঙ্গে যাবে। তিনি বলেন, "দেশকে দুই ভাগ করার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে, আমার দেশ ভাঁঙ্গা আমি সমর্থন করতে পারি না," আইয়ুব বলেন, যদি ছয় দফা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কেন্দ্রের কি দরকার আছে? আইয়ুব অন্য বিকল্প খুঁজতে থাকেন। তার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হতে থাকে এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকেন। তার সামনে বিকল্প ছিলঃ ০১. আংশিক সামরিক শাসন ঘোষণা করা এবং শহরগুলোর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা; ০২. পুরো দেশে সামরিক আইন জারি করে নিজেকে চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঘোষণা করা, ০৩. সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতা স্পীকার আব্দুল জব্বার খানের হাতে হস্তান্তর করা; অথবা ০৪. পদত্যাগ করে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া।

শহরগুলোতে সামরিক আইন জারি করে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ছিল না। সমস্যাটি স্থানীয় ছিল না। এখানে জাতীয় ইস্যু জড়িত ছিল। প্রয়োজন ছিল কেন্দ্রে নতুন নেতৃত্বের।

দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব ছিল না। কারণ, আইয়ুব খান আর সেনাসদস্য ছিলেন না, তাই তিনি নিজেকে সিএমএলএ হিসেবে ঘোষণা দিতে পারেন না। এ টাইটেল সাধারণ সেনা কর্মকর্তাদের দেয়া হয় (যদিও সব নিয়ম ভেঙ্গে ভুট্টো ১৯৭১ সালে নিজেকে সিএমএলএ ঘোষণা দিয়েছিলেন)। তিনি নামে মাত্র রাষ্ট্রপতি থাকতে পারেন, সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফের হাতে সব ক্ষমতা দিয়ে। সি-এন্ড-সি পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করবেন যেমনটি তিনি করেছিলেন ১৯৬৮-এ, প্রেসিডেন্ট সিকান্দার মির্জার বেলায়। তৃতীয় বিকল্পটি, অর্থ্যাৎ স্পীকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, সংবিধান সম্মত হত এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে অরো গ্রহনযোগ্য হত কেননা স্পীকার আব্দুল জব্বার ছিলেন একজন বাঙ্গালী। কিন্তু এ কারনেই এই সিদ্ধান্ত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকদের কাছে গ্রহনযোগ্য থাকবে না, বিশেষ করে ভুট্টো এবং পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির কাছে। আইয়ুব মনে করেন জব্বারের হাতে দেশ নিরাপদ থাকবে না

www.pathagar.com

বলা হয়, জেনারেল ইয়াহিয়া আইয়ুব খানকে বলেছিলেন,"জব্বারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন না কেন?" আলী ইয়াহয়িা খান বলেন যে আইয়ুব খান উত্তর দেন,"ঐ হরামজাদাকে আমি বিশ্বাস করি না" তিনি ভুট্টোর নিয়ন্ত্রণহীন আকাঙ্খার ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন। তিনি জানেন যে ভুট্টোর স্ট্রিট পাওয়ার এমন শক্তিশালী ছিলো যে তিনি সহজেই একজন দুর্বল বাঙ্গালী।

রাষ্ট্রপ্রধানের পতন ঘটাতে পারতেন। ভুট্টো আইয়ুবের ভক্ত ছিলেননা। তিনি আইয়ুবকে ঈর্ষা করতেন এবং ক্ষমতায় আশার জন্য ধৈর্য হারাতে থাকেন। আইয়ুব ছিলেন তার ক্ষমতায় আসার জন্য অন্তরায়।

ক্ষমতার হস্তান্তর

অবশেষে রাষ্ট্রপতি চতুর্থ বিকল্প নিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যদিও ১৯৬২ সংবিধান তাকে সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার অধিকার দেয় নাই। তিনি সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে চিঠি প্রেরণ করেন মার্চ ১৯৬৯-এ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করেন। চিঠিটা ড্রাফ্‌ট্‌ করেছিলেন আলতাফ গওহর এবং তা সে দিনই ইয়াহিয়া খানের কাছে, কমান্ডার-ইন-চীফের-এর বাসায়, সন্ধা পাঁচটায় পৌছানো হয়। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তা ছাড়া তিনি বিশ্বাস করেন যে সেনাবাহিনী দেশকে ধংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও এর সাথে জড়িত ছিল।

মার্চ ২৫-এ আইয়ুব খান শেষবারের মত জাতির উদ্দ্যেশে ভাষণ দেন। সন্ধ্যা ৭ টায়, ইয়াহিয়া খানের উপস্থিতিতে, প্রেসিডেন্টের বাসায় বসে তিনি এ ভাষণটি দেন এবং তা কয়েক ঘণ্টা পরে প্রচারিত হয়।

নতুন ক্ষমতাধারী আইয়ুব খানের সাথে ভালই ব্যবহার করেছিলেন। তাকে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাখা হয়। তাকে ব্যক্তিগত অ্যাসিট্যান্টও দেয়া হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রায় দুই কোটি রুপি দেয়া হয়। যদি ভুট্টো তার স্থলাভিষিক্ত হতেন, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্নতর হতো। রাষ্ট্রপতি আসনে বসে, ভুট্টো প্রতিশোধ নিতেন। আইয়ুবকে সে অবস্থায় হয় গৃহবন্দী রাখা হতো অথবা তাকে আইনের কাঠগড়ায় দাড়াতে হতো।

আইয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া খানের মধ্যে কমান্ডের হস্তান্তর সমন্ধে বিভিন্ন মত রয়েছে। অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল এসজিএমএম পীরজাদার মতে কোন চাপ ছাড়াই

www.pathagar.com

আইয়ুব খান স্বেচ্ছায় ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তার বক্তব্য অনুযায়ী, জেনারেল ইয়াহিয়া তার বাসায় দুই সার্ভিস চিফদেরকে এবং প্রতিরক্ষা সচিব সৈয়দ গিয়াসউদ্দীনকে ডাকেন এবং তাদের সামনে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের চিঠি উপস্থাপন করেন। ইয়াহিয়া খানের বাসায় সেদিন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা কেউই বলেন নাই যে ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহনের জন্য কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। পীরজাদা স্বীকার করেন যে, নৌ প্রধান অ্যাডমিরাল এসএম এহসান এবং বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খান ঘন ঘন জেনারেল হেডকোয়ার্টারে ইয়াহিয়া খানের সাঙ্গে দেখা করতেন। কিন্তু তিনি এমন কোন আভাস পান নি যে ইয়াহিয়া খান জোরপূর্বক ক্ষমতা নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য পাকিস্তানের সেনাপ্রধান এ সব বিষয়ে অন্য দুই বাহিনীর প্রধানদের কাছে আলোচনা না করারই কথা, কারণ ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে একই ধরনের ষড়যন্ত্রের সম্ভবনা থেকে যায়। জুলাই ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউল হক একটি ক্যু করেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ফেলেন। তিনি তার আগের কোন বাহিনীর প্রধানকে বা জয়েন্ট চিফ-এর চেয়ারম্যানকে তার এ পরিকল্পনার কথা জানান নাই।

জেনারেল ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভার তথ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল নওয়াবজাদা শের আলী খানও বলেন যে সেনাবাহিনী আইয়ুব খানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আসতে বাধ্য জেনারেল তাকে আইয়ুবের কাছ থেকে জোড় করে ক্ষমতা নেয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

২০ মার্চ জেনারেল হেড কোয়ার্টারে পিএসও-দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। সবাই একমত ছিলেন যে আইয়ুব খানকে সরে যেতে হবে। কারণ তিনি সরে গেলে শুধু পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। কোন মতে যেন তিনি পরকবর্ষী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে না দাঁড়ান। কিভাবে নেতৃত্বের বদল হবে, তা নিয়ে নিয়ে কিছু মতবিরোধ দেখা দেয়। মাস্টার জেনারেল অব অর্ডন্যান্স (এমজিও) মেজর জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দীন মত প্রকাশ করেন যেন আইয়ুব খান স্পিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। আইএসআই এ মহা পরিচালক মেজর জেনারেল মুহম্মদ আকবর এর বিরোধীতা করেন। কারণ, তার মতে, একটি বেসামরিক সরকার দ্বারা পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয়। আইএসআই প্রধান এর মতে, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন ছিল। এও পর্যায়ে জেনারেল ইয়াহিয়া বলে উঠলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করলে, কেমন হবে?" জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন ইয়াহিয়া

www.pathagar.com

বক্তব্যের বিরোধীতা করে বলেন, এটা করলে মনে হবে যে সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে বৈষম্য প্রদর্শন করছে।

অবশেষে ইয়াহিয়া খান সিদ্ধান্ত নিলেন। পিএসও-দেরকে জানালেন, 'সেনাবাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ করতেই হবে।' ওয়াসিউদ্দীন প্রশ্ন করলেন, "আইয়ুব খানকে কিভাবে সামাল দিবেন?" জেনারেল উত্তর দিলেন, "সৈন্য ব্যবহার করা হবে, যদি দরকার হয়।"

১৯৬৯ সালের ২২/২৩ মার্চ রাতে ক্ষমতা গ্রহণের পক্ষে অবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ।

জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের চিঠি তার জন্য তেমন বিস্ময়কর কিছু ছিল না। কেননা, তিনি তার আগে থেকে পরিস্থিতি অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন। তার অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলকে তিনি আগেই সাবধান করে বরলেন, " পীরু, আমাকে যদি extra Curriculam activities-এর জন্য ডাকা হয়, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে। এখন থেকে তুমি প্রস্তুতি নিতে থাকো। " জেনারেল পীরজাদা বলেন, তিনি অবাক হয়েছিলেন। চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল গুল্ হাসান খান যখন এটা জানতে পারেন, তিনি ক্ষুব্ধ হন। কারণ, তাকে টপকিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি মনে করেন যে, যখন ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হন, তাকেই প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার বানানো উচিৎ । তারপর থেকেই এ দুজনের মধ্যে (পীরজাদা এবং গুল্ হাসান) শত্রুতা সৃস্টি হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী বলেন যে, মেজর জেনারেল রাওফরমান আলী বলেন যে মেজর জেনারেল গুল্ হাসান যখন ১০ এপ্রিল ১৯৬৯ ঢাকা সফরে আসেন তিনি তাকে বলেন, "ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা নিচ্ছিলেন না। আমি (গুল হাসান)তাকে ক্ষমতা নিতে বাধ্য হরলাম।" ফরমান বলেন যে গুল হাসান তখন ইয়াহিয়া খান এবং আইয়ুব খানের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, তার পূর্ণ বর্ণনা দিতে থাকেন। তিনি বলেন যে, আইয়ুব ইয়াহিয়াকে বলেন- রাজনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল সামরিক শাসন জারি করা। ইয়াহিয়া খান একমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু বলেন যে,"হ্যাঁ সামরিক শাসন দেয়া হবে, কিন্তু তা হবে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।" আইয়ুব কথাটির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি তখন ক্ষমতাহীন এবং তার ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন। গুল হাসান রাও ফরমানকে বলেন, আইয়ুব ইয়াহিয়াকে বললেন, "আমি বুঝি তুমি কী বলতে চাও, আমার ভাষণ প্রস্তুত কর এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কাগজপত্র তেরি কর।"

www.pathagar.com

২৫ মার্চ ১৯৬৯ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে তার পদত্যাগ ঘোষণা করেন। উর্দু ভাষায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে এ শেষবারে মত আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখছি।" তিনি আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে বলেন যে কিছু কিছু রাজনীতিবিদ দেশকে দুইভাগে ভাগ করতে চান। আবেগ জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, "আমাদের দেশের ধ্বংসে আমার পক্ষে নেতৃত্বে থাকা সম্ভব নয়।" তিনি বলেন যে সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভয়ভীতি বিরাজ করছিল। তারপর কোন কোন জেনারেল যা শুনতে চাচ্ছিলেন, তিনি তা বললেন, "সমগ্র জাতি চাচ্ছে যে কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন।" শেষে আইয়ুব বলেন, "এ পরিপ্রেক্ষিতে আজকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে আমি বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

বিভিন্ন জনের মতে, বিশেষ করে যারা ঘটনাসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব খান তার পদ থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিভাবে এ কাজটি সম্পন্ন হবে এবং কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, তা নিশ্চয় রাষ্ট্রপ্রধান এবং তিনবাহিনীর প্রধানদের মাঝে আলোচিত হয়। যেহেতু রাজনীকিদের উপর এবং সিভিলিয়ানদের উপর সামরিক নেতৃত্বের আস্থা ছিল না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যাপারে। তারা নিশ্চয় ঐকমত্যে পৌছান যে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হবে, তবে নতুন নেতৃত্বাধীনে।

যারা প্রেসিডেন্টের স্থলাভিষিক্ত হতে চেয়েছেন, তারা নিশ্চয় তখন রাষ্ট্রপতি উপর চাপ প্রয়োগ করেন। আইয়ুব হয়তো নামেমাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তার সরে যেতে হবে। পরিস্থিতি আরো অবনতির আগে আইয়ুব এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট যদিও পীরজাদা এবং অন্যদের দায়ী করে। ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা নেবার জন্য বাধ্য করার ব্যাপারে পীরজাদা বলেন বেশ যৌক্তিকভাবে, যদি আইয়ুবকে ক্ষমতা থেকে সরে আসার জন্য কেউ বাধ্য করে তা হবে তিন বাহিনীর প্রধানরা, তাদের স্টাফ অফিসার নয়।

মন্তব্য

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অচল অবস্থায় এসে পৌছায়। দুই প্রদেশের জনগণ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছিল। তারা আইয়ুবের 'বেসিক ডেমোক্রেসির'

www.pathagar.com

বিরোধীতা করে। কিন্তু এর সমাধান সামরিক শাসন ছিল না। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব একটি নির্বাচিত সরকারের। রাজনীতিকদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া উচিৎ ছিল। ব্যর্থ হলে, সে ব্যর্থতার ভারও রাজনীতিকদের বহন করতে হতো। সেনাবাহিনীর উচিৎ ছিলনা ফের ক্ষমতায় আসা। আইয়ুব খান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ চাইলেও, ইয়াহিয়া খানের উচিৎ ছিল "না" বলা। আইয়ুব খানকে বলা উচিৎ ছিল তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য সংবিধানের আওতায় এবং সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে, তারপর নির্বাচিত জাতীয় সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং বিধান অনুযায়ী এ সংসদ ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন করতে পারতো। সেনাবাহিনীর দূরে থাকা উচত ছিল। তারা নিজেদেরকে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে সীমিত রাখা উচিৎ। কিন্তু ১৯৫৮ সালে একটি নজির স্থাপন করা হয়েছিল। ক্ষমতার লোভ সামলাতে পারলেন না জেনারেলগণ।

ইয়াহিয়া খানের শাসনামলে ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আইয়ুবের আমলে ১৯৫৯ সালে যে নির্বাচন হতে পারতো, তার মধ্যে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে ১৯৬৯ সালে গণপরিষদের অধিবেশন তলব করা সম্ভব ছিল, তার ফলাফল যা-ই হোক না কেন। এতে খুব বেশি সমস্যার সৃষ্টি হতো না। সংসদে আওয়ামী লীগের ছয়দফা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব ছিল, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায়। এ দাবি গুলোর ফলে অবশেষে কনফেডারেশন সৃষ্টি হলে, এমনকি দেশ বিভক্ত হলেও, তার জন্য সেনাবাহিনিকে দায়ী করা হতো না।

পুরানো মদ, নতুন বোতল

জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান ছিলেন ফার্সি ভাষাভাষী পাঠান, যার পূর্ব পুরুষেরা ইরান থেকে পেশোয়ারে আসেন। ইয়াহিয়ার দাদা ছিলেন বিখ্যাত Guides Cavalry-র সুবেদার মেজর ADC to the Viceroy of India. ১৯৩৮ সালে ইয়াহিয়া বিখ্যাত বালুচ রেজিমেন্টের তৃতীয় ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে তিনি ইতালিতে সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং জার্মানরা তাকে বন্দী করে।

ইয়াহিয়া ছিলেন একজন স্মার্ট, বুদ্ধিমান এবং কঠোর পরিশ্রমী তরুণ অফিসার। ভারত বিভক্তির আগে তিনি মিলিটারি অপারেশনস ডিরক্টোরেট এ জেনারেল স্টাফ অফিসার গ্রেড-২ (জিএসও ২) ছিলেন। মেজর হিসেবে এটি একটি সম্মানজনক

www.pathagar.com

পদ ছিল। ১৯৪৭ সালে এস. এইচ. এফ. জে মানেকশ, যার কাছে ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান পরাজিত হন, ছিলেন তার ইমিডিয়েট সিনিয়র অফিসার। মানেকশের চোখে ইয়াহিয়া ছিলেন একজন ''চমৎকার, কঠোর পরিশ্রমী কর্মকর্তা, যার চিন্তাধারা ছিল যৌক্তিক স্পষ্ট।''

বলা হয় যে যখন ভারতীয় প্রশিক্ষকরা ভারতে চলে যাচ্ছিলেন, ইয়াহিয়া স্টাফ কলেজ লাইব্রেরিতে ঘুমাতেন। যেন তারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল পত্র না নিয়ে যেতে পারে।

১৯৪৮ সালে স্টাফ কলেজে কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার লডার মেজর ইয়াহিয়াকে ''an outstanding all –round oficer''বলে আখ্যায়িত করেন। ইয়াহিয়ার বাৎসরিক গোপন প্রতিবেদনে (এসিআর) -এ মেজর জেনারেল আকবর, মে. জে. হাইউদ্দীন, মেজর জেনারেল শের আলী এবং পরবর্তীতে আইয়ুব এবং হাবিবুল্লাহ খান সবাই তার ভুয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন যে তিনি ''সেনাবাহিনীর মূল্যবান সম্পদ, একজন মূল্যবান অফিসার এবং তিক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী।'' তারা বলেন যে তাকে চিহ্নিত করা দরকার যাতে তাকে ''আরো উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।'' ১৯৬৩ পর্যন্ত তিনি জেনারেল মুসার চোখে ছিলেন, '' একজন ক্লিন ইমেজের অফিসার এবং ফার্স্ট ক্লাস চিফ অব জেনারেল স্টাফ।'' তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়, ''ব্রিগেডিয়ার হিসেবে তিনি গড়পড়তার অনেক উর্ধ্বে এবং জেনারেল হিসেবে আউটস্ট্যান্ডিং।'' তার কোর কমান্ডার লে. জে. বখতিয়ার রানার মতে, ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি সরল, সম্মানজনক জীবনযাপন করতেন। ১৯৬৫ সারের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধকালে তিনি ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের চাম্ব ও জওরিয়ান দখল করে তার পেশাগত ক্ষমতা প্রমাণ করেন। বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে, যদি কোন জেনারেলকে আবার ক্ষমতা দখল করতে হয়, তবে সে কাজের জন্য ইয়াহিয়াই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু

সিনিয়র হবার সাথে সাথে ইয়াহিয়ার জীবন বদলাতে থাকে। ক্ষমতা মানুষের চরিত্রকে কলুষিত করে, নিরুঙ্কুশ ক্ষমতা চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে। রাষ্ট্রপ্রধান হবার আগেই তার ব্যক্তিগত আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি এবং চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হবার পরে তিনি অসৎ সঙ্গ কাছে টানেন। মদ ও নারীর প্রতি তার আসক্তির কারণে তার বদনাম হয়।

তার নৈশ জীবনে যা-ই করেন না কেন, তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কোন কমতি ছিল না। কর্নেল এজাজ আজিম (পরবর্তীতে লে. জে. এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের

www.pathagar.com

রাষ্ট্রদূত) তখন সিএমএলএ হেড কোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়া দ্রুত ফাইরের কাজ সম্পন্ন করতেন এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি বলেন পেশার বাইরের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা স্বত্তেও ইয়াহিয়া প্রত্যেক সভার মিনিট নিখুঁতভাবে পড়তেন এবং সে অনুযায়ী গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতেন। এ বক্তব্যটি সমর্থন করেন ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার উল করিম (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) এবং কর্ণেল কে এম আরিফ (পরবর্তীতে জেনারেল), লে. জে. গুল হাসান স্বীকার করেন যে, জেনারেল ইয়াহিয়া পেশাগতভাবে দক্ষ ছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক সচিব বলেন যে, অফিসের সময়কালে তিনি কোন সময় মাতাল থাকতেন না।

২৬ মার্চ তারিখে স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট এবং সিএমএলএ জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান (৫২) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ''পাকিস্তানী সাথীগণ ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। (ভাগ্যের পরিহাস ইয়াহিয়ার শাসনকালে দেশ ভেঙ্গে যায়)। তিনি ভাষণে আরো বলেন, ''আমি সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেছি। সামরিক আইন জারির পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন, মুক্তি, আর সম্পদ রক্ষার্থে এবং প্রশাসনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবার লক্ষ্যে।'' তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলেন, তার বাক্য ছিল সংক্ষিপ্ত, তার কথা ছিল অতি স্পষ্ট, কিন্তু তার কথায় ছিল বিচক্ষণতার অভাব। তিনি অবশেষে তার প্রদত্ত লক্ষ্যে পৌছুতে পারেন নাই। তিনি আন্তরিকতার সাথে বলেছিলেন, ''আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমার নিজস্ব কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি শুধু একটি সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই।'' ১৯৬২ এর সংবিধান বাতিল করে এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত করে, তিনি রাজনৈতিক কলহ বৃদ্ধি করেন। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রহসন চলছিল, তার আওতায় ২৪ মার্চ ১৯৬৯ এ মোনেম খানকে সরিয়ে মির্জা নুরুল হুদাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসাবে বসানো হয়। তার দুই দিন পর, ২৬ মার্চ সামরিক আইন জারি করা হয় এবং উনাকেও সরিয়ে দেয়া হয়।

প্রশাসন

সিএমএলএ হেডকোয়ার্টারস লে. জে. সৈয়দ গোলাম মুহম্মদ মহিউদ্দীন পরিজাদা (৫১)-র নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

www.pathagar.com

(পিএসও)। ইয়াহিয়া যখন চিফ অব জেনারেল স্টাফ ছিলেন, তখন পীরজাদা ইয়াহিয়ার ডাইরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস- এ ছিলেন। আর ইয়াহিয়া যখন সিএন্ডসি ছিলেন, তখন পীরজাদা জেনারেল হেড কোয়ার্টারসে এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল ছিলেন।

জেনারেল পীরজাদা ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবেরও সামরিক সচিব ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে তিনি মাইল্ড স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে, তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। এ কারণে হয়তো তিনি আইয়ুব খানকে অপছন্দ করতেন। মনে করা হয় আইয়ুব খানও পীরজাদাকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন তিনি পীরজাদাকে পিএসও হিসেবে নিয়োগ না দেন। পীরজাদাকে সহায়তা করেন ব্রিগেডিয়ার সিভিল এ্যাফেয়ার্স, ব্রিগেডিয়ার হায়দার জং এবং ব্রিগেডিয়ার মার্শাল ল, ব্রিগেডিয়ার এম. রহিম খান।

প্রেসিডেন্ট একটি প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠন করেন। এ কাউন্সিলে ছিলেন সিএমএলএ হিসেবে তিনি নিজে এবং তার তিন বাহিনীর প্রধানগণ: লে. জে. আব্দুল হামিদ খান, ভাইস এডমিরাল এস. এম. এহসান এবং এয়ার মার্শাল নূর খান। তারা মার্শাল ল প্রশাসক হিসেবে ছিলেন। জেনারেল পীরজাদা ছিলেন প্রশাসনিক কাউন্সিলের সচিব। এ কাউন্সিলের সদস্যদের এক এক জনের আওতায় ছিল একাধিক মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে, ১৯৬৯ এর আগস্টে একটি সিভিল মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এতে দশজন সদস্য ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম থেকে পাঁচজন করে। এর মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলও ছিলেন। বাঙালিরা এ মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে দ্বিধাবোধ করে। কারণ, এতে মনে করা হবে যে তারা সামরিক শাসনের পক্ষে এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। জেনারেল পীরজাদা বলেন, 'বাঙালিদের এ মন্ত্রীসভায় আনতে তাকে মোটামুটি জোর প্রয়োগ করতে হয়েছিল । মন্ত্রীসভায় বাঙালি সদস্য ছিলেন- আনোয়ারুল হক, ড. এ. এম. মালেক, প্রফেসর শামসুল হক, এবং জি. ডব্লিউ. চৌধুরী।'

তবে এ সভা ছিল মূলত ক্ষমতাহীন। ক্ষমতা ছিল সিএমএলএ সেক্রেটারিয়েটের হাতে। এ মন্ত্রী সভার তথ্যমন্ত্রী শের আলী খানের মতে, মন্ত্রীদের তেমন আত্ম বিশ্বাস ছিল না। কারণ, তারা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছিলেন না। তাদের কোন রাজনৈতিক আসন ছিল না। তারা ভার করেই জানতেন যে এই মন্ত্রীসভার আসলে কোন মূল্যই ছিল না। এটি ছিল সামরিক সরকারের বেসামরিক মুখোশ।

www.pathagar.com

ফিল্ড মার্শাল
মুহাম্মদ আইয়ুব খান
রাষ্ট্রপতি, পাকিস্তান
১৯৫৮-১৯৬৯

জেনারেল আগা মুহাম্মদ
ইয়াহিয়া খান
রাষ্ট্রপতি, পাকিস্তান
১৯৬৯-১৯৭১

www.pathagar.com

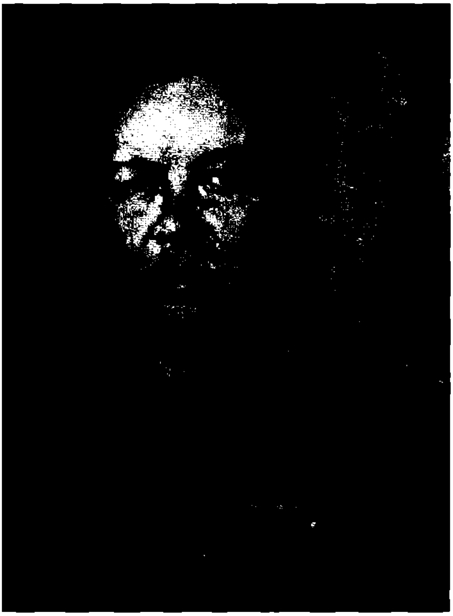

জেনারেল আবদুল হামিদ খান
চিফ অব স্টাফ, পাকিস্তান
আর্মি, ১৯৬৯-১৯৭১

লে. জেনারেল
এস.জি.এম.এম পীরজাদা
রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল স্টাফ
অফিসার, ১৯৬৯-১৯৭১

www.pathagar.com

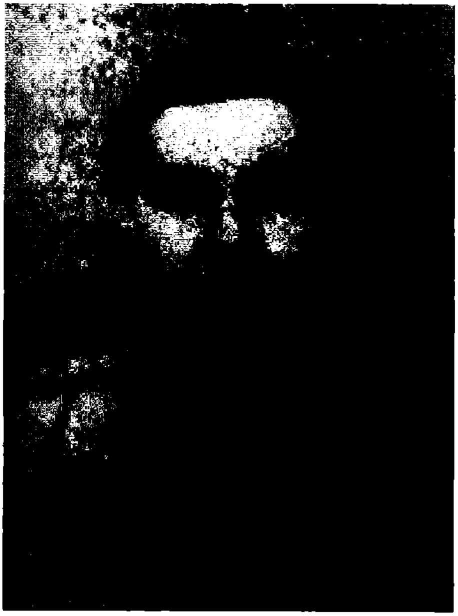

মেজর জেনারেল
গুল হাসান খান
চিফ অব দ্য জেনারেল স্টাফ,
পাকিস্তান আর্মি, ১৯৭১

ভাইস এ্যাডমিরাল
এস.এম. আহসান
গভর্ণর এন্ড এমএলএ
পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

লে. জে.
সাহেবজাদা ইয়াকুব খান
কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড
গভর্ণর পূর্ব পাকিস্তান

লে. জে. টিক্কা খান
কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড
গভর্ণর পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

ঢাকার বেশির ভাগ রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীরাও এটা স্পষ্ট করে বুঝতেন যে মন্ত্রীসভাটি মুখোশ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমীর উল ইসলাম বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার কোন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে নি। তাই এটি পাকিস্তানের বিভিন্ন মেরুর প্রতিনিধিত্ব করে নি।" ইত্তেফাকের সম্পাদক মঈনুল হোসেন বলেন, "রাজনীতিকদের প্রতিনিধিত্বের চরিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়।" কেন্দ্রে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব সমন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. কামাল হোসেন বলেন, "নাজিমুদ্দীন, নুরুল আমীন, ওয়াহিদুজ্জামান, সবুর খান, মুহম্মদ আলী এবং খায়রুদ্দীন এরা সবাই স্রোতের বিপরীতে সাতার কাটছিলেন।" যখন এ লেখক বলেন যে, আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভায় বাঙালিরা সমান সুযোগ পেয়েছিলেন, তার জবাবে খন্দকার মোস্তাক মন্তব্য করেন, "যতসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মন্ত্রীসভায় রাখা হয়েছিল।"

তবে জেনারেল পীরজাদার মতে, "এ মন্ত্রীসভা অনেক সহায়ক ছিল। কেননা, এদের মধ্যে অনেকে বেশ খোলামেলা ও সাহসী বক্তব্য রাখতেন। অবশ্য সব সিদ্ধান্ত ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া ও পীরজাদার হাতে।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়র সরকারের সবচাইতে কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ছিল জেনালে পীরজাদার নেতৃত্বে সিএমএলএ সেক্রেটারিয়েট এবং তার সাথে প্রদেশসমূহে সামরিক আইন প্রশাসকরা। যদিও সব পদে নিয়োগ দেন সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইসহাক খান, বলা হয় যে নম্র-ভদ্রভাষী জেনারেল পীরজাদা তার নিজের কর্তৃত্বকে বেশ শক্তভাবে জারি করতেন। তিনি চেইন অব কমান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের সাথে ইতিমধ্যে দুইবার কাজ করার সুবাদে পীরজাদা তার বিশ্বস্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্টের কাছে পৌছার আগে সব ফাইল তার হাত হয়ে যেত। মন্ত্রী এবং সচিবগণ খুব কমই সরাসরি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করতে পারতেন কারণ পিএসও খুব শক্ত হস্তে প্রশাসন চালাতেন। প্রেসিডেন্টের অফিসে ঢোকার আগে, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সিনিয়র আমরা এবং সামরিক কর্তকর্তাদেরকে প্রথমে অনেকক্ষণ পিএসও এর অফিসে বসে থাকতে হতো। এভাবে তাদের সাথে জেনারেল পীরজাদা তাদের অনেকের সাথে বেশ ঘনিষ্ট হন। কেউ কেউ আবার তার কঠোর মানসিতা পছন্দ করতেন না।

প্রথম দিকে মন্ত্রীসভার নিয়মিত সভাগুলো প্রত্যেক সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে। তাছাড়া, জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে প্রত্যেক সপ্তাহে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের (পিএসও) সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রীসভার

www.pathagar.com

মিটিংগুলোতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত না, তবে পিএসও এর সভার আলোচনর বিষয়বস্তু ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যেমন প্রতিরক্ষা বিষয়ক আলোচনা। আর পাকিস্তানের নিরাপত্তার সাথে জড়িত সিদ্ধান্ত নেয়া হতো একটি কিচেন কেবিনেটের মাধ্যমে। এ কিচেন কেবিনেটে ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তার নিকটতম সহকারিবৃন্দ, চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ, কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল আবু বকর ওসমান মিটঠা এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি চিফ মেজর জেনারের গোলাম ওমর। তারা অফিসের পরে আলোচনায় বসতেন। দেশের যত সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাদের দ্বারা গৃহিত হয়। মাঝে মাঝে জনাব ভুট্টোও এ দলের সাথে ভিড়তেন।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পূর্ব বাঙলায় জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় আসা নিয়ে সাথে সাথে তেমন কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই, কারণ আইয়ুবের বিদায় নেয়াতেই জনগণ খুশী ছিল। তবে সামরিক শাসন চলতে থাকাতে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ জমতে থাকে। প্রফেসর মুনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, 'সেখানে এ নিয়ে জনগণ মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না।' জেনারেল ফজল মুকিম খান লেখেন যে, 'তারা সামরিক শাসন তখন বলবৎ থাকতে দেখে বেশ অবাক হল । কিছু দিন পরিস্থিতিকে চুপচাপ মেনে নেয়া হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আবার সেই অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্বের উপর ক্ষোভ জমতে থাকে। তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন শুরু হয়, তার চরিত্র ছিল আরো অনেক রাজনৈতিক।'

কতিপয় কারণ

ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে ইয়হিয়া খান যে সকল ইস্যুর সম্মুখীন হন, তার মধ্যে ছিল ১. ওয়ান ইউনিটের সম্ভাব্য বিলুপ্তি; ২. দুই প্রদেশের মধ্যে সমতার প্রশ্ন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সমর্থকদের কাছে এটা ছিল অগ্রহণযোগ্য; ৩. নির্বাচন সম্পন্ন করা (কখন এবং কোন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায়?) ৪. এক ব্যক্তি এক ভোট এর গণতান্ত্রিক অধিকারটি জনগণকে দেয়া কি সমীচীন হবে? ৫. নির্বাচনের পূর্বেই কি কেন্দ্র প্রদেশের সম্পর্ক নির্ণয় করা উচিৎ, নাকি এ ব্যাপারটি নির্বাচন পরবর্তী সরকারের দায়িত্ব? ৬. ১৯৫৬ অথবা

www.pathagar.com

১৯৬২ সালের সংবিধানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ? ৭. কেন্দ্রীয় সংসদের কাঠামো কি হবে, এক কক্ষ বিশিষ্ট নাকি দুই কক্ষ বিশিষ্ট এবং এতে দুই প্রদেশের প্রতিনিধি কেমন হবে এবং ৮. কিভাবে দ্রুত দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর যায়?

এটি দুভার্গ্যের বিষয় যে ২২ বছর পরেও পাকিস্তানের নাগরিকগণ তখনও স্থির করতে পারেনি, একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্টগুলো ।

এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন করার ব্যাপারে ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ করার জন্য পূর্ণ অনুমোদন থাকেবে। ২৬ মার্চ ১৯৬৯ সালে জাতির প্রতি তার প্রথম প্রথম ভাষণে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি ওয়ান ইউনিট ভেঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে পুনরায় চারটি প্রদেশ স্থাপন করেন।

এ দুটি সিদ্ধান্ত ছিল অতিগুরুত্বপূর্ণ। তবে সেগুলো শুধু কয়েকজন নিকটতম সহকারির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখলে শ্রেয় ছিল। দুইজন সম্মানিত সিনিয়র বাঙালি নেতা ১৯৫৬ সংবিধান সম্পর্কে জানিয়েছিলেন । মৌলভী ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুজনই দুই প্রদেশের মধ্যে সমতার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছিলেন। তবে যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে এ ব্যাপারে কিছু অসন্তোষ বিরাজ করছিল। বিষয়টি হয়তোবা নির্বাচিত সংসদের সিদ্ধান্তের জন্য রাখা গেলে ভালো ছিল।

ওয়ান ইউনিটের বিলুপ্তির জন্য জোর দাবি জানাচ্ছিলেন কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা। তার মধ্যে ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা মিয়া মমতাজ খান দৌলাতানা, সরদার শওকত হায়াত খান এবং বলা বাহুল্য, পাকিস্তান পিপলস পার্টির টগবগে তরুণ নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো। ওয়ান ইউনিট বিলুপ্তির আরো দাবি জানিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শক্তিশালী দুই নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা ভাসানী। দুই প্রদেশের মধ্যে যে সমতার ফর্মুলা করা হয়েছিল, তারও বিলুপ্তি তারা দাবি করে। তারা চেয়েছিলেন যে, এ সব বিষয়ে নির্বাচিত সংসদে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সমতা ফর্মুলা বিলুপ্তির যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জেনারেল পীরজাদা বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান ফর্মুলার বিরোধীতা করেন এবং বাঙালিরা এ ফর্মুলা গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন পশ্চিম পাকিস্তানেও এ সমতা ফর্মুলা বিলুপ্তির বিরুদ্ধে কেউ তেমন আপত্তি জানায়নি।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে ২৮ জুলাই প্রদত্ত ভাষণে ইয়াহিয়া এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন,'' এসব বিষয়ে আমার মন একেবারেই খোলা। জনগণকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার শুধু একটাই কথা- জনগণ নিজেদের জন্য যে সংবিধান বা সরকার কাঠামো গ্রহণ করুক না কেন, তা হতে হবে পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইয়াহিয়া একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ছিলেন যদি কোন ব্যক্তি বা দল ইসলামের মূল আদর্শ এবং পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে প্রচারণা করে, তবে সে ব্যক্তি বা দলকে জনগণের এবং সেনাবাহিনীর রোষানলের সম্মুখীন হতে হবে।

পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানদের থেকে আলাদা মানসিকতা নিয়ে ইয়াহিয়া খান বুঝতে পেরেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হচ্ছিল এবং তিনি নিজেই বলেন যে, ''এ পরিস্থিতির ব্যাপারে তাদের অসন্তুষ্টি সম্পূর্ণ যৌক্তিক।" তিনি এ পরিস্থিতির সুরাহা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষনে তিনি বলেন, ''পাকস্তানের দুই প্রদেশের জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ সম্ভব স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু তা কোনভাবেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতাকে ক্ষতি করতে পারবে না।"

পরের বছরগুলোতে জেনারেল ইয়াহিয়া তার কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতার শিকার হতে থাকেন। এ দুর্বলতার জন্য তিনি নিজেই লজ্জাজনকভাবে পরিস্থিতির সম্মুখীন হন এবং সমগ্র জাতি অস্বস্থিকর অবস্থার মধ্যে ফেলেন। শুধু তাই নয়, এ দুর্বলতার কারণ তার বিচারবুদ্ধিরও ক্ষতিসাধিত হয় এবং সংবেদনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি অদক্ষ হয়ে পরেন। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিতে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, যাতে পরবর্তীতে এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্বের কোন ক্ষতি না হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা হবার ছিল না। তিনি নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন এমন সব নীচু ব্যক্তির দ্বারা, যাদের চরিত্র তার মতই অনৈতিক। তিনি স্বার্থপর রাজনীতিক, চরিত্রহীন জেনারেল এবং অনৈতিক জাল থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারেন নি। এখান থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টা করলেই এমন ঝড়ের সৃষ্টি হতো যে তার নিজের ভীত নড়বড়ে হয়ে উঠত। কিছু কিছু পাশ্চোত্যের লেখক এমনও লিখেছিলেন যে রাতের আঁধারে দেশটি কিছু 'খদ্দের' দ্বারা পরিচালিত হয়।

তবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে জেনারেল ইয়াহিয়াকে আন্তরিক মনে হয়ে ছিল। দেশের আদর্শ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে,

www.pathagar.com

তিনি এ হস্তান্তর গণতান্ত্রিক উপায়ে করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেন। এবং প্রেসকেও তুলনামূলক স্বাধীনতা প্রদান করেন।

ক্ষমতা গ্রহণের একবচল পর, জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন কিভাবে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) প্রণয়ন করে এটি অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। এটির গুরুত্বপূর্ণ দিক লো ছিল নিম্নরূপঃ

সংবিধানের মৌলিক নীতি (২০ ধারা)

সংবিধান এমনভাবে রচিত হবে যাতে নিম্নলিখিত নীতিগুলো সংযুক্ত থাকবেঃ

১. পাকিস্তান একটি ফেডারেল রিপাবলিক (প্রজাতন্ত্র) থাকবে এবং ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান নামে পরিচিত হবে এবং এর প্রদেশসমূহ এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহ একটি ফেডারেশনে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, যাতে করে পাকস্তানের সংহতি অক্ষুন্ন থাকে এবং ফেডারেশনের একতার কোন রকমের ক্ষতি সাধন না হয়।

২. (ক) পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি হচ্ছে ইসলামি আদর্শ এবং এটাকে সংরক্ষণ করা হবে।

(খ) রাষ্ট্রপ্রধানকে একজন মুসলমান হতে হবে।

৩. (ক) জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও অবাধ নিয়মিত ফেডারেল ও প্রাদেশিক সংসদীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে ধরে রাখা হবে।

(খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার চিহ্নিত করা হবে এবং নিশ্চিত করা হবে।

(গ) বিচার ও মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিৎ করা।

৪. আইন, প্রশাসনিক এবং অর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকারে এমনভাবে বণ্টন করা হবে যাতে প্রদেশসমূহের থাকবে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন, অর্থাৎ সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা। তবে ফেডারেল সরকারের যথাযোগ্য ক্ষমতা বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দায়িত্ব পালন করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য।

৫. নিশ্চিত করা হবে যে:

(ক) পাকিস্তানের সবস্থানের জনগণ সব রকমের জাতীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়কালে আইনগত এবং অণ্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, যাতে সব প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর হবে।

সংবিধান প্রণয়নের মেয়াদ (ধারা ২৪)

কনস্টিটিউশন বিল নামে একটি বিলের মাধ্যমে জাতীয় গণপরিষদ এ বিষয়ক আলোচনা শুরুর ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণনয়ন করবে। তাতে ব্যর্থ হলে, সংসদ বিলুপ্তি বলে গণনা করা হবে।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন (ধারা ২৫)

জাতীয় গণপরিষদে পাশকৃত কনস্টিটিউশন বিলটি সম্মতি গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। যদি তিনি প্রত্যাখান করেন, তবে গণপরিষদ বিলুপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

যে সব কারণে গণপরিষদের অধিবেশন বসতে পারে (ধারা ২৬)

১. সংবিধান প্রণয়নের বিষয় ব্যতীত গণপরিষদ কোন কারণেই অধিবেশনে বসতে পারবে না, যতদিন না কনস্টিটিউশন বিলটি রাষ্ট্রপতির দ্বারা অনুমোদিত হয়ে প্রণীত হয়।

২. যতদিন রাষ্ট্রপতির দ্বারা জাতীয় গণপরিষদে পাশকৃত কনস্টিটিউশন বিলটি

www.pathagar.com

অনুমোদন ও প্রণনয়ন হয়, ততোদিন প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনে বসবে না।

মন্তব্য

লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) -তে কিছু শর্ত ছিল, যাতে একটি নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় আসতে পারে এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট থাকবে। কিন্তু রাজনীতিকরা এবং জেনারেলরা এই এলএফও-কে নিজ ইচ্ছায় অনুমোদন দিতে চাচ্ছিলেন না। পূর্ব পাকিস্তানে এটি সমালোচিত হয় এবং বলা হয় যে, এটি ইয়াহিয়া খানের ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বরের পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে। রাষ্ট্রপতির দ্বারা সংবিধানের অনুমোদনকে বাঙালিরা ভাল চোখে দেখেনি। তাদের মতে, এটি গণপরিষদের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর আন্তরিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। কথিত আছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন,''নির্বাচন সম্পন্ন হবার পরপরই আমি এলএফও ছিড়ে ফেলব।" তিনি জানতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিপুল সমর্থন পেলে, তিনি হয়তো তা-ই করতে পারবেন।

জুলফিকার আলী ভুট্টো আশঙ্কা করেন যে, লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক -এর আওতায় নির্বাচন হলে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিপদের সম্মুখীন হবে। নির্বাচনের ১২০ দিন পর সংবিধান প্রণয়ন করা হবে- তিনি এ শর্ত পছন্দ করেন নি। নির্বাচনে যাবার আগেই তিনি রাজনীতিকদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যম অথবা গণভোটের মাধমে স্বায়ত্তশাসন বিষয়টির সুরাহা দাবি করেন। অনেক জেনারেল তাকে এ ব্যাপারে সমর্থন দেয়। তারা নির্বাচনের আগেই সাংবিধানিক দলিল চান, যাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের নির্দিষ্ট পরিধি উল্লেখ থাকবে। এটা যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক দূরত্বের কারণে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক -এর মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লাভ করলে, শেখ মুজিব পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে এতটা ক্ষোভ জাগাতে পারতেন না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এতটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে পারতেন না, যেমন তিনি দিতেন নির্বাচনী প্রচারণার সময়, একথাটি একজন পশ্চিমা বিশ্লেষকের।

লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে রাজি হননি ক্ষমতাধর দুই প্রার্থী। মুজিব ঠিক করেই রেখেছিলেন যে তিনি এ অর্ডার মানবেন না এবং ভুট্টোও এটাকে

www.pathagar.com

গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, কোথাও উল্লেখ ছিল না যে, দুই-তৃতীয়াংশ পার্লামেন্ট সদস্য অনুমোদন করলে এলএফও রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা যাবে। এ শর্তের অনুপস্থিতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানীরা সহজেই তাদের ছয় দফার উপর ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন করতে পারতো। ইয়াহিয়ার মন্ত্রীসভার সিভিলিয়ান সদস্য জি ডব্লিউ চৌধুরী দাবি করেন যে, ''সংবিধান পাশ করার জন্য সংসদের ৬০% ভোটের প্রয়োজনীয়তার শর্ত ইয়াহিয়া খান লুপ্ত করেন।"

যারা এলএফও রচনা করেছিলেন, তারা ছিলেন এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট। তারা লেখেন, ''প্রদেশসমূহ এমনভাবে ফেডারেশনে একত্রিত হবে যে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা, ভূখণ্ডের অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতির নিশ্চয়তা থাকবে এবং ফেডারেশনের একতা কোনভাবেই বিপদের সম্মুখীন হবে না।"

এলএফও ভঙ্গের ব্যাপারে মুজিবকে কোন সময় সাবধান করা হয়নি। আসলে রাষ্ট্রপতি ছয় দফার মধ্যে ক্ষতিকর কোন কিছু খুঁজে পাননি। এমনকি সিএমএলএ হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হয়, ''ছয় দফার প্রচারণা সামরিক আইনের ধারা-২০ এর বিরোধী নয়। " হয়তোবা ইয়াহিয়া এবং তার নিকটস্থ সহকারিরা ভেবেছিলেন যে, ছয় দফা শুধুমাত্র নির্বাচনী প্রচারণা ছিল, এর বেশি কিছু নয়। তারা ভেবেছিলেন সংবিধান প্রণয়নের সময় ছয় দফায় কিছু পরিবর্তন আসবে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল যে, প্রতিবাদমুখর মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ১৯৭১ সালের নির্বাচনী প্রচারণার মাধ্যমে সর্বাত্মক স্বায়ত্তশাসনের দিকে এগিয়ে নিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্রে কোন সরকার, তা সামরিক বা বেসামরিক হোক না কেন, ছয় দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবকে বাঁধা দিতে পারেনি।

ইয়াহিয়া যদিও বারবার বলতে থাকেন যে, দেশ ভাঙ্গার কোন পরিকল্পনাকে তিনি বরদাস্ত করবেন না। ততোদিনে তার শক্তি অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে তার সামরিক কমান্ডারগণ এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না এবং ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণকে মোকাবেলা করবার মত তাদের শক্তি ছিল না।

নির্বাচনী প্রচারণা

এ নির্বাচনী প্রচারণা ১৮ মাস ধরে চলতে থাকে, যা ছিল উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচে' দীর্ঘ নির্বাচনী প্রচারণা। রাজনীতিকদের একবছরের বেশি সময় দেয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর। পূর্ব পাকিস্তানের প্রচারণা ছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এবং বাঙালিদের উপর পাঞ্জাবিদের তথাকথিত শোষণের বিরুদ্ধে।

নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বেশিরভাগ দলের তেমন কোন জনসমর্থন ছিলনা। চারিত্রিকভাবেও তারা জাতীয় পর্যায়ের দল ছিল না। তাদের ছিল আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের চারজন প্রার্থী ছিল, কিন্তু তারা একজনও গণপরিষদে স্থান পায়নি। আর ভুট্টোর পিপল্‌স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টাই করে নি। তার মানে নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ আঞ্চলিক। চারটি প্রধান দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ পশ্চিমের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করে এবং সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করতে থাকে। যা প্রায় স্বাধীনতার দাবির সমকক্ষ ছিল। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে, তারা আঞ্চলিক দল নয়। কিন্তু ততোদিনে তার চেহারা থেকে মুখোশ খুলে গিয়েছিল।

অভিজ্ঞ রাজনীতিক খন্দকার মোশতাক, যিনি শাসকদের নীতি অমান্য করার দায়ে বহুবার জেলে গিয়েছিলেন, তার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করে দেশ বিভাগের আগে। তিনি তখন মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু মনে প্রাণে ছিলেন জাতীয়তাবাদী। তার মধ্যেও দ্বিধা ছিল। ঢাকায় তার খুবই সাধারণ বাসায় বসে এ লেখকের সাথে আলাপকালে বলেন, ‘‘লাহোর প্রস্তাবে দুইটি রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল।’’

আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘একবার কেকের এক টুকরা খেয়ে ফেললে পুরোটাই খেতে ইচ্ছে করে, তখনই আমাদের সন্দেহ জাগে।’’ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের আধিপত্যের মানসিকতায় রাগান্বিত হলেও তিনি পাকিস্তারে বিরুদ্ধে ছিলেন না। এমন কি তিনি বলেন, ‘‘পাকিস্তান এখানে (বাংলাদেশে) থাকা উচিৎ। এটাই ইতিহাসের দাবি।’’

খন্দকার দাবি করেন যে মুজিব নয়, তিনিই আওয়ামী-মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, মুসলিম লীগ পূর্ব প্রদেশের দাবি পূরণ করতে পারছিল না। অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের মত তিনিও ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে থাকেন। কিন্তু তার দলের কট্টরপন্থীদের থেকে তিনি কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে থেকেই স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

মার্চের ২০ তারিখে ফেনিতে বক্তৃতাদান কালে মোস্তাক বলেন, ''আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী পাকিস্তান, যার জন্য একান্তই প্রয়োজন সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।'' কিন্তুর প্রচারণার ধারার সাথে সাথে তার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তিনি বলেছিরেন,''যদি ছয় দফা মানা না হয়, তবে আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র একদফা দাবি করবে।'' বলা বাহুল্য এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত স্বাধীনতার ঈঙ্গিত দিয়েছিলেন।

২১ জুন রাজশাহীতে বক্তৃতা দেয়ার সময় অল পাকিস্তান আওয়ালী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুজ্জামান বলেন, ''পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করা হবে।'' ২১ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জে শেখ মুজিব স্পষ্টভাবে বলেন, ''পাকিস্তানের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হবে না।'' পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম বলেন, ''পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা হবে।'' এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি খোলাখুলিভাবে তার রাজনৈতিক মানসিতায় ভারতপন্থী ছিলেন।

২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শুধু প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের কথা বলেন। তিনি স্বাধীনতা বা বিভক্তির কথা উল্লেখ করেন নি। ২৭ সেপ্টেম্বর লাহোরে ভাষণ দেয়ার সময় কামরুজ্জামান অস্বীকার করেন যে, তার দল পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছিল (অবশ্য পাকিস্তানের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে), যেখানে ৩০ বছর আগে পাকিস্তান প্রস্তাব ঘোষিত হয়েছিল। তার অন্য কিছু বলবার অবকাশ ছিল না। এমনকি, ৬ নভেম্বর তারিখে যখন নির্বাচনের মাত্র এক মাস বাকি, মুজিব শুধু পূর্ব বাঙলার স্বার্থ রক্ষার কথা বলে যাচ্ছিলেন।

অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বারবার উল্লেখ করা হচ্ছিল, যাতে করে মধ্যপন্থী বাঙালিরা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে ভোটদান না করে। তাজউদ্দীনের মনস্থির ছিল। তিনি ছয় দফার বাস্তবায়ন, কোন রকম শর্ত ছাড়া, দাবি করে যাচ্ছিলেন। এর পরে পাকিস্তান ভাঙলেও, তিনি ছিলেন অনড়। ১৯৭০ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় নি। অনেকে বলতেন যে পূর্ব বাংলা বস্তুত আর পাকিস্তানের অংশ ছিল না। ইস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ফেডারেশন - এর জঙ্গি অংশ একটি স্বাধীন গণ-প্রজাতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার দাবি জানাচ্ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বকে সমালোচনা করবার সময়, আওয়ামী লীগ নেতারা কোন ছাড় দেয় নি। যে সকল বাঙালি তাদের সাথে একমত পোষণ করেনি, তাদেরকেও তারা তীব্র সমালোচনা করে। ১১ মার্চ হাজারিবাগে মুজিব বললেন যে,

www.pathagar.com

মীর জাফরদেরকে খতম করা হবে। তার বিশ্বস্ত তাজউদ্দীনও বলতে থাকেন যে, ‘‘পাকিস্তানের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ও নিপীড়নের ইতিহাস।’’

অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানেই অনেক রাজনীতিক ছিলেন যারা মুজিব ও তার ছয় দফার বিরুদ্ধে ছিলেন। নুরুল আমিন এবং মাহমুদ আলীও বক্তৃতা বিবৃতি দিতে থাকেন এবং তাদের সভায় বেশ জন সমাগমও হতো। তারা ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ এর তীব্র সমালোচনা করেন। গোয়েন্দাবাহিনী তাদের সভায় এতো লোক দেখে বেশ অভিভূত ছিলেন এবং সরকারের উচ্চ মহলে ভুল ধারণা দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ডানপন্থীরা জেগে উঠেছে। এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। ইসলামপন্থী দলগুলোকে দেখে গোয়েন্দাদের প্রতিবেদনে ভুল ধারণা উঠে আসে।

পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাদের) -এর ফজলুল কাদের চৌধুরীও আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু কণ্ঠ তেমন জোরালো ছিল না। একইভাবে ন্যাশনাল পাকিস্তান লীগের আতাউর রহমানের মুজিব বিরোধী বক্তব্যও তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

নির্বাচনী প্রচারণার আগে থেকেই আওয়ামী লীগ তার শক্তির প্রদর্শন করতে থাকে এবং এটি একটি ফ্যাসিবাদি জঙ্গি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিরোধী মতের প্রতি ছিল একেবারেই অনমনীয়। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন দলকে তারা ছাড় দেবে না- এ ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। এর ফলে, পূর্ব পাকিস্তানে আর কোন রাজনৈতিক দল সভা সমাবেশ করতে পারছিল না। ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০, জামায়াত ই ইসলাম পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। কিন্তু এ সভা বেশিক্ষণ চলতে দেয়া হয়নি। তার চারদিন পর জামায়াত ই ইসলামের অফিসে আক্রমণ চালানো হয় এবং সব প্রকাশনা বিনষ্ট করা হয়। একইভাবে ১৯৭০ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভা, মিটিং ভণ্ডুল করা হয়, এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ ভণ্ডুল করতে থাকে।

বলা হয় যে, স্থানীয় পুলিশ সুপারের নির্দেশে ৩১ মে চট্টগ্রামে জামায়াতের মিছিলে আক্রমণ করা হয়। ৩০ মে হবিগঞ্জে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সভা ভন্ডুল করে মুজিব সমর্থক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

মুজিব এবং তার সমর্থকগণ প্রত্যক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতার কথা বলতেন না, কারণ পূর্ব পাকিস্তানেও এর যথেষ্ট বিরোধীতা দেখা যেত। পাকস্তানের ভাঙ্গনকে কেউ

www.pathagar.com

সহজভাবে গ্রহণ করত না। এমনকি, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, মুজিব কোরআন শরীফ ছুঁয়ে বলতেন, "আমি দেশ বিভক্তি চাই না।" পূর্ব পাকিস্তানে অনেক ডানপন্থী ছিলেন যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিতেন না, যদি তারা বুঝতে পারতেন যে আওয়ামী লীগের আসল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। মুখে মুজিব বলতেন," Pakistan has come to stay." অর্থাৎ "পাকিস্তান চিরস্থায়ী।" কিন্তু মনে মনে তিনি বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবতেন। তিনি জানতেন যে, ধীরে ধীরে পাস্তিান বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে পারলে জনগণ শেষঅব্দি নিজরাই স্বাধীনতার দাবি জানাবে। খন্দকার মোশতাক বলেন যে পাকিস্তান তাদের ভুল নীতির মাধ্যমে মুজিবকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হিসেবে গড়ে তুলেছিলা।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে মুজিব নাকি বলেছিলেন, তিনি ১৯৬৮ থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এও বলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম আসলে ১৯৪৮ সাল থেকেই শুরু হয়। মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ইচ্ছামত প্রচারণা চালিয়ে যেতে থাকেন। আওয়ামী লীগের সবচাইতে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)ও তার প্রচারণা থামাতে কোন উদ্যোগ নেয় নি। নির্বাচনী প্রচারণাকালে পিপিপি'র কোন বড় মাপের নেতা পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। তাদের জনসভায় ভুট্টো কখনো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে কোন কথা বলেননি। তিনি মুজিবের ছয় দফারও সমালোচনা করেন নি, এমনকি উল্লেখও করেননি। তিনি ছয় দফা প্রখ্যান করলেও, তার প্রচারণায় এ নিয়ে কোন কথা বলেননি। বরং তার প্রচারণার বিষয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক শোষণ, কিন্তু দুই প্রদেশের মধ্যের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ নিয়ে কোন কথা বলেন নি। আসলে তিনি পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে কোন আগ্রহই প্রকাশ করেন নি। ভুট্টো বলেন যে, তিনি অর্থনৈতিক বিষয় এবং পররাষ্ট্র বিষয়ের উপর জোর দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একজনও পিপিপি প্রার্থী দাঁড় করান নি। এতে বোঝা যায় যে, নির্বাচনের আগেই তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সেখানে তার কোন ক্ষমতা নেই। সেখানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ইচ্ছাও পোষণ করেননি। মুজিবের ন্যায় তিনিও তিনিও মনে মনে দেশকে আগে থেকেই ভাগ করে ফেলেছিলেন। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তান শাসনে ক্ষমতার ভাগ না দেয়া। অন্যদিকে, মুজিব নিজেই পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছিলেন, সেখানে তার দলের চার প্রার্থীর জন্য প্রচারণা করার জন্য। (যদিও অবশেষে তারা চারজনই হেরে যায়।)। লাহোরে ৫ জুলাই বক্তৃতা দিতে গিয়ে শেখ মুজিব বেশ রেগে বলে উঠলেন, "তোমরা পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে

www.pathagar.com

চাও। ৯৫% বাঙালি আমার পক্ষে। আমরা এ কাজটি পূর্ব পাকিস্তানে করতে পারি।" এবং তারা তাই করলেন। লাহোরে থাকাকালে তিনি লে. জে. (অব) আজম খানের সাথে দেখা করেন। আজম খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর এবং তিনি ভাল কাজের জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। আজমখান যেন আওয়ামী লীগে যোগ দেন মুজিব সে চেষ্টাই করেছিলেন। । কিন্তু আজম খান তা করেননি।

জুনের ১৩ তারিখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী) ঢাকায় একটি সভা করে। কিন্তু তারপর পূর্ব পাকিস্তানে এ দলটি কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়। নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে খান আব্দুল কাইয়ুম খান মুজিবের ছফ দফার সমালোচনা করেন এবং মাঝে মাঝে বলেন যে, "হিন্দুরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের মেরুদণ্ড। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা।" তিনি হয়তো হয়তো খুব একটা ভুল বলেন নি। কিন্তু এ ঘৃণার পিছনে কি কারণ ছিল, তা তিনি বুঝতেন না।

পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে ছিল। কিন্তু তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের মনোভাব জয় করতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে হেরে যাবার পর, মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে পেছনে ফেলে দেয়া হয়। মোনেম খান ও সবুর খানের মধ্যে দ্বন্দ্ব ওদেরকে আরো অজনপ্রিয় করে তোলে। আইয়ুব খানতে তোষামোদ করার জন্য তারা পূর্ব পাকিস্তানে পুরোপুরি জনপ্রিয়তা হারায়।

জামায়ত-ই- ইসলামির মত দলগুলো ধর্ম বনাম রাষ্ট্র বিষয়ক ব্যাপারগুলোকে সামনে নিয়ে আসে। যা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে কোন আগ্রহই ছিল না। জামায়াত বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী দল ছিল। এ দলের খুব কম সংখ্যক নেতা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। একমাত্র নাম করা বাঙালি যিনি জামায়াত ইসলামিতে যোগ দিয়েছিলেন, ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আজম। গোয়েন্দা বাহিনী জানায় যে, তিনি জুনের ২ তারিখে ঢাকায় এক সভায় বক্তব্য রাখেন। কিন্তু এ সভায় কারা কারা ছিলেন, কয়জন ছিলেন, তিনি কি বলেছিলেন তা কিছুই উল্লেখ করা করা হয়নি। বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল কারণ তারা হিন্দুদের আধিপত্য দূর করতে চেয়েছিল। এ লক্ষ্য সফল হবার পর তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিজেদের অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করা। দুই প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ককে ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে শক্তিশালী করা। এ নিয়ে তাদের

মধ্যে কোন আগ্রহ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানী ধর্ম নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের কাছে জামায়াতের ধর্মনীতির কোন আকর্ষণ ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ চেতনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মাওলানা মওদুদীর ঢাকা সফরগুলো এ প্রদেশে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নাই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন না করে, জামায়াতের অভিযোগ ছিল স্থানীয় পুলিশ হলে টমবোলা বাজানো। এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খান ২৩ অক্টোবর কুষ্টিয়ায় তার দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে এর কোন প্রভাবই ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে ডানপন্থী দলগুলোর ব্যর্থতার আরেক কারণ ছিল অর্থের অভাব। পূর্ব পাকিস্তানে তারা তেমন অর্থ সংগ্রহ করতে পারে নি এবং পশ্চিম পশ্চিম পাকিস্তানে যা অর্থ সংগ্রহ হতো, তা সেখানকার প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত হতো। খাজা খয়েরউদ্দীন ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দীনের ভাই এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের সদস্য। তিনি অভিযোগ করেন যে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান মে. জে. গোলাম ওমর খান আব্দুল কাইয়ুম খানকে ৪০ লাখ রুপি দিয়েছিল, কিন্তু তাকে, নূরুল আমীন, ফুয়াদ আহমেদ এবং নিজাম ই ইসলাম পার্টিকে মাত্র পাঁচ লাখ রুপি করে দিয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (পিকিংপন্থী)- এর নেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রথম দিকে শেখ মুজিবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তার প্রথম দাবি ছিল খাদ্য, তারপর অন্যকিছু। পরে তিনি নির্বাচনে যোগ দেয়ার ব্যাপারে রাজি হন, কিন্তু শর্ত ছিল তার দলের সব বন্দী নেতা ও কর্মীকে আগে তুক্ত দিতে হবে। এ শর্ত মানা হয়নি। ভাসানীও তখন অন্য পথ ধরেন। তিনি প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের দাবি থেকে সরে আসেন। তিনি বলেন যে, লাহোর প্রস্তাবে দুইটি রাষ্ট্রের উল্লেখ ছিল, তাই পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া উচিৎ। খায়েরুদ্দীন, আবুল কাশেম, আতাউল হক এবং শফিউল আযম ছিলেন কাউন্সিল মুসলিম লীগের সদস্য। তারা মুজিবের ছয় দফার সমালোচনা করেন এবং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক -এর প্রশংসা করেন। কিন্তু তারা এত দুর্বল ছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে স্বাধীনতার স্বপ্ন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) নামে আরেকটি রাজনৈতিক দল ছিল, কিন্তু পাকিস্তানে এর আওয়াজ ছিল ক্ষীণ। পূর্ব পাকিস্তানে পিডিপি'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্দুস সালাম এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাহমুদ আলী, যিনি

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাদের তেমন কোন প্রভাব ছিল না। আওয়ামী লীগ কর্মীরা প্রায়ই পিডিপির জনসভায় এসে চেয়ার ভেঙ্গে, মাইক কেড়ে নিয়ে সভা ভন্ডুল করে দিতো।

মাহমুদ আলী স্মরণ করেন কিভাবে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী তাকে ঘেরাও করে এবং জোর করে তার স্বাক্ষর নিচ্ছিল মুজিব বিরোধী বক্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য। তারপর জোর করে তাকে মাইকের সামনে আনা হয়, যাতে তিনি এটা জনসম্মুখে পড়ে শোনান। মাহমুদ আলী এ সুযোগে নিজের রাজনৈতিক মতামতও প্রকাশ করেন।

তিনি বর্ণনা করেন, ওরা কিভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যেতো। নির্বাচনের দিনের ২৪ ঘন্টা আগে সিলেটের সুনামগঞ্জ আসনে গুজব ছড়ানো হয় যে, মাহমুদ আলী নিজেকে নির্বাচন থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এ কথা মিথ্যা প্রমাণ করার আগেই নির্বাচন শেষ হয়ে যায় এবং মাহমুদ আলীর এক ভাই আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

নির্বাচনী প্রচারনার সময়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যা ইচ্ছা তা বলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল যে মুজিবের ব্যাপারে তিনি নমনীয় ছিলেন, যাতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিনষ্ট না হয়। কিন্তু এতে মুজিব আরো সাহসী হয়ে ওঠেন এবং তিনি নির্বাচনী প্রচারণাকে ব্যবহার করেছেন তার ছয় দফাকে সামনে আনার জন্য। সামরিক শাসকরা এমন কিছু করতে চান নাই, যা দেখে বাইরের জগৎ মনে করবে যে তারা নির্বাচনী প্রচারণায় হস্তক্ষেপ করছে।

গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম এহসান এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান মুজিবের ছয়দফার প্রচারণায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিলেন না। তাদের ওরকম কোন নির্দেশও দেয়া হয় নাই।

১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা, যিনি প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শাসনের দায়িত্বে জড়িত ছিলেন, তিনি বলেন, ‘‘মুজিবের ছয় দফা প্রচারণা বন্ধ করার জন্য সিএমএলএ হেডকোয়ার্টার থেকে কোন নির্দেশনা আসেনি।’’ নির্দেশনা দেয়া হলেও তা পালন করার ক্ষমতা ছিল না। জেনারেল রাজা বলেন, প্রাথমিকভাবে আওয়ামী বিচ্ছিন্নতার

পক্ষে ছিল না। তবে তারা ছয় দফাকে সংবিধানে নিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর ছিল। তিনি বলেন যে, ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের গোপন সমঝোতা ছিল, যাতে মুজিব ছয় দফা নিয়ে বড় বড় কথা বললেও, তিনি আসলে এ ব্যাপারে অবশেষে অনড় থাকবেন না। ‘‘ইয়াহিয়া এটা বিশ্বাস করতেন” বলেন রাজা। কিন্তু ভোটারদের কাছে কথা দেওয়ার পরে সে কথাটি আর ভাঙলেন না মুজিব।

নির্বাচনী প্রচারণায় সেনাবাহিনী কোন হস্তক্ষেপ করে নি। যদিও সেনা সদস্যদেরকে নির্বাচনী কেন্দ্রের কাছে থাকতে বলা হয়েছে, তারা কেন্দ্র সমূহ থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে রাখে শুধুমাত্র গন্ডগোল হরে তারা এগিয়ে আসবে। দুর্ভাগ্যবশত সেনাবাহিনী এমন নিরপেক্ষতা পালন করে যে, আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিজয়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করলেও সেনা সদস্যরা অবাধ নির্বাচনের সআর্থে চুপ রয়ে গেল।

নভেম্বর ১৯৭০ -এর ঝড়

নির্বাচনী প্রচারনা যখন তুঙ্গে আর পূর্ব পাকিস্তানের সব সমস্যার পশ্চিম পাকিস্তানীদের দায়ী করা হচ্ছিল (বিশেষ করে পাঞ্জাবিদেরকে) । তখন প্রকৃতিও পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটালো। ১২ নভেম্বর ১৯৭০ , যখন নির্বাচনের একমাসের কম সময় বাকি ছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলিয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন আক্রমণ করে। পটুয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘণ্টায় ১২৫ মাইল বেগে তুমুল হাওয়া বয়ে যায়। ২০ ফুট উঁচু ঢেউ এসে কাঁচা ঘরগুলো ধ্বংস করে।

গ্রামের লোকজন পানিতে ভেসে যায়। এটি ছিল দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়। ছয় ঘন্টা ধরে ঝড় চলতে থাকে। অবশেষে নোয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও অন্যান্য চরে আঘাত হানার পর ঝড় থেমে যায়। ১২০ টি ছোট ছোট দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে যায়। দুই হাজার বর্গমাইল জমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। প্রায় পাঁচ লাখ নারী পুরুষ ও শিশু মৃত্যুবরণ করে। ২৫ লাখ মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের সম্পদ ধ্বংস হয়।

এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে একটি উন্নত সম্পদশালী রাষ্ট্রের পক্ষেও কষ্টকর হতো, মন্তব্য করেন জার্মান খবরের কাগজ Die Welt. নোয়াখালির একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী আব্দুল কাইয়ুম একই মন্তব্য করেন।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের এ দুর্যোগ মোকাবেলায় কেন্দ্র কিছুটা বিলম্বে এগিয়ে আসে। ভুট্টো ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজনৈতিক নেতা দুর্যোগ এলাকায় আসেন নি। ভুট্টোকেও তেমন সাদরে গ্রহণ করা হয়নি। পিকিং থেকে ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একরাতে জন্য ঢাকায় আসেন। তিনি দুর্যোগ এলাকার উপর দিয়ে ছোট বিমানে করে উড়ে যান এবং সব রকমের সাহায্যেও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান ছিল এক হাজার মাইল দূরে এবং মাঝে ছিল একটি বৈরী মনোভাবের দেশ। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি হেলিকপ্টার ও নৌবাহিনীর জাহাজে পাঠানো খুব সহজ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে একটি আর্মি ডিভিশন ছিল তখন। সেখানে মাত্র দুটি এমআই-৮ হেলিকপ্টার ও একটি পিআইএ প্ল্যান্ট প্রটেকশন হেলিকপ্টার ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণাকালে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সেনাবাহিনীকে অপমান করে এবং তারা ব্যারাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারপরও সেনা সদস্যরা যতটা সম্ভব মৃত লাশ উদ্ধার করে এবং দাফন দেয়। এ দুর্যোগকালে বাঙালিরা তাদেরকে কোন সহযোগিতা করে নাই।

পূনর্বাসন কমিশনার ছিলেন একজন বাঙালি। কিন্তু তিনি তার কাজে খুব একটা আগ্রহ দেখান নি। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি , যিনি কুমিল্লায় এক ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন, অভিযোগ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকরা ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাদেও সাথে সহযোগিতা করতেন না। মুজিব নিজেও ভোলায় যান নি, যেখানে ঘূর্ণিঝড় সবচাইতে বেশি আঘাত হেনেছিল। তিনি পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনা পর্যন্ত গিয়েছিলেন মাত্র। তিনি চাইলে বিরাট ত্রাণ কর্মসূচি আয়োজন করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি সরকারকে দায়ী করতে থাকেন এবং এ দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে বদনাম করতে থাকেন।

জেনারেল রাজা পুরো অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে দেখেন এবং গভর্নর এস এম এহসানকে পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। বাঙালি মূখ্য সচিব শফিউল আযম এহসানকে বলেন, ‘‘আমরা নিজেরাই পরিস্থিতি সামলিয়ে নেবো।’’ জেনারেল রাজা দুই ব্রিগেড নিয়োগ করলেন ত্রাণ কাজে। তিনি বলেন, ‘‘কোমর পর্যন্ত পানির ভেতর দিয়ে হেটে সৈন্যরা দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করে।’’

ঘূর্ণিঝড়ের এতা ক্ষয়ক্ষতি তোকাবেলার জন্য মাওলানা ভাসানী চেয়েছিলেন যে, নির্বাচন স্থগিত করা হোক। কিন্তু মুজব এর বিরোধিতা করেন। তিনি এ ঝড়ের সুযোগ নিয়ে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে চেয়েছিলেন। বৈরী পরিস্থিতির

www.pathagar.com

সুযোগ তিনি হাত ছাড়া করতে চাই। তিনি চিৎকার করতে থাকেন, ''পশ্চিম পাকিস্তানে সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ মেরিনরা আমাদের লাশ দাফন করছে পটুয়াখালীতে।'' একটা কিন্তু সঠিক তত্ত্ব নয়। সেনাবাহিনীর জওয়ানরা আসলে লাশ দাফন করতে থাকে।

অনেক বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও ফোর আর্মি অ্যাভিয়েশন স্কোয়ার্ডন এর পাইলটরা হেলিকপ্টার নিয়ে সেখানে যায় এবং তিনটন ওজনের বেশি বহন করা নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তারা এক এক হেলিকপ্টারে চারটন ওজনের ত্রাণ বিতরণ করেন। দুই তিন মাস ধরে তারা এ ত্রাণ বিতরণ করতে থাকে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদেরকে কোন প্রশংসা করেনি। বিদেশীদের সীমিত সাহায্যকে বরঞ্চ খুব বেশি প্রশংসা করেছিল তারা। হেলিকপ্টার নিয়ে ভুট্টোও ভোলার এক বন্যা প্লাবিত এলাকায় যান। কিন্তু বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে ঘিরে ধরলে তাকে আবার হেলিকপ্টারে চলে যেতে হয়। পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ম্যাকফারলেইন দুই সপ্তাহের মধ্যে ভিয়েতনাম থেকে ১২টি Huey হেলিকপ্টার আনার ব্যবস্থা করেন। বাইরে থেকে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল এবং পাওয়াও গিয়েছিল কিন্তু মুজিব ইচ্ছাকৃতভাবে এ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ব্যবহার করেন।

পশ্চিমা সংবাদপত্র, এমনকি টাইমস অব লন্ডন, ত্রাণ কার্যক্রমে অবহেলার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে দোষারোপ করে। অভিযোগ করা হয় যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আগ্রহ নিয়ে কাজ করেনি এবং পাকিস্তানের জন্য ঠিকমত অর্থ না দিয়ে, অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা বাঁধের জন্য। জানা উচিৎ ছিল যে উন্নয়নশীল দেশে এসব প্রকল্প বহুজাতিক এবং আন্তর্জাতিক দাতাদের দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। তারা শুধুমাত্র টেকনিক্যালি ফিজিবেল প্রকল্পে যেখানে লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে, সেখানেই অর্থ দিয়ে থাকে।

১৯৯১ সালের ১লা মে একই ধরনের ঘূর্ণিঝড় স্বাধীন বাংলাদেশের একই এলাকায় আঘাত হানে। এক লাখেরও বেশি বাংলাদেশী নাগরিক প্রাণ হারায়।এবং লাখ লাখ মানুষ তাদেও ঘরবাড়ি হারায়। নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক মহলের কাছে সাহায্যেও জন্য অনুরোধ জানালেন। বিদেশীরা আবার এসে খুঁজে খুঁজে লঅশ দাফন দিতে থাকে। কিন্তু তখন মুজিব ছিলেন না পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাড়ে এ ''বেধর্মী'' কাজের দায় চাপানোর জন্য। দি টাইমস অব লন্ডনও বাংলাদেশ সরকারকে অন্য প্রকল্পে অর্থ খরচ করার বিষয়ে দোষারোপ করে নি। ১৯৯২ সালের আগস্টে ফ্লোরিডার দক্ষিণ উপকূলে টাইফুন অ্যান্ড্রু যখন আঘাত হানে, তখনও কিন্তু দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছাতে বেশ সময় লেগেছিল।

www.pathagar.com

নির্বাচনের ফল

সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ভাবতে পারে নি যে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মত এতগুলো আসনে জয়লাভ করবে। তারা ভেবেছিল যে সরকার গঠন করার জন্য আওয়ামী লীগ অন্যকোন দলের সাথে হাত মিলাতে বাধ্য হবে। এতে তাদেরকে ছয়দফার দাবি থেকে সরে আসতে হবে। নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা ভেবেছিল যে আওয়ামী লীগ ৬০% সফলতা লাভ করবে। জেনারেল রাজা কিন্তু অনুমান করেন যে আওয়ামী লীগ ৭৫% আসনে জয়ী হবে। তিনি সিএমএলএ হেড কোয়ার্টারকে এ কথা জানান। আর মেজর জেনারেল গোলাম জিলানী খান, যিনি ঢাকায় মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে ছিলেন, তিনি অনুমান করেন যে, আওয়ামী লীগ ৮৫% আসনে জয়ী হবে।

সরকারি কর্মকর্তাদের অনুমানের ভিত্তি ছিল ঢাকার গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের উপর। তাদেরকে আপাত দৃষ্টিতে ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছিল। তাদের মতে, যারা শেখ মুজিবের বক্তব্য শুনতে এসেছিল, তারা হতাশ হয়ে ফিরে যায়। পরিস্থিতি সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়, ‘‘জুনের ১ তারিখে শেখ মুজিব ময়মনসিংহের নান্দিনায় বক্তৃতা দেন। এখানে ৬ হাজারের মত লোক সমবেত হলেও এর অর্ধেক সভা ছেড়ে চলে যায় এবং গোলমালের সৃষ্টি হয়। এতে স্পষ্ট বোঝা য়ায় অনেকেই শেখ মুজিবের ব্যাপারে হতাশ।’’ আরেকটি জরুরী রিপোর্টে বলা হয়, ‘‘শওকত ইসলাম দিবসে মুসলমানদের বিরাট সমর্থন ইঙ্গিত করে যে তারা পাকিস্তানী ইসলামি আদর্শে পূর্ণ বিশ্বাসী।’’ আইএসআই এর মহাপরিচালক জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সিএমএলএ হেডকোয়ার্টার এবং প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিদিনকার রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন। তারা বাস্তব চিত্রটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করে নাই।

এমনকি, প্রেসিডেন্টের সংবিধান বিষয়ক বাঙালি উপদেষ্টা জি ডব্লিউ চৌধুরী লন্ডনে পাকিস্তান সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের একক কোন দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম।

নির্বাচনের আগের দিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দানকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন এবং যারা এ প্রক্রিয়াকে বাঁধা দিতে চায়, তাদেরকে সাবধান করে দিলেন।

তিনি বলেন, ‘‘আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে এ নির্বাচন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং সামরিক শাসনের আওতায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ নির্বাচন আমাদের

www.pathagar.com

পরিকল্পনার প্রথম ধাপমাত্র। এর পরের ধাপ হবে সংবিধান প্রণয়ন এবং শেষধাপে হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে, যাতে তারা ভবিষ্যত সংবিধান সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন। তাদেরকে দেয়া নেয়া করতে হবে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে এবং এ ঐতিহাসিক মুহূর্তের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। যারা এ প্রথম ধাপে বাধা দিতে চেষ্টা করবে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিবে।

নির্বচনের ফলাফল

নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভোটকেন্দ্রে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পার্লামেন্টের ৩০০ আসন নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী বন্টন হয়।

প্রদেশ	পুরুষ	নারী	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫
সিন্ধ	২৭	১	২৮
এনডব্লিউএফপি	১৮	১	১৯
বালুচিস্তান	৪	১	৫
উপজাতি এলাকা	৭	-	৭
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

ফলাফল

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসন সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৮১ ও ৭৯৮টি। অর্থাৎ এধরনের মোট আসন ছিল ১৫৭৯টি।

নির্বাচনে মোট ভোট পড়েছিল ৩৪,৯৮৮,৩১১টি। এরমধ্যে ১৭,১৯৩,৩৫১ ভোট ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং ১৭, ৭৯৪,১৬০টি ভোট ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে ৫৫% ভোট কাস্ট করা হয়েছিল, আর পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ভোট প্রদানের হার ছিল ৬১%। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ভোটদানের হার ছিল বেশি।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টিতে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে। ৭টি মহিলা আসনও যায় আওয়ামী লীগের ঘরে। অর্থাৎ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একটি আসনেও জিততে পারেনি। যদিও তারা সেখানে ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এটি পুরোপুরি আঞ্চলিক দল থেকে গেল।

পশ্চিম পাকিস্তানের ১২০টি আসনের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ৮১টি। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৬টি আসনও পিপলস পার্টিও ঘরে যায়। তারা মোট ৮৭ টি আসনে জয় লাভ করে। পিপল্স্ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনেও প্রার্থী দেয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বি আওয়ামী লীগের চেয়েও পিপল্সল পার্টি বেশি আঞ্চলিক দল হয়ে থাকলো।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মোট ভোটের ৭৫.১১% অর্জন করে। পিপল্স্ পার্টি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ অর্জন করে .০৭% ভোট। পাকিস্তান পিপল্স পার্টি পায় ৪১.৬৬% (পাঞ্জাব); ৪৪.৯৫%(সিন্ধ); ১৪.২৮% (এনডব্লিউএফপি); আর বালুচিস্তানে মাত্র ২.৩৮% ভোট। নিম্নের ছকে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলোঃ

টেবিল ২২

১৯৭০ -এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলের বিস্তারিত তথ্য

পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী লীগ	পিডিপি	স্বতন্ত্র	মোট
১৬২(১৬০)	৭৮(১)	১১৩(১)	৩৫৩(১৬২)

পশ্চিম পাকিস্তান

	আ. লীগ	পিপিপি	পিএমএল (কিউ)	পিএমএল (কাউন)	পিএমএল (কনভেঃ)	জেইউআই (ডব্লিউপি)	এমজেইউপি (জেআই)	এনএপি (ডব্লিউ)	স্বতন্ত্র
পাঞ্জাব	৩(-)	৭৮(৬২)	৩৫(১)	৫০(৭)	২৪(২)	৪৬(১)	৪৪(১)	-	১০৫(৫)
সিন্ধ	২(-)	২৫(১৮)	১২(১)	১২(-)	৬(-)	২১(-)	১৯(২)	৬(-)	৪৬(৩)
এনডব্লিউ এফপি	২(-)	১৬(১)	১৭(৭)	৫(-)	১(-)	১৮(৬)	১৫(১)	১৬(৩)	১৬(-)
বেলুচিস্তান	১(-)	১(-)	৪(৪)	২(-)	-	৪(১)	২(-)	৩(৩)	৬(-)
মোট	৮(-)	১২০(৮১)	৬৮(৯)	৬৯(৭)	৩১(২)	৮৯(৭)	৮০(৪)	২৫(৬)	১৭০(৮)

www.pathagar.com

বি দ্র : ব্র্যাকেট ছাড়া সংখ্যা হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসন সংখ্যা। ব্র্যাকেটবন্দী সংখ্যা হচ্ছে অর্জিত আসন সংখ্যা।

সূত্র: Reports on general Elections, 1970-1971, Vol-II, by the Election Commission, Government of Pakistan, pp14-122

নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ

নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকাল দেখা যায় যে, ১. কোন দল ছিল না যাকে চারিত্রিকভাবে বলা যায় জাতীয় দল। প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও পিপিপি যার যার প্রদেশে সীমাবদ্ধ রইল; ২. পূর্ব পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ বিজয় দাবি করলেও, বস্তুত আওয়ামী লীগ সেখানে মাত্র ৭৫% ভোট লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে ভোটারদের ২৫% ছয় দফাকে সমর্থন করে নি। এটি নগন্য সংখ্যা নয়; পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশের কোনটাতে পিপিপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি। তাই দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ একক প্রতিনিধি।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং বিদেশী পর্যবেক্ষক স্বীকৃতি দেয় যে, সামরিক আইনের আওতায় ডিসেম্বর ১৯৭০ এর নির্বাচন ছিল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। জাতির প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছিল। কিন্তু মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী লক্ষ্য করেছিলেন যে আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছু জঙ্গিবাদী জোর করে শেখ মুজিবের পক্ষে সমর্থন আদায় করে। ফরমান এটাও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ইসলামপন্থী দলগুলোকে অর্থ দিয়ে বলিষ্ঠ করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ ছিল।

সরকারি সংস্থা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করলে, সাধারণত সে নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ বলা হয়, তবে যদি তারা কোন রাজনৈতিক দলের শক্তি ও চাপ প্রয়োগের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, তখনও কি এ নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু বলা যাবে? মাহমুদ আলীর মতে, আওয়ামী লীগের দুইটি সুবিধা ছিল। তারা সন্ত্রাসকে ব্যবহার করেছিল এবং বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তাদের প্রচুর অর্থ ছিল।

কিন্তু এটাও অস্বীকার্য যে, বাঙালিদের মনোভাব সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী বিরোধী ও পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী হয়ে গিয়েছিল ততোদিনে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ঠিক বলেছিলেন যে তারা নিরঙ্কুশ বিজয় আশা করছিল। ভাসানীর নির্বাচন বর্জন এবং কেন্দ্রে বিপুল পরিমাণ ঢালা, নির্বাচনের ফলাফলে কোন প্রভাবই ফেলতে পারে নাই।

নির্বাচনের পরবর্তীকাল

যে সব দেশে গণতন্ত্রের শক্ত ভীত রয়েছে এবং গণতান্ত্রিক রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দৃঢ়ভাবে, সে সব দেশে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উত্তেজনা, উল্লাস নির্বাচনের পরে স্তিমিত হয়। সবাই যার যার কাজ কর্মে ফিরে যায়। যে প্রার্থী হেরে যায়, সেই সাথে সাথে বিজয়ী প্রার্থীকে অভিনন্দন জানায়। নির্দিষ্ট তারিখে নব নির্বাচিত সরকার প্রধান শপথ গ্রহণ করে। এবং তা যথাযথ উৎসবমুখরভাবে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বের সরকার প্রধান অন্য কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যবশত, উন্নয়নশীল দেশ সমূহ নির্বাচনী কলহ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেও চলতে থাকে। বিজয়ী প্রার্থীগণ এবং যারা হেরে গেছে। তারা এমন সব মন্তব্য করেন, যা পরিস্থিতিকে আরো উত্তেজিত করে । বিরোধী দল ক্ষমতা হস্তান্তরে বিঘ্ন ঘটাতে চেষ্টা করে। ক্ষুব্ধ বিরোধী দলের সমর্থকরা আবার রাস্তায় নামার হুমকি দেয়। অভিযোগ করা হয় যে নব নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ হয় যে নব নির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে। ১০৭০ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরে ঠিক এমনই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

নির্বাচনের ফলাফল সামরিক সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিল। বড় দুই দলের। কোনটার জাতীয় চরিত্র ছিল না। দুই দল উঠে এসেছিল, যার যার অঞ্চলে সিংহ রূপ ধারণ করে। কিন্তু পরস্পরের অঞ্চলে তারা ছিল ইঁদুরের সমান। গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন পেয়ে, সিএমএলএ হেড কোয়ার্টারসও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলো যে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ হবে এককভাবে সবচেয়ে বড় দল। তারা নিশ্চিত ছিল যে সরকার গঠন করার জন্য, অন্য ছোট দলের সমর্থনের দরকার হবে। জেনারেল পীরজাদার মতে, তারা ভাবতেই পারেনি যে, শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে; তারা এই রকম সম্ভাবনাকে আমলে নেয়নি। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাদের পরিকল্পনাই ছিল না।

তারপরও পীরজাদা বিশ্বাস করতেন যে নির্বাচনের ফলাফল তেমন ভীতিকর কিছু ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখান নি। তিনি নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

অবাক হয়েছিলেন, যেমনটি হয়েছিল অংশগ্রহণকারীরা। প্রেসিডেন্টের চিন্তার বিষয় ছির যে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ভোটও পাননি, আর ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে ভুট্টোর প্রতিনিধিরা সব হবে পশ্চিম পাকিস্তানী।

প্রথম দিকে ইয়াহিয়ার মনোভাব ছিল, ''আমার দায়িত্ব শেষ।'' এমন কি তিনি ঢাকায় মন্তব্যও করেছিলেন যে মুজিব হবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, ''উনি এসে যখন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তখন আমি থাকবো না, সরকার শীঘ্রই তার হবে। ''

কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব স্থানীয় কর্মকর্তারা মুজিবের বিজয়কে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আইএসআই'র মহাপরিচালক জেনারেল আকবর বলেন, ''ওই হারামজাদাকে দেশ শাসন করতে দেব না আমরা।'' ফরমানের মতে, ১২ জন জেনারেল মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে ছিল। তারা আশঙ্কা করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে, তারা ভারতের প্রতি নমনীয় হবে, কাশ্মীর ইস্যুকে প্রাধান্য দেবে না। এবং প্রতিরক্ষা খাত থেকে ফান্ড নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরাদ্দ দেবে। দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতাকে বাদ দিয়ে, তারা বাঙালিদেরকে বিভিন্ন অফিস আদালতে নিয়োগ করবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে হ্রাস করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তানে পরাজিত প্রার্থীরা তাদের পরাজয় মেনে নিয়েছিল। ১৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়মী লীগের বিরাট জয় মুজিবের মাথায় চড়ে বসলো, তিনি নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবতে শুরু করেন।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী প্রফেসর আব্দুল কাইয়ূম বলেন, ''পূর্ব পাকিস্তান একজন গলাবাজকে নির্বাচিত করেছে।'' মুজিব তার দলের নেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। ২০ ডিসেম্বর ড. কামাল হোসেন, যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, জনগণের প্রতি ডাক দিয়ে বলেন, তারা যেন ছয় দফা ও এগার দফা বাস্তবায়নের আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকে, যদি ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণীত না হয়।''

বলা বাহুল্য, সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনারা মুজিবের উল্লাসিত ছিল। তারা সেনাবাহিনীতে বেশি প্রতিনিধিত্ব পাবে এবং নৌবাহিনীর প্রধান কার্যালয় হয়তো চট্টগ্রামে স্থানান্তর হবে। এতে তারা নিজ প্রদেশে কাজ করার বেশি সুযোগ পাবে।

পশ্চিমে ভুট্টো রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। তিনি বিরোধীদল হিসেবে সংসদে বসতে না রাজ ছিলেন। এ বেসামরিক একনায়ক এবং সামন্তবাদী জমিদার

www.pathagar.com

বলেন, ''পিপিপি'র সমর্থন ছাড়া কোন সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না।'' তিনি বলেন, ''পিপিপি কে উপেক্ষা করা পশ্চিম পাকিস্তানকে উপেক্ষা করার সামিল।'' তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ও পিপিপি কেন্দ্রে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে পারবে। ভুট্টো ক্ষমতালোভী হয়ে যে সকল মন্তব্য করতে থাকে, তা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগও পাল্টা মন্তব্য করতে থাকে। এ দুই বড় দল, তথাপি আঞ্চলিক দল মুখোমুখী অবস্থান গ্রহণ করে। ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং মাঝখানে সেনা শাসন মধ্যস্থতার ভূমিকায় উপনীত হয়। দুই নেতার একজনও পাকিস্তানের অখন্ডতা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। শাসকরা এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রধান কারণ ছিল দেশ পরিচালনার জন্য একটি সংবিধানের অনুপস্থিতি। সামরিক জেনারেলদের দ্বারা আগের দুই সংবিধান (১৯৫৬ ও ১৯৬২) বাতিল করা হয়েছিল। পাকিস্তান পুনরায় সামরিক শাসনের আওতায় ছিল এবং নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে, একটা নতুন সংবিধান প্রণয়নের দরকার ছিল। আওয়ামী লীগ বলে এটাকে সংসদের ভিতরে করতে হবে। আর পিপিপি বলে এটাকে সংসদের বাইরে, পিপিপি এবং আওয়ামী লীগের সমঝোতার ভিত্তিতে করতে হবে। প্রেসিডেন্ট এবং তার আর্মি জেনারেলরা এ ব্যাপারে ভুট্টোর পক্ষে ছিল।

নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের তিন সপ্তাহ পর, সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ভুট্টো প্রেসিডেন্টের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন: ১. প্রেসিডেন্ট, আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি একসাথে বসে সংবিধান প্রণয়ন করবে; অথবা, ২. পিপিপি ও আওয়ামী লীগ এক সাথে বসে ঐকমত্যে পৌছাবে; অথবা, ৩. দুইদল দুইটি আলাদা সংবিধান প্রণয়ন করবে, যার যার প্রদেশের জন্য। তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, ''পিপিপি'র সহযোগিতা ব্যতীত কেন্দ্রে কোন সরকার চলবে না এবং কোন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে না। তিনি যত নিজের দলের গুরুত্বের উপর জোর দিতে থাকেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিকরা ততই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে থাকেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ ভুট্টোকে ভুট্টোর ভাষায়ই জবাব দিতে সক্ষম ছিলেন। এ ভারতপন্থী নেতা বলে উঠলেন, ''পিপিপি'র সমর্থন ছাড়াই আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আছে এককভাবে সংবিধান প্রণয়নের।'' পাঞ্জাব আর সিন্ধ এখন আর ক্ষমতার কিন্দ্রবিন্দু নয়। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম। পিপিপি ছাড়া অন্যান্য দলের সহযেগিতা চাওয়া হবে। নীতির ব্যাপারে কোন আপোশ হবে না। ছয় দফার আর এগার দফা এখন আর মুজিবের বা তার দলের নয়,'' বলেন তাজউদ্দীন।

www.pathagar.com

৩ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ প্রথম নির্বাচন পরবর্তী মিটিং করে। এমএনএ এবং এমপিরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল যে তারা কোন রকম আপোশ করবে না। তারা জনগণকে উত্তেজিত করতে থাকে যেন তারা আবার আন্দোলনে নেমে পড়ে, যদি ছয় দফা সংবিধানে যুক্ত না হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্ররা পরিস্থিতিকে আরো বিতর্কিত করে তাদের শ্লোগানের মাধ্যমে, ''বাংলা ছাড়'' আর ''জয় হিন্দ''। তাদের দুই ছাত্র নেতা ছিলেন দুলাল চন্দ্র মজুমদার ও পরিমল চন্দ্র গুহ।

নির্বাচন বর্জন করলেও ভাসানী এখন জনসভা ও মিছিল করতে থাকেন। তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ডাক দেন। তার শ্লোগান ছিল, ''বিপ্লব হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ'', ''সংগ্রামে নেমে আসো'', ইত্যাদি। চরমপন্থীরা শক্তিশালী হতে থাকে এবং মুজিবকে সতর্ক করা হয় যে, ছয় দফা ছাড়া সংবিধান হলে, তাকে জবাব দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদুল্লাহ বলেন, ''বিশ্বাসঘাতকদেরকে টুকরা টুকরা করা হবে।''

প্রেসিডেন্ট জাতীয় গণপরিষদ বসার তারিখ ঘোষণা করতে বিলম্ব করলে আওয়ামী লীগ অস্থির হয়ে ওঠে।

নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খানের সরকার যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তা হচ্ছে: ১. ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে যত শীঘ্রই সম্ভব হস্তান্তর করা কি উচিৎ, কোন রকম বিলম্ব আলোচনা ছাড়া? ২. নতুন সংবিধান সম্পর্কে সমঝোতা কি এ্যাসেম্বলির ভেতরে হবে নাকি বাইরে? ৩. জাতীয় গণপরিষদের অধিবেশন ডাকার আগে কি সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে, নাকি তা একই সাথে করা হবে? ৪. দুইদল মিলে কি সংবিধান প্রণয়ন করবে, নাকি দুই দল আলাদা আলাদাভাবে সংবিধানের খসড়া তৈরি করবে এবং সরকার এগুলো একত্রিত করে সমঝোতায় পৌছাবে? ৫. আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির মধ্যে কি ক্ষমতার ভাগাভাগি হবে, নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজের কোয়ালিশন পার্টনার ঠিক করবে? এবং ৬. ১২০ দিনের সময়সীমা কি বাতিল করা হবে?

কিছু ব্যক্তির নিজ ইচ্ছায় সংবিধান বারবার লঙ্ঘিত হবার ফলে এ সব সমস্যার উদ্ভব হয়।

www.pathagar.com

তাই ডিসেম্বর ১৯৭০ নির্বাচন কোন আইনগত কর্তৃত্ব ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়। জনগণের দ্বারা নব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দারা নতুন সংবিধান প্রণীত হবার কথা। কিন্তু বাঙালিদের আধিপত্য মেনে নেয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা রাজি ছিল না, যেখানে সংবিধান ছয় দফার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হবে এবং পাকিস্তান একটি ফেডারেশনের পরিবর্তে দুই বা ততোধিক রাজ্যের সমন্বয়ে একটি কনফেডারেশনে পরিণত হবে।

আরেকটি ব্যাপার ছিল, দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা ছিল সমঝোতা বিরোধী এবং আগ্রাসী। তিনি পরাজয় না মেনে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন, অন্তত পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, যা গণতন্ত্রের রীতি, তিনি জাতীয় গণপরিষদের অধিবেশন ডাকার ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে থাকেন। জাতীয় গণপরিষদের অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করার জন্য তিনি পাঁচ সপ্তাহ সময় নেন।

নির্বাচন পরবর্তী আলোচনা

সরকার এবং প্রধান দুই দুই দলের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১৩ জানুয়ারি ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে। এই আলোচনায় বসে আওয়ামী লীগ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ। আওয়ামী লীগের পক্ষে এতে অংশ নেন শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, কামারুজ্জামানসহ আরও দুউজন। প্রেসিডেন্টকে আলোচনায় সাহায্য করেন ভাইস এডমিরাল এস এম এহসান, লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং লে. জে. এস জি এম পীরজাদা।

জেনারেল ইয়াহিয়া স্বীকার করেন আওয়ামী লীগ এককভাবে দেশ পরিচালনার ক্ষমতা রাখে। তবে তিনি বলেন, সরকারে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকার দরকার ছিল। তিনি মুজিবকে বলেন, "৩০০ আসনের মধ্যে আপনাদের আছে মোট ১৬২ আসন, তাই আপনারা এককভাবে সরকার গঠন করতে পারেন, কিন্তু আমি আশা করবো আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকেও মন্ত্রীসভায় রাখবেন, যাতে এটি সত্যিকার অর্থে জাতীয় সরকার হয়।" তিনি নির্দিষ্ট কোন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাকে ইঙ্গিত করেন নি। পীরজাদা বলেন যে, ইয়াহিয়া খানের কথায় মুজিবকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলেও তিনি মন্ত্রীসভায় পাকিস্তানের দুই অংশ থেকে লোক নিতে রাজী হন।

www.pathagar.com

বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিকরাও একমত ছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নে আওয়ামী লীগের সামর্থ্য ছিল। এসব রাজনৈতিক নেতার মধ্যে ছিলেন সরদার শওকত হায়াত খান, মাওলানা শাহ্ আহমেদ নূরানী (জেইউপি), এয়ার মার্শাল আসগর খান (টিআইপি), জি এম সাঈদ (জিয়ে সিন্ধ) এবং আকবর বুগতি। ভুট্টো স্বীকার করেন যে আইনগতভাবে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কিন্তু তিনি বলেন, "ঐকমত্য ছাড়া এটি একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া হবে।"

মুজিব বলেন যে, গণপরিষদের অধিবেশন যত শীঘ্র সম্ভব ডাকা উচিৎ। ইয়াহিয়া একমত হন, কিন্তু বলেন যে যেহেতু বিদেশ থেকে কিছু ভিজিটর দেশে আসার কথা এবং যেহেতু ঈদুল ফিতর ঘনিয়ে এসেছে, সেহেতু তিনি কয়েকদিন পর তারিখ জানাবেন। তিনি বলেন যে, মতানৈক্য দূর করার জন্য এ সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনায় বসা উচিত।

মুজিব পাকিস্তানী রাজনীতিকদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হন, এমন কি ভুট্টোর সাথেও, কিন্তু মুজিব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য তাদের কারও সমর্থন দরকার ছিল না। তারা এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে। তার মতে ছয় দফা ভাল ছিল। তিনি এটা বলেন যে, ছয় দফা বাইবেল নয়, আলোচনার ভিত্তিতে এতে কিছু পরিবর্তন আনা যাবে। "কিন্তু" তিনি বলেন, "একটা জিনিস স্পষ্ট হওয়া দরকার। ছয় দফা সমন্ধে নেতিবাচক মনোভাব থাকা উচিৎ নয়।"

নির্বাচনের পর ভুট্টোর সাথে তার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেন মুজিব। তিনি বলেন, "আমি শুনেছি যে ভুট্টো ভাবেন আমি যেমন পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়, তিনি একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে তেমনি জনপ্রিয়। এটা ঠিক নয়। পূর্ব পাকিস্তানে আমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বি নেই। আমি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি। পশ্চিম পাকিস্তানের আরো অনেক আসন আছে, যারা ভবিষ্যৎ মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।" এটাই ভুট্টোর ভয় ছিল। তিনি বিরোধী দলের আসনে বসতে চান নি। তিনি আওয়ামী লীগ নেতাদের বুঝাতে চেয়েছেন যে সেনাবাহিনী তাকে সমর্থন করে। তিনি আওয়ামী লীগের ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামকে বলেন, "ভুলবেন না, আমি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছি।"

পীরজাদা বলেন, আওয়ামী লীগ ও সরকার ৬ দফা নিয়ে আলোচনা করে। সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করে যে ছয় দফার ৩, ৪ ও ৫ দফা আর্থিক বিষয়ক ছিল

www.pathagar.com

বিধায় এ দফাগুলো অর্থনৈতিক উপদেষ্টার কাছে পর্যবেক্ষণের জন্য দেয়া যেতে পারে।

সরকারের গঠন সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পক্ষে ছিল, কারণ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদে অনেক বিলম্ব হয় এবং তা ব্যয় বহুল। দ্বিকক্ষের সংসদ পছন্দ না করার আসল কারণ ছিল বাঙালিরা ভয় পেতো যে, এটা হলে তারা কোন রকম আপোসে আসতে বাধ্য হবে।

প্রেসিডেন্ট সভা শেষে বোঝালেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে জুলুম জবরদস্তি করা চলবে না। অন্যদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

তারপর আলোচনা চলে লারকানায়। এটা ইসলামাবাদে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হলো লারকানায়। ভুট্টো ইয়াহিয়াকে তার পৈতৃক বাড়িতে দাওয়াত দিলেন এবং ঢাকা থেকে ফেরত এসে ইয়াহিয়া সেখানে গেলেন।

ভুট্টোর পৈতৃক বাড়ি শাহনেওয়াজ হাউজের বিস্তির্ণ বাগানে বসে ইয়াহিয়া তার সাথে মতবিনিময় করলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো বেশ চাঙ্গা ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৭ আসনের মধ্যে তিনি ৮৭টি আসনে বিজয়ী। তিনি তখন বিরাট নেতা। অন্তত তার কাছে তাই-ই মনে হচ্ছিল। ইয়াহিয়া যেন মুজিবের সব দাবি মেনে না নেন, সেটুকু চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। একাজে তাকে সহায়তা করেন স্বঘোষিত লায়ন অব পাঞ্জাব গোলাম মোস্তফা খের, আর তার গুণী কাজিন মমতাজ আলী ভুট্টো। লারকানায় ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান এবং জেনারেল পীরজাদা।

পীরজাদার মতে, ‘‘এ বৈঠকটি মুজিবের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকের তুলনায় ততোটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। এটি বেশ বৈরী ছিল।" অনেকে লিখেছেন যে পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী ষড়যন্ত্র এই লারকানার বৈঠকে জন্ম নেয়, কিন্তু তিনি এসব গুজব প্রত্যাখ্যান করেন।

সকালের বৈঠকে কুশল বিনিময় এবং অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ে সীমাবদ্ধ ছিল (এত সকালে মদ্য পান করে নিজে ছেড়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতি হয় নাই)। লারকানার দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাড়ির ভিতরে, সন্ধ্যার সময়ে। বৈঠক শুরু করেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল এবং তিনি ভুট্টোকে অভিনন্দন জানান। ভুট্টো তারপর কথা বলবার অনুমতি চাইলেন। ভুট্টো

www.pathagar.com

গুছিয়ে কথা বলার ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। তিনি ছিলেন জমিদার বংশের। তার ইংরেজি ভাষা ছিল নির্ভুল এবং সংবিধান সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি পাকিস্তানের ইতিহাস দিয়ে শুরু করে নির্বাচন প্রসঙ্গে আসেন। এ অসম ফলাফল কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে, তা তিনি বর্ণনা করতে থাকেন। তিনি কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাবনা তুলে ধরেন:

১. মুজিব এককভাবে, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু ছোট ছোট দলের সঙ্গে শাসন চালিয়ে যাবেন;

২. মুজিব তার (ভুট্টোর) সাথে হাত মিলিয়ে দুইজন যৌথভাবে সরকার গঠন করবেন; এবং

৩. মুজিব এবং ভুট্টো সেনাবাহিনীর সহায়তায় দেশ শাসন করবেন।

জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। তিনি বললেন, ''আমি এসবের মধ্যে নাই। আমি আশা করি যে এখন থেকে তোমরা এ ভার গ্রহণ করবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যতীত সেনাবাহিনীর আর কোন ভূমিকা থাকবে না।" তবে তিনি এটাও বলেন, ''আমি তো এখনও প্রেসিডেন্ট। কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আমি তো আছি।"

জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন সরাসরি একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যা সকাল থেকে তিনি আভাস দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, ''প্লিজ, মুজিবকে বলবেন যে ভুট্টোর হাতেই পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব তাই দেশের স্বার্থে ভুট্টোকে সরকারে নেওয়া হলে, তা সবার জন্য মঙ্গল। বলবেন, তিনি রাজি না হলে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ হবে।" পীরজাদা বলেন যে এ কথা শুনে ইয়াহিয়া অবাক হলেন। ইয়াহিয়া বলেন, ''জুলফি, জুলফি ভেবে চিন্তে কথা বলো। সেনাবাহিনী কাউকে হুমকি দেবে না, বা কারো জন্য তদবিরও করবে না। মুজিবের সাথে আলাপ করা তোমার দায়িত্ব এবং সে যাকে ইচ্ছা তাকে নিবে।" ভুট্টো এবার দ্রুত বললেন, '' না না, আমি সে অর্থে কথাটি বলিনি।" তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, ''পাকিস্তানে একটা কোয়ালিশন সরকার হলে, ভাল হতো না?" ইয়াহিয়া কোন মন্তব্য করেন নাই। পীরজাদা ভুট্টোকে বোঝালেন ভুট্টোর অবস্থান আর মুজিবের অবস্থান এক ছিল না। তিনি বললেন, ''পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আপনি মাত্র স্বাভাবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন।" ভুট্টো বললেন, ''তা হতে পারে। কিন্তু আমরা আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলছি, জেনারেল।"

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট যখন বুঝলেন যে তার পিএসও এবং ভুট্টোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তিনি ভুট্টোকে বললেন, "আমি তোমাকে বলবো মুজিবের সাথে দেখা করো। আমি মুজিবকেও বলবো ৬ দফায় উপনীত হওয়ার আগে সে যেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলাপ করে, যার মধ্যে তুমি অন্যতম। সে তোমাকে বাদ দিতে পারবে না।" তিনি বলেন যে মুজিব ভুট্টোর সাথে আলাপ করতে রাজি হয়েছে এবং বড় দুই দলের মধ্যে সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। তবে প্রায় সবই নির্ভর করছিল আওয়ামী লীগের ইচ্ছার উপর।

বৈঠক শেষে ইয়াহিয়া বললেন, "ভুট্টো, তোমাকে মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে, অথবা তোমাকে বিরোধী আসনে বসতে হবে। বিরোধী দল বেশ শক্তিশালী হবে বৈকি।" পীরজাদার কানে কানে ভুট্টো বললেন, "আপনারা কি আমাকে বন্দরনায়েক ভাবছেন?" (অর্থাৎ তিনি বিরোধী দলের ভূমিকায় উপনীত হতে নারাজ)। অনেকেই বলেন যে লারকানার বৈঠকে ভুট্টোর কাছে ইয়াহিয়া নত হয়েছিলেন, কিন্তু আসলে এ বৈঠকের মূল পয়েন্টগুলো ছিল মুজিবের কাছে ভুট্টোর যাওয়া উচিৎ। যেন তারা কোন একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেন এবং সেনাবাহিনী এর মধ্যে নাক গলাবে না। দুর্ভাগ্যবশত, বৈঠকে উপস্থিত গোলাম মোস্তফা খের এবং মমতাজ আলী ভুট্টো, দুইজনের একজনও ফাঁস করেননি বৈঠকে কি কথপোকথন হয়েছিল।

২৭ জানুয়ারি ভুট্টো ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের আরো অনেকের সঙ্গে ৬ দফা নিয়ে আলাপ করেন। কারণ, এটাই ছিল সব চেয়ে বড় বাঁধা। প্রথম দফা নিয়ে তাদের কোন দ্বিমত ছিল না- সরকার ফেডারেল এবং সংসদীয় হবে। ভুট্টো মুজিবের সাথে একমত হন যে কেন্দ্রের হাতে ন্যূনতম এক্সক্লুসিভ বিষয় থাকবে। তবে যেহেতু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্র বিষয় পরস্পরের সাথে জড়িত, ভুট্টো বলেন বৈদেশিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় বিষয় থাকো উচিৎ। তৃতীয় দফাটি ছিল আলাদা কারেন্সি বা মুদ্রা বিষয়ক। মুজিব এটার ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন, যদি পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির প্রবাহ বন্ধ হয়। চতুর্থ , পঞ্চম ও ষষ্ঠ দফা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না– অর্থনীতি, আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল এবং পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া। জানুয়ারির মধ্যেই তিনি তিনি মুজিবকে ৬ দফার মধ্যে সাড়ে ৫ দফার ব্যাপারে রাজি হলেন।

যে বিষয়টি ভুট্টোর কাছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, তা হলো পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ঋণের প্রধান অংশের ভার

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান বহন করবে। (বৈদেশিক ঋণ ছিল ৪০ বিলিয়ন রুপি এবং মুজিব দাবি করেন এর মধ্যে ৩৮ বিলিয়ন রুপি পরিশোধ করার ভার পশ্চিম পাকিস্তান বহন করবে।)

একই দিন আওয়ামী লীগ একটি খসড়া সংবিধান তৈরি করে। এতে বলা হয়–

১. পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রাখা হবে;

২. পার্লামেন্টের অধিবেশনের জন্য দুইটি স্থান থাকবে, শীতকালে ঢাকায় এবং গ্রীষ্মকালে ইসলামাবাদে;

৩. বিমানবাহিনী অথবা নৌবাহিনীর সদর দফতর বাংলাদেশে স্থানান্তর করতে হবে;

৪. পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা এবং মুদ্রা হবে কেন্দ্রীয় বিষয়;

৫. দুইটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকেবে;

৬. বৈদেশিক ঋণ দুই প্রদেশের আনুপাতিক ব্যবহার মাফিক পরিশোধযোগ্য;

৭. কেন্দ্রের কর আরোপের কোন ক্ষমতা থাকবে না, তবে তারা প্রদেশে কর আদায় করতে পারবে এই হারে– বাংলাদেশ ২৭%; পাঞ্জাব ৩৭%, সিন্ধ ২১% এবং এনডব্লিউএফপি ৭%।

মুজিবের সাথে আলোচনাকালে ভুট্টো ছয়দফা ছাড়াও ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে এবং মন্ত্রীসভায় পিপিপি'র অংশগ্রহণের ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন। তিনি নিজে হতে চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট, অথবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ভুট্টোর এ দাবি মেনে নেয়া হলে তিনি সম্ভবত পুরো ছয় দফার ব্যাপারেই রাজি হতেন। সবকিছু মুজিবের পক্ষে ছিল। তার এ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আশ্বস্থ করার কোন ইচ্ছা ছিলনা। ভুট্টো ফিরে এলন, তার আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশন বিলম্বিত

প্রাথমিকভাবে পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশন মুজিব অথবা ভুট্টোর কাছে মূখ্য বিষয় ছিল না। যদিও মুজিব একবার ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ তারিখটি উল্লেখ করেছিলেন। ভুট্টো অন্যদিকে অধিবেশনের উদ্বোধন চেয়েছিলেন ২৩ মার্চ তারিখে।

www.pathagar.com

২৩ মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল। তিনি অবশ্য তারিখ নিয়ে তেমন জোরাজুরি করেন নি। শুধুমাত্র বলেছিলেন, ''২৩ মার্চে হলে ভাল হয়, স্যার।''

এ্যাসেম্বলির বাইরে রাজনৈতিক নেতারা প্রস্তাবিত সংবিধান নিয়ে আলাপ করার জন্য আরো কিছু সময় দিতে চেয়েছিলেন ইয়াহিয়া। তাই তিনি উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করেন ৩ মার্চ। যেহেতু লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে নির্দিষ্ট কোন তারিখ উল্লেখ ছিলনা এবং যেহেতু তিনি দুই প্রধান নেতার মত বিবেচনায় এনেছিলেন, তাই তিনি নিশ্চিৎ ছিলেন যে ৩ মার্চ তারিখটি দুইজনের কাছে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। তাই ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ সকাল ৯টার জন্য ঘোষণা করেন। স্থান স্থির করা হয় ঢাকার প্রভিন্সিয়াল এ্যাসেম্বলি ভবনে।

এ তারিখটি ছিল নির্বাচনী ফল ঘোষণার ৪০ দিন পর, তাই পূর্ব পাকিস্তানীরা সন্দেহ পোষণ করতে থাকে। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর ১৯৭০ রাষ্ট্রপতি আগেই বলেছিলেন যে নির্বাচন এবং উদ্বোধনী অধিবেশন এর মধ্যে সময়টা যেন রাজনৈতিক নেতারা আলাপ আলোচনা করে একটা ঐকমত্যে পৌছানোর জন্য ব্যবহার করেন । তিনি শেখ মুজিবকে প্রথমে ১৯৭১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং পুনরায় আমন্ত্রণ জানান ১৭ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু মুজিব তাতে রাজি হননি।

এদিকে ভুট্টো ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগের পরিকল্পনা করেন, যাতে তারা তার প্রস্তাব মেনে নেয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো পেশোয়ারে ছিলেন। জিন্না স্টেডিয়ামে তার ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। সেদিন রাতে তিনি পীরজাদাকে ফোন করলেন। সিএমএলএ-র আইন উপদেষ্টা কর্ণেল হাসান ফোন ধরেন। তিনি ফোনটি পিএসও'র হাতে দিলেন। তিনি ভুট্টোর ক্ষুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। ''আমরা নির্বাচিত নেতা। তারিখ ঘোষণার আগে আমাদের সাথে অন্তত যোগাযোগ করা উচিৎ ছিল।'' পীরজাদা নিজেই বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং রাজনীতিকরা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন, তিনি তাদের ভয় পেতেন না মোটেও। তিনি বললেন, ''আপনাদের সাথে পরামর্শ করে তারিখ দেয়ার ব্যাপারে আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে যেহেতু আপনি ব্যাপারটা এমন সিরিয়াসলি নিয়েছেন, আমি এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলবো।'' কিন্তু তিনি ফোন ছেড়ে দেয়ার আগে ভুট্টোর ক্ষুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন- '' দেখবেন কি হয়, আমি যখন যাবো না, আমার দলও যাবে না। আমি দেখবো, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কে যায়।''

www.pathagar.com

১১ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছিলেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় যে, ৩ মার্চ ঢাকায় পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এতে বোঝা যায় যে, সে সময়ে পিপিপি নেতা এ নিয়ে কোন আপত্তি জানান নি। কিন্তু এর চারদিন পর ভুট্টো ঘুরে দাঁড়ান এবং সিদ্ধান্ত নেন তিনি এ অধিবেশনে যোগ দেবেন না।

ভুট্টোর সাথে তার কথপোকথনের বিবরণ ইয়াহিয়াকে জানালেন পীরজাদা এবং ইয়াহিয়া খুব ধীর স্থিরভাবে বললেন, "তারিখ নিয়ে সে এতো উত্তেজিত কেন" পীরজাদা বলেন, "আমরা তো দুইনেতার মতামতের ভিত্তিতে একটি তারিখ স্থির করলাম।" ইয়াহিয়া তার পিএসও-কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, ঠিক বলেছো। হারামজাদা শুধু শুধু সংকট সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।" কিন্তু পীরজাদা বলেন যে যখন ইয়াহিয়া জানতে পারেন যে ভুট্টো ৩ মার্চের উদ্বোধনী অধিবেশনে আসতে নারাজ, তখন তিনি ভুট্টোর এ অসহযোগিতায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন।

ভুট্টো পেশোয়ারে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "পিপিপি ঢাকার পার্লামেন্ট অধিবেশনে যোগ দেবে না।" তিনি ব্যাখ্যা দেন- "আমরা সেখানে গেলে শুধু অপমানিত হয়ে ফিরে আসবো। কারণ, সংবিধান আগের থেকেই একটি দল তৈরি করে রেখেছে।"

নির্বাচনী প্রচারণার সময় ভুট্টো ছয় দফাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে একজন প্রার্থীও দেন নাই। আর একবছর ধরে নির্বাচনী প্রচারণাকালে তার কোন নেতাও পূর্ব পাকিস্তানে আসেনি। তিনি ভাল করেই জানতেন যে ছয় দফা ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার মূল স্তম্ভ। তার তখনও অধিকার ছিল জাতীয় গণপরিষদে প্রস্তাবিত সংবিধানের সাথে দ্বিমত পোষণ করা। দরকার হলে তিনি ওয়াকআউটও করতে পারতেন। আর রাষ্ট্রপতির অধিকার ছিল সংবিধান অনুমোদন করা, যদি তিনি তা সমীচীন মনে করেন।

ভুট্টো অবস্থার আরো অবনতি ঘটালেন। তিনি করাচিতে ঘোষণা করলেন যে তার দলের কোন সদস্য যদি অধিবেশনে যোগ দেয়, তিনি তাদের পা ভেঙ্গে ফেলবেন এবং তার অনুমতি ছাড়া যারা যাবেন, তাদেরকে ফিরে আসতে দেয়া হবে না। তিনি "করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত বিপ্লবের" হুমকি দেন। তিনি আওয়ামী লীগকেও বিক্ষুব্ধ করেন, যখন বলেন, " যারা ঢাকায় যাবেন, খাকি বা কালো কাপড় পড়ে তারা নিজ ঝুঁকি নিয়ে যাবেন।" তিনি বলেন যে এ্যাসেম্বলি 'কসাইখানায়' পরিণত হবে। এধরনের বক্তব্য অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতার জন্য শোভনীয় ছিলনা।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া যখন মাতাল ছিলেন না, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে ভুট্টো উদ্বোধনী অধিবেশনে না গেলে তার ফল শুভ হবে না। তিনি এও জানেন ভুট্টোর ক্ষমতা ছিল জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে অশান্ত করা। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মুজিবের সাথে কথা বলবেন এবং তাকে নতুন তারিখের ব্যাপারে রাজি করাবেন। তিনি তার পিএসওকে বলেন,"পীরু, শেখকে বলো আমার সাথে দেখা করার জন্য।" পীরজাদা রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শেখ মুজিবকে ফোন করেন। মুজিব জানতে চাইলো, "কী হচ্ছে?" জেনারেল পীরজাদা তাকে তখনই রাওয়ালপিন্ডিতে আসার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি বলেন, "প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে উদ্বোধনী অধিবেশন নিয়ে কথা বলতে চান।" মুজিব জবাব দিলেন, "এখন আসতে পারবো না। দলের মিটিং আছে। যখন তাকে বলা হয় যে তারিখ পরিবর্তন হতে পারে, আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, "আমি তারিখ পরিবর্তনের ব্যাপারে রাজি নই। আমি এখন আসতে পারব না, পরে আসব।"

যখন ইয়াহিয়াকে মুজিবের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়, তিনি বলেন, মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে আনার জন্য আবার চেষ্টা করুন। তিনি এহসানের কাছে খবর খবর দিলেন, "মুজিব এবং অন্যদের অনুরোধ করো তারা যেন রাওয়ালপিন্ডিতে আসে। এবং ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী অধিবেশনের নতুন তারিখ নিয়ে আলোচনায় বসে।" এহসান মুজিবের সাথে দেখা করেন এবং রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার অনুরোধ জানান। কিন্তু মুজিব ভুট্টোর চেয়েও দৃঢ় আবস্থান গ্রহণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মতই তিনিও চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন। তিনি আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন। যদিও আওয়ামী লীগ এ নম্রভদ্র এডমিরালকে পছন্দ করতো, তারা ভুট্টোর পেশী শক্তির কাছে নত হতে রাজি ছিল না। তাদের যক্তি ছিল, যতি পিপিপি- এর প্রধান পূর্ব পাকিস্তানে আসতে রাজি না হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের প্রধানও পশ্চিম পাকিস্তানে যাবেন না। তার জবাবটা সেদিনই পাঠানো হয়। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে খবর পাঠানো হয়, "মুজিব বলেছেন তিনি এখন আসতে পারবেন না; তিনি পরে আসবেন।"

ইয়াহিয়া দুই নেতার উপর ক্ষেপে যান। আবারো চেষ্টা করা হয় মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডি আনার জন্য। এবার একজন উচ্চ পদস্থ বাঙালি সেনা কর্মকর্তা চেষ্টা করেন। ব্রিগেডিয়ার ইসকান্দার উল করিম (বাচ্চু) এবং তিনজন বাঙালি মন্ত্রীকে ঢাকায় পাঠানো হয়। কিন্তু তারাও মুজিবের মত পাল্টাতে ব্যর্থ হয়। তারা বাঙালি হলেও মুজিব এ তিনমন্ত্রীকে কোন গুরুত্ব দেন নাই।

www.pathagar.com

জেনারেল ফরমান ততোদিনে ঢাকার গভর্নমেন্ট হাউসে অনেক অভিজ্ঞ ছিলেন, মুজিব ও অন্যান্য পূর্ব পাকিস্তানী নেতার সঙ্গে তার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনিও মুজিবকে রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ যেতে রাজি করাতে পারেননি। ফরমানের জোরাজুরিতে মুজিব অবশেষে ১৯ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু ১৮ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো যখন আবার ঘোষণা করলেন যে তিনি ঢাকায় যাবেন না , তখন মুজিবও আবার বেঁকে বসেন।

এ পরিস্থিতি নিয়ে ইয়াহিয়া ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন নির্বাচনের পর সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে, কিন্তু এখন তিনি পদে পদে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পীরজাদা বলেন, "তিনি খুব ব্যথিত হলেন।" ফরমানকে নির্দেশ দেয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে এসে সিএমএল-কে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সম্ভব হলে মুজিবকে সাথে আনা।

১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সিভিলিয়ান মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেন। এমনিতে এটি কোন কার্যকরী মন্ত্রীপরিষদ ছিল না। কারণ, সব সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতির দ্বরা গৃহিত হতো। তার উপদেষ্টারা ছিল পিএসও- এর নেতৃত্বে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা।

এরমধ্যে ভুট্টো ভাবলো হয়তো বা তাকে বাইরে রেখে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং রাজি এতে রাজি হলেন, ১৯ ফেব্রুয়ারি তারা বৈঠক করলেন। ততোদিনে মুজিবের আসল মতলব নিয়ে ইয়াহিয়ার সন্দেহ হল। তাই ভুট্টোর পক্ষে বেশ সহজ ছিল মুজিবকে খলনায়কের ভূমিকায় উপস্থাপন করা। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া যদি মুজিবের দাবি দাওয়া মেনে নেন, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানকে শোষণ করা হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ থাকবে না। মুজিব একজন স্বৈরাচারে পরিণত হবেন এবং তিনি শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ দেখবেন।

তিনি ইয়াহিয়াকে বোঝালেন যে, পার্লামেন্টের বাইরে সংবিধানের সমস্যার সমাধান করতে হবে। তিনি এও বোঝলেন যে, যদি পিপিপি পার্লামেন্ট থেকে ওয়াকআউট করে, তাহলে আরো বড় ধরনের সংকটের সৃষ্টি হবে। তিনি আভাস দেন পশ্চিম পাকিস্তানে সংকট সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সক্ষম।

আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর ভেতরে মেরুকরণ ছিল। যারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী হওয়া স্বত্তেও তারা

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন। কারণ, আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল। তারা সচেতন ছিল এটা করা না হলে বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন হতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে কর্তৃপক্ষ কিন্তু শেখ মুজিবর রহমানের মতলব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, যদি মুজিব ক্ষমতায় বসে যান, তাহলে তিনি পাকিস্তানের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে অবস্থান নিবে। তারা এটাও আশঙ্কা করে যে সব অর্থ সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবহেলিত হবে।

ইয়াহিয়া সচেতন ছিলেন যে, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, শিল্পপতি এবং সামন্তবাদীরা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানী ছিল। বাঙালি সংসদ সদস্যদের কাছে তারা মাথা নত করবে না। প্রয়োজন ছিল একটি কোয়ালিশন সরকার, অথবা একটি শক্তিশালী বিরোধীদল। যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের উগ্রপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। ভুট্টো এরকম বিরোধীদল গঠন করতে সক্ষম। কিন্তু তখনও ইয়াহিয়া অনড় ছিলেন এবং ভুট্টোকে আভাস দেননি যে তিনি পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশনের তারিখ পাল্টাতে পারেন। তাই ১৯ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো সংবাদপত্রকে বলেন নির্দিষ্ট তারিখে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধন হবে। কিন্তু পিপিপি তাতে যোগ দেবে না।

সরকার এবং শেখকে বিচলিত করার জন্য ভুট্টো ২০ ফেব্রুয়ারি করাচিতে একটি কনভেনশন আহবান করেন। এ কনভেনশনে পিপিপি'র ৬০০ সদস্য অংশগ্রহণ করেন, যারা আসন্ন জাতীয় ও প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলিতে যাবেন। কনভেনশনে এই প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগের ৬ দফা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভুট্টোর মূল উদ্বেগ ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পূর্ব পাকিস্তান খবরদারি করবে।

দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার ব্যাপারে সদস্যরা শপথ নিলেন। কনভেনশনে ভুট্টো বলেন, "সরকারকে হয় এ্যাসেম্বলি বিলম্ব করতে হবে, অথবা ১২০ দিনের সময়সীমাকে বাতিল করতে হবে।" তিনি অভিযোগ করেন যে, এডমিরাল এহসান আওয়ামী লীগের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন।

ভুট্টো ইয়াহিয়ার মনের মধ্যে ঢোকাতে সক্ষম হলেন যে এহসান এবং তার স্টাফ দুর্বল ছিল এবং তারা মুজিবের পক্ষে ছিল। ভুট্টোর মত একজন আরো শক্তিশালী ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। যে পূর্ব পাকিস্তানে আরোর সুদৃঢ় সামরিক আইন জারি

www.pathagar.com

করতে পারবে। তাই ২০ ফেব্রুয়ারিতে যখন ফরমান ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সিএমএলএ-কে অবহিত করার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে আসেন, ইয়াহিয়া তাকে ধমক দিয়ে বলেন, "তোমরা সবাই অক্ষম! মুজিব কেন আসেনি? তোমরা কি শাসন করছো নাকি মুজিবের আদেশ পালন করছো?" তিনি বাস্তবতা থেকে কত দূরে ছিলেন! সবাই মিলে মুজিবকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনা সম্ভব ছিল। তার সাথে ছিল ছয় কোটি বাঙালি এবং তার হাতে জিম্মি ছিল ৯৩ হাজার 'শালা পাঞ্জাবি'। মুজিব হয়তো রাজি হতেন কিন্তু তার সাথীরা ছিল চরমপন্থী। তারা তাকে ইসলামাবাদে না যাওয়ার জন্য রাজি করান।

পরবর্তী করণীয় নিয়ে ইয়াহিয়া তার সহকারিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ভবনে গভর্নরগণ এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চিফ অব জেনারেলর স্টাফ মেজর জেনারেল গুল হাসান খান; আইএসআই'র ডিজি মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর; ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মে. জে. গোলাম ওমর; ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক নাসির রিজভী; পুলিশের আইজি আগা এবং প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) লে. জে. এস জি এম এম পীরজাদা। ঢাকা থেকে এসে সভায় যোগ দেন গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম এহসান; কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং ডেপুটি মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর (সিভিল এ্যাফেয়ার্স) মে. জে. রাও ফরমান আলী খান। সভা শুরু হল যথাযথ এক রাউন্ড মদ দিয়ে। তারপর চলে আলাপ আলোচনা। এ আলোচনার চলার ফলে উপমহাদেশের মানচিত্র আবার বদলে যায়। প্রেসিডেন্ট হাউসের ড্রইং রুমে সেদিন পাকিস্তানের ভেতর থেকে একটি নতুন স্বাধীন দেশের ভীত স্থাপিত হয়।

সভার শুরুতে জিএইচকিউ এবং আইএসআই দেশের পরিস্থিতি, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি, সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মনোভাব মুজিবের বিরুদ্ধে যেতে থাকে কারণ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে রাজি হলেন না। তাদের মতে, মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। যাতে সে তার দলের চরমপন্থীদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনে। জেনারেল জবাব দিলেন, "এখানেও যথেষ্ট কোলাহল রয়েছে। ভুট্টোর উপরেও চাপ প্রয়োগ করা উচিৎ।" জেনারেল আকবর কিন্তু মুজিবের সাথে যেমন ব্যবহার করতে চেয়েছেন, সেরকম ভুট্টোর সাথে করতে চাননি। তিনি মুজিবকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন। আইএসআই এর ডিজি বলেন, "ভুট্টোর সাথে দুর্ব্যবহার করা হলে, জনগণ এবং

www.pathagar.com

আর্মির জুনিয়র অফিসাররা তীব্র প্রতিক্রিয়া করবে।" পীরজাদা কড়া সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন, তা পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে, যেখানেই হোক।

জেনারেল ইয়াহিয়া তারপর বর্ণনা করলেন উনি কি সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন এবং যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরস্পরের সাথে সহযোগিতা না করে,তাহলে কি সংকটের সৃষ্টি হবে। তিনি অনেক দুঃখের সঙ্গে তাদের জানালেন যে, যদি আওয়ামী লীগ ও পিপিপি- এর দ্বন্দ্ব সমাধান না হয়, তাহলে তিনি পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশন বিলম্ব করবেন। জেনারেল ফরমান দাবি করেন যে, তিনি ইয়াহিয়াকে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির অধিবেশন স্থগিত করতে নিষেধ করেছিলেন। এডমিরাল এহসান ও জেনারেল ইয়াকুবও অধিবেশন স্থগিতের বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু তাদের কথা শোনা হয়নি।

রাষ্ট্রপতি তারপর আরেকটি কক্ষে চলে যান, এখানে তার সাথে বসেন হামিদ, এহসান, ইয়াকুব এবং পীরজাদা। তিনি তার পরবর্তী পদক্ষেপ তাদের জানালেন। "আমি ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি স্থগিত করবো। কারণ, পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছে না। আমি নবকিছু উল্টিয়ে আবার সামরিক শাসন জারি করবো, তবে শুধু পূর্ব পাকিস্তানে। মুজিবের উপর আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রসরের সাথে সাথে আমরা সামরিক আইন শিথিল করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে ফেলবো। মুজিবের মাথায় বুদ্ধি ঢোকাতে হবে। এ্যাসেম্বলির অধিবেশন বসবে আওয়ামী লীগের ধ্বংসের পর। আমাদের আবার চলতে হবে, কিন্তু এবার শক্তি প্রয়োগ করে চলতে হবে" বলেন রাষ্ট্রপতি। এই প্রথমবারের মত তিনি সত্যিকারের কমান্ডার ইন চিফ-এর মত কথা বললেন।

সাহেবজাদা ইয়াকুব খুব ভদ্রভাবে কথাগুলো শুনলেন, তারপর তার সুন্দর বচন ভঙ্গিতে বললেন, "এ সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সমন্ধে আমি কোন মন্তব্য করবো না। তবে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে আমি পার্লামেন্ট স্থগিতের সামরিক পরিণতি বলতে পারি। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুকে রাজনৈতিক বিবেচনায় দেখতে হবে।"

তিনি আরো বলেন, "নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর এবং বাঙালিদের মধ্যে আশা জাগানো যে সামরিক শাসন থেকে নব নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে, বাঙালিদের আকাঙ্খা বদলে গেছে। তারা ক্ষমতা প্রয়োগে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছে। সেটা তাদেরকে দেয়া না হলে, তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা জন্ম নেবে। "

www.pathagar.com

সাহেবজাদা ইয়াকুব বলেন, "বেসামরিক সংস্থার মাধ্যমে সামরিক শাসন চালানো হয়। আর সৈন্যের অভাবে, তা আরো বেশি প্রযোজ্য পূর্ব পাকিস্তানে। সিভিল কর্তৃপক্ষ তাদের আনুগত্য বদলিয়ে এখন নতুন সূর্যের উদয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের আশা পূর্ণ না হলে, অবশ্যই সংকট দেখা দিবে।"

সীমান্তের ওপারের প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে জেনারেল সাহেবজাদা বলেন যে, ভারত এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির সুযোগ নেবে। ভারতীয় আগ্রাসন এ পরিস্থিতিতে মারাত্মক হবে। কারণ, এমনিতেই ইস্টার্ন কমান্ড অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিল। তিনি বলেন, "আমরা হয়তো কিছুদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো। কিন্তু দীর্ঘ দিনের জন্য নয়।"

তিনি আরো বলেন, "এভাবে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে কারণ সামরিক আইন আরো তীব্রভাবে জারি হবে, আহত নিহতের সংখ্যা বাড়বে। এর ফলশ্রুতিতে বাড়বে সেনাবাহিনীর প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ। আইন-শৃঙ্খলা জোর করে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব না। আমাদের সফলতাই হবে আমাদের ব্যর্থতা। পূর্ব পাকিস্তানের ছয় কোটি মানুষ একটি দলের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সামরিক শাসনের তলোয়ার উঠালে, তা হবে আত্মহত্যার শামিল।"

তিনি বলেন, "আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা ভুল হবে। এতে আমরা ব্যর্থ হবো এবং পাকিস্তান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিভক্ত হয়ে পড়বে।"

তিনি সুপারিশ করেন যে- ১. রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; ২. রাজনৈতিক নেতাদেরকে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানে, বোঝাতে হবে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি স্থগিতের কি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে; ৩. তাদের ঘারে দোষ চাপাতে হবে, সেনাবাহিনীর উপরে নয়; এবং ৪. এক সাথে বসার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে।"

জেনারেল ইয়াহিয়া এবং অন্যরা একদম চুপ করে শুনলো তার কথা। তারপর ইয়াহিয়া বললেন, "চলুন, এখন ডিনার খেতে বসি। কাল ১০ টায় আবার দেখা হবে।"

ইয়াকুব ও এহসান ইস্ট পাকিস্তান হাউসে ফিরে আসলেন। তাদের দুজনের মধ্যে একজনের ঘুম হল না। ইয়াকুব বললেন যে, তার চোখে পানি ছিল এবং তিনি বারবার স্মরণ করছিলেন সে রাতে তিনি ইয়াহিয়াকে কি কি বলেছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

গভীর রাতে উঠে যতটা সম্ভব সব কথাগুলো লিখে রাখলেন। তিনি এ লেখাটি প্রথমে এহসানকে দেখালেন, এহসান প্রত্যেকটি কথার সাথে একমত প্রকাশ করলে কাগজটা পীরজাদার কাছে পাঠালেন।

ইয়াহিয়া ইয়াকুব ও এহসানকে অনুরোধ করলেন যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত যাবার আগে যেন ভুট্টোর সাথে দেখা করে তাকে শান্ত করেন এবং সে যেন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেয়। এহসান, ইয়াকুব এবং পীরজাদা করাচিতে গিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি ভুট্টোর সাথে দেখা করেন- এডমিরাল মুজাফফরের বাসায়। এডমিরাল মুজাফফর তখন পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন। ইয়াকুব ভুট্টোকে বলেন, "আপনার ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী অধিবেশন বর্জন করার কোন কারণই আমরা দেখি না। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আপনাকে অনুরোধ করার জন্য আপনি যেন অধিবেশনে যোগ দেন।" ভুট্টো ছিলেন উদ্ধত ও অহংকারী। তিনি জবাব দিলেন, "আমাকে না বলে আপনারা মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে আসতে বলেছেন। " ইয়াকুব তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করে বলেন, "আমরা তার সাথেও কথা বলব।" ভুট্টো একটু শান্ত হয়ে বললেন, "আমি কথা দিতে পারছি না, আমি আমার দলের সাথে কথা বলব। তাদের উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।" সবাই মৃদু হাসলো কারণ সে কি বলতে চাচ্ছিল, তা স্পষ্ট ছিল।

ভুট্টো বললেন, "আমি আব্দুল হাফিজ পীরজাদাকে ফোন করব।" এ বলে তিনি কামরা থেকে বের হয়ে যান। আব্দুল হাফিজ পীরজাদা ছিলেন তার ঘনিষ্ট সহকারি। ভুট্টো কক্ষে ফিরে এসে বললেন, "আমার দল এ সেশনে অংশগ্রহণ না করার ব্যাপারে অনড়।" আর কিছুই বলার ছিলনা। জেনারেল পীরজাদা রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে গিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়াকে এ বৈঠক সম্পর্কে অবহিত করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি এহসান ঢাকায় পৌছেন এবং তিনি সেদিনই মুজিবের কাছে গিয়ে বলেন যে, ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির অধিবেশন বিলম্বিত হবে। মুজিব পরামর্শ করলেন, সিডিউল অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখেই যেন এ্যাসেম্বলি উদ্বোধন হয়, তারপর প্রাথমিক ফরমালিটিজের পর প্রেসিডেন্টের ভাষণের পর মুলতবী ঘোষণা করা যেতে পারে। এরপর পিপিপি'র দাবি অনুযায়ী সাংবিধানিক বিষয়গুলো হাউজের বাইরে আলোচিত হতে পারে। পীরজাদা যখন এ কথাটি ইয়াহিয়াকে জানালেন, ইয়াহিয়া বললেন, "পীরু, মুজিব এহসানকে বোকা বানাচ্ছে। মুজিব তো বার বার

কথা ভঙ্গ করছে।" ইয়াহিয়া তাকে মনে করিয়ে দিল কিভাবে মুজিব আগে বলেছিল যে ছয় দফা নিয়ে আলাপ করলে সেগুলোতে কিছু পরিবর্তন আনা যাবে, কিন্তু এখন সে বলছে যে ব্যাপারটা জনগণের হাতে। রাষ্ট্রপতি বললেন, "মুজিব তিনবার কথা দিয়েছে রাওয়ালপিন্ডি আসার ব্যাপারে, কিন্তু সে কথা রাখেনি।" তার পিএসও'র দিকে তাকিয়ে ইয়াহিয়া বললেন, তুমি এখন চাচ্ছো আমি তার ফাঁদে পা দেই। যতদিনে সংবিধান পাস না হয় সে সংসদ মুলতবী ঘোষণা করবে না। এর থেকে ভাল, বদলে দিয়ে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।" পীরজাদা বলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিলেন, অধিবেশন বিলম্ব ঘোষণার সাথে সাথে যেন নতুন তারিখ দেয়া হয়। এর জবাবে ইয়াহিয়া বললেন, "আমি একবার তারিখ দিলাম, আর ভুট্টো হৈচৈ করলো। এবার দুজনের সাথে কথা বলার পর নতুন তারিখ দিতে হবে।"

পরের দিন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে যাবার পথে প্রেসিডেন্ট করাচিতে থামলেন। সব কিছু প্রস্তুত ছিল। টিকিট কেনা হয়ে গিয়েছিল, সিটও রিজার্ভ ছিল। কিন্তু যাবার আগে রাষ্ট্রপতি তার পিএসওকে দুটি খসড়া ঘোষণা তৈরি করে রাখতে বলেন। একটি খসড়া ছিল তার উদ্বোধনী ভাষণ, যা ৩ মার্চ দেয়ার কথা ছিল ঢাকায় পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অধিবেশনে। আরেকটি ছিল অধিবেশন বিলম্বিত বিষয়ক।

তিনি পীরজাদাকে বলেন, "পীরু, আমরা এখনও স্থির করিনি... আমি অপ্রস্তুত থাকতে চাইনা।" কিন্তু ততক্ষণে স্পষ্ট হল যে ইয়াহিয়া অধিবেশন বিলম্ব করে পরিস্থিতি জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। আসলে ২২ ফেব্রুয়ারি এমএলএ কনফারেন্সে ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে এ্যাসেম্বলি বিলম্বিত হবে। বিলম্ব করার প্রতিক্রিয়া বেশি তীব্র হলে তিনি আর্মি ক্র্যাকডাউন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

করাচিতে ভুট্টোর সাথে দেখা করলেন রাষ্ট্রপতি। পীরজাদা তখনও রাওয়ালপিন্ডিতে ছিলেন। ঢাকায় যাবার সময় তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে নিজের পক্ষে টেনে আনতে ভুট্টোর বেশি সময় লাগেনি।

সামরিক প্রস্তুতি

দুইদলের নেতৃবৃন্দের অনড় অবস্থানের কারণে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিকে স্থগিত করতে হবে। এর তীব্র প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানে আরো সেনা মোতায়েনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হল। তবে ইস্টার্ন কমান্ডের

www.pathagar.com

কমান্ডার খুব বেশি সৈন্য মোতায়েন চান নাই। কারণ, তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন যে, পরিস্থিতির একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব। এহ্সান ও ফরমান তখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন মুজিবকে বুঝিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে আনা, তারা চায়নি যে মুজিব বুঝে ফেলুক রাজনৈতিক সমাধান আর বিবেচিত হচ্ছে না। মাত্র একটি ব্রিগেডকে করাচিতে আনা হয়েছিল, যাতে ১২ ঘন্টার নোটিশে ঢাকায় যেতে পারে।

২৫ ফেব্রুয়ারিতে মুজিব চেয়েছেন যে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন এবং আভাস দেন তিনি ছয় দফায় কিছু পরিবর্তনও আনতে পারেন। মুজিব বলেন, "যদি পাকিস্তানের অন্যান্য ফেডারেটিং স্টেটস বাংলাদেশের মত এতটা স্বাতন্ত্র না চায়, ৬ দফা তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না।"

২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা জেনারেল উমর জেনারেল ইয়াহিয়ার একজন ঘনিষ্ঠ সহকারি পীরজাদাকে ফোন করেন। জেনারেল উমর তখন করাচিতে ছিলেন। তিনি পীরজাদাকে বলেন যেন স্থগিতের ঘোষণা ১ মার্চ (১৯৭১) দুপুর ১২টায় প্রচারিত হয়। উমর বলেন যে তারা এ বিষয় সম্পর্কে ঢাকায় এহ্সানকে জানিয়েছেন। যাতে এহ্সান রেডিওতে ঘোষণাটি প্রচারের আগেই মজিবকে জানান। ভুট্টোকে আগেই অবহিত করা হয়েছেল (স্বাভাবিকভাবে, কেননা ভুট্টোই তো ইয়াহিয়াকে এ সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছিলেন।)

পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিকবাহিনী এ ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল, আর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক অপারেশন ব্লিথজ-এর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তিনি অপারেশন ব্লিথজ চালানোর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ অপারেশনটি হওয়ার কথা ছিল দ্রুত, অল্পসময়ের এবং স্থানীয়, যাতে সরকার বিরোধী আন্দোলন দ্রুত দমন করা যায়। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ্যাসেমব্লি স্থগিতের ঘোষণার সাথে সাথে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই মর্মে জেনারেল ইয়াকুব সিএমএলএ হেডকোয়ার্টারের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

এহ্সান পীরজাদাকে ফোন করে করে জানান যে, স্থগিতের ব্যাপারে সে হয়তো মুজিবকে রাজি করাতে পারবেন, তবে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য নয় এবং দেখাতে হবে যে, স্থগিতটি হচ্ছে প্রশাসনিক কারণে। পীরজাদা এহ্সানের একমত পোষণ করলেও তার হাতে করবার কিছু ছিল না। তিনি বলেন যে জেনারেল ইয়াহিয়াকে করাচিতে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন কিন্তু পাননি। রাষ্ট্রপতি এবং তার সামরিক সচিব উমর দুজনের একজনকেও পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

তিনি এহ্সানকে ফোন করে জানালেন যে প্রেসিডেন্টকে তিনি যোগাযোগ করতে পারেন নি। এহ্সান নিজেও সরাসরি সিএমএলএ-র সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হলেন । তিনি শিয়ালকোটে জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং জেনারেল হামিদ উমরের সাথে কথা বলেন। অবশেষে ইয়াহিয়াকে খবর দেয়া হল । কিন্তু পীরজাদা বলেন, এহ্সানের প্রস্তাব দুটির সাথে একমত হন নাই।

এ্যাসেমব্লি স্থগিতের সিদ্ধান্তের কথা এবং ঘোষণাটি যে সেদিন দুপুরে রেডিওতে প্রচার করা হবে সে বিষয়ে জানানোর জন্য মার্চের ১ তারিখে এডমিরাল এহ্সান মুজিবকে ডাকলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ এবং কামাল হোসেনকে সাথে নিয়ে মুজিব গভর্নমেন্ট হাউজে আসেন, বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে। যখন ইয়াকুব ও এহ্সান তাদেরকে অধিবেশন স্থগিতের কথা জানান, তখন তারা বিচলিত ও হতভম্ব হন। তাজউদ্দীন বলে উঠলেন, "আমরা জানতাম যে পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।" মুজিব এহ্সান ও ইয়াকুবকে একপাশে নিয়ে বললেন,"দয়া করে অধিবেশনের জন্য একটা নতুন তারিখ স্থির করেন।" তা না হলে তিনি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন না। মুজিব বলেন, "চিত্রটি এখন স্পষ্ট। লারকানায় আলোচনা ভুট্টোর পক্ষে গেছে। এখন আমার জনগণ একতরফা স্বাধীনতার জন্য দাবি করতে থাকবে। স্থগিত এর পরে পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। আমি চেষ্টা করবো একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা না করার জন্য। দয়া করে পরিস্থিতি সামলান। তাই যদি করেন, যদি একটি নতুন তারিখ দেন, আমি পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো।" তিনি পীরজাদার সাথেও কথা বলেন এবং পীরজাদা বললেন তিনি জেনারেল ইয়াহিয়াকে তার কথা জানাবেন।

ওরা চলে গেলে, এহ্সান সিএমএলএ হেডকোয়ার্টারে টেলেক্স পাঠালেন। এতে লেখা ছিল, "আমি মিনতি করছি যেন আপনি আজকে রাতে একটি নতুন তারিখ ঘোষণা করেন। কালকের জন্য অপেক্ষা করলে তা বেশি দেরি হয়ে যাবে।" এ মিনতির কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ইয়াহিয়া করাচিতে ভুট্টোর কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। ১৯৭১ সালের মার্চের ১ তারিখ বেলা ১২টায় স্থগিত ঘোষণাটি প্রচার করা হয়। এ ছিল শেষের শুরু। ইয়াহিয়া ঢাকায় তার সেনা কর্মকর্তার পরামর্শ উপেক্ষা করে মারাত্মক এ সিদ্ধান্তটি নেন।

www.pathagar.com

মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে আনতে ব্যর্থ ছিল বলে এহ্‌সানের উপর ইয়াহিয়া ক্ষিপ্ত ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, এহ্‌সান আওয়ামী লীগের দাবি সমর্থন করেছিলেন। ১লা মার্চ রাতে স্থগিতের ঘোষণার পর, এডমিরাল এহ্‌সানকে সরিয়ে ফেলার জন্য ইয়াহিয়া পীরজাদাকে নির্দেশ দিলেন এবং তার স্থলে জেনারেল ইয়াকুবকে ইষ্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হয়। পীরজাদা দাবি করেন যে, তিনি এহ্‌সানকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তিনি ইয়াহিয়াকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এহ্‌সানের উপর বাঙালি নেতৃবৃন্দের বিশ্বাস ছিল এবং সিএমএলএ হেডকোয়ার্টারের কাছে তাকে প্রয়োজন হতে পারে। তাকে যেন চাকরিচ্যুত না করা হয়। কিন্তু ইয়াহিয়ার চেখে এহ্‌সান ছিল দুর্বল এবং তিনি তার আদেশ পুনরায় ব্যক্ত করেন, "আমি যা বলেছি তাই কর এবং এখনই কর।" তাই এহ্‌সানকে সরিয়ে ফেলা হল। অথচ এহ্‌সানের সাথে মুজিবের ভাল সম্পর্ক ছিল। সে বাঙালি এবং অবাঙালির কাছে সমান জনপ্রিয় ছিলেন। এহ্‌সান ছিলেন সৎ। তার কোন ব্যক্তি স্বার্থ ও উচ্চবিলাসিতা ছিল না। তিনি যা করতেন, যা পরামর্শ দিতেন সবই ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে।

পীরজাদা এহ্‌সানকে তার বরখাস্তের খবরটি জানানোর জন্য ফোন করলেন, কিন্তু ফোন ধরলেন ইয়াকুব। পীরজাদা খুশী হলেন যে সরাসরি এহ্‌সানকে খবরটি দিতে হলনা। তিনি ইয়াকুবকে বললেন, "প্লিজ, এহ্‌সানকে বলবেন আপনার কাছে যেন সে তার দায়িত্ব হস্তান্তর করে।"

ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশন স্থগিত

পিপিপি ব্যতীত, সব রাজনৈতিক দলের নেতারা চেয়েছিলেন যে, আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হোক। এ পিরিস্থিতিতে একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ, পাকিস্তানের ৫৪% জনগোষ্ঠি ছিল বাঙালি। এবং তাদের ছিল একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সিদ্ধান্তটি হয়তোবা গণতান্ত্রিকভাবে সঠিক ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে তা সমীচীন ছিলনা।

ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশন স্থগিতের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বাঙালিদের অর্জিত অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। তারা আশা করেছিল যে, পাঞ্জাবিদের দ্বারা তাদের প্রতি যে সব অবিচার করা হয়, এবার তার একটা সমাধান

www.pathagar.com

হবে। ভুট্টো অথবা জেনারেলদের মধ্যে কেউ কেউ ইয়াহিয়াকে প্ররোচণা করেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য, যতক্ষণ মুজিব তার ছয়দফার কিছু পরিবর্তন না আনে। কিন্তু যে-ই তাকে প্রভাবিত করুক না কেন দায়িত্বটা কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাঁধে পড়ে। তারই দায়িত্বে নতুন কোন তারিখ স্থির না করে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি'র অধিবেশন স্থগিত করা হয়, যার পরিণতি ছিল মারাত্মক।

ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি'র অধিবেশন স্থগিত করার পেছনে ইয়াহিয়া ৩টি কারণ দর্শালেন– ১. একটি প্রধান রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দর ঘোষণা দিয়েছিল যে তারা ৩ মার্চের উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবে না। ২. ভারত দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে ফেলেছিল। এবং ৩. সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি ঐকমত্যে পৌছাতে আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল।

এর একটি কারণও গ্রহণযোগ্য ছিল না। শুধুমাত্র ভুট্টো আর কাইয়ুম সিদ্ধান্ত দিয়েছিল অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য। পিপিপি-র তথ্যসচিব মাওলানা কাওসার নিয়াজি বলেন, প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত সৎ উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছিল।

তেহরিক-ই- ইস্তিকবাল এর প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান দাবি জানান, যেন অবিলম্বে ক্ষমতা বৃহত্তম দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রবীণ রাজনীতিক এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান অখুশী ছিলেন ভুট্টোর ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনের না যাওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। জামাত ই ইসলামির মাওলানা মওদুদী বলেন, ''এ্যাসেমব্লির বাইরে সমাধান খোঁজ করা ভুল হবে।'' তিনি মনে করেন যে, সংবিধান তৈরি করার ১২০ দিনের সময়সীমা আরো বাড়ালেই হতো।

ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তোলার জন্য ভুট্টোকে দোষারোপ করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান আব্দুল ওয়ালী খান। পাঞ্জাব পাকিস্তান ফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট মালিক গোলাম জিলানী পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিতকে ''একটি দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত'' হিসেবে বর্ণনা করেন। মাওলানা গোলাম গাউস হাজার্ভিও স্থগিতের বিরুদ্ধে ছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালি খান গ্রুপ) এর হাশিম খান গিলজাই বলেন যে, সিদ্ধান্তটি ছিল ''নিন্দনীয় এবং অগণতান্ত্রিক'' পাঞ্জাব আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ খুরশীদ ''অবিলম্বে একটি নতুন তারিখ ঘোষণা'' দাবি করেন। মিয়া মুহম্মদ ইয়াসিন খান ওয়াত্তু, মালেক এম জাফর, আবিদ হাসান মন্টু এবং মেজর জেনারেল

www.pathagar.com

নওয়াবজাদা শের আলী খান, লাহোরে এক যৌথ বিবৃতিতে দাবি জানান, যেন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের আগে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধনী অধিবেশন ডাকা হয়। মুজিব পল্টন ময়দানে ভাষণ দেয়ার জন্য ৭ মার্চ দিনটি ধার্য করেছিলেন এবং ধারণা করা হয়েছিল যে, তিনি হয়তো ওই দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন।

বিচারপতি জেড. এইচ. লারি (সিএমএল) এ স্থগিত আদেশে ক্ষুব্ধ ছিলেন। সরদার আতাউল্লাহ মেঙ্গাল (ন্যাপ) এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করেন নি। এয়ার মার্শাল নূর খান (সিএমএল) প্রেসিডেন্টকে অবিলম্বে নতুন তারিখ ঘোষণা করার জন্য তাগিদ দেন। তা না হলে , তার মতে, বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। তার মতে, মুজিবের শাসন করার অধিকার ছিল।

পিপিপি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট মে. জে. সরফরাজ খান বলেন, এটি সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টকে সুপারিশ করেন। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগের আতাউর রহমান খান, যিনি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরোধী ছিলেন, প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। পূর্ব পাকস্তান জামাত ই ইসলাম নেতা গোলাম আযম বলেন যে, গণতানিত্রক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের শামসুল হুদা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, ''আমি বিক্ষুব্ধ ও দুঃখিত।'' পিপিপি'র নুরুল আমীন মনে করেন যে, এ সিদ্ধান্তে সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারটি আরো ক্ষীণ হয়ে যায়।

ডন পত্রিকার সম্পাদকীয়কে লেখা হয়, ''আমরা ক্রসরোডে। নির্বাচন পরবর্তী আমোদ ও আশার পরিবর্তে এখন বিরাজ করছে হতাশা ও উদ্বিগ্নতা।'' নামকরা সাংবাদিক এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্রাস্ট পেপারস্ এর প্রাক্তণ চেয়ারম্যান জেড এ সুলেরি মনে করেন যে, ভুট্টো বর্জন করলেও নির্দিষ্ট তারিখে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল।

প্রায় সকল রাচনৈতিক দল এ স্থগিত আদেশের বিরুদ্ধে ছিল। ইয়াহিয়া যে বক্তব্য দিয়েছিলেন যে সব দল এ বিলম্ব চেয়েছিল, তা সঠিক নয়। শুধু পিপিপি এবং আর একটি দল এ বিলম্ব চেয়েছিল।

এ বিলম্বের আরেকটি কারণ হিসেবে ইয়াহিয়া বলেছিলেন যে ভারত পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করেছে। ভারত তো অনেক আগে থেকেই বিভিন্নভাবে জড়িত ছিল। তাই

www.pathagar.com

এ কারণটিও যৌক্তিক ছিল না। এ পরিস্থিতিতে ভারত তার লক্ষ্য অর্জনে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

তৃতীয় কারণটি ছিল সংবিধানের ব্যাপারে ঐকমত্যে আসতে রাজনীতিকদের সময় দেওয়া। এটাও মিথ্যা ছিল, কারণ তিনি একটি নতুন তারিখের ঘোষণা দেন, যা বেশি দূরবর্তী ছিল না।

মুজিব ছিলেন বিক্ষুব্ধ, তিক্ত এবং হতাশাগ্রস্ত। তিনি বলেন, ''অধিবেশন স্থগিতকে চ্যালেঞ্জ করা হবে।" তিনি অধিতেশন স্থগিত করায় ক্ষুব্ধ হন। এবং ৭ মার্চ হরতাল আহবান করেন। ভুট্টোই এসব সমস্যার মূলে ছিলেন। তিনি বলেন, ''কোন ক্ষতি হয়নি। কিছুদিনের বিলম্বের ফলে যদি অখন্ড পাকিস্তান রক্ষা পায় এবং এবং প্রধান দলগুলো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে ভাল।" তিনি ভেবেছিলেন একটা সমাধান হবে। তিনি ভাবেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া অতিরিক্ত তীব্র ছিল। তিনি ভুলে যান তার কিছুদিন আগেই তিনি নিজেই বলেছিলেন যে যদি কোন নির্বাচিত এমএনএ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে যোগদান করেন, তাহলে খাইবার থেকে করাচি পর্যন্ত আগুন জ্বলবে। পার্থক্য ছিল এই- মুজিব সারা দুনিয়াকে দেখাতে পারলেন যে তার কথায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জেগে উঠবে। কিন্তু ভুট্টোর কথা ছিল দম্ভপূর্ণ, কার্যকরী নয়।

অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

স্থগিতাদেশের ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ দেখা যায়। সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে বয়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। দুপুর ১:০৫ টায় যখন রেডিওতে ঘোষণা করা হল , তখন শেখ মুজিবুর রহমানের ছেলে শেখ কামাল পাকিস্তান এবং ইন্টারন্যাশনাল ইলেভেনের ক্রিকেট খেলা দেখছিলেন। কাছেই বসা আহমেদ সালাউদ্দীন দেখলেন যে এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে শেখ কামাল এবং তার বাঙালি বন্ধুরা উঠে শামিয়ানা ছিড়ে ফেলে এবং আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে দর্শকের সারি খালি হয়ে যায়। সবাই উঠে চলে যায়। অখন্ড পাকিস্তানের ভাঙ্গন শুরু হল।

১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পিপলস্ এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়- ''একটি সংখ্যালঘু দলের স্বার্থে সংবিধান প্রণয়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়েছে এবং ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

www.pathagar.com

করা হয়েছে।" পূবাণী হোটেলে তাৎক্ষণিক একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। মুচিব বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি রেগে বলে উঠলেন, "ষড়যন্ত্রকারীরা যদি ঠিক পথে না আসে, আপনারা একটা নতুন ইতিহাস দেখবেন। প্রত্যেক বাঙালির দায়িত্ব হচ্ছে, যারা ক্ষমতা হস্তান্তরের বিপক্ষে, তাদের সাথে সহযোগিতা না করা।" বঙ্গবন্ধু চিৎকার দিয়ে বলেন, "সব শক্তি নিয়ে বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।" এই প্রথমবারের মত শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" নামে উল্লেখ করলেন। ড. কামাল হোসেন এডমিরাল এহসানের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালেন যে অধিবেশন যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত না করা হয়।

কেন্দ্রে সরকার গঠনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে জনগণ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়া হয়। অবাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং তাদের দোকানপাট লুট করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেনা বাহিনীকে আহবান করে। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রণে আসে ততক্ষণে ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন আহত হয়।

মার্চের ১ ও ২ তারিখের গোয়েন্দা রিপোর্টের পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তীব্র প্রতিক্রিয়া করে। শ্লোগান দেয়া হয়- "আজ থেকে বাংলা মুক্ত; অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর; পশ্চিম পাকিস্তানীদের হটাও; ক্যান্টনমেন্ট দখল কর।" এ ঘোষনার ফলে বামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করবেন। মার্কিন দূত মুজিবের সাথে যোগাযোগ রাখছে। রাষ্ট্রপতির ঘোষণা সমন্ধে মুজিব সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। তিনি স্থগিতাদেশকে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে আওয়ামী লীগ ৩ মার্চে প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করবে। ৭ মার্চ সম্ভবত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পেশ করবেন।

১ মার্চ ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট ডাকা হয়। ৩ মার্চ সারা প্রদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এ দিনটিকে শোক দিবস বলা হয়। এ দিন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির উদ্বোধন হবার কথা ছিল। পাকিস্তানের ইতিহাসে এদিন প্রথমবারের মত বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি প্রদর্শনের কথা ছিল। এই প্রথম একজন নির্বাচিত বাঙালি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবার কথা ছিল। এটি ছিল একটি গর্বের মুহূর্তে। কিন্তু নাচগান ও আনন্দের বদলে ঢাকার রাস্তার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জাতির

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠাতার ছবিতে আগুন লাগানো হয়। পাকিস্তানের পতাকা পদ দলিত করা হয়। সেনাবাহিনীকে গালি দেয়া হয়। ক্যান্টনমেন্টে পানি ও বিদ্যুৎ সরকরাহ বন্ধ করে হয়। খাদ্য সরবরাহও বন্ধ করা হয়। ঢাকার টেলিভিশন আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ৩ মার্চ টেলিভিশনে তারা বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রচার করে। সরকারি স্টক থেকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ঢাকা সেনানিবাসকে ঘেরাও করা হয়। ইকবাল হলের নাম পাল্টিয়ে জহুরুল হক হল নাম দেয়া হয়। জহুরুল হক পাকিস্তান বিমানবাহিনীর একজন সার্জেন্ট ছিলেন। যিনি আগরতলা মামলায় কাস্টডিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। জিন্না হলের নাম বদলিয়ে সূর্যসেন নামকরণ করা হয়।

৩ মার্চ থেকে সব সরকারি অফিস বন্ধ থাকে। চারদিকে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং লুটপাট চলতে থাকে। সেনাবাহিনী এবং প্যারা মিলিটারিরা গুলি বর্ষণ করে। পুলিশসহ অনেকে নিহত হয়। উর্দুভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারের কারণে সিলেট রেডিও স্টেশনে হামলা চলে। ঢাকা সেনানিবাসের বাইরে, রেল স্টেশনের কাছে, ২৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি লে. নজরুল ইসলামকে ৫ মার্চ গুলি করা হয়। ৬ মার্চের মিলিটারি রিপোর্টে বলা হয়, ''সংঘাত এবং পরিস্থিতির অবনতি ঠেকানোর জন্য যা করার প্রয়োজন তা করতে হবে।''

বাংলাদেশের এ্যামিনিস্ট্রেশনের জন্য জাতিসংঘে আবেদন করা হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চলে যায়। নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ ভবনের সামনে জোর করে পাকিস্তানী পতাকা নামানো হয় এবং ওয়াশিংটনে পাকস্তানী দূতাবাস দখলে নেয়ার চেষ্টা চলে।

সাহেবজাদা ইয়াকুব যিনি এহসানের স্থলে পূর্ব পাকিস্তারে গভর্নর হন, তিনি পীরজাদাকে ফোন করে অনুরোধ করেন ইয়াহিয়া যেন ঢাকায় আসেন। তার অনুরোধে ইয়াহিয়া সারা দেন। যদিও নির্দিষ্ট কোন তারিখ দেয়া হয়নি। তাকে বলা হয় যেন তিনি মুজিবের সাথে আলোচনা চালিয়ে যান, যাতে মুজিব একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা না করেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে ঢাকায় ১০ মার্চ বৈঠকের আমন্ত্রণ জানান। মুজিব বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। ৩ মার্চ ইয়াকুব পুনরায় ইয়াহিয়াকে ঢাকায় আসার জন্য অনুরোধ জানান। ৪/৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া ইয়াকুবকে ফোন করে বলেন যে তিনি আপাতত ঢাকায় যেতে পারছেন না। তিনি নব নিয়োগকৃত এ গভর্নরকে বলেন, ''আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি। আমি এখন ঢাকায় যাব না।''

www.pathagar.com

ইয়াকুব ছিলেন রামপুম নবাবের বংশধর, খানদানী, নম্র-ভদ্র প্রকৃতির। তিনি দেখলেন পদত্যাগ করা ছাড়া তার আর কোন বিকল্প নেই। ভদ্রলোক হিসেবে তিনি নিজের বিশ্বাস, নিজের লোকদের যেতে পারেন না। তিনি তার সিনিয়র কর্মকর্তাকে লিখেন, ''যদি প্রেসিডেন্টকে এখানে আসতে রাজি করানো সম্ভব না হয়, তাহলে আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি।''

ইয়াহিয়াকে ইয়াকুবের টপ সিক্রেট সিগনাল ছিল, ''পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, এতে মিলিটারি সমাধান সম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করেছি আপনাকে এখানে এনে একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে, কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। এ সমস্যার কোন সামরিক সমাধান নেই। সামরিক সমাধান করতে হলে অজস্র নিরাপরাধ সিভিলিয়ানকে মারতে হবে। এতে সফলতা লাভ করা যাবেনা। বরঞ্চ, এর মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। আমি এটা মেনে নিতে পারি না। তাই আমি পদত্যাগ করছি।''

এ সিগনাল পাঠানোর আগে ৪ মার্চ ইয়াকুব প্রেসিডেন্টকে তার পদত্যাগের কথা জানানোর জন্য ফোন করেন। প্রেসিডেন্ট হাউসে ফোন ধরেন পীরজাদা। ইয়াকুব বলেন, ''দয়া করে প্রেসিডেন্টকে আমার পদত্যাগের কথা জানান।'' পীরজাদা এটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু ইয়াকুব গম্ভীর ছিলেন। পীরজাদা প্রশ্ন করলেন, ''প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান?'' 'জবাব আসলো, না।'' পীরজাদা ইয়াকুবকে প্রশ্ন করলেন, তিনি পদত্যাগ করলে কে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে। ইয়াকুব জানান যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ১৪ ডিভিশনের জিওসি জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা।

পীরজাদা ইয়াহিয়াকে একথা জানালে, ইয়াহিয়ার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, ''What the hell is he talking about?'' সে কি ঠাট্টা করছে'' তার পিএসও জবাব দিল, ''না, সে সিরিয়াস।'' ইয়াহিয়া প্রথমে অবাক এবং পরে ক্ষুব্ধ হলেন। ইয়াকুবের উপর তিনি ক্ষেপে যান। তিনি সেখানে উপস্থিত জেনারেল হামিদকে বলেন, ''ইয়াকুবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।'' হামিদ সম্মতি জানিয়ে বলেন যে, ইয়াকুবের স্থলে আরেকজনের দরকার হবে। একজন শক্তিশালী কোর কমান্ডার, বাহাদুর শেরের নাম উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য অনেকের মতে তিনি এ সংকটময় মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে রাজি হলেন না।

একমাত্র অনুগত জেনারেল যিনি কোন প্রশ্ন ছাড়াই নির্দেশ পালন করতে রাজি। তিনি হলেন টিক্কা খান। তাকে তাৎক্ষণিক ঢাকায় পাঠানো হয় ইয়াকুবের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া ইয়াকুবকে পছন্দ করতেন কিন্তু এ বিপদের সময়ে ডুবন্ত জাহাজকে পরিত্যাগ করার যুদ্ধে তিনি যুদ্ধে ছিলেন। তিনি ইয়াকুবকে কোর্ট মার্শাল করতে চেয়েছিলেন। তার পদমর্যাদা লাঘব করা হয়।

সাহেবজাদা মুহম্মদ ইয়াকুব খান যখন পদত্যাগ করে তার সি এন সি এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার বয়স ৫১ বছর। সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন তিনি ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন ডিসেম্বর ১৯৪০ লালে। পরে তিনি ১৮ ক্যাভারলি রেজিমেন্টে ছিলেন। ইয়াকুব সেনাবাহিনীর একজন সুদক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। তরুণ অফিসার হিসেবে তিনি ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি আহত হন। আহত অবস্থায় তিনি জার্মানি ও ইতালির ভাষাও শিখেন। পরবর্তীকালে তিনি রুশ ও ফরাসি ভাষো শিখেন।

পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরপরই কায়েদ ই আযমের আমলে তিনি সম্মানজনক গভর্নর জেনারেলের বডিগার্ড-এর কমান্ডান্ট পদে নিয়োগ পান। তিনি প্যারিসে `Ecole superieure de guerre' (Franch War Course) করেন। ফিরে এসে তিনি কোয়েটার Command and staff College 'র Directing staff -এর সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান। French War College -এর কমান্ডান্ট জেনারেল দ্য লাশাপেল বলেন যে ইয়াকুব একজন 'অতি চমৎকার' কর্মকর্তা ছিলেন।

ইয়াহিয়া যখন সিজিএস ইয়াকুব তখন তার ভাইস চিফ অব জেনারেল স্টাফ নিযুক্ত হন।

ইয়াহিয়া তাকে বর্ণনা করেন একজন 'উচ্চ কলেবরের কর্মকর্ত' হিসেবে এবং বলেন যে, ইয়াকুব কোন রকম পক্ষপাতিত্ব করতেন না। বলা হয় যে, ইয়াকুব একজন অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ এবং তিনি ছিলেন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি।

১৯৬৭ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া, যিনি ততদিনে কমান্ডার ইন চিফ হয়েছিলেন, বলেন যে ইয়াকুবের পরামর্শ সবসময় বুদ্ধিদীপ্ত ও ব্যালান্সড ছিল। তিনি ইয়াকুবকে "অত্যান্ত বুদ্ধিমান" হিসেবে বর্ণনা করেন এবং বলেন, তার বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল চমৎকার। তিনি জটিল সমস্যাকে খুব স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম ছিলেন। অথচ এই একই কর্মকর্তা পরবর্তীকালে লে. জে. ইয়াকুব খানকে মর্যাদা ও পদবীহানী করলেন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী সামাল দিতে না পারার কারণে। আসলে তারও আগে ১৯৬৩ সালে লে. জে. বখতিয়ার রানা

www.pathagar.com

ইয়াকুব সমন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, ‘‘তার মন-মানসিকতা. আচার-আচরণ এবং পছন্দ-অপছন্দ কমান্ডের চেয়ে স্টাফের সাথে বেশি মিল।”

কিন্তু আসলে ইয়াকুবের নৈতিকতা তাকে পদত্যাগ করার জন্য বাধ্য করল। তার আদর্শের বিপরীতে সে আদেশ পালন করতে রাজি ছিলেন না।

পূর্ব পাকিস্তানের সংকটময় পরিস্থিতি যাতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণর বাইরে না যায়, ফরমানকে ৫ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠানো হয়। তিনি সিএমএলএ হেড কোয়ার্টারকে অবহিত করেন যে, একটি রাজনৈতিক সমাধানে আসতে না পারলে, পূর্ব পাকিস্তানে আগুন জ্বলবে।

ইয়াহিয়া তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে ঢাকায় গিয়ে মুজিবের সাথে কথা বলতে হবে। তাকে শান্ত করতে হবে। ৬ মার্চ ১৯৭১ সালে তিনি মুজিবের সাথে কথা বলেন। তিনি মুজিবকে বলেন যে, তিনি শীঘ্রই ঢাকায় তার সাথে কথা বলার জন্য আসবেন এবং তার আগে যেন মুজিব কোন সিদ্ধান্ত না নেন। অনেক বিলম্বে ইয়াহিয়া ২৫ মার্চেকে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনের জন্য তারিখ হিসেবে ঘোষণা দেন।

সরকার ২৬ মার্চ মিলিটারি এ্যাকশন গ্রহণ করে। কিন্তু ২ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ অবাঙালিদের উপর লুটপাট, খুন, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন ও হয়রানি চলতে থাকে। কিছু সূত্রের মতে, আওয়ামী লীগ জঙ্গিদের দ্বারা একলাখ বিহারি এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার ও খুন করা হয়। এর মধ্যে ২৫ হাজার খুন হয় শান্তাহারে, ১০ হাজার চট্টগ্রামে এবং ২ হাজার ময়মনসিংহে। তাদের দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়া হয়। বাসাবাড়ি লুট করা হয়, নারীদের ধর্ষণ করা হয়। শোষণকারীদের উপর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল এসব ঘটনা। তার ‘দেশবাসী’র এসব কর্মকান্ড মুজিব এ্যালাউ করলেন, যার ফলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং তখনই বৈদেশিক সাহায্যের জন্য আবেদন করা যাবে।

প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান সরকার ব্যাপারটিকে চেপে রাখার চেষ্টা করলো, যাতে বহিঃবিশ্ব না বুঝতে পারে যে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উঠে পরে লেগেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি তাদের ঘৃণা এমন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছে না।

অবাঙালির উপর অত্যাচারের খবর পত্রিকায় বা সরকারি হ্যান্ডআউটে উঠে আসেনি। কারণ, আশঙ্কা ছিল যে এটা দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করবে এবং

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিহিংসা জাগ্রত হতে পারে। এটা অবশ্য যুক্তিহীন ছিল। একই ধর্মেও বিভিন্ন এথনিক্ গ্রুপ বা কমিউনিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে পারে, বাঙালি মুসলমান আর পাঞ্জাবি মসিলমানের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে, কিন্তু তাতে দ্বিজাতি তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়না।

১৯৭১ এর আগষ্টে প্রকাশিত শ্বেত পত্রে বাঙালিদের আপ রাইজিংয়ের বর্ণনা দেয়া হয়। কিন্তু অনেক বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ায় এটা পাকিস্তানীদের তথাকথিত ২৫ মার্চের গণহত্যাকে বন্ধ করতে পারেনি।

পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত করার ফলে এ অপ্রত্যাশিত সংঘাতের প্রতিক্রিয়ায় জুলফিকার আলী ভুট্টোও বিচলিত হন। তিনি নিজেকে নির্দোষ রূপে জনগণের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, যদিও তিনি অধিবেশন স্থগিত করার জন্য দায়ী ছিলেন এ তিনি বলেন, ''আল্লাহ্ জানেন আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা, আমরা কিভাবে সাংবিধানিক সংকটকে সমাধান করার চেষ্টা করেছি, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তার প্রতিকার হয় এবং পুরো জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা খুবই দুঃখজনক যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনের বিলম্বের কারণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এমন তীব্র প্রতিক্রিয়া করবে। আমরা স্থগিতাদেশ চেয়েছিলাম যাতে প্রধান দুই দল আবার আলোচনায় বসবার সুযোগ পায়। ''

এগুলো ছিল লোক দেখানো দুঃখপ্রকাশ। আন্তরিক হলে, তিনি কেন রাষ্ট্রপতিকে নতুন তারিখ স্থির করার জন্য আহবান জানান নাই। যেমন ঢাকায় দাবি জানানো হচ্ছিল ? তিনমাসে যে সমস্যা নিয়ে প্রধান দুই দলের মধ্যে সমঝোতায় পৌছানো যায় নি, তিনি কি করে আশা করলেন তা তিন দিনে সমাধান হবে?

আসলে ইয়াহিয়া, তার উপদেষ্টগণ এবং ভুট্টো চিন্তা করতে পারেন নি যে এতটা তীব্য প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। তারা হয়তো ভেবেছিলেন এ স্থগিতাদেশের কারণে আওয়ামী লীগ থমকে দাঁড়াবে। তারা বুঝতেই পারলেনা যে তারা আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে। এ স্থগিত আদেশের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সমান্তরাল সরকার চালানোর জন্য মুজিব আরো সমর্থন লাভ করলেন। ৩ মার্চের পর শুধুমাত্র উনার আদেশ পালিত হয়, প্রতিষ্ঠিত সরকারের নয়। মুজিবের আরো ক্ষুব্ধ হবার কারণ ছিল যে, এ স্থগিতাদেশের ব্যাপারে তাকে কোন প্রকার অবহিত করা হয়নি।

ততোদিনে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসযোগ্যতা বিলুপ্ত হয়েছিল। রমনা রেইস কোর্সে মুজিব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন, বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। এবং ঢাকার

www.pathagar.com

আকাশে বাতাসে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী শ্লোগান ধ্বনিত হয়। ৭ মার্চের মুজিবের সেই জনসভা পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের বৃহত্তম জনসমাবেশ ছিল। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৬০ হাজার লোক এ সমাবেশে যোগদান করে। বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। কোথাও পাকিস্তানী পতাকা দেখা যায় নি। হাতে লাঠি ও লৌহদন্ড নিয়ে লোকজন শ্লোগান দিতে থাকে, ''পাঞ্জাবিদের রক্ত চাই! বাঙালি, বিহারী, হিন্দু পাঠান, সিন্ধি, বালুচি ভাই- ভাই!'' মুজিব তখন তার নেতৃত্বের চূড়ায়। সব তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সে দিন তার বিরুদ্ধে কেউ দাড়াতে পারেনি। এমনকি সামরিক শাসকও নয়।

বক্তৃতার শুরুতে মুজিব তার জনগণকে মনে করিয়ে দেন তারা ইতিমধ্যেই জন্মভূমির স্বার্থে ঢাকায়, খুলনায় এবং চট্টগ্রামে রক্ত দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, ''আজ বাঙালি মুক্তি চায়।'' তিনি সামরিক সরকারকে হুঁশিয়ার করে বলেন, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান তাকে নির্বাচিত করেছে এবং এখন তারা জোর পূর্বক তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতিক মুক্তি আদায় করবে।

আইয়ুবের সামরিক শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে ঈঙ্গিত করে তিনি বলেন, ''আমাদেরকে গুলি করে মারা হয়। তারপর আসেন ইয়াহিয়া, যিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে কথা রাখেন নি।'' তার কণ্ঠে ছিল দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা। আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে মুজিব ভুট্টোকে আলোচনায় না বসার জন্য দোষারোপ করেন । তারপর সেনাবাহিনীর প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, ''তারা গরিব মানুষের উপর অস্ত্র চালায়। মুজিব তারপর জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়ার বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন, ইয়াহিয়া ওই ভাষণে অধিবেশন বিলম্বের জন্য মুজিবকে দায়ী করেছিলেন। তিনি বলেন, এ অভিযোগ মিথ্যা এবং অবিশ্বাস্য। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ এখন আর ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে যোগ দেবে না; যতক্ষণ আরো চারটি দাবি মেনে না নেয়া হয়। দাবি চারটি ছিল: ১. সামরিক আইন অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। ২. সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। ৩. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। এবং ৪. ১ ও ২ মার্চ সেনাবাহিনীর গুলিতে কিছু নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যুর ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে তুলে ধরে বলেন, ''এ দেশের সবাই, হিন্দু-মুসলমান, এক জাতি। আমরা রক্ত দিয়েছি, আমাদের জনগণের মুক্তির জন্য আরো রক্ত দেবো।''

www.pathagar.com

তিনি তার ১৭ মিনিটের বক্তৃতা শেষ করেন এ কথায়, "আমাদের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।" কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে বলেননি যে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র চাচ্ছিলেন। কিন্তু অর্থটা স্পষ্ট ছিল। মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন তাকে সাবধান করেছিলেন, এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তার এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ছাত্র ও চরমপন্থীদের চাপ ছিল মুজিবের উপর এ ঘোষণা দেয়ার জন্য। তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করলেন এবং এ কারণে অনেক দেরিতে রেসকোর্সে আসেন। একজন বিদেশী সাংবাদিক যখন তাকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তিনি জবাব দিলেন, "নট গেট, এখনও না।"

নিঃসন্দেহে এটি ছিল মুজিবের দিন। তার কণ্ঠে ছিল আবেগ। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। বক্তার প্রত্যেকটি কথায় জনগণ উৎফুল্ল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে। এটি একটি বলিষ্ঠ ভাষণ ছিল। জনসমাবেশে তার বজ্রকণ্ঠের প্রভাব দেখবার মত ছিল।

৭ মার্চের সমাবেশ সমন্ধে প্রতিবেদন দিতে গিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা সুপারিশ করে যে সব রকমের প্রস্তুতি নেয়া দরকার, কারণ অসহযোগ আন্দোলন দেখা দেবার সম্ভাবনা বেশি।

মহাত্মা গান্ধীর স্টাইলে শেখ মুজিব কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এদিন তার ১০ দফায় ছিল: ১. বাঙালিরা যেন সরকারকে কর প্রদান না করে; ২. সব সরকারি কর্মকর্তাগণ যেন হরতাল পালন করে এবং অফিসে অনুপস্থিত থাকে; ৩. রেল এবং বন্দও শ্রমিকরা যেন সরকারের সাথে সহযোগিতা না করে; ৪. আওয়ামী লীগের বক্তব্য এবং তাদের বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনীর অ্যাকশন যেন রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার হয়; ৫. শুধুমাত্র স্থানীয় ও জেলা টেলিফোন লাইন যেন চালু রাখা হয়; ৬. সব স্কুল যেন বন্ধ রাখা হয়; ৭. 'বাংলাদেশের' ব্যাংকগুলো থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যেন কোনটাকা পাঠানো না হয়।; ৮. সব দালান, দোকান এবং পরিবহন থেকে যেন কালো পতাকা ওড়ানো হয়; ৯. সারাদেশ থেকে হরতাল প্রত্যাহার এবং ১০. মহল্লা, ইউনিয়ন ও জেলা স্তরে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে।

আওয়ামী লীগ এ দফাগুলো বার বার প্রচার করে এবং প্রায় সকল বাঙালি এগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। তিনি আরো দাবি করেন: ১. পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে সেনা মোতায়েন বন্ধ করা; ২. জনগণের উপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ অবিলম্বে

www.pathagar.com

বন্ধ করা; ৩. পূর্ব পাকিস্তানে সরকার চালানোর ব্যাপারে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা; এবং ৪. বাঙালি পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা অইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিৎ করা। বলতে গেলে, ৭ মার্চেই বাংলাদেশ আপাত দৃষ্টিতে জন্ম লাভ করে।

জেলের তালা ভাঙ্গা হয় এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের খোলামেলা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। নতুন এ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাংকগুলো অস্বীকার করে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে যেতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের বেতার কেন্দ্রগুলো 'রেডিও পাকিস্তান' ঢাকার পরিবর্তে ঘোষণা করে 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র।' সব সরকারি কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগ তহবিলে একদিনের বেতন প্রদান করে। অনেকে হয়তো ভয়ে তা করে, কিন্তু ৭ মার্চের পরে তাদের আনুগত্য যে ছিল তা নিয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

জেনারেল ইয়াহিয়াও শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং বলেন, যতদিন তিনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্র প্রধান থাকবেন ততদিনে পাকিস্তানের অখন্ডতা বিনষ্ট হতে দেবেন না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ঐক্য সেনাশক্তির দ্বারা নিশ্চিত হয়না। দরকার ছিল জাতীয় ঐক্যমত্য। ১ মার্চের পর পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রনায়কোচিত এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আন্তরিক রাজনৈতিক নেতা। কিন্তু কায়েদ-ই- কাযমের পর এমন কোন নেতা ছিল না।

৭ মার্চ সাড়ে তিনটায় যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে দায়ত্ব গ্রহণ করার জন্য জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় এলেন। আগওয়ামী লীগ তাকে স্বাগত করেনি। ঠিক সে মুহূর্তে রেস কোর্সে জনসভাটি চলছিল। জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন পেশাদার সেনা কর্মকর্তা যিনি আদেশ পালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুগত । এমনকি যদি জোর করে শক্তি প্রয়োগও করতে হয়। মুজিবের কাছে তিনি ছিলেন সামরিক শক্তির প্রতীক। ইতিপূর্বে এ জেনারেল বালুস্তিানে কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করাতে তাকে 'বালুস্তিানের কসাই' নামে ডাকা হয়। তাই আশ্চর্যের কিছু ছিল না। বাঙালিরা নম্রভদ্র এডমিরাল এহসানের পরিবর্তে তাকে পেয়ে খুশি হতে পারল না। জেনারেল টিক্কাকে রিসিভ করেন ইয়াকুব, খাদেম রাজা এবং বাঙালি মূখ্য সচিব শফিউল আযম।

মুজিব ছিলেন অঘোষিত শাসনকর্তা। তাই জেনারেল টিক্কাকে শপথ গ্রহণ করানো জন্য ৮ মার্চ বিচারপতি সিদ্দিকীকে আহবান করা হলে তিনি অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে অনুস্থিত ছিলেন। আসলে এ কাজটা করতে তিনি এবং তার পরিবার বিপদের

www.pathagar.com

আশঙ্কায় ছিলেন। শেষঅব্দি টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একজন বিচারপতিকে ঢাকায় আনতে হয়েছিল।

জেনারেল টিক্কা মুজিবের সাথে দেখা করতে চান। তার মূখ্য সচিব জানান যে, ৯ মার্চ তিনি এ বৈঠকটি আয়োজন করতে পারবেন। মুজিবের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি রাজি হন। তবে তিনি বলেন টিক্কা খান তার বাসায় এলে তিনি বৈঠকে বসতে পারবেন। কারণ, তিনি গভর্নমেন্ট হাউসে গেলে, অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা তাকে ভুল বুঝতে পারেন। জেনারেল প্রস্তাব করেন যে প্রাদেশিক এ্যাসেমব্লি ভবনের মত একটি নিরপেক্ষ স্থানে বৈঠকটি হতে পারে। কিন্তু মুজিব রাজি হননি এবং বৈঠকটিও হয়নি।

৯ মার্চ মাওলানা ভাসানী এবং আতাউর রহমান, যারা সব সময় মুজিবকে বিরোধীতা করে আসছিলেন, তার প্রতি সমর্থন জানালেন এবং এতে বাঙালিদের উপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে, ১০ মার্চ ১৯৭১ ভুট্টো টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানান যে তিনি ঢাকায় আসতে রাজি। তিনি বলেন যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে একটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে, দেশটির অখন্ডতা রক্ষার জন্য। তারপরও তিনি বিরোধী দলে থাকার ব্যাপারে রাজি ছিলেন না।

এ সংকটময় মুহূর্তে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেশন মুসলিম লীগ, জামাত- ই-ইসলামি, জমিয়াত উলেমা ই ইসলাম, জমিয়ত ই উলেমা পাকিস্তান এবং অন্যান্য ছোট দলের নেতৃবৃন্দ লাহোরে মিলিত হয় ১৩ মার্চ তারিখে। তারা আওয়ামী লীগের পরের চারটি দফা সমর্থন করে ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহবান জানান, ঢাকায় গিয়ে সংকটের রাজনৈতিক সমাধান করা জন্য।

নওয়াব আকবর খান বুগতি, বালুচিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং বুগতি উপজাতির প্রধান, মুজিবের কাছে অবলিম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন। তার কথা ছিল, "মুজিব যদি সম্পূর্ণ দেশকে শাসন করতে পারে, অর্ধেক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন কেন?" তিনি ভুট্টোকে সমালোচনা করে বলেন যে তিনি ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, সংবিধান প্রণয়নে নয়। কিন্তু তার অবস্থানে ভুট্টো অনড় রইলেন। পেশওয়ারের নিস্তার পার্কে ভাষণকালে তিনি বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেয়া হোক। আর পশ্চিম পাকিস্তানে পিপিপিকে।" তার মতে, এ দুই দল দেশকে গণতান্ত্রিকভাবে শাসন করতে পারবে। তা সঠিক নয়।

www.pathagar.com

এক ইউনিট বিলুপ্তি হওয়ার পর ভুট্টোর আশা করা উচিৎ ছিল না যে তিনি এনডব্লিউএফপি এবং বালুচিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে তার পিপিপি সরকার গঠন করতে পারবে। কেন্দ্র প্রদেশ সম্পর্ক সমন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। তার কথা ছিল যে ভৌগলিক দূরত্বের কারণে সংখ্যারিষ্ঠতার নিয়ম এখানে প্রযোজ্য নয়। তাই কেন্দ্রে কোয়ালিশন এর প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক দল তার এ বক্তব্যকে সমালোচনা করে। জেনারেল শের আলী বলেন, ''আমি আশা করি তিনি বাস্তবে এ কথগুলো বলেন নাই।'' এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর বলেন, ''দুঃখজনক।'' নসরুল্লাহ্ বলেন, ''এটি গণতান্ত্রিক নিয়মের বাইরে।'' খান আব্দুল ওয়ালি খান বলেন, ''তিনি এনডব্লিউএফপি-র হয়ে কথা বলতে পারেনা।''

১৪ মার্চ ভূটো বলেন যে, দুই প্রধান দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলকে আলাদা করার ব্যাপারে এটাকে সম্মত স্বরূপ দেখা যেতে পারে।

দুই নেতাকে একত্রিত করবার জন্য সময় এসে গেল এবং তার জন্য প্রয়োজন ছিল ইয়াহিয়া আগে মুজিবের সাথে বৈঠকে বসা। জেনারেল টিক্কাকে খবর পাঠানো হলো আওয়ামী লীগ প্রধানকে জানানোর জন্য এ প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে। টিক্কার উত্তর ছিল।'' মুজিব রাষ্ট্রপতির সাথে ঢাকায় বৈঠকে বসতে রাজি।'' এটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের তুলনায় আওয়ামী লীগের শক্তি অনুধাবন করা যায়।

১৫ মার্চ দুপুরে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তেজগাঁ বিমানবন্দরে নামেন, সেখানে কোন বাঙালি আমলা বা রাজনীতিক ছিলেন না তাকে রিসিভ করার জন্য। নিরাপত্তা জীপ, মোটর সাইকেলের সারি, বিভিন্ন গাড়ি ইত্যাদি সবই ছিল, ছিল না কোন অভ্যর্থনা জানানোর লাইন। ছিল না হাততালি, রাস্তায় বা ফুলের পাপড়ি। শুধু ছিল নিস্তব্ধতা।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী কোন বাঙালি কর্মচারি গভর্নমেন্ট হাউসে ছিলেন না। সিএন্ডসি'র সব ফুট ফরমায়েস করেন পাকিস্তানি ব্যাটমানরা।

রাষ্ট্রপতির সাথে মধ্যস্থতাকারী দলের সদস্য হয়ে আসেন জেনারেল পীরজাদা, বিচারপতি এ আর কর্ণেলিয়াম, ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার উর করিম এবং কর্ণেল হাসান। তাদের সাথে পরে যোগ দেন জেনারেল আব্দুল হামিদ, জেনারেল গোলাম ওমর এবং জেনারেল আবু বকর মিঠ্টা।

পরে অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ জনাব এম এম আহমেদ তাদের সাথে যোগ দেন।

www.pathagar.com

ঢাকার আসার সাথে সাথে জেনারেল পীরজাদা কাজে নেমে পড়েন। তিনি সংবিধান সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব পেশ করার জন্য আওয়ামী লীগকে আহ্বান করেন।

সরকারি দল প্রশ্ন করল, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের কি অভিযোগ ছিল। ড. কামাল হোসেন তুলে ধরেন দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য। এম এম আহমেদ এবং তার সহকারি ড. বাকের অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। কামাল হোসেন ভাল প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন দলিলপত্র দেখান। তিনি ছয় দফার ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন কারণ ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারকে যথাযথভাবে প্রদেশ সমূহ থেকে ফর্মুলা অনুযায়ী আর্থিক সম্পদ পাঠানো হবে। প্রথম অনানুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে বলা হয় যে দুই দল প্রস্তাব তৈরি করবেন যাতে কেন্দ্র কেন্দ্র এবং পূর্ব পাকিস্তান উভয় সন্তুষ্টজনক সংবিধান পায়।

১৬ মার্চ কুর্তা পায়জামা এবং নেহরু জ্যাকেট পরিহিত মুজিব বাংলাদেশ পতাকাবাহী গাড়িতে করে প্রেসিডেন্ট ভবনে আসেন। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইসহাক খান তাকে রিসিভ করেন এবং তাকে পেছনের বারান্দায় নিয়ে যান, সেখানে ইয়াহিয়ার বেতের সোফাতে বসে ছিলেন। তাদের সাথে বসার জন্য জেনারেল পীরজাদাকে ডাকা হয়। প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্য শুরু করলেন, ‘‘আমি আপনার সাথে কাজ করতে বসেছি। এ প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি আপনার সহযোগিতা চাই। আমি চাই আপনি যেন জাতীয় গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেন। ” মুজিব সন্তোষজনকভাবে এদিক সেদিক তাকিয়ে বললেন, ‘‘অন্যখানে কথা বলা উচিৎ হবে না?” তিনি সন্দেহ করেন তার কথাগুলো রেকর্ড হচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট পীরজাদার দিকে তাকালেন এবং পীরজাদা মুজিবকে ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করেন, ‘‘কি হলো?” মুজিব ঈঙ্গিত করে বললেন উনি অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলতে চান। তারা উপরে ইয়াহিয়ার বেডরুমে কথা বলেন। মুজিব তারপর তার ৭ মার্চের উল্লিখিত ৪ দফা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে যোগ দেয়ার আগে এ শর্তগুলো পূরণ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট তাকে জানালেন যে চারদফার মধ্যে ইতিমধ্যে দুটি পূরণ করা হয়েছে। সেনা সদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১ এবং ২ মার্চে সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্দোষ নাগরিকদের হত্যার অভিযোগ তদন্তের জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। অন্য দুটি শর্ত সম্পর্কে জেনারেল ইয়াহিয়া বুঝালেন যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির মাধ্যমে সামরিক আইন তুলে ফেলা এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিৎ।

www.pathagar.com

তদন্ত কমিটির গঠন নিয়ে মুজিবের আপত্তি ছিল কারণ তার মতে, এ কমিটিতে আওয়ামী লীগের একজন সদস্য রাখা উচিৎ ছিল। তিনি তদন্ত কমিটির বিবরণ প্রত্যাখ্যান করেন। আর তিনি বাকি দুই দফার ব্যাপারে অনড় ছিলেন। তিনি বলেন যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি শুরুর আগে এ দুই দফাও বাস্তবায়ন করতে হবে। ইয়াহিয়া জবাব দিলেন, "নীতিগতভাবে সামরিক আইন তুলে ফেলা আমার কাজ নয়, বা ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্বও আমার না, তবে শান্তি ফিরিয়ে আনার স্বার্থে আমি এ দুই দফাও বিবেচনা করবো এ্যাসেমব্লির আগে। তবে এ নিয়ে কিছু কাজ করতে হবে।" মুজিব এতে রাজি হলেন।

প্রেসিডেন্ট তারপর বলেন, "আমরা একসাথে এ নিয়ে কাজ করবো। আমাদের টিম আছে। ওরা এক সাথে বসে বিষয়গুলো ঠিক করুক। আমরা তদারকি করবো।" মুজিব তার টিম পাঠাতে রাজি হলেন, কিন্তু যাওয়ার আগে তিনি বলে উঠলেন, "আমরা কনফেডারেশন করি না কেন? তারপরও আমাদের প্রেসিডেন্ট এক, এক পতাকা থাকবে।" ইয়াহিয়া অবাক হলেন। নিশ্চুপ ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপরও তিনি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন। তিনি বলেন, "শেখ সাহেব, আমি পাকিস্তান ফেডারেশন সমন্ধে কথা বলতে এসেছি। কনফেডারেশন নয়। কোন কোন প্রদেশকে [অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান] বেশি স্বাতন্ত্র দেয়ার ব্যাপারে আমরা তো প্রস্তুত আছি।"

বৈঠকটি একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চলে (১১:৪৫ থেকে ১টা পর্যন্ত) এবং বৈঠক শেষে স্থির করা হয় যে তাদের দুই তাদের দুই মধ্যস্থাকারী দল আলোচনায় বসবে। প্রেসিডেন্ট পীরজাদাকে নির্দেশ দিলেন যেন 'কনফেডারেশন' শব্দটি কোথাও উচ্চারিত না হয়। আওয়ামী লীগ জোর দিয়ে বলল যে এ আলোচনা ত্রিপাক্ষিক হবে না। এখানে ভুট্টোকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। ড. কামাল হোসেন পীরজাদাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তাদের সব খসড়া শুধুমাত্র তারা ইয়াহিয়ার কাছে পেশ করবে।

মুজিব চলে যাওয়ার পর, ইয়াহিয়া তার সব সহায়তাকারিকে ডাকলেন। বিচারপতি কর্ণেলিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে সামরিক শাসন তুলে ফেলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কারণ, সামরিক আইন তুলে ফেলা হলে, একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে। কেননা, তখন প্রেসিডেন্টের কোন আইনগত কর্তৃত্ব থাকবে না। তার মতে, প্রক্রিয়াটি এভাবে চালানো উচিৎ হবে: ১. ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশন ডাকা; ২. এ্যাসেমব্লি সিএমএলএ-কে সামরিক আইন তুলে ফেলার অনুরোধ জানাবে; এবং ৩. নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট চেয়েছেন যেন কর্নেলিয়ার বাস্তবের মুখোমুখি হন। তিনি তাকে মনে করিয়ে দেন যে ওই দুই দফা নিয়ে কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা না হলে, আওয়ামী লীগ অধিবেশনে যাবে না। কর্নেলিয়ার জবাব দিলেন, "দেখি কি করা যায়।"

মার্চের ১৭ তারিখে টিম দুটি বৈঠকে বসে। ততদিনে জনাব এম এম আহ্মেদ এবং সারতাজ আজিজ সরকারি টিমে যোগ দেন। আওয়ামী লীগ টিমে ছিলেন তাজউদ্দীন আহ্মেদ, ড. কামাল হোসেন এবং নজরুল ইসলাম।

সভার শুরুতে কর্ণেলিয়াস তার পরিকল্পিত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বর্ণনা করলেন। তাজউদ্দীন এ সুপারিশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমাদের নেতা প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছেন।" তারা তাদের দাবিতে অনড় রইল । প্রধান বাধাটি ছিল ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির আগে সামরিক আইন তুলে ফেলা। বিচারপতি কর্নেলিয়া বলে যে তা করা হলে, একটি সাংবিধানিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে। ড. কামাল হোসেন নিজেই সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ টিমের আইন উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি সমস্যাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন এরও সমাধান আছে। তিনি মনে করেন, একটা স্বাধীন মতামত নিলে সমস্যার সমাধান হবে। কামাল হোসেন প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি জনাব এ কে ব্রোহির কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারি না? উনি তো নাম করা সাংবিধানিক আইন বিশেষজ্ঞ।" বিচারপতি কর্নেলিয়া সম্মতি জানালেন। ব্রোহি বলেছিলেন "হ্যাঁ, এটা সম্ভব, অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি আদেশ পেশ করা হয়।"

একটি সন্তোষজনক সমাধানে আসার জন্য আবার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারি টিম একটা খসড়া মার্শাল ল অর্ডার (এমএল এ) তৈরি করল। এতে বলা হয় যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থেকে গভর্নরকে সাহায্য করতে পারে প্রদেশের প্রশাসনের ব্যাপারে। মার্শাল ল রেজুলেশনের আওতায় সামরিক আইনকে স্থগিত রাখা হবে।

মার্চ ৯ তারিখে, একজন ব্যতীত যখন সব পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ঢাকায় আসেন, তখন মনে হল যে রাজনৈতিক সংকট এখনই কেটে যাবে। আগত পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের মধ্যে ছিলেন মমতাজ দৌলতানা (সিএমএলএ), সরদার শওকত হায়াত খান (সিএমএলএ), মুফতি মাহমুদ মাহমুদ(জেইউআই), খান আব্দুল ওয়ালী খান (ন্যাপ), সাহেবজাদা আব্দুল কাইয়ুম (মুসলিম লীগ), মাওলানা শাহ আহমেদ নূরানি (জামাত ই উলেমা)। যার অনুপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়, তিনি ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপিপি)।

www.pathagar.com

১৯ মার্চ দুই আবার বৈঠকে বসে। আওয়ামী লীগের টিম এমএলও প্রত্যাখ্যান করে। তারা তাদের নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করে: (১) সামরিক আইন অবিলম্বে তুলে ফেলা হোক। (২) প্রদেশ সমূহকে যথাক্রমে প্রধান দলগুলোর কাছে হস্তান্তর করা হোক। (৩) কেন্দ্রে কোন পরিবর্তন না হোক (৪) ১৯৬২ এর সংবিধানকে সংশোধন করে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র দেয়া হোক। (৫) প্রাথমিকভাবে দুইটি কমিটি হবে সংবিধান রচনার জন্য। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি এ দুই প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করবে, তারপর দুইটার মধ্যে একটা সমঝোতায় পৌঁছাবে। (৬) প্রেসিডেন্ট দুজন গভর্নর মনোনয়ন করবেন এবং (৭) ছয় দফায় যেভাবে বর্নিত কেন্দ্রে সেভাবে বিষয়ভিত্তিক তালিকা থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্য কেন্দ্রের হাতে থাকতে পারে, যদি তারা সেটা চায়। ভুট্টো কোন আপত্তি না জানালে, ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের এ প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া, ইয়াহিয়া সবগুলোতে সম্মতি জানান। কিন্তু তিনি ভাল করে জানতে যে, জেনারেলরা এবং ভুট্টো এগুলোতে রাজি হবে না।

অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে, প্রাথমিকভাবে আওয়ামী লীগের কিছু প্রস্তাব ছিল: (১) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা সামরিক বাহিনী; (২) দুই প্রদেশের জন্য আলাদা মুদ্রা; (৩) বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে আলাদাভাবে নেগোশিয়েশন করা। (৪) রপ্তানি আয় সমানভাবে ভাগ করা;(৫) দুইটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দুইটি কেন্দ্রীয় রাজস্ববোর্ড এবং (৬) করারোপ হবে প্রাদেশিক বিষয়।

দুই টিমের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে এই প্রধান প্রধান বিষয় নিয়ে তাদের মতানৈক্য কমে যায়। আলোচনার ফলে দুই পক্ষ একমত হয় যে আলাদা মুদ্রা এবং আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ঐক্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। পুঁজির স্থানান্তর যেন না হয়, সেজন্য লাভের কিছু অংশ মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবে। আলাদা মুদ্রা এবং আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাপারগুলো বাদ দেয়া হয় এবং এটা সাক্ষর করেন কামাল হোসেন এবং রেহমান সোবহান।

বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ রাজি হয়, এক শর্তে– ইস্ট পাকিস্তান যেন বৈদেশিক সাহায্যের ন্যায্য ভাগ পায়। এ পয়েন্টও বাদ দেয়া হয় আর স্বাক্ষরিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকারি টিম রাজি হয় এক শর্তে- রাজস্ব নির্দিষ্টভাগে কেন্দ্রে দেয়া হবে এবং এটি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকবে। আওয়ামী লীগ এ শর্তে রাজি হয়। তারা এটাতেও রাজি হয় যে রফতানির ফলে আয়কৃত

বৈদেশিক মুদ্রা দুই প্রদেশের মধ্যে প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ভাগাভাগি হবে। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার ব্যাপারে সরকারি টিম রাজি ছিলো, তবে সে বাড়তি খরচের ভার পূর্ব পাকিস্তানেরই বহন করতে হবে। আর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই সামরিক বাহিনী একজন সি ইন সি' র এর অধীনে থাকবে।

আওয়ামী লীগের খসড়া যথাযথভাবে সংশোধিত হয়। অবস্থার উন্নতির লক্ষ্য করা যায়। কারণ, দুই-ই পক্ষ পরস্পরের সহযোগিতা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ যখন জানতে পারল যে এম এম আহমেদ ঢাকা ত্যাগ করেছেন, তখন প্রশাসনের আসল মতলব নিয়ে মনে সন্দেহ জাগে। তারা উপলব্ধি করতে লাগলো যে, এ সমঝোতা আলোচনা লোক দেখানো মাত্র।

ইতিমধ্যে অন্য রাজনৈতিক দলগুলো এই দু'পক্ষের আলোচনা খুব তীক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তারা মুজিবের সাথে আলাপ করেছিল, তিনি যেন এ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যোগদান করেন। কারণ, তাতে প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন তুলে নেয়ার ক্ষমতা পাবেন।

২০ মার্চ সকাল ১০টায় এ দুপক্ষের মধ্যে আবার বৈঠক হয়। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের টিমে এবার খন্দকার মোশতাক এবং কামারুজ্জামানও যোগ দেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্রপতি। ১৬ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত কি অগ্রগতি হয়েছিল, বা হয়নি, তা পর্যবেক্ষণ করা হয় এ বৈঠকে। আওয়ামী লীগের খসড়ায় এ পয়েন্টগুলো ছিল। ১. সামরিক আই তুলে ফেলতে হবে। ২. কিছু সংশোধন সহ ১৯৬২ সালের সংবিধান হবে দেশের অস্থায়ী আইন। ৩. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে থাকবেন। ৪. তার হাতে জাতীয় গণপরিষদ বিলুপ্ত করার ক্ষমতা থাকবে না। ৫. খসড়া সংবিধানের উপর ঐকমত্যে পৌছার আগেই প্রাদেশিক এ্যাসেমব্লিগুলো কার্যকরী হবে। ৬. কেন্দ্রীয় আইনসভা শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা রাখবে। ৭. মুখ্য মন্ত্রীদের পরামর্শে গভর্নরগণ নিযুক্ত হবেন। ৮ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রে ক্ষমতা থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং মুদ্রার ক্ষেত্রে । পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন হবে এবং ১০. সাতদিনের মধ্যে সংবিধানের অনুমোদন হতে হবে।

জেনারেল ইয়াহিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো দিলেনঃ ১. সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। ২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩. এ্যাসেমব্লিগুলোকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। ভৌগলিকভাবে পৃথক হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে পূর্বপাকিস্তানকে অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র দিতে হবে। এবং ৫. কোন সামরিক আইনের প্রস্তাবনা থাকবে না, তবে ঘোষনা থাকবে।

তবে, প্রেসিডেন্ট স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সব দলের নিঃশর্ত ঐকমত্য অপরিহার্য। চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হেড কোয়ার্টার এবং আওয়ামী লীগ প্রণীত খসড়া তুলে ধরা হল।

কর্ণেলিয়াস ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি বসার আগে সামরিক আইন তুলে ফেলার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তিনি এ প্রক্রিয়ায় আবার বাঁধা দেন। তিনি বলেন যে, যদি কোন সামরিক আইন রেজুলেশনে না থাকে, তাহলে কোন ঘোষণাও থাকতে পারবে না। যতদিন সংবিধান প্রণীত না হয়, ততদিন সিএমএলএ থাকা উচৎ।

শেখ মুজিব কথা দিলেন, আইনী দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা মেনে চলবেন।

২০ মার্চ এবং ২১ মার্চের মধ্য রাতে সবখানে একটা রমরমাভাব বিরাজ করছিল। সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য একটা চুক্তিতে পৌছানো গেছে। কিন্তু এ রমরমাভাব কিছুটা স্থিমিত হল যখন ২১ মার্চ মুজিব এবং তাজউদ্দীন প্রেসিডেন্ট হাউসে অনির্ধারিত ভিজিটে যান এবং প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন, যেন ঘোষণা থেকে থেকে ফেডারেল মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারটি বাতিল করা হয়। মুজিবের এ সুপারিশে ইয়াহিয়া এবং তার সহকারিরা উপলব্ধি করল যে মুজিব আর অখণ্ড পাকিস্তান চাচ্ছেন না। কামাল হোসেনও একটি নতুন খসড়া পেশ করলেন, যা আগেরটা থেকে ভিন্ন ছিল।

ইয়াহিয়া একটি রাজনৈতিক সমাধানের আশা ছেড়ে দিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে এ স্থবির অবস্থার জন্য মুজিবই দায়ী ছিলেন। মুজিব চলে যাবার পর তিনি জেনারেল টিক্কাকে বললেন, ‘‘হারামজাদাটা ঠিক করছে না। তুমি প্রস্তুত হও।”

একমাত্র ভুট্টো ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সব শীর্ষ নেতারা আইন পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য এসময় ঢাকায় ছিলেন। ইয়াহিয়া আবারো ভুট্টোকে ঢাকায় এসে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আহবান করলেন। তিনি ইয়াহিয়ার এ কথায় কান দেননি। ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্টের পিএসও আবারো ভুট্টোর কাছে মেসেজ পাঠান। কিন্তু ভুট্টো পুনরায় বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখান করলেন। তিনি আসতে রাজি হন নাই। কারণ, তাকে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে বলা হচ্ছিল, মুজিবের সাথে নয়।

www.pathagar.com

তাকে যখন বলা হল মুজিব তার সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, তিনি ঠিক করলেন ঢাকায় অবস্থানকারী অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের সাথে যোগ দিবেন এবং একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য চেষ্টা করবেন। উনি ২২ মার্চ যখন ঢাকায় আসেন, তখন একটি শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা পিপল মন্তব্য করন, "স্বৈরাচারি চেঙ্গিস খানের মত পাকিস্তানের রাজনীতির খল-নায়ক ভুট্টো আসলেন, সামনে পিছনে মেশিনগানের নিরাপত্তা নিয়ে।" শ্লোগান দেয়া হয়, ভুট্টো, গণতন্ত্রের হত্যাকারী।

সংবিধানের খসড়া তৈরি করতে দুই আলাদা কমিটির গঠনকে ভুট্টো বিরোধীতা করেন। তিনি ভাবলেন এ ধরনের কমিটি পশ্চিম পাকিস্তানে গঠন করা খুবই কঠিন হবে। কারণ, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত বিরাজ করতো।

তিনি মনে করেন, যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ না হলে এসব দল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তার নিজের দলই সংবিধানের খসড়ার বিষয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। পিপিপি'র চেয়ারম্যান বলেন, "এটা হবে দুটি পাকিস্তানের সামিল। দুই অঞ্চলকে ভিন্ন রকমের স্বাতন্ত্র দেয়া হবে। এটা করলে পরিস্থিতি সামলানো দুস্কর হবে।" তিনি আশঙ্কা করেন যে, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তার মতাদর্শে টেনে আনতে পারবেন না। তিনি বালুচিস্তানের এক নেতার উদ্ধৃতি দেন, "দুটি কমিটি থাকতে পারলে, পাঁচটি কমিটি থাকতে পারবে না কেন?"

একজন সেনা কর্মকর্তা ভুট্টোর এক বিশ্বস্ত সহকারি আব্দুল হাফিজ কারদারকে বললেন, "আমরা তাদেরকে শিক্ষা দেব। তোমার চেয়ারম্যানকে শক্ত থাকতে বল।" জেনারেল আকবর ফরমানকে বললেন, "এ হারামজাদাকে শক্ত পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে দেব না।"

২২ মার্চ ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। একই দিনে তার সাথে শেখ মুজিবের বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। দুইজনের একজনও সামনা সামনি স্বস্তিবোধ করেন নাই। মুজিবের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বলেন যে, ঘোষনার দুই কপি তাদেরকে দেয়া হবে দুপুরের সময়।

ভুট্টো আবার আলোচনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি 'লন্ডন পরিকল্পনার' কথা বললেন, যেটাতে নাকি তার দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তারপর

www.pathagar.com

ব্যাপারটা বাদ দেয়া হল, যখন ইয়াহিয়া বললেন যে, মুজিব আর ভুট্টো একসাথে বসলে ভাল হয়। যেন তারা তাদের দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলতে পারে। তারা দুইজন খোলামেলা আলাপ করলেও কোন সমাধানে আসতে পারেন নি। ২২ মার্চ দুপুর বেলায় ঘোষণাটি দুজনের হাতে দেয়া হল।

দুই রাজনৈতিক নেতাই সামরিক সরকারকে দোষারোপ করলো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে শত্রুতা করার জন্য। মুজিব ভুট্টোকে বললেন, 'সেনাবাহিনী বিশ্বাস করবেন না।' কিন্তু মুজিবের সমর্থকরা বলে যে, ভুট্টো নাকি এ মন্তব্যটি করেন মুজিবের কাছে।

এবার যেহেতু ২৫ মার্চ ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যোগ দেয়ার জন্য মুজিব তৈরি ছিলেন না, প্রেসিডেন্ট ফের অধিবেশন স্থগিত করেন।

২২ মার্চ সন্ধ্যায় ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সাথে আবার বৈঠকে বসার জন্য অনুরোধ করেন। পীরজাদার মতে, যে সংবিধান খসড়া প্রণয়নের জন্য দুই কমিটি গঠনের প্রস্তাবে রাজি হলেন। তবে আব্দুল হাফিজ কারদার বলেন, পিপিপি আলাদা দুটি কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনের বিরুদ্ধে ছিল। কারণ, এটার ফলে বিচ্ছিন্নতা হওয়াটা অনিবার্য। সিদ্দিক সালিকও বলেন যে ভুট্টো মন্তব্য করেন যে মুজিবের প্রস্তাবে দুই পৃথক পাকিস্তানের বীজ নিহিত ছিল।

প্রেসিডেন্টের টিমের সাথে আওয়ামী লীগের চতুর্থ বৈঠক বসে ২৩ মার্চ সকাল ১১: ৪৫ মিনিটে প্রেসিডেন্ট হাউসে। তাজউদ্দীন এবং কামাল হোসেন একটি ২৬ পৃষ্ঠার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, যা গ্রহণ করা হলে, তা হতো পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লিখিত অনুমোদন। এ প্রস্তাবনার তিনটি অংশ ছিল– সাংবিধানিক বিষয়, অর্থ ও প্রশাসন। আওয়ামী লীগ তাদের দাবি বাড়িয়ে দিল।

পীরজাদা খসড়াটা নিয়ে বলেন যে, সরকার এটাকে পর্যালোচনা করে দেখবে। কিন্তু ততক্ষণে রমরমা ভাবটা বিলিন হয়ে গিয়েছিল। ২৪ মার্চে দুই পক্ষের বৈঠক আবার বসে এবং কর্ণেল হাসানের মতে, তারা প্রায় সমঝোতায় পৌছাল।

বিচারপতি কর্ণেলিয়াস এবং জেনারেল পীরজাদা জেনারেল ইয়াহিয়াকে জানালেন যে, যদি তারা আওয়ামী লীগের এ প্রস্তাবকে গ্রহণ করে, এটির অর্থ হবে কনফেডারেশন, যা তাদের দেবার অধিকার ছিলনা।

পাকিস্তানের জাতীয় দিবস প্রতিবছর ২৩ মার্চে পালিত হয়। এ দিনটিতে একজন বিশিষ্ট বাঙালি নাগরিক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ভারতের মুসলমানদের

www.pathagar.com

জন্য একটি স্বাধীন দেশের দাবি জানান। তার ঠিক একত্রিশ দিন পর বাঙালিরা দাবি জানায় তাদের নিজেদের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন দেশ, পাঞ্জাবীদের শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। এ দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতার কারণ ধর্ম ছিলনা, এর কারণ ছিল, অর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক। বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম ২৩ মার্চকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে।

সব সরকারি এবং বেসরকারি ভবনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়। চাঁদতারা পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়ি ও দোকানে উড়তে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য ট্যাক্সি , রিকসা ও ঠেলা গাড়িতেও ছোট ছোট পতাকা উড়তে থাকে। কর্ণেল এম এ জি ওসমানী তার বাহিনী নিয়ে কুচকাওয়াজ করলে বঙ্গবন্ধু সালাম গ্রহণ করেন। মুজিবের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মজিদ। গর্বিত কণ্ঠে সারা পৃথিবীকে বোঝানোর জন্য যে বাংলাদেশ আলাদা হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এ একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণাকে উপেক্ষা করে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল (উত্তর বঙ্গের সৈয়দপুরে যেখানে বিহারী জনগোষ্ঠী ছিল, তারা আওয়ামী লীগকে অমান্য করে পাকিস্তানের পতাকা উড়ায়। তারা বিপদের মুখে সাহস করে তাদের দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে।)

সামরিক শক্তি প্রয়োগ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে এ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন বন্ধ করার বিকল্প ছিল না। এটি একটি জটিল প্রশ্ন ছিল- একটি দেশের নাগরিকদের বিচ্ছিন্নতা দাবি করার কোন অধিকার ছিল? এটা কি জোর করে দমন করা উচিৎ, নাকি নিজের দেশের ভাঙ্গনে সহায়তা করা উচিৎ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ জটিল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান নি।

১৯৮৪ সাল থেকে পাঞ্জাবের শিখরা নয়াদিল্লি থেকে আলাদা স্বাধীন দেশ দাবি করছে। ১৯৯২ পর্যন্ত তারা ১৫ হাজারের অধিক প্রাণ দিয়েছে। হাজার হাজারকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল। ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অসীম ক্ষমতা ছিল এবং শ্যুট টু কিল এর অদেশ ছিল। এ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল- এর ১৯৯২ সালের প্রতিবেদনে ভারতীয় সরকরকে দোষারোপ করে পাঞ্জাবে এসব হত্যা, নিপীড়ন জালানোর জন্য। কিন্তু ভারত পাঞ্জাবীদেরকে তাদের স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ওদিকে কাশ্মীরে আগুন জ্বলছিল। কাশ্মীরী মুজাহিদিনরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ৫ লাখ ভারতীয় সৈন্য তাদেরকে দমন করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তল্লাশী, গ্রেফতার, আটক এবং হত্যা করার জন্য তাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। বিদ্রোহীদেরকে দমন করার

www.pathagar.com

জন্য তারা গণধর্ষণ এবং আধুনিক প্রক্রিয়ায় নির্যাতন করে। এসব তারা করে তাদের দেশের ভাঙ্গন বন্ধ করার জন্য।

শ্রীলঙ্কার সরকার তামিল গেরিলাদের বিরুদ্ধে এক যুগ ধরে লড়াই করতে থাকে। জাফনার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দমন করার জন্য তারা ট্যাংক, যুদ্ধ জাহাজ এবং জঙ্গি বিমান ব্যবহার করে। তারা ভারত থেকেও সহায়তা আহ্বান করে এবং ভারত অবিলম্বে ৬০ লাখ অস্ত্রধারী তথাকথিত শান্তি রক্ষাকারী সৈন্য প্রেরণ করে। তারা তামিলদেরকে নিরস্ত্র করার জন্য হেলিকপ্টার, অস্ত্রধারী জাহাজ, বিমান, ভারী অস্ত্র এবং নৌবাহিনীর জাহাজ ব্যবহার করে। অথচ, শ্রীলঙ্কাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতীতে তারাই তামিলদের হাতে অস্ত্র তুলেছিল। বিশেষ একটি এথনিক্ কমিউনিটি আলাদা হতে চেয়েছিল কিন্তু তাই বলে শ্রীলঙ্কার কর্তৃপক্ষ জাফনাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি।

ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করলেন মুজিবকে এমন পথে আনা যাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে না যায়। তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মুজিবকে বোঝানোর জন্য পাঠালেন। কিন্তু তারা সবাই বিফলে ফিরে এলেন। ড. কামাল হোসেনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল যখন ২৪ মার্চে তিনি এসে প্রস্তাব করলেন যে আওয়ামী লীগের খসড়ায় 'ফেডারেশন' শব্দটি বদলিয়ে 'কনফেডারেশন' করা হোক। হাসান বলেন, যখন তাকে একথা বলা হয়, সে মুজিবকে ফোন করে প্রশ্ন করল তিনি হঠাৎ করে মত পাল্টালেন কেন। মুজিব হাসানকে বললেন ফোনটা কামাল হোসেনকে দেয়ার জন্য। মুজিবের সঙ্গে কথা বলার পর কামাল হোসেন বললেন, ফেডারেশন কথাটাই থাকবে। কামাল হোসেন স্বীকার করেন- এমন একটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এটাও বলেন যে, ব্যাপারটা বঙ্গবন্ধু এবং ইয়াহিয়ার হাতে ছেড়া দেয়া যায়, যাতে তারাই এ বিষয়ে ফয়সালা করেন।

এ লেখককে কামাল হোসেন এবং রেহমান সোবহান জোর দিয়ে বলেন যে, আওয়ামী লীগ ছয় দফা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন নিয়ে আলাপ করার জন্য প্রস্তুত হলেও, অন্য পক্ষ ঠিকমত তৈরি হয়ে আসে নি। তারা বলেন ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একই পরিস্থিতি বিরাজ করছিল আইয়ুব খানের আমলে, যখন আওয়ামী লীগ ছয় দফা পেশ করেছিল।

সোবহান বলেন যে ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো দুই জনের একজনও এ ব্যাপারটি সিরিয়াসলি আলাপ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি বলেন যে, কামাল আফসার, আব্দুল পীরজাদা এবং পিপিপি'র মাহমুদ আলী কাসুরীর সাথে এ ব্যাপারে কথা

বলার সময়, মনে হচ্ছিল তারা কেউ এ ব্যাপারে সিরিয়াস নন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে সরকার এবং আওয়ামী লীগের টিম ২২ মার্চে একটি ঐকমত্যে পৌছেছিল। সোবহান বলেন যে আওয়ামী লীগ সংশোধিত খসড়ায় রাজি হলো এবং যৌথ ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তারা যখন জানতে পারল যে, এম এম আহমেদ এবং বিচারপতি কর্ণেলিয়াসকে করাচিতে যেতে বলা হয়েছে, তখন তারা উপলব্ধি করল- এ সমঝোতার চেষ্টাটি ছিল মূলত লোক দেখানো। আসলে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিয়তই ছিল না। "তারা সময় ক্ষেপন করচে" তিনি বললেন।

ভুট্টো দাবি করেন, মুজিব বিশিষ্ট পিপিপি নেতা গোলাম মুস্তফা খেরকে বললেন, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হোক, আর সে নিজে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবেন। একই দিনে তাজউদ্দীন বললেন, যতদূর যাওয়া সম্ভব আওয়ামী লীগ ততোদূর গেছে, এখন আলোচনার আর কিছুই ছিল না। তখন ইয়াহিয়া স্থির করলেন যে, তিনি যা ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি তা এখন কার্যকরী করবেন– তা হলো সামরিক শক্তি দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা। তিনি কুরমিটোলায় জেনারেল টিক্কার হেড কোয়ার্টারে গিয়ে তাকে সবুজ সংকেত দিলেন অপারেশন সাচলাইট শুরু করার জন্য। ১৭ মার্চ এ অপারেশনের পরিকলানা করা হয়।

সে দিন দুপুর তিনটায় ইয়াহিয়া পীরজাদাকে বলেন, "আমরা আজ রাতেই ফেরত যাচ্ছি। তুমি একটা বক্তৃতার খসড়া তৈরি করো, যেটাতে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হবে।" তার কয়েক ঘণ্টা পর, গভীর রাতে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং সেনা প্রধান জেনারেল আগা মুহম্মদ ইয়াহিয়া খান তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে ঢাকা ছেড়ে চলে যান এবং আর কোন দিন ফিরে আসেন নি। পূর্ব পাকিস্তাকে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া হল । বর্ষার আকাশে শকুনদের আর বেশি দেরী হলনা খাদ্যের সন্ধানে।

একটি জটিল বিশ্লেষণ

দুর্ভাগ্যবশত, জন্মের একাধিক যুগ পরও পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রীতির শিকড় গজায়নি। ১৯৫৪ সালে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে এবং বার বার দেশটিকে সংকটের হাত থেকে "রক্ষা' করে। জনগণেরও অভ্যাস হয়ে গেল সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করা এবং পরিস্থিতি সামলানোর জন্য এবং জেনারেলরা এ সুযোগে অসাংবিধানিকভাবে দেশ শাসন করে।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জনগণের কাছে অপ্রিয় হন এবং তার স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। স্বার্থপর রাজনীতিকরা পরস্পরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকলে, সেনাবাহিনী অপেক্ষা করতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে আইয়ুবের কী করা উচিৎ ছিল? সামরিক শাসনের দশ বছর পর, জনগণ শুধু একব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল না, তাদের আন্দোলন ছিল গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এ ব্যবস্থাটি সেনাবাহিনীর দ্বারা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই সেনা প্রধানের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে, ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিৎ ছিল একটি সিভিলিয়ান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে। যা ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আওতায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে। সামরিকবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতা দখল ছিল ভুল, যেমনটি তা ভুল ছিল ১৯৫৮ সালেও। অবশেষে এর ফলশ্রুতিতে দেশ ভেঙ্গে যায়।

প্রাথমিকভাবে অবশ্যই ইয়াহিয়া খান আন্তরিক ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। তবে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কোন একটা দল এককভাবে ক্ষমতায় আসতে পারবে না, তাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার পদ এবং সেনাবাহিনীর গুরুত্ব অটুট থাকবে।

সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট দিতে পাররে, জনগণ তাদের অংশগ্রহণকারী ভূমিকা ভোগ করতে পারত। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করে তারপর নির্বাচনে গেল, তা আওয়ামী লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হতো। এতে নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিত ক্ষতিকর আলোচনা এড়ানো সম্ভব হতো। মুজিব তার ছয় দফা জাতীয় গণপরিষদে উপস্থাপন করতে পারতেন এবং ভুট্টো তার ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ থেকেও বিরত থাকতেন।

একটি স্বল্পস্থায়ী নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হলে দুই অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা আরও সহজ হতো। সবাই এক বছরস্থায়ী নির্বাচনী প্রচারণাকালকে সমালোচনা করে, বিশেষ করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াকে বিচেনায় আনা হলে। এ লম্বা প্রচারণার সুযোগে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

সরকার গঠন করা এবং সংবিধান তৈরি করা, দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। সরকার গঠনের জন্য দরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সংবিধান তৈরির জন্য প্রয়োজন সব ফেডারেটিং ইউনিটের মধ্যে ঐক্যমত। স্পষ্ট করে বোঝানো উচিৎ ছিল যে সংবিধানের অনুমোদনের দরকার ছিল অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের ভোট। পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য সেক্ষেত্রে ছয় দফারও

www.pathagar.com

সংশোধন প্রয়োজন হতো, পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে এটাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য। ভোট প্রক্রিয়া সমন্ধে সিদ্ধান্ত ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির জন্য ছেড়ে ভুল ছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের একটা সীমারেখা থাকা দরকার ছিল। যাতে নির্বাচনে এ প্রশ্নটি প্রধান বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। এটি নির্বাচনের আগে সমাধান করা উচিত ছিল, পরে নয়।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের প্রতিবেদনে নিরপেক্ষ ছিল না। বাস্তব চিত্র না দিয়ে তারা কর্তৃপক্ষকে খুশী করার জন্য প্রতিবেদন তৈরি করে। ভুট্টো মন্তব্য করেন, "তাদের পারফরমেন্স ছিল দুঃখজনক।" ভুট্টো ঠিকই বলেছিলেন। তারা কখনই সঠিক চিত্র তুলে ধরেনি। তারা আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাকে ঠিক মত তুলে ধরে নি। তাই নির্বাচনের ফলাফল সমন্ধে তাদের ভবিষ্যৎ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। তারা দেখাতে চেয়েছিল যে ইসলামি দলগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ছে কিন্তু এ ধরনের প্রতিবেদন ছিল সম্পূর্ণ ভুল। গোয়েন্দা সংস্থা শুধু দেখাতো যে আওয়ামী লীগ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ভঙ্গ করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ। কিন্তু ইয়াহিয়ার শাসনকালেও বহাল তবিয়তে রাজনৈতিক কার্যক্রম চলতে থাকে। গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক দুজনই ছিলেন অতি ভদ্রলোক। তারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনর্বহালে প্রতিজ্ঞ ছিল।

সামরিক আইন তেমন কার্যকরী না থাকায় এবং সরকারের অবস্থান তাদের অনুকূলে দেখে, আওয়ামী লীগ এ সুযোগে জনগণের আবেগকে জাগ্রত করল আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রের পক্ষে যা একটি কনফেডারেশন এর সমান। ইয়াহিয়ার ভুল ছিল যে তিনি মুজিবকে বিশ্বাস করেছিলন যখন মুজিব বললেন যে সে ছয় দফার সংশোধন আনবে। তারপর মতলব বোঝা উচিত ছিল। মুজিবের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, এটা আশা করাটা বোকামি ছিল মুজিব সঠিকভাবে বলেছিলেন যে ছয় দফা এখন আর তার একার ব্যাপার নয়। এখন তা ছয় কোটি বাঙালি।

সবচেয়ে বড় ভুল নতুন তারিখ না দিয়ে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত করা। এতে সামরিক বাহিনীর দু'জন দক্ষ এবং সৎ কর্মকর্তা সরে যান- একজন পদত্যাগ করে এবং একজন চাকরিচ্যুত হয়ে। বাঙালিদের জন্যও এটি ছিল প্রচণ্ড আঘাত। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এটাকে মেরামতের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টার দরকার ছিল। ভুট্টো সবার আগে আঘাত হানে যখন তিনি ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য ঢাকায় আসতে অপারগতা জানান। বাকি ক্ষতি

www.pathagar.com

সাধন করল ইয়াহিয়া, তিনি তার প্রতিশ্রুত রাখেনি। স্থগিতাদেশের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, কর্তৃপক্ষ তা ঠিক মত অনুধাবন করত পারেনি। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পল্টন ময়দানে জনসভার উচ্ছ্বাস এবং পূর্ব পাকস্তানের প্রশাসনের উপর মুজিবুর রহমানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যাশিত।

আওয়ামী লীগের সমঝোতাকারী দলটি আপোশ না করলেও, ২২ মার্চে আলোচনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একটু এদিক সেদিক করলেই একটি সমঝোতায় আসা যেত। কারণ, ছয় দফার সাড়ে পাঁচ দফায় কর্তৃপক্ষ রাজি ছিল।

সামরিক আইন তুলতে কি করার দরকার ছিল, এ প্রশ্নে বিচারপতি কর্ণেলিয়াস কোন সহায়তা করেন নি। তিনি কেবলমাত্র আইনি চোখে বিষয়টি দেখলেন। তিনি দু'দলকে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেন নি।

সেনাবাহিনীর হার্ডলাইনাররা কিছুতেই ইয়াহিয়াকে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে দিলেন না। প্রেসিডেন্টের উচিৎ হয়নি তাদের কথা মত চলা।

এই হার্ডলাইনারা ভেবেছিল যে সামরিক শক্তি দিয়ে মুজিবকে দমন করা যাবে। এটা তাদের ভুল ধারণা ছিল। ২৫/২৬ মার্চ ১৯৭১ প্রস্তাবিত সামরিক এ্যাকশন নেয়া হল।

একজন বাধ্য এবং অনুগত সেনা কর্মকর্তা দ্বারা এ এ্যাকশন বাস্তবায়িত হয়। তার মিশন ছিল সরকার কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করা- এটাতে যে দুই প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হবে, তা তিনি আমলে আনেন নি। মিলিটারি এ্যাকশনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা নিশ্চিত করলেন যে পাকিস্তানী পতাকা আবার সরকারি ভবনে উড়তে থাকলো, স্কুল কলেজ খুলে গেল। অফিস আদালতে পুনরায় কাজ চলতে থাকলে। এবং রাস্তাঘাটে সেনা সদস্যরা আর অপমানিত হয়নি। তিনি সন্তুষ্ট হলেন যখন ভুট্টো বলে উঠলেন, "আলহামদুলিল্লআহ, পাকিস্তান বেঁচে গেল।" তিনি দেখতে পান নি যে সামনে আরো অনেক বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। তির্ক্তা আর ক্ষোভ কোন অংশে কমেনি। এ তিক্ততা ও ক্ষোভ বিরাজ করছিল, এমনকি তা বেড়েও গেল। তখনও দাউ দাউ করে আগুন জলছিল এবং ভারত এ আগুনে বাতাস দিতে থাকলো। ধীরে ধীরে তা সম্পূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করে। সামরিক ক্রাকডাউন এর পরে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী, যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন বা মাঝামাঝি স্থানে ছিলেন, তারা মুক্তিবাহিনীর পক্ষে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

আসলে সামরিক এ্যাকশন থাকা উচিৎ ছিল শুধু নির্দিষ্ট স্থানে। শুধু চরমপন্থীদের আটক করা উচিৎ ছিল। আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ ছিল। সেনাবাহিনীকে আওয়ামী লগের ছাত্রদের থেকে দরে থাকা উচিৎ ছিল। তাদের হওয়াউচিৎ ছিল সংযমী। তাদের প্রচেষ্টা থাকা উচিৎ ছির যত অল্প সময়ে সম্ভব যত সম্ভব কম শক্তি প্রয়োগ করে, আইন শৃংখলা পুনর্বহাল করা।

মুজিবকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে, ইয়াহিয়া সমাধানের সব দ্বার রূদ্ধ করলেন। তিনি প্রত্যক্ষ সংঘাতে নেমে গেলেন। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে তিণি বুঝতে পারতেন তার সিদ্ধান্ত যে কত ভুল ছিল।

তার উচিৎ ছিল ২৫ মার্চে আওয়ামী লগের প্রস্তাবিত কনফেডারেশন সমন্ধে একটা গনভোট দেয়া। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যদি বিচ্ছিন্নও হতে চাইতেন, তাও কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীকে সম্মানের সাথে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে আনতে পারতো। ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সম্পৃক্ততা হতো না এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৬৫ হাজার বীর সেনা সদস্যকে প্রায় তিন বছরের জন্য ভারতের পিওডব্লিউ ক্যাম্পে থাকার অপমান সহ্য করতে হতো না।

www.pathagar.com

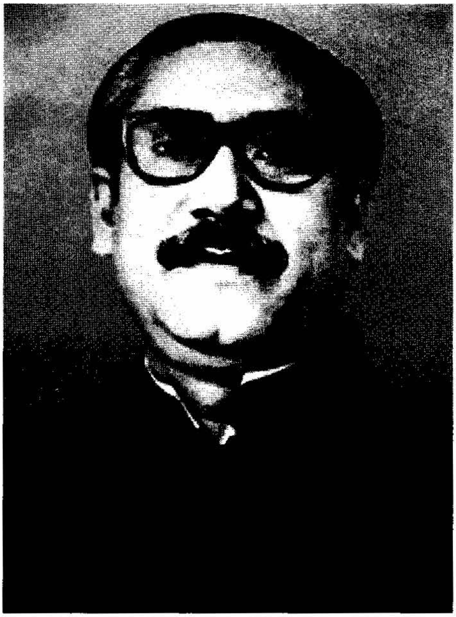

শেখ মুজিবুর রহমান
দলীয় প্রধান, আওয়ামী লীগ

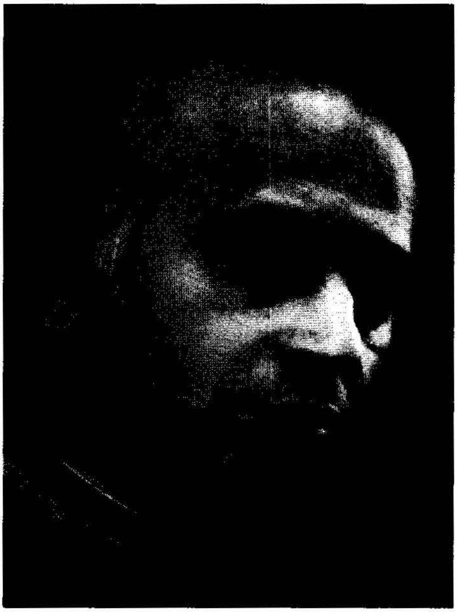

জুলফিকার আলী ভুট্টো
চেয়ারম্যান, পাকিস্তান
পিপলস্ পার্টি

www.pathagar.com

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
দলীয় প্রধান, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), পূর্ব পাকিস্তান

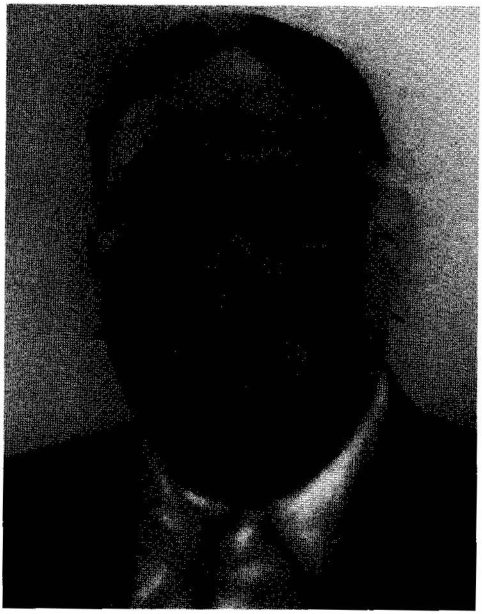

শের-ই-বাংলা মৌলভী আবুল কাশেম ফজলুল হক
লাহোর প্রস্তাবক, ২৩ মার্চ ১৯৪০

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লারকানার হেলিপ্যাডে রাষ্ট্রপতি জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে স্বাগত জানান জুলফিকার আলী ভুট্টো

ঢাকায় জাতীয় গণপরিষদ ভবন, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ এ ভবনে গণপরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিস্থ প্রেসিডেন্টস হাউজে রাষ্ট্রপতি জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সভাপতিত্বে সকল গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তিবাহিনী

কোন দেশের সেনাবাহিনী তা যতই শৃঙ্খলাবদ্ধ আর অরাজনৈতিক হোক না কেন, দেশের ক্রান্তিলগ্নে তা প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক, বিশেষ করে জাতিগত বিষয়ে সংকট দেখা দিলে এবং নির্বাচন প্রচারণাকালে ঠিক তাই হয়েছিল। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যদের মধ্যে, বিশেষ করে যারা পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিল। প্রাথমিকভাবে যদিও আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতা দাবি করছিল না। শেখ মুজিব এবং তার সহযোগীরা সাধ্য মত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্বকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করে তোলেন। যদিও তিনি সরাসরিভাবে স্বাধীনতা দাবি করেন নি; ৭ মার্চের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় স্বাধীনতার ডাক ছিল সুস্পষ্ট।

'জয় বাংলা' এবং 'শালা পাকিস্তানী' শ্লোগান সেনানিবাসে সেনা সদস্যদের কানে আসে এবং এর প্রভাব এথনিক গ্রুপের মধ্যে পড়ে। অনেক বাঙালি সেনা সদস্য রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দিচ্ছিল। আর যারা যাচ্ছিল না, তারা বক্তৃতাগুলো রেডিওতে শুনতো। তারা আবেগাপ্লুত হয়ে নিজেরাও জড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের একক বিজয়ে বাঙালিরা উৎফুল্ল ছিল। তারা আশা করছিল যে, তাদের লোকজন এবার ক্ষমতার শীর্ষে থাকবে। তাদের প্রতি অবিচার বন্ধ হবে। এ নতুন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

তাই যখন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা অনুযায়ী মার্চে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় নি, পূর্ব পাকিস্তানি সেনা সদস্যদের মধ্যে হতাশার ঢেউ বয়ে যায়। এ হতাশা ধীরে ধীরে ক্ষোভে পরিণত হয়, সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষোভ, ভুট্টোর প্রতি ক্ষোভ, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ক্ষোভ তীব্র হয়। ১ মার্চের পর যখন মুজিব বললেন যে এ স্থগিতাদেশ বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেওয়া হবে না, তখন তার সাথে সমগ্র বাঙালি জাতি ছিল, সাথে সাথে বাঙালি সেনা সদস্যরাও আবেগাপ্লুত হয়।

www.pathagar.com

স্থানীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ এড়ানোর জন্য বৃটিশরা একটা কৌশল অবলম্বন করে। তারা একটি মিলিটারি ইউনিট এ বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের সৈন্য নিয়োগ করতো। যদিও এ ইউনিট সমূহের নাম ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, বালুচ রেজিমেন্ট, রাজপূত রেজিমেন্ট বা ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট, আসলে তাদের মধ্যে সে নির্দিষ্ট জাত বা গোত্রের সদস্য পুরাপুরি ছিলনা। তারা মিশ্রিত ছিল। এতে তাদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা চলে আর বিদ্রোহের সম্ভাবনাও কমে যায়।

দেশ বিভাগের পরে ভারতীয় এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এ কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়োগ নীতিমালার ক্ষেত্রে।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

জেনারেল আয়ুব খান যখন ইস্ট বেঙ্গলে জিওসি হিসেবে ছিলেন। তখন ১৯৪৮ সালে ঢাকার কুর্মিটোলায় ইবিআর-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ান গঠিত হয়। তারা শতভাগ ছিল বাঙালি। আয়ুব খান এতে কোন আপত্তি করেন নি। কারণ, তখন হয়তো ধারণা করা হয়েছিল যে তারা শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত থাকবে। পাকিস্তানের স্বাধীনতার এক বছর পর কেউ ভাবতেই পারেনি যে, একটি ইউনিট বিদ্রোহ করতে পারে। ১৯৬৫/৬৬ সাল নাগাদ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচটি ব্যাটালিয়ান ছিল।

আরো ইবিআর ইউনিট গঠিত হয় এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানেও দায়িত্ব পালন করে। লে. জে. খাজা ওয়াসিউদ্দীন, ভারত বিভক্তির সময়ে সবচাইতে সিনিয়র বাঙালি কর্মকর্তা, স্মরণ করেন যে, বাঙালি সৈন্যরা কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা।

সমস্যা শুরু হয় যখন সব ইউনিট-এ উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হয়। আগে উর্দু ভাষা ইংরেজি অক্ষরে লেখা হতো, কিন্তু তা পরিবর্তন করে পুরোপুরি উর্দু অক্ষরে উর্দু লেখা শুরু হয়। এতে বাঙালি সৈন্যদের অনেক অসুবিধা হয়। তারা উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারে, আর বুঝতেও পারে, কিন্তু লিখতে বা পড়তে পারে না। শুধু ১৯৬৯-এ এসে বাঙালি সেনা সদস্যরা তাদের পদোন্নতি পরীক্ষায় বাংলায় উত্তর দেওয়ার অনুমতি পায়।

যেসব বাঙালি সৈন্যদের ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তানে দায়িত্বরত ছিল, তাদের পরিবারদের বিশেষ করে সন্তানদের অনেক সমস্যা হয়। কারণ, সেখানে কেবল

www.pathagar.com

উর্দু আর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ছিল। এ জন্যই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোকে খুব বেশি সময়ের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে রাখা হতো না। যাতে সন্তানদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত না ঘটে (পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী ইউন্টিগুলোও একই সমস্যার সম্মুখীন হয়)।

জেনারেল ওয়াসিউদ্দীন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করেন, অনুষ্ঠানটি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারে। সেখানে সেনা সদস্যরা শতভাগ বাঙালি থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি গান আর আইটেম ছিল উর্দু ভাষায়। তারা বাঙালিদের বিবেচনায়ই নেয় নি। ভ্রাতৃত্ববোদ গড়ে তোলা কঠিন হয় এসব আচরণে।

মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত দশটি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠিত হয়। মিলিটারি অভিযানের সময়ে তারা নিম্নোক্ত স্থানে কর্মরত ছিলো:

ইউনিট	প্রতিষ্ঠার বছর	স্থান	কমান্ডিং অফিসার ১৯৭১
১ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৪৮	যশোর	লে. ক. রাজা উল জলিল (পূ. পা.)
২ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৪৮	জয়দেবপুর	লে. ক. মাহমুদুল হোসেন মে. শফিউল্লাহ (পূ. পা.)
৩ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৫৬	সৈয়দপুর	রে. ক. মঞ্জুর আহমেদ (প. পা)
৪ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৬৩	কুমিল্লা	লে. ক. খিজির হায়াত (প. পা.) মে. খালেদ মোশাররফ (পূ. পা.)
৫ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৬৫	সিয়ালকোট, পরে ১৯৭১ সালে লাহোরে আনা হয়	লে. ক. এম এ রউফ
৬ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৬৫		লে. ক. ফিরোজ সালাউদ্দীন লে. ক. মাশরুল হক
৭ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৬৯	মালির	লে. ক. এরশাদ মুহম্মদ খান (পূ. পা.)
৮ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৭০	চট্টগ্রাম	লে. ক. এম রাশিদ জানজুয়া (প. পা.), মেজর জিয়াউর রহমান, পূ. পা. (পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি)
৯ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৭০		
১০ ইস্ট বেঙ্গল	১৯৭০	ঢাকা ট্রেনিং ব্যাটালিয়ান	লে. ক. মুয়িদউদ্দীন (পূ. পা.)
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টার (২৫০০ রিক্রুট)		চট্টগ্রামে নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্ট	ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (পূ. পা.)

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে ছয়টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়োগকৃত শতভাগ বাঙালিসহ, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সব পদাতিক ইউনিট এবং ফরমেশন হেডকোয়ার্টারসে ৪% থেকে ৫% বাঙারি নিয়োগ দেওয়া হয়। টেকনিক্যালস আর্মসে আর নৌবাহিনীতে এর অনুপাত আরো বেশি ছিল। দীর্ঘ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকালে, পূর্ব পাকিস্তানে অন্য ইউনিটের মত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন কোম্পানী ও প্ল্যাটুনকে আন্তর্জাতিক সীমানায় পোস্টিং দেওয়া হয়।

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্

ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তিকালীন ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে প্রহরীর দায়িত্ব পালন করা এবং যুদ্ধকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার লক্ষে। সীমান্ত ছয়টি সেক্টরে বিভক্ত ছিল: ঢকা, চট্টগ্রাম সিলেট, দিনাজপুর, রাজশাহী ও যশোর। প্রত্যেকটি সেক্টরে ছিল ছয়টি উইং, যার এক একটায় ছিল ৪৫০ জন সৈন্য। সাধারণ সৈন্যদের বেশিরভাগ ছিল বাঙালি, আর তাদের কর্মকর্তারা ছিলেন উভয় অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী। তাছাড়া, ময়মনসিংহে আলাদা উইং ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের শক্তি

মার্চ ১৯৭১ সালে পূবৃ পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী এবং প্যারা মিলিটারিতে মোট ২১ হাজার বাঙালি সেনা সদস্য ছিল।

১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের প্রত্যেকটি ব্রিগেডে একটি করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল। এদের সহযোগী বিভাগগুলোতে বাঙালিও ছিল। ১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনা সদস্যদের মধ্যে ৫০% ছিল বাঙালি। তা ছাড়া ছিল রাজাকার ও পুলিশ। তারা এভাবে বিভক্ত ছিল:

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৬ ব্যাটালিয়ন	৫,০০০ নিয়মিত সৈন্য
ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্	১৬,০০০
রাজাকার	৫০,০০০
পুলিশ	৪৫,০০০
	১,১৬,০০০

www.pathagar.com

ভাঙ্গন

৩ মার্চ ১৯৭১ -এর পর, বাংলাদেশে একটি ডিফ্যাক্টো প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেনাবাহিনীতে বাঙালি কর্মকর্তাগণ ও তাদের সৈন্যরা আনুগত্যের বিষয়ে প্রচুর চাপের মধ্যে পড়ে। এরই মধ্যে প্রাক্তন সেনা সদস্যরা আওয়ামী লীগের সমর্থনে একটি প্যারা মিলিটারি ফোর্স গঠন করে। মার্চের সংকটময় সেই তিন সপ্তাহে যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে বাঙালি সেনা সদস্যরা তখনও বিদ্রোহ করেনি, তা ছিল বেশ আশ্চর্যের বিষয়। তারা নিশ্চয়ই অনেক মানসিক চাপে ছিল; তারা ভবিষ্যৎ সম্মন্ধে অনিশ্চিত ছিল। কিন্তু তখন তারা কাকুল একাডেমিতে নেওয়া শপথে অনড় রইল। শুধু একটা স্ফুলিঙ্গের দরকার ছিল বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য।

এ স্ফুলিঙ্গটি ছিল মূলত মিলিটারি অ্যাকশন, যখন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সেনাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে তাদের অস্ত্র হস্তান্তর করার জন্য বলা হলো। অপ্রত্যাশিতভাবে তারা তাতে রাজি হয় নি। তারা বিদ্রোহ করে এবং তাদের নব্য রক্ষাকারী প্রাক্তন শত্রুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে ।

মিলিটারি ক্রাকডাউন-এর আগেই কিছু কিছু সন্দেহজনক বাঙালি সেনা কর্মকর্তাকে স্পর্শকাতর জায়গা থেকে দূরে রাখা হয়। কিন্তু এ অবিশ্বাস ও সন্দেহ থেকে জন্ম নেয় ক্ষোভ। অন্যান্য সেনা সদস্যরা তখন সহজেই রাজনৈতিক নেতাদের প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়। মেজর খালেদ মোশাররফ ছিলেন ঢাকায় ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর। তাকে অনেক দূরে পোস্টিং দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আদেশ ভঙ্গ করে, গোপনে এসে তার ইউনিটে একটি বিদ্রোহী দল গঠন করতে থাকে। পরে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং সিলেটের কাছে একটি হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি একাধিক আক্রমণ এবং সাবোটাজ পরিচালনা করেন। মেজর শফিউল্লাহ, যার হেড কোয়ার্টার ছিল ময়মনসিংহে, পরে মোশাররফের সাথে যোগ দেন (নিষ্ঠুর পরিহাস, পরবর্তীতে শেখ মুজিবুরের মৃত্যুর পর মোশাররফ নিজের লোকদের হাতে নিহত হন)।

যেখানে শীর্ষ ইউনিটগুলোতে বাঙারিরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে কর্মরত ছিলেন, সেখান থেকে অনেক বাঙালি বিদ্রোহ করে নি। ব্রিগেডিয়ার সি. এম. এ. কে জাহেদ, যিনি তখন ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের আর্টিলারি কমান্ড করছিলেন, বললেন যে, তার ইউনিটের সাথে বাঙালি সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত রেজিমেন্টের সাথে রইল, এমন কি ইউনিটের সাথে ভারতের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। সৈয়দপুরে ২৩

www.pathagar.com

ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সব বাঙালি অফিসার যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাদের ইউনিটের প্রতি অনুগত ছিল। ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির একজন বাঙালি অফিসারও এভাবে অনুগত ছিরেন এবং বাংলাদেশ জন্মের পর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন।

পূর্বে ভারতের ইন্ধনে কিছু বাঙালি সেনা কর্মকর্তা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু ২৫ মার্চের পরে সবগুলো ইউনিট বিদ্রোহ করে এবং রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে চলে যায়। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেন, 'কেবলমাত্র যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে এবং বাঙালি সেনা সদস্যদেরকে হত্যা করে, তখন তারা সবাই মিলে বিদ্রোহ করে।' তিনি বলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বারাই মুক্তিবাহিনী রাতারাতি সৃষ্টি হয়।'

মুক্তিবাহিনী গঠন

পাবনার প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব নূরুল কাদের বাংলাদেশের সৃষ্টি এবং মুক্তিবাহিনীর গঠন সম্পর্কে মজার বর্ননা করেন।

তিনি বলেন যে, মুক্তিবাহিনীরা পাবনা শহরকে ২৫ মার্চের পরে মুক্ত করলেও, পরে পাকিস্তানী বাহিনী পুনরায় শহরটাকে দখলে নেয়। তিনি তখন চুয়াডাঙ্গার সীমান্তবর্তী গ্রামে যান। পরে তার সাথে যোগ দেয় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের মেজর ওসমান, যিনি সাথে এনেছিলেন অস্ত্রসহ ইপিআর-এর এক কোম্পানী সৈন্য।

কাদের দাবি করেন যে, ৬ এপ্রিল তার সাথে দেখা করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে. কর্ণেল ব্যানার্জি। লে. কর্ণেল ব্যানার্জি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভারত থেকে তাদের কী সাহায্য প্রয়োজন। ভারতের কৃষ্ণনগর শহরে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান জেলা প্রশাসক কাদেরকে তাজউদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। তাজউদ্দীন আহমেদ আগেই পালিয়ে কলকাতায় ছিলেন। পরে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর কমান্ডান্ট লে. জেনারেল রোস্তমজী এবং ভারতীয় সেক্টর কমান্ডার গোলক মজুমদার, কাদেরের সাথে যোগাযোগ করে এবং তার আসলে কি কি প্রয়োজন। কাদের তাদের বলেন যেন তিনি তাজউদ্দীন এবং অন্যান্য বাঙালি নেতাদের অনুরোধ করেন চুয়াডাঙ্গায় এসে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দেন এবং মুক্তিবাহিনী গঠনের ঘোষণা দেন। কাদের বলেন যে, মেজর ওসমান এবং অন্যান্য

বাঙালি অফিসারগণ বারবার বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার কথা বলতে থাকে। কারণ তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে আটক হলে তাদের প্রতি যুদ্ধবন্দী হিসেবে আচরণ করবে, তাদেরকে গুলি করে মারা হবে না।

১০ এপ্রিল, বাংলাদেশের তথাকথিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ অস্থায়ী সরকার অবস্থান করছিল কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে। এই স্থানটি ছিল পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস।

তাজউদ্দীনের চুয়াডাঙ্গা সফরের ব্যবস্থা করে ভারতীয়রা। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, বেলা সাড়ে দশটায় তাজউদ্দীন বৈদ্যনাথ তলায় আসেন, এটি সীমান্তের ৪ কিলোমিটার দূরে, মেহেরপুরের কাছে (এই জায়গায়ই লর্ড ক্লাইভ স্থানীয় মুসলিম শাসকের কাছ থেকে বাংলাকে দখল করে নেয়।) কর্ণেল ওসমানীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তি বাহিনীরা তাকে গার্ড অব অনার দেয়। একটি যুদ্ধকালীন পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের চেয়ারম্যান হন কর্ণেল এমএজি ওসমানী। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন শফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, নূরুল ইসলাম এবং রফিকুল ইসলাম। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, বাংলাদেশের সরকারের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগরে কর্ণেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

আসামের সোনাগঞ্জে ১৯১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর আতাউল গণি ওসমানীর জন্মদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তার পিতা খান বাহাদুর মফিজুর রহমান একজন অনারারী রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। ওসমানী একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র হিসেবে ততোটা ভাল করতে পারেন নি। ১৯৩৮ সালে তিনি আলীগড় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু ভূগোলে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করার আগেই তিনি সেখান থেকে ১৯৩৯ সালে বেরিয়ে আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন তিনি ভারতীয় টেরিটোরিয়াল পোস্টে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে তিনি বৃটিশ-ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ইন্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর-এ দায়িত্ব পালন করেন। পরে তাকে পদাতিক বাহিনীতে স্থানান্তর করা হয়। ১৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ৯ম এবং ৫ম ব্যাটালিয়ানে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করার পর তিনি ১৯৫২ সালে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে তাকে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের কমান্ডান্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

তিনি একজন দক্ষ এবং উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তা ছিলেন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি পূর্ণ কর্ণেল পদে উঠেন। তাকে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে মিলিটারি অপারেশনস-এর পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শজনক পদ। তিনি এ পদ থেকে ১৯৬৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বাঙালি অফিসাররা তাকে অনেক সম্মান করতেন। কারণ, তাদের অধিকার নিশ্চিৎ করার জন্য তারা তাঁর উপর আস্থা রাখে। রাওয়ালপিন্ডি ক্লাবে তার এপার্টমেন্টে বাঙালি অফিসাররা প্রায়ই জড়ো হয়ে আড্ডা দিতেন। তিনি তাদের পিতৃতুল্য ছিলেন। তাকে যখন ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকে পদোন্নতি না দিয়ে একটি কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম হয়। তার মধ্যে এক ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়। যারা তাকে বঞ্চিত করেছিল, তাদের উপর তার রাগ বাড়ে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে দেওয়ার জন্য ওসমানীই ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। তিনি মনেপ্রাণে বাঙালি ছিলেন। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্র মতে, তিনি কখনও ভারতপন্থী ছিলেন না। এ জন্যই হয়তো ইন্ডিয়ান ইস্টার্ন কমান্ডের আর্মি কমান্ডার লে. জে. জগজিৎ সিং আরোরা তাকে মনে করেন একজন "ডিফিক্যাল্ট পারসন টু গেটন উইথ", অর্থাৎ 'তিনি এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে মেলামেশা কঠিন" । তিনি মনে করেন যে, ' ওসমানী ছিলেন 'উদ্ধত ও অহংকারী', এবং তার বড় গোঁফ দেখে তিনি মোটেও অভিভুত হন নি। এ গোঁফ বা মোচের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের কাছে ওসমানী 'মাচ্চু ওসমানী' নামে পরিচিত ছিলেন। মানেকশ ওসমানীকে অপছন্দ করতেন। অরোরা বলেন, 'তারা দুইজন পরস্পরকে দেখতে পারতেন না।'

সিনিয়র অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা হিসেবেই মিলিটারি অ্যাকশনের আগেই ওসমানী আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করে একটি প্যারা মিলিটারি ফোর্স গঠন করেন। ২৩ মার্চ ১৯৭১ এ তিনিই মুজিবের বাসার সামনে প্যারেডে নেতৃত্ব দেন। কিছু কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী আসলে ১৯৭০ সালের জুলাই থেকেই ওসমানী একটি প্রতিরোধকারী দল গঠন করেন। তিনি তখন থেকেই মুজিবের সাথে কাজ করেন। বিশ বছর পর কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ তার এ সেনা প্রধানের সম্মানে একটা ডাক টিকিট প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

সংগঠন

মিলিটারি এ্যাকশনের ফলে অনেক বাঙালি, বেশির ভাগ হিন্দু সীমান্তের ওপারে চলে যায়। ভারত এ সুযোগ হাত ছাড়া করেনি। তারা বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেন। পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা শরণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকে এবং তাদেরকে সংগঠিত করতে থাকে।

এ সকল 'বেআইনী অভিবাসী' বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ছাত্র এবং অন্য নাগরিক যারা অস্ত্র ধরতে সক্ষম, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তথ্য যোগাড় করার জন্য। সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশদের নিয়ে একটি দল গঠিত হয় এবং ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাবাহিনী তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয় এবং এ যুব বাঙালি শ্রেণীকে গেরিলায় পরিণত করে। ইস্ট পাকিস্তানের প্যারা মিলিটারি ফোর্স থেকে যারা বেরিয়ে এসেছিল , তাদেরকে আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এর অফিসার ও সেনা সদস্যরা মূল মুক্তি ফৌজ গঠন করে। এটাকে পরে মুক্তি বাহিনী হিসাবে নামকরণ করা হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। মেজর শফিউল্লাহর মতে, সেদিনই বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। পরে এ বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করা হয়, সংগঠিত করা হয় এবং অস্ত্র দেওয়া হয়। মোট কথা, তারা নিয়মিত ব্যাটালিয়ন গঠন করে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে।

মুক্তি যোদ্ধাদেরকে ৫০০ জন করে দলে দলে সাজানো হয়। এ দলগুলোকে বলা হতো, স্বাধীন বাংলা রেজিমেন্টস। তুরাতে ৩ হাজার করে দুইটি ব্রিগেট গঠন করা হয়। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর নারী শাখাও গঠন করা হয়।

এপ্রিলের শেষ নাগাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায় সকল সীমান্ত পোস্ট তাদের নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীরা তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইস্টার্ন ফ্রন্টের একজন ভারতীয় কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জগদেব সিং স্বীকার করেন, ''যোদ্ধাদের তৎপরতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'' তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনী পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে মুক্তিবাহিনীকে আরো শক্তিশালী ও সংগঠিত করে। যেন ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে তাদেরকে কাজে লাগানো যায়। জগদেব সিং বলেন, তারা মনোবল পুনর্জীবিত করে। তিনি স্বীকার করেন যে, ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের তত্ত্বাবধানে একটি কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টার গঠন করা হয়। তিনটি সেক্টরেও হেডকোয়ার্টার গঠিত হয়।

www.pathagar.com

একটি ছিল আগরতলায়, একটি কুচ বিহারে এবং আরেকটি বালুরঘাটে। তাদের দায়িত্ব ছিলমুক্তিবাহিনীর কোম্পানী গড়ে তোলা এবং গেরিরাদের তৎপরতা সমন্বয় করা। ভারতীয় সেনাবাহিনরি ব্রিগেডিয়ার শাহবেগ এবং ব্রিগেডিয়ার সান্ত সিংকে মুক্তিবাহিনী গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রথমজন আগরতলা থেকে তার দায়িত্ব পালন করেন এবং পরের জন টাইগার সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। টাইগার সিদ্দিকী মেঘালয়ের তুরায় অবস্থানকারী একজন বাঙালি বিদ্রোহী ছিলেন। পরে ভারতীয় সিনিয়র কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ

ব্রিগেডিয়ার জগদেব সিং বলেন যে, প্রতিরোদের জন্য দরকার ছিল পরিকল্পনা, অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব; এসব কেবল ভারতই দিতে পারতো। মে মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহী ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। মোট ৭০ হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদী বাঙালি ভারতীয়দের জন্য প্রস্তুত ছিল। এদের দিয়ে তারা ৮টি প্রশিক্ষিত অস্ত্রধারী মুক্তিবাহিনী ব্যাটালিয়ান গড়ে তোলে।

ভারতে ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটির নেতৃত্বে ছিলেন একজন করে ব্রিগেডিয়ার। এই ছয়টি সেক্টর ছিল:

সেক্টর	স্থান	কমান্ডার
আলফা সেক্টর	মুক্তি ক্যাম্প, পশ্চিম বঙ্গ	ব্রিগেডিয়ার যোশী
ব্রাভো সেক্টর	রায়গঞ্জ, পশ্চিম বঙ্গ	ব্রিগেডিয়ার প্রেম সিং
চার্লি সেক্টর	চাকুলিয়া, বিহার	ব্রিগেডিয়ার এন এ নাইক
ডেল্টা সেক্টর	ডেক্টা মুরা, ত্রিপুরা	ব্রিগেডিয়ার শাহ বেগ সিং
ইকো সেক্টর	মাসিরপুর, আসাম	ব্রিগেডিয়ার এম. বি ওয়াদিয়া
ফক্সট্রোট সেক্টর	তুরা, মেঘালয়	ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং

এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো থেকে মুক্তিবাহিনীর প্রয়োজন অনুযায়ী সব অস্ত্র ও সামরিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। প্রত্যেক সেক্টরে কয়েকটি ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। ৮৩টির অধিক ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয় (কেউ কেউ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের কাছে ভারতে মোট ১৫০টি প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ছিল) এসব ক্যাম্পে প্রথম দুদিন চলে ডকুমেন্টেশনে, তারপর তিন সপ্তাহ ধরে চলে নিবিড় প্রশিক্ষণ।

www.pathagar.com

একজন ভারতীয মেজর জেনারেলকে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিদ্রোহীদেরকে সাব-ইউনিট, ইউনিট এবং ফরমেশনে সাজানো হয়। মুক্তি বাহনীর ৬০০ থেকে ৮০০ অফিসার ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নেয়। এমনকি অনেকে দেরাদুনে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ লাভ করে। তারা মাইন এবং বিস্ফোরক এর প্রশিক্ষণও পায়। এ ছাড়া মর্টার, মেশিন গান ও পিআরসি ২৫ ওয়্যারলেস ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেন। এ সব অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ভারতই তাদের সরবরাহ করে। প্রত্যেক ছয় সপ্তাহে ২ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাকে অপারেশনে পাঠানো হয়। তিন মাসে এসব ক্যাম্পে ৫ হাজারের বেশি গেরিলা প্রশিক্ষণ পায়। কোচিন আর পলাশীতে ৬০০ বিদ্রোহীকে ডুবুরীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অস্ত্র

অস্ত্র গোলাবারুদ আসে ভারতীয় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি (আইওএফ) থেকে, এমনকি অস্ত্রের গায়ে 'আইওএফ' লেখাটিও স্পষ্ট দেখা যায়। বিহারের মূখ্যমন্ত্রী খোলাখুলি বললেন যে, তারা বাংলাদেশের জন্য অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে। আরো অস্ত্র আসে পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও। রাশিয়া থেকে আসে ৫৭এমএম রিকোলি রাইফেলস্ এবং লিমপেট মাইনস্। ইসরাইল থেকে আসে ওয়ারলেস সেটস।

বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র সরবরাহ করা হলেও অনেক কুটনীতিক বলেন যে, বেশির ভাগ অস্ত্র আসে ভারত থেকে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অস্ত্রাগারে হামলা চালিয়েও কিছু অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়। অনেক বাঙালি ইউনিট পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় সঙ্গে করে অস্ত্র নিয়ে আসে। তারপর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাও কিছু কিছু অস্ত্র নিজেরাই তৈরি করে। এরমধ্যে ছিল মলটভ কুকটাইলস, হোমিমেড গ্রানডাস, স্থানীয়ভাবে তৈরি এন্টি পারসনাল এবং এন্টি ট্যাংক মাইনস্। মিলিটারি অ্যাকশনের অনেক আগ থেকেই বাঙালিরা লাইসেন্স ছাড়াই অস্ত্র সংগ্রহ ও জমা করতে থাকে। আত্ম-সমর্পণের পর এ ধরনের প্রায় ২ লাখ অস্ত্র পাওয়া যায়।

সেনাবাহিনী বণ্টন

কর্ণেল ওসমানী (ততোদিনে তিনি জেনারেল হয়েছেন) পূর্ব পাকিস্তানকে ১০টি অপারেশনাল এলাকায় বিভক্ত করেন। এক একটি এলাকা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক বা একাধিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকে।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর শক্তি ছিল নিম্নরূপ:

সেক্টর	স্থান	শক্তি	কমান্ডার
১	চট্টগ্রাম	৭০০০	মেজর জিয়াউর রহমান
২	ফেনী	-	লে. ক. এস এম রব/ উইং কমান্ডার বাশার
৩	কুমিল্লা	১০০০	মেজর খালেদ মোশাররফ
৪	ভৈরব বাজার	-	-
৫	সিলেট	৯০০০	মেজর কিউ এন জামান
৬	রংপুর	৫০০০	ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ
৭	দিনাজপুর	৫০০০	ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ
৮	রাজশাহী		
	পাবনা	১৫০০০	ক্যাপ্টেন নাজমুল হক
৯	যশোর	২০০০০	আবু ওসমান চৌধুরী
১০	বরিশাল	৫০০০	ক্যাপ্টেন এম এ জলিল
১১	টাঙ্গাইল	৫০০০	টাইগার সিদ্দিকী
১২	ময়মনসিংহ	৫০০০	মেজর শফিউল্লাহ

সূত্র: শফিউল্লাহ কে এম মে. জে., বাংলাদেশ এ্যাট ওয়ার, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ১৪৯

প্রবাসী 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর' সকল বাছাই নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের জন্য ওসমানী নিজে দায়িত্ব নেন।

অন্যান্য প্রতিরোধ বাহিনী

পাকিস্তানবিরোধী প্রতিরোধ বাহিনীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- ১. ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবশিষ্ট সেনাদের নিয়ে তৈরি ট্রেডিশনাল বৃটিশ আর্মি স্টাইলের ইউনিটস। এগুলো জেনারেল এম এ জি ওসমানীর কমান্ডে ছিলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজ্ লেখেন, ''তাবুতে ছিল কার্পেট, অফুরন্ত হুইস্কি আর চারদিকে তাদের

www.pathagar.com

ব্যাটসম্যান।" এ দলটি ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপে তাদের কোন দ্বিধা ছিল না। ২. দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল আরেকটু জাতীয়তাবাদী। মেজর তাহের আর মেজর জিয়াউদ্দীন ভারতের সহায়তা ছাড়াই একটি 'পিপলস্ ওয়ার' এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল এসব সেক্টরের হেড কোয়ার্টার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকবে। তারা ভারতের প্রতি ঋণী হতে চায় নি। তাদেরকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেন মেজর জিয়াউর রহমান, যিনি ভারত থেকে যতটা কম সম্ভব সহায়তা চান। ৩. তৃতীয় দলটি ছিল যে সব অস্ত্রধারী নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছোট ছোট সেনাদল গঠন করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

মুক্তবাহিনীর বাইরে অন্য প্রতিরোধকারী বাহিনীও গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এরা ছিল অতি উৎসাহী দেশপ্রেমিক। এর মধ্যে ছিল মুজিব বাহিনী। মে. জে. কেএম শফিউল্লাহর মতে, মুজব বাহিনী 'রাজনৈতিক আদর্শে মাতাল' ছিল। এতে ছিল ২০ হাজার অনুগত মুজিববাদী, যারা মুজিবের আদেশ পালনে ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

চারটি সেক্টরে এ বাহিনী বিভক্ত হয়- শেখ কামাল-ইস্টার্ন সেক্টর, শেখ মণি- নদার্ন সেক্টর, সিরাজুল আলম খান- নর্থওয়েস্টার্ন আর ওয়েস্টার্ন সেক্টর- তোফায়েল আহেমদ। পুরো বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমিতে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গেরিলা বিশেষজ্ঞ মেজর জেনারেল উবান এ বাহিনী গঠনের কথা চিন্তা করলেন; যাতে তারা আদর্শগতভাবে ভারতপন্থী হয়।

অন্য প্রতিরোকারী বাহিনী ছিল 'জেড ফোর্স' মেজর জিয়ার নামে গঠন কার হয়। ১৯৭১ সালের জুনে মেজর খালেদ মোশাররফ ৪, ৯ এবং ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে আসা সেনা সদস্যদের নিয়ে নিজের নামে গঠন করেন 'কে ফোর্স'। মেজর শফিউল্লাহ (পরে তিনি মেজর জেনারেল এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন) গঠন করেন 'এস ফোর্স'। এ বাহিনীতে ১, ২ ও ১২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে আগত মোট ১১,২০০ জান সৈন্য ছিল। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ শফিউল্লাহ্ নিজেকে ব্রিগেডিয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার দুজন স্টাফ অফিসার ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর তার ব্রিগেড মেজর ছিল ভারতীয় আর্টিলারির গার্নার অফিসার। মেজর গুলাটি এবং ডেপুটি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (ডিকিউ) ছিলেন মেজর ডি. আর নিজরাওয়ান। ২১ নভেম্বরের আগেই ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যুদ্ধ অপারেট করেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী, বীর এবং নির্ভয় ছিলেন আবুল কাদের সিদ্দিকী। তিনি তার নিজের একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং এর নাম দেন

www.pathagar.com

কাদেরিয়া বাহিনী। এটি স্বাধীনভাবে কাজ করে ঢাকার নিকটবর্তী ময়মনসিংহে। তিনি ১৯৭১ সালের জুনে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে যান এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা তার বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং ভারত কাদেরিয়া বাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণে সহায়তা করে।

টাঙ্গাইলের 'টাইগার' কাদের সিদ্দিকী একজন ২৩ বছর বয়সী ছাত্র ছিলেন এবং টাঙ্গাইল ও ঢাকার মধ্যবর্তী স্থান তার নিয়ন্ত্রেণ ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে তার বাহিনীতে ৫ হাজার অস্ত্রধারী যোদ্ধা ছিল। পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হাজারে দাঁড়ায়। তিনি শেখ মুজিবের ভক্ত ছিরেন। কথিত আছে যে, মুজিব ১৯৭৫ সালে নিহত হলে, কাদের সিদ্দিকী তার ২ হাজার অনুসারী নিয়ে ভারতে চলে যান, ভারতপন্থী মুজিববাদকে পুনজাগ্রত করার জন্য। বলা হয়ে থাকে যে, ভারত সরকারও তাদের আশ্রয় দেয়। কারণ, তারা দাবি করেছিল যে, বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী মিজোদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে তারা বাঁধা দেবে।

গণবাহিণীর সদস্যরা ছিল কমিউনিস্টপন্থী। বিমানবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সদস্যরা গড়ে তুলেছিল বিমানবাহিনী, আর তুফানবাহিনী।

মুক্তিবাহিনীর নৌ বিভাগও ছিল। তারা ডুবুরি অভিযানের প্রশিক্ষণ নেয় এবং ১৯৭১ এর আগস্ট নাগাদ ৩০০ বিদ্রোহীকে কোচিনে পাঠানো হয় এই আন্ডার ওয়াটার প্রশিক্ষণের জন্য। পলাশিতে আরো ৩০০ ফ্রগম্যানকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথী নদীতে। তারা জাহাজ পূর্ব পাকিস্তানে জাহাজ ডুবিয়ে দেয়, কোস্টার ও তেলবাহি ট্যাঙ্কার ধ্বংস করে। নৌকা, লঞ্চ ও বার্জ দখল করে নেয়। মুক্তিবাহিনী ও তার অন্য সংগঠনগুলো ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে। জুনের শেষে এদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজার। নভেম্বর নাগাদ গিয়ে দাড়ায় ৭০ হাজারে এবং যুদ্ধ যখন পুরোদমে শুরু হয়, তখন এদের সংখ্যা ছিল এক লাখ।

কৌশল

মার্চ আর এপ্রিলে সীমান্ত এলাকায় ভারতের বিএসএফকে সহায়তার জন্য মুক্তিবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। তাদের দায়িত্ব ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সীমান্ত থেকে দূরে রাখা এবং সীমান্তবর্তী এলাকা সম্পর্কে ভারতীয়দেরকে তথ্য সরবরাহ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী সাধারণ পোশাক পড়ে নিজ দেশের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। তারা ব্রিজ উড়িয়ে দেয়, সড়ক অবরোধ করে,

আক্রমণ করে এবং পাক আর্মির অনেক সদস্য তাদের হাতে নিহত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি কেবলমাত্র ফরিদপুরেই ৭০০ গেরিলা পাঠানো হয়। এ ধরনের তথাকথিত দুস্কৃতকারীরা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ঢুকে পড়ে। তারা সরকারি অফিসের অবস্থান নেয়। দিনের বেলা তারা ছিল সাধারণ নাগরিক, আর রাতের বেলায় গেরিলা। একজন ভারতীয় লেখক বলেন যে, তারা ধূতি পরিহিত হিন্দু ছিল। মুক্তিবাহিনীর ইন্ধনে শ্রমিকরা খুলনা ও ময়মনসিংহে ৩৮টি জুট মিল ধ্বংস করে। ১৯৭১ সালের জুনে মুক্তিবাহিনী দাবি করে ফেনির যুদ্ধে তারা ৫০০জনকে মেরে ফেলেছে। এ. কে কামারুজ্জামান তার ভারতীয় নেতাকে বলেন যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১২ জুন পর্যন্ত তারা ১৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য হত্যা করেছে। একাত্তরের ২০ জুন ভারতীয় সৈন্যদের সহায়তায় মুক্তিবাহিনী সীমান্তবর্তী ভৈরব বাজার দখল করে নেয়। লে. কর্ণেল শাকুরজানের নেতৃত্বে এলাকাটি পুনর্দখলের জন্য দুটি কোম্পানি কমান্ডারদের নদীর ওপাড়ে নামানো হয়। এ অভিযানে মুক্তিবাহিনীর ৫০০ সদস্য মরারা যায়, আর শাকুরজানের মারা যায় একজন।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় একাত্তরের আগস্টে। ভারতীয় আর্টিলারি এতে সাহায্য করে। পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে অরক্ষিত এলাকায় যাতে করে ভারতীয় বাহিনীর অনুপ্রবেশে সুবিধা হয়, এ লক্ষ্যে পাকিস্তানী বর্ডার পোস্টে আক্রমণ করার জন্য মুক্তিবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে ভারত সরকার আটজনকে নিয়ে পলিটিক্যাল কমিটি গঠন করে, যাতে করে মুক্তিবাহিনীর উপর তাদের বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে মুক্তিবাহিনী অনেক জায়গায় সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনায় বিস্ফোরণ ঘটায়। তারা সরকারি অফিস ও গোডাউনে আক্রমণ করে, ব্রিজ ও রেল লাইন উড়িয়ে দেয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ছিন্ন করে ফেলে। তারা ব্যাংক লুট করে, নির্দোষ নারী পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে।

ভারতীয়দের আক্রমণের দিন যতোই ঘনিয়ে আসতে থাকে, ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের বিদ্রোহীরা আর ভারতীয় সেনা সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো দখল করতে চেষ্টা করে। ৮/৯ নভেম্বও তারা বেলোনিয়ায় আক্রমণ করে, ১৩/১৪ নভেম্বর রাতে কুড়িগ্রাম আক্রমণ করে। এরপর ২১ নভেম্বর ভারত পূর্ব পাকিস্তানের উপর পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আহতদের ভারতীয় মেডিকেল সেন্টারগুলোতে

www.pathagar.com

চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে লক্ষ্য করে মুক্তিযুদ্ধের সফলতা সম্বন্ধে প্রচার করা হয়, যা ছিল মূলত অতিরঞ্জিত। প্রচার করা হয় যে, পাকিস্তানের ২৫ হাজার সৈন্য হত্যা করা হয়েছে। তারা দাবি করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত ৫টি ডিভিশনের মধ্যে ৩টি ডিভিশন অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে। আসলে যা প্রচার করা হচ্ছিল তার ১০ ভাগও সঠিক ছিল না। মুক্তি বাহিনীর কর্মকাণ্ডকে অনেক ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছিল। তাদের মনোবল শক্তি করা; অপরদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল দুর্বল করা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনের লক্ষ্যে এটা করা হয়।

ভারতের অস্বীকার

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু বলতে থাকেন যে, তার সরকার কেবলমাত্র মানবিকতার বিবেচনায় শরণার্থীদের সহায়তা প্রদান করেছে। তিনি পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদেরকে সীমান্ত এলাকায় যেতে দেননি। কারণ, সেখানে গেলে তারা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো দেখতে পেতো, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। ৬ নভেম্বর ১৯৭১, তিনি কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতাদান কালে, কিছু ছাত্র এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করে। তিনি উত্তর দিলেন, ‘‘যদি জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকরা সেখানে যায়, তাদের কি লাভ হবে? তারা এসে পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে, সে কথাই বলবে। আর সেটাতো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’’ বলা বাহুল্য, আসল কারণটি ছিল, তিনি চান নি পর্যবেক্ষকরা দেখুক যে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে চলছে। তবে ভারতের প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই স্বীকার করেন যে, ভারতীয়রা শুধু মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণই দেয়নি, তারা মুক্তিবাহিনী সেজে একাত্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে লড়াই করে।

মুক্তিবাহিনীর কার্যকারিতা

মুক্তিবাহিনীর সবাইকে ভারতীয়দের পাশাপাশি লড়াই করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। একটা যুদ্ধে সফলভাবে বিজয়ী হবার মত শক্তি হিসেবে তাদের কখনই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী অপারেশন এবং শত্রু পক্ষের পালিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিছু কিছু অবশ্য নিয়মিত যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল।

www.pathagar.com

যতটা আশা করা হয়েছিল, মুক্তিবাহিনীর ততটা কার্যকর হতে পারে নি। কারণ, এপ্রিল থেকে নভেম্বর- এই কয়েক মাসে তাদেরকে ওভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভবও ছিল না। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে অনেক সিভিলিয়ান ছিল, অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল। কমান্ড আর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও ছিল দুর্বলতা। তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না বলে একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া বা টিকে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

একজন ভারতীয় লেখক মুক্তিবাহিনী সম্বন্ধে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন, 'তিনি বলেন, যে বিদ্রোহীরা পাঠানদেরকে খুব ভয় পেত। তারা ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করতো; 'পাঠানটা কি মরে গেছে, নাকি এখনও বেঁচে আছে? না মরলে, আমরা সামনের দিকে আর এগিয়ে যাবো না।" মুক্তিবাহিনী সমন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে জেনারেল অরোরা বলেন, "তারা পাঞ্জাবী মুসলমানদের ভয় পেতো। তারা তাদের কাছেই যেত না, ছোট ছোট ছোকরাদের পাঠাতো তথ্য পাওয়ার জন্য।"

তবে আত্মসমর্পনের পর জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি স্বীকার করেন যে, মুক্তিবাহিনী তাকে "অন্ধ ও বধির" করে ফেলেছিল। মুক্তিবাহিনী নিজ শক্তিতে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পারতো না, যদিও ওসমানী দাবি করেন যে, "যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে না আসতো মুক্তি বাহিনীই পাকিস্তানীদের তাড়িয়ে দিত আরো ১০ মাস পরে।"

এুক্তিবাহিনীর সব চাইতে বড় ভূমিকা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য দেওয়া, তাদের শক্তি সমন্ধে অবহিত করা, মাইন ফিল্ডে কোথায় কোথায় ফাঁক আছে, তা নিরূপণ করা, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া ইত্যাদি। মুক্তিবাহিনীই ভারতীয়দেরকে জানিয়েছিল যে পাকিস্তানীরা খুলনায় পশ্চাৎপদ করে, তারা যশোরে যায় নি। এ খবর পেয়ে ভারতীয়রা সহজে যশোরে ঢুকে পড়ল।

অন্যান্য আদর্শগত গেরিলা সংগঠনের ন্যায় আত্মসমর্পণের পরে মুক্তিবাহিনীরা অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে যায়। "আত্মসমর্পণের দুই সপ্তাহ পর অবাঙ্গালিদেরকে খুন, অত্যাচার করা হয়।" অরিয়ানা ফালাচি এবং জিয়ানফ্রাঙ্কো মরলডো লিখেছেন, "শত্রু মনে হলেই, মুক্তিবাহিনী প্রতিশোধ নিতে থাকে। তারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেরাই হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মর্পণের পর, তাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য।"

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

সামরিক অভিযান

একটি দেশের সেনাবাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তকে বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা, দেশকে কোন বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা, বা অইনশৃংখলা রক্ষা করা। এ জন্য সেনাবাহিনী এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতও থাকে।

সাধারণত শান্তিকালীন সময়ে এ সকল অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিকল্পনা চাপা পড়ে থাকে আর্মি হেড কোয়ার্টারের এ্যাডজুটেন্ট জেনারেলের অফিসে। কিন্তু দেশে যখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ এসব আইএস পরিকল্পনাকে নতুন করে পর্যবেক্ষণ করে।

অপারেশন ব্লিটজ

১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারিতে ইস্টার্ন হেডকোয়ার্টারের কমান্ডার লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান, পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এ পরিকল্পনার গোপন বা কোড নাম ছিল অপেরাশন ব্লিটজ। তিনি অবশ্য সচেতন ছিলেন যে, শুধুমাত্র সামরিক অভিযান দিয়ে রাজনৈতিক স্থবিরতার সমাধান সম্ভব না। ইয়াকুব ইয়াহিয়াকে লিখেন ‘‘বলা বাহুল্য অপারেশন ব্লিটজ যথেষ্ট নয়। এরপর দরকার হবে জাতীয় পর্যায়ে অবিলম্বে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রদর্শন করা।”

আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি

জাতীয় আইন পরিষদ স্থগিত ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান আদেশ দিয়েছিলেন, প্রদেশের প্রশাসনকে যেন

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয় এবং তার আহ্বানে সবাই যেন এগিয়ে আসে। তার সমর্থকদের মধ্যে ছিল প্রায় সকল রাজনীতিক, বেশির ভাগ আমলা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যকার বিরাট সংখ্যক বাঙালি। এর সাথে সাধারণ বাঙালি জনগণতো ছিল।

যাদের সাক্ষৎকার নেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রায় সকলেই অস্বীকার করেন যে, আওয়ামী লীগের মধ্যে জঙ্গিবাদীরা পাকিস্তান আর্মির ক্র্যাকডাউনের আগেই অবাঙালিদের উপর হামরা চালায় এবং হত্যা করে। তবে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে যে, ১ মার্চ ১৯৭১, যখন জাতীয় পরিষদ স্থগিত করা হয়, সাথে সাথে তারা উন্মত্ত হয়ে বিশৃংখলা শুরু করে।

ততোদিনে ইস্টার্ন থিয়ার্টারে তার সামরিক কমান্ডারদের উপর ইয়াহিয়া খান সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেললেন। 'দুটি বুড়োর কারণে পূর্ব পাকিস্তানে একটা প্রথম শ্রেণীর সেনাবাহিনী তাদের মনোবল হারিয়ে ফেললো ?' প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন টিক্কা খানের কাছে। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন যে, সময় মত পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণর বাইরে যেত না। জেনারেল টিক্কা অন্ধভাবে বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। তাই ইয়াহিয়া জানতেন তিনি সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ আনবেন।

এ পর্যায়ে মাত্র দুটি বিকল্প ছিল। আর্মিকে নির্দেশ দিয়ে সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠদালের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

বিদ্রোহকে সামরিক শক্তি দিয়ে দমন করার প্রশ্নে শাসকরা দ্বিধা বিভক্ত ছিল। যারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিল, তারা এর বিরোধিতা করে। কারণ, তারা আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দেখতে পায়। তারা বুঝতেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদ শেষ করতে পারলেও ছয় দফার আন্দোলন শেষ হবে না। তারা আশঙ্কা করে, যদি সেনাবাহিনী তাদের অপমানকারীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যায়, তাহলে দুপক্ষেই গণহারে হত্যা হবে।

তারা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন, বিশেষ করে যারা চরম ক্ষমতাধর বলে পরিচিত ছিলেন, তারা শক্তিশালী মিলিটারি অ্যাকশনের পক্ষে ছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল মিটঠা (কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল); খোদা দাদ (এ্যাডজুটেন্ট জেনালে); ইফতেখার জানজুয়া (মাস্টার জেনারেল অর্ডন্যান্স) এবং গোলাম উমর (ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রধান)। আইএসআই চেয়েছিল সরাসরি নির্মম মিলিটারি অ্যাকশন, বলেন সাহেবজাতা ইয়াকুব খান। জেনারেল আকবর বলেন,

www.pathagar.com

'যদি প্রয়োজন হয়, কমান্ডারের যে কোন অ্যাকশন নিতে হবে, তাকে কসাই ডাকা হবে, এ ভয়ে বসে থাকলে চলবে না। জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা এবং জেনারেল রাও ফরমান আলী দুজনেই উপলব্ধি করলেন যে মিলিটারি অ্যাকশন-এর আগে যে দুইজন পিএসও-কে ঢাকায় পাঠানো হয়, তারা তাদের থেকে ক্ষমতা নেওযার জন্যই এসেছিলেন, যদি তারা শক্ত পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেন, জেনারেল রাজা এ লেখককে বলেন, 'আমি এবং অন্যরা অ্যাকশন- এ যেতে রাজি নাও হতে পারে ভেবে, মিটঠা, খোদা দাদ ও জানজুয়াকে পাঠানো হয়।' তিনি বলেন এর আগে কোন পিএসও-কে ঢাকায় পাঠানো হয় নি।

অপারেশন সার্চলাইট

মার্চ ১৫ তারিখে যখন ঢাকায় রাজনৈতিক বৈঠক চলতে থাকে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কর্তৃপক্ষকে একেবারেই উপেক্ষা করা হয়। যখন রাজা টিক্কাকে বৈঠকের অগ্রগতি সমন্ধে জিজ্ঞেস করেরেন, টিক্কা উত্তর দিলেন, 'আমি যতদূর জানি, তুমিও ততোদূর জানো– আমরা দুজনই খবরের কাগজ পড়ি।' কিন্তু টিক্কা ছিলেন একজন পেশাদার সৈনিক এবং তিনি সবচেযে খারাপ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে চেয়েছেন তিনি বাঙালিদের চোখে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানদিের বিরুদ্ধে ঘৃণা দেখতে পেয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়াও তাকে আভাস দিয়েছিলেন যে, বৈঠকের মাধ্যমে যদি কিছুই না হয়, তাহলে হয়তো শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি তাই ১৫ মার্চ তারিখেই ১৪ ডিভিশনের জিওসিকে বলে রাখলেন যে আলাপ আলোচনা ফলপ্রসূ না ফলে, তিনি যেন শক্তি প্রয়োগের জন্র প্রস্তুত থাকেন। ১৬ মার্চ টিক্কা খান রাজা ও ফরমানকে ডেকে তাদেরকে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেন, যাতে সরকারের কথামতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার জন্য পরিকল্পনা নয়; এটি ছিল প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্দে বিদ্রোহকে দমন করার জন্য পরিকল্পনা, যা বাস্তবায়িত হবে যদি আলোচনা ব্যর্থ হয়।

১৭ মার্চ তারিখে রাজার ফরমান বৈঠকে বসেন তারা তাদের কাজকে দুভাগে ভাগ করেন। ফরমান পরিস্থিতির একটচা বিশ্লেষণ লেখেন, আর রাজা কি কি করণীয়, তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন। ১৯ মার্চ জেনারলে টিক্কা এবং সিওএস

www.pathagar.com

জেনারেল হামিদের কাছে মিলিটারি অ্যাকশনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। জেনারেল রাজা বলেন যে, পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয়। জেনারেল হামিদ পরিকল্পনার নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করতে চেয়েছিলেন এবং রাজাকে বলেন যে, প্রয়োজন ছাড়া পরিকল্পনাটি সমন্ধে কেউ যেন কিছু না জানে। শুধু সেক্টর কমান্ডারগণ এটি সমন্ধে অবহিত ছিলেন।

১৯ মার্চ ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহাজেব আরবাব জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যান। ফেরার পথে একটি রেলওয়ে ওয়াগন তার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো দেখতে পান। ওয়াগনটি স্থানীয় লোকজন তার যাওয়ার পথে রেখেছিলেন। জাহাজেব ছিরেন পেশওয়ারের পাঠান এবং বেশ কড়ামেজাজের কর্মকর্তা। তিনি কমান্ডিং অফিসারকে আদেশ দিলেন যেন ওয়াগনটি সরানো হয়। তিনি বলেন, 'বিশ মিনিটের মধ্যে আমি এটাকে সরানো দেখতে চাই। আমাদেরকে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব, যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা।'

ভীড় কিন্তু একটুও কমল না এবং নড়লোও না। গুলি ছোড়া হলো, গুলি বিনিময় হলো। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের সৈন্যরা তাদের কর্মকর্তাদের আদেশ পালন করল ঠিকই। কিন্তু খুব অনিচ্ছার সঙ্গে তারা ৬৩ রাউন্ড গুলি ছুঁড়লো। তাও বেশির ভাগ আকাশের দিকে লক্ষ্য করে। এতে মাত্র দুজন লোক মারা যায়। পাঁচজন বাঙালি সেনা যারা নিজেদের লোকদের দিকে গুলি ছুঁড়তে রাজি ছিল না, তারা অস্ত্র, গুলি বারুদ নিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বাঙালি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে যায়।

২২ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে প্রেসিডেন্ট, গভর্নর এবং মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মধ্যে ঢাকায় যে বৈঠক হয়, তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহ দমন করতে সামরিক শক্তি ব্যবহৃত হবে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস ছিল। সে দিন ঢাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল। পাকিস্তানের পতাকার বদলে বিভিন্ন ভবনে ও গাড়িতে কালো পতাকা উড়ানো হয় ৩ মার্চ দুপুরে একদিকে ঢাকা অ-খণ্ড পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অন্যদিকে সেনা প্রধানগণও মিলিটারি অ্যাকশনের জন্য সুপারিশ পেশ করেন। সেদিনই ইয়াহিয়া তার অনুমোদন দিলে আইন শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার জন্য।

২৪ মার্চ এসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থককে একেবারে দমন করা। রাজনেতিক সমাধানের সকল সম্ভাবনা দেখা হয়েছিল, কিন্তু

www.pathagar.com

কোন ফল হলনা। অনেক অনুরোধ, বোঝানো আর আলাপ আলোচনার পরও মুজিব ও ভুট্টো তাদের অনমনীয় অবস্থান থেকে সরে আসলেন না। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি স্থগিত করে ইয়াহিয়া দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন; এখন তিনি একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন। এখান থেকে ফিরে আসা। সম্ভবপর ছিল না।

ইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কাখান এবং মে. জে. রাও ফরমানকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, অপারেশন সার্চলাইটকে চূড়ান্ত করার জন্য। ইয়াহিয়া বলেন, 'দেশকে বাঁচানোর স্বার্থে কয়েক হাজারজনকে হত্যা করলে ক্ষতি নেই। ওদেরকে দাঁত দেখালে, ওরা চুপ হয়ে যাবে।'

অপারেশন সার্চ লাইট- এর উদ্দেশ্য

অপারেশন সার্চ লাইটের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য ছিল: ১. সীমান্ত বন্ধ করা। ২. সিভিলিয়ান ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৩. প্রদেশটির প্রশাসনকে ফের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং ৪. নির্বাচিতদের মধ্যে যারা নমনীয়, তাদেরকে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণে নিয়ে আসা।

সামরিক ক্র্যাকডাউন-এর তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল: ১. সব বাঙালি সৈন্যকে নিরস্ত্র করা। এর অর্থ হলো- ছয়টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য, ৩০ হাজার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্য ও পুলিকে নিরস্ত্র করা। (এতে বাঙালি সেনা সদস্যদের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা বিবেচনায় আনা হয়নি। ২. গব শীর্ষ স্থানীয় নেতাদেরকে গ্রেফতার করা। ৩. কড়াভাবে সামরিক আইন জারি করা। ৪. সবগুলো বিমান বন্দরের রানওয়ে নিয়ন্ত্রয়ণে রাখা। ৫. চট্টগ্রাম নেভেল বেসকে নিয়ন্ত্রণ রাখা। ৬. সকল শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করা। ৭. যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ পূর্ব পাকিস্তাসকে বহির্বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্ন করা। এবং ৮. আওয়ামী লীগের হাত থেকে রেডিও ও টেলিভিশন স্টেশনগুলো পুনরায় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

পূর্বের মিলিটারি অ্যাকশনের সাথে এবারের মিলিটারি অ্যাকশনের পার্থক্য হচ্ছে, এবার তা গৃহযুদ্ধকালীন অবস্থায় পরিচালিত হবে, আগে যেটা ছিল কেবল সিভিল কর্তৃপক্ষের সহায়তার জন্য। প্রথমেই আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়।

ফরমান বুঝলেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের খুঁজে বের করা মুশকিল হবে। কারণ, তারা স্থানীয় জনগণের সমর্থন পাচ্ছিল। তিনি একটা রাজনৈতিক কনফারেন্স

www.pathagar.com

আয়োজনের পরামর্শ দেন। এতে সবাই হাজির হলে তখন তাদের গ্রেফতার করা হবে। প্রেসিডেন্ট ন্যায়সঙ্গভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি ফরমানের সাথে একমত হলেন না তিনি বলেন, '' আমার সাথে সম্মেলনে বসা অবস্থায় নেতাদের গ্রেফতার করবে না।'

কোন লিখিত আদেশ না দিয়ে কমান্ডারদের সংকটে ফেলা হল। ফরমান যশোরে যান। রাজা কুমিল্লায়, আর কর্ণেল সাদুল্লাহ রংপুরে ও রাজশাহীতে যান। তিনি চট্টগ্রামে যেতে চেষ্ঠা করেন কিন্তু পারেন নি। একজন লিয়াজোঁ অফিসারকে সিলেটে পাঠানো হয় কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

ঢাকা থেকে প্রেসিডেন্টের বিদায় ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়। তিনি হঠাৎ করে মার্চের ২৫ তারিখে সন্ধ্যা ৭ টায় ঢাকা ত্যাগ করেন। নিজের দেশের একটি প্রদেশের জনগণকে ভয় পেয়ে প্রেসিডেন্ট অতি গোপনে জেনারেল হামিদ চালিত টএকটি প্রাইভেট গাড়িতে করে এয়ারপোর্ট যান এবং সেখান থেকে বিশেষ বিমানে করাচি চলে যান ফেরার পথে লজিস্টিক এরিয়া কমান্ডার প্রেসিডেন্টের গাড়িতে বসেন। গাড়িতে চার তারা লাইসেন্স প্লেট ছিল, প্রেসিডেন্টের পতাকা ছিল এবং ইয়ং ব্রিগেডিয়ার ভান করেন যে, তিনি ইয়াহিয়া খান।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তখন মুজিবপন্থী ইনফরমাররা সবখানে। উইং কমান্ডার খন্দকার ঢাকা ঢাকা বেসে এর সেকেন্ড ইন কমান্ড, প্রেসিডেন্টকে প্লেনে উঠতে দেখেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুজিবকে ফোন করে জানালেন এবং গোপন তথ্যটি ফাঁস হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বুঝতে পারলো যে, বিপদ সামনে চলে এসেছে। টিক্কা বললেন, 'মধ্যরাতে ক্রাকডাউনের আগে একজন ছাড়া সব পাখিরা উড়ে গিয়ে ভারতে আশ্রয় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিল।'

তাৎক্ষণিক এ অ্যাকশন না নেওয়া হলে কর্ণেল ওসমানির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হত। ইবিআর এবং ইপিআর বিদ্রোহ করে ঢাকার বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম নৌবন্দরকে দখলে আনার কথা ছিল। বিদ্রোহী ইপিআর এবং পুলিশ ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণ করা কথা ছিল। আর মার্চের ২৫/২৬ রাতে ইবিআর উদ্দেশ্য ছিল সেনানিবাস আক্রমণ করা। ভারত থেকে সীমান্তে সহায়তা প্রদান করার কথা ছিল। এ জন্য জেনারেল টিক্কা তার অপারেশনকে এ গিয়ে আনলেন, যাতে তারা সরকারকে চার ঘন্টার মধ্যে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন।

এ বিরাট কাজটি করার জন্য টিক্কা খানের জন্য প্রস্তুত ছিল- ১৪ ইনফ্যানট্রি ডিভিশন, যার অধীনে ছিল ৪টি ইনফ্যানট্রি ব্রিগেড, একটি আর্মার্ড রেজিমেন্ট,

পাঁচটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট, দুইটি মর্টার ব্যাটারিজ,, ৬টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এবং ১৬ হাজার সদস্য বিশিষ্ট ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে নিরস্ত্র করার কথা, তাই এদের ব্যবহার করা যাবে না। এরা আসলেই বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। জেনারেল টিক্কার হাতে ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত ১২ হাজার সৈন্য, ১৩ ব্যাটালিয়ন মুজাহিদ ও রাজাকার। তাদের বিরুদ্ধে ছিল ১০ হাজার অস্ত্র সজ্জিত বাঙালি, ছয়কোটি উত্তেজিত জনগণ, যারা দেশের ৫৫ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকায় অবস্থান করছিল। আর ছিল অসংখ্য নদনদী। (মানচিত্র ৩: ১৪ ইনফ্যানট্রি ডিভিশন মোতায়েন।)

যখন বোঝা গেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত অবস্থিত সেনা সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো সৈন্য পাঠানো হয় বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। কথা ছিল দুই ব্যাটালিয়নের একটি ব্রিগেট পাঠানো হবে। কিন্তু ১৪ ইনফ্যানট্রিকে সহায়তা করার জন্য ২৫ মার্চের আগে মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় পৌঁছায়।

দি ক্রাকডাউন

২৫ ও ২৬ মার্চের মাঝামাঝি রাত ১টায় সামরিক ক্রাকডাউন আরম্ভ হয়। তার পরের দিন রেডিওতে মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে শোনা যায়, ' আজ থেকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।" করাচিতে নেমে ইয়াহিয়া রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং আওয়ামী লীগকে বেআইনি ঘোষণা করেন। সব রাজনৈতিক দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মিডিয়ার উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপ করেন। এবং মুজিবের তৎপরতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে আখ্যায়িত করেন। (ব্রিগেডিয়ার রহিমউদ্দীন খানের একটি বিশেষ ট্রাইবুনাল শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষী ঘোষণা করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন ১৯৭১ এর আগস্টে। কিন্তু ইয়াহিয়া এটাতে স্বাক্ষর দেননি)

অপারেশন সার্চলাইট আরম্ভ হবার ১৫ মিনিটের মাথায় ধানমন্ডির বাসভবন থেকে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। এ কাজটি করেন মেজর বিলাল এবং তত্ত্বাবধানে ছিলেন লে. কর্নেল জেড এ খান।

দোতলা বাসাটি ছিল সাদাসিদে কাঠামোর এবং সামনের বাগানটি ছিল ছোট। এটাকে খুব সহজেই ঘেরাও করা হয়েছিল। কমান্ডো কোম্পানি এ কাজে কোন বাঁধার সম্মুখীন হয় নি। শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের পর বাসা সার্চ করার

www.pathagar.com

কথা ছিল। ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির (লে. কর্নেল চৌধুরী মোজাফফর আলী খান জাহিদ)। জাহিদ বলেন, সে আদেশ পেয়েছিল যে কোন গুলি করা না হয়। জাহিদ তার সৈন্যদের বলেন, 'আমরা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাতে চাই না। এটা আমাদের দেশ। কিন্তু যখন জাহিদ শেখ মুজিবের বাসায় যান, মুজিবের স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে তাকে গালাগালি করে। তারা কায়েদ কায়েদ-ই-আযমকেও গালাগারি করে। জাহিদ এ অপমান সহ্য করতে না পেরে, এই মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে চলে আসেন। কর্ণেল জাহিদ বলেন যে, শেখ মুজিবের বাসায় ৫ লাখ রুপি মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ছিল মার্কিন ডলার, জার্মানির মার্ক এবং ভারতীয় রুপি। বসার ঘরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি সাজানো ছিল।

৪ এপ্রিল কোন বিঘ্ন ছাড়াই ড. কামাল হোসেন ঢাকায আত্মসমর্পণ করেন। আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা পালিয়ে গেল। দিনের বেলায় মুজিবকে রাখা হয় আদমজী গ্যারিসন হাইস্কুলে এবং নিরাপত্তার কারণে রাতে তাকে সরিয়ে আনা হয় ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউজে। ভুট্টো তখনও ঢাকায় ছিলেন। তিনি হোটেল ইন্টারকন্টিন্টোলে অবস্থান করছিলেন। ভুট্টোর সহকারি গোলাম মোস্তফা ফের ২৭ মার্চ মুজিবের সাথে ভুট্টোর একটা বৈঠকের আয়োজন করেন। মুজিব আটকাবস্থায় ভুট্টোকে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন, 'তোমার বাপ তো চলে গেছে।' তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে আলাপ করার আর কিছু নেই। ভুট্টো ঢোক গিলে অপমান হজম করল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপমহাদেশের অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উত্তপ্ত কেন্দ্র। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের দাপট প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। স্বাধীনতার পরও এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে এ প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭১ সালে এসে আওয়ামী লীগের জঙ্গি শাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দাপট প্রতিষ্ঠিত করে।

২ মার্চ ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের জঙ্গি নেতা আ স ম রব এবং তার সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে একটি সভার আয়োজন করে, যেখানে প্রথমবারের মত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আসম রব ছাত্রদের আবেগকে জাগ্রত করল। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালি সেনাবাহিনী ছিল বৈদেশিক আগ্রাসনের শক্তি। তাদের ধ্বংস করতে হবে। তিনি ছাত্রদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলেন, যাতে তারা পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম সৈয়দপুর, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকার বিহারী অধ্যুষিত অবাঙালি ক্যাম্পগুলো মোকাবিলা করতে পারে। চরমপন্থী ছাত্রদের জন্য গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পর মার্টিন তার প্রতিবেদনে বলেন, ‘‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের মাঠে চরমপন্থীরা ছাত্রদেরকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দিতে থাকে।’’

তাই আশ্চর্যের কিছু নয় যে ২৫/২৬ মার্চ রাতের মিলিটারি অ্যাকশনের প্রথম টার্গেট ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষকরা জিন্নাহ হলে থাকতেন এবং হিন্দু ছাত্ররা থাকত জগন্নাথ হলে। ইকবাল হল সব রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। রোকেয়া হল ছিল মেয়েদের। জগন্নাথ হলকে বেরিকেট দেওয়া হয়। চারপাশে ছিল কাঁটাতারের বেড়া, আর ভেতরে চলে রাইফেল ট্রেনিং। বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছিল বিদ্রোহীদের কেন্দ্র। এদের মধ্যে ছিল বিদ্রোহী ছাত্র, অধ্যাপক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা।

৫৭ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সব বিদ্রোহীদের অপসারণ করা। এটি কঠিন কাজ ছিল। কারণ, এখানে ছিল অসংখ্য ভবন ইত্যাদি। এজন্য ব্যাটালিয়নকে দেওয়া হয় ট্যাঙ্ক এবং আর্টিলারি ব্যাটালিয়ন। ধারণা করা হয়েছিল যে বড় বড় ট্যাঙ্ক আর বন্দুক দেখে ছাত্ররা নিজেদের অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু তা হয়নি। এ জন্য একটা সর্বাত্মক মিলিটারি অপারেশন পরিচালিত হল। মেশিন গান মর্টার সেলস আর রাইফেল ব্যবহৃত হয়। এমনকি ট্যাঙ্কও ব্যবহৃত হয়। বিকট আওয়াজে বিদ্রোহীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন অস্ত্র চালানো হয়। জগন্নাথ হলের প্রতিটি কক্ষ খালি করা হল। ইকবাল হল ও রোকেয়া হলেও বন্দুক চালানো হয়।

ভোর চারটার মধ্যে জমজমাট ক্যাম্পাস নীরব হয়ে পড়ে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ছিল ৬৬ জন ‘চরমপন্থী’ বাঙালি। আহত ছিল ৩১ জন। আর ৪

জন জওয়ান প্রাণ দিয়েছিলেন নিজ দেশের নাগরিকদের কাছ থেকে দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষার জন্য। জেনারেল আরবাবের ভাষ্য অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ছিল ১৬৭ জন। তিনি স্বীকার করেন যে তার সৈন্যরা অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার সাদামাটা এপার্টমেন্টে বসে, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান স্মরণ করেন, তিনি ২৫/২৬ মার্চের রাত। তিনি এ লেখককে বলেন যে তিনি অনেক গুলির আওয়াজ শুনতে পান। তার মতে কয়েকশ মারা গিয়েছিল সে রাতে। যখন তাকে নিহত বুদ্ধিজীবীদের নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি তাদের নাম বলেন, তাদের মধ্যে ছিল বাংলার অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী; দর্শনের অধ্যাপক জে সি দেব; সঙ্গীতের অধ্যাপক সুরজউদ্দীন হোসেইন, ইংরেজির অধ্যাপক জগন্নাথ। বেসরকারি সূত্র অনুযায়ী নিহতের সংখ্যা ছিল পাঁচশো। মেজর শফিউল্লাহ্ বলেন, এটি সব চাইতে বেশি রক্তক্ষয়ী অপারেশন, য়েখানে কয়েক হাজার জনকে হত্যা করা হয়। আরবাবের সৈন্যদেরকে অপমানিত করা হয়, ওদের উপর থুথু ফেলা হয় একমাস ধরে। তারা ইচ্ছা মত প্রতিশোধ নিল। জঙ্গি ছাত্ররা সৈন্যদেরকে বিদেশী সৈন্য বলে আখ্যায়িত করেছিল। সে রাতে তারা আসলেই ভিনদেশি সেনাবাহিনীর মত আচরণ করল। তার পরেও অনেক রাতে তারা এধরনের আচরণ করে। তাদের আর পূর্ব পাকিস্তানী নাগরিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় একটি বড় দূরত্ব। আরবাবের অধীনে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন, ৩২ পাঞ্জাব, ঢাকার পুলিশ লাইনকে মোকাবিলা করল। তাদেরকে নিরস্ত্র করবার প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি। কারণ, বাঙালি পুলিশ অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

টিক্কা খান সবসময় ভোরে উঠতেন এবং ২৬ মার্চ তিনি ভোর সাড়ে চারটায় উঠে পড়েন। আযানের সময় তিনি ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি ভবনে অবস্থিত মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে যান মিলিটারি অ্যাকশনের ফলাফর জানার জন্য। যাওয়ার পথে তিনি দেখেন যে সববাংলাদেশি পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো হচ্ছিল। তিনি স্বস্তিবোধ করলেন যে, অন্ততঃ বর্তমানের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য চিহ্নগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ঢাকায় এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনদিন ধরে মিলিটারি অ্যাকশনের পর অবশেষে চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। তিনি চিন্তা করেন নি যে, এ নিস্তব্ধতা ছিল ভয়ের ফলশ্রুতি। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের সমর্থন মোটেও কমে নি। সরকারের প্রতি ঘৃণা বরং বেড়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহ

১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: বাঙালি অফিসার রেজাউল জলিলের কমান্ডে ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোরে, ভারত সীমান্ত থেকে ৩০ মাইল দূরে। ব্রিগেডিয়ার এস. এ. আর দুররানীর কমান্ডে ১০৭ ব্রিগেডের সাথে এই রেজিমেন্ট যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ২৯ মার্চ যখন ১ ইস্ট বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার জানতে পারেন যে তার রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা হবে, তিনি বিক্ষুব্ধ হন। রেজাউল জলিল বলেন, 'এটি একটি অপমান, এর অর্থ হচ্ছে যে, তারা আমাকে বিশ্বাস করছে না।' একটা সমঝোতা হল। ঠিক করা হল যে, অস্ত্র আর্মারিতে জমা হবে, আর চাবি থাকবে ব্রিগেড কমান্ডারের হাতে। পরের দিন যখন ব্রিগেডিয়ার দুররানী চাবি নিতে আসলেন, ইস্ট বেঙ্গলের সিও- ১ তার নিজের ব্যাজ, র‌্যাঙ্ক সব ছিড়ে চাবিসহ তার ব্রিগেড কমান্ডোরের পায়ের সামনে মাটিতে ফেলে দিলেন। একই সময়ে ১ ইস্ট বেঙ্গল গুলি করতে শুরু করে ২২ ও ২৫ বালুচ- এর দিকে। এ দুই পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন একইভাবে পাল্টা গুলি ছুঁড়তে থাকে। নির্দেশ দেওয়া হয়- ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট সরাসরি দুইটি গান/বন্দুক নিয়ে ১ ইস্ট বেঙ্গলের কোয়ার্টার গার্ডে গুলি মরার জন্যে।

১ ইস্ট বেঙ্গল সরে আসে রেঞ্জ এর আঙ্গিনায়। একই দিনে বিকেল ৪ টায় ১ ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে দুই ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন ও একটি ফিল্ড রেজিমেন্ট আক্রমণ চালায়। ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অবশেষে পরাজিত হয় এবং ১৩০ জন বাঙালি সৈন্যকে আটক করা হয়।

২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: জয়দেবপুরের পুরানো রাজপ্রাসাদে অবস্থিত ২ ইস্ট বেঙ্গলকে দুটি কোম্পানি ও একটি প্লাটুনে বিভক্ত করা হয়। একটি কোম্পানি ছিল টাঙ্গাইলে, আরেকটি কোম্পানি ছিল ময়মনসিংহে, আর প্লাটুনটি ছিল গাজীপুরে। এগুলোর কাজ ছিল আইন- শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গর্বের সঙ্গে শফিউল্লাহ বলেন যে, মার্চের ১ তারিখের পর (যখন ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি স্থগিত হল) তিনি আর পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের প্রতি অনুগত থাকাটা বাধ্যতাবোধ মনে করলেন না। তিনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং শেখ মুজিবের নির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি বলেন, সে তারিখের পর থেকে ২ ইস্ট বেঙ্গল গোপনীয়ভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয় যখন সারা শহরে কালো পতাকা উড়ানো হয়। শফিউল্লাহ বলেন, যে তিনি অন্তর থেকে এর বিরোধিতা করেন নি, যদিও ওই দিনেই তিনি অতীতে চাঁদতারা পতাকাটি উত্তোলন করতেন।

www.pathagar.com

২৭ মার্চ শফিউল্লাহ্ তার কমান্ডিং অফিসারকে বলেন, 'আমরা শেখ মুজিবের পক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনি চলে যেতে চাইলে যেতে পারেন। আর থাকতে চাইলে থাকতেও পারেন। আর যদি বলেন, আমরা আপনাকে বেধে রাখতে পারি, যাতে বোঝা যায়, আপনি বিদ্রোহের অংশ নন।' লে. কর্ণেল রকিব নীরবে ইউনিট ছেড়ে চলে যান।। কারণ, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। তারপর থেকে তার আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

শফিউল্লাহ্ ২ ইস্ট বেঙ্গলকে ময়মনসিংহে রেখে এবং শেখ মুজিবের প্রতি তার সৈন্যদের আনুগত্যের শপথ নেন। তার রেজিমেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি থেকে তিনি একটি ঘোষণা প্রচার করেন, ''আমি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শফিউল্লাহ্, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছি। আপনি যদি বাঙালি হন, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনারা অস্ত্র বা যে কোন কিছু হাতে তুলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এবং আপনার দেশকে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্ত করুন। তিনি ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমানকে হালুয়াঘাটে পাঠান ভারতীয় বিএসএফ এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। আজিজ বিএসএফ এর কমান্ডান্টের সাথে দেখা করেন। আর শফিউল্লাহ্ ভারতীয় গোয়েন্দা ও ক্যাপ্টেন বালজিৎ এবং লে. ক. সিনহার সাথে দেখা করেন। শফিউল্লাহ্ বলেন যে, তার অনুরোধে তিনি ইতিবাচক সাড়া পান। তিনজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ২ ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেন। এরা ছিলেন মেজর কাজী নুরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ও ক্যাপ্টেন আব্দুল মতিন। শফিউল্লাহ্ দাবি করেন যে তিনি ৩ হাজার সৈন্য এবং আটজন অফিসারকে সংগঠিত করতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন সেহগাল, যিনি আর্মি এভিয়েশন স্কোয়ার্ডন থেকে পালিয়ে আসেন। ময়মনসিংহে এবং মধুপুরে ২ ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর হামলা চালায়। তারা ব্রিজ উড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাণীপুর ব্রিজ। ইউনিটটি পরে রাজশাহীর উপর দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ২ ইস্ট বেঙ্গলে চারজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ছিল।

৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: ২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট ও ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের সাথে ৩ ইস্ট বেঙ্গল সৈয়দপুরে ছিল। এ শহর এবং এর আশপাশের এলাকায় উর্দুভাষী বিহারীরা ছিল, তারা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিল।

সে দিন রাত ১০ টায়, ড. মঞ্জুর আলম নামের এক ভদ্রলোক ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মুহম্মদ শফিকে ফোন করে জানালেন যে,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক দল সৈয়দপুরে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। শফি তার লোকজনকে বাইরে পাঠালে তারা দেখতে পায় যে, অনেক লোক সৈয়দপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ওদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য আকাশের দিকে গুলি ছোড়া হল। কিন্তু তারা সেটাকে পাত্তাই দিল না। একজন সাহসী বাঙালি যুবক প্রতিবাদ জানানোর জন্য তার শার্ট খুলে বুক সামনে এগিয়ে দিল। মিছিলটা সামনে অগ্রসর হতে থাকলো এবং তাদেরকে ভয় দেখানো জন্য গুলি ছোড়া হলে একজন নিহত হয়। সবাই তখন পালিয়ে গেল। অবশ্য, টান টান অবস্থা বিরাজ করছিল। স্থানীয় জেলা প্রশাসক আন্দোলনকারীদের পক্ষে ছিল এবং কর্নেল শফির উপর রেগে গেলেন। কারণ, কর্নেল শফি সিভিলিয়ান কর্মকর্তার কোন রকমের অনুরোধ ছাড়াই অ্যাকশন পরিচালনা করেছেন।

ডনজের ব্যাটালিয়নের সামনে যাতে পড়তে না হয়, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মঞ্জুর আহমেদ সাব ইউনিটগুলিকে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন দিকে পাঠালেন।

একটি কোম্পানিকে পাঠানো হয় ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দিনাজপুরে এবং আরেকটি কোম্পানিকে পাঠানো হয় ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বগুড়ায়। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার এবং দুই কোম্পানি সৈয়দপুরে থেকে গেল।

৩ ইস্ট বেঙ্গলের কিছু দূরে আজম কোয়ার্টারে অবস্থিত ছিল ২৩ ফিল্ড। শফিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ৩ ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার জন্য। এ দু ইউন্টি ১ এপ্রিলে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংক্ষিপ্ত তিক্ত সংঘর্ষের পর ৩ ইস্ট বেঙ্গল পরাজিত হয়। ৪০ থেকে ৫০ জনকে বন্দী করা হয়। অন্যরা অস্ত্রসহ ১০ মাইল দূরে পার্বতীপুর রেল স্টেশনে পালিয়ে যায়। তারা রেখে যায় ৬৯ জন নিহতের লাশ। তারা পরে দিনাজপুরে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে একত্রিত হয়।

ইস্ট বেঙ্গলের কোম্পানি দিনাজপুরে এসে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের সাথে একত্রিত হয়। এবং তারা মিলিত অবস্থায় দিনাজপুর দখল করে। তারা কমান্ডিং অফিসার এবং তার সেকেন্ড ইন কমান্ডসহ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের হত্যা করে। পরে ২৩ ফিল্ডের সহায়তায় ২৬ এফএফ অপারেশন চালিয়ে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে দিনাজপুরকে তাদের দখলে আনে। যখন শফি দিনাজপুরে আসেন, তিনি কাঞ্চন নদীতে হাজার হাজার লাশ দেখতে পান। দিনাজপুরে অবাঙালিদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান টেলিভিশনের আসলাম আজহার এ হত্যাকান্ডের ছবি তুলে রাখেন।

www.pathagar.com

রংপুর ও বগুড়াকে সাফ করার জন্য ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টর দায়িত্ব গ্রহণ করে। অস্ত্র ছাড়া বিভিন্ন দিকে ২৫/২৬ মার্চ রাতে রেজিমেন্ট বের হয় । রাস্তায় গাছ ফেলে তাদের পথে বাঁধা দেওয়া হয়েছিল। তারা এগুলো সহজে পার হতে পারলো। রংপুরকে সাফ করা হলো, আর বিদ্রোহী বাঙালিদের কাছ থেকে খুব বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি।

২৩ ফিল্ডকে দায়িত্ব দেওয়া হয়- বগুড়াকে মুক্ত করার জন্য, সেখানকার সব এমএনএ ও এমপিএ- কে গ্রেফতার করা, বগুড়ায় অবস্থিত ৩ ইস্ট বেঙ্গল এবং ইপিআর সদস্যদের নিরস্ত্র করা এবং অস্ত্রাগারকে হামলা থেকে রক্ষা করা।

যখন ২৩ ফিল্ড শহরের কাছাকাছি আসলো, তারা রেলক্রসিংয়ের সব গেট বন্ধ পেল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একটা বিদ্রোহী দল বগুড়ার অস্ত্রাগার দখল করে এবং ওদের দিকে গুলি ছুড়তে থাকে। শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরো জনবল ও অস্ত্র পাঠানোর জন্য খবর দেওয়া হল।

অস্ত্রধারীদের সাথে ৩ ইস্ট বেঙ্গল বিদ্রোহীদের বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। রেজিমেন্ট শেষ পর্যন্ত আর্টিলারী গুলি বর্ষণ করতে থাকলো বিদ্রোহীদের বিভিন্ন ঘরবাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য। বাঙালি অফিসারগণ লে. কুদ্দুস, লে. সালাম এবং লে. আলাউদ্দীন পালিয়ে যান নি; তারা ২৩ ফিল্ডের প্রতি অনুগত হয়ে থেকে গেল। এপ্রিলের শেষ নাগাদ বগুড়া সাফ করা হল। কিন্তু কয়েকশ নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিল কিছু নির্দোষ নাগরিক, যারা বন্দুক যুদ্ধের মাঝে পড়ে গিয়েছিল।

৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের লে. ক. খিজার হায়াতের অধীনে ৪ ইস্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করা সম্ভব ছিল না। এ রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর খালেদ মোশাররফ সিওসহ তার পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করে। আর ব্যালিয়ানকে সীমান্তের ওপারে ভারতের আগরতলায় নিয়ে যায়।

৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন প্রথম বাঙালি অফিসার যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি ইউনিটগুলোকে নিরস্ত্র শুরু করার পরের দিনই ২৬ মার্চ চট্টগ্রামে বসে রেডিওতে জিয়া নিজেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, তিনি পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। ২৭ মার্চ ১৯৭১ তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকবার ঘোষণা করেন। রেডিও স্টেশনটি কক্সবাজারের নিকটবর্তী কালুরঘাটে স্থাপন করেছিলেন।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুরের পক্ষে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেকে বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর অস্থায়ী কমান্ডার ইন চিফ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন শহরে সংঘর্ষ চলছে।

বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য তিনি সকল দেশের সরকারের প্রতি আহবান জানান । তার রেডিও কেন্দ্র থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে বিজয়ের কল্পিত খবর প্রচার করা হয় এবং এসব খবর আবার প্রচার করে অল ইন্ডিয়া রেডিও, বিবিসি এবং রেডিও অস্ট্রেলিয়া।

চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে বিরাট সংখ্যক বাঙালি সৈন্য ছিল, যার জন্য মেজর জিয়া বৃহত্তম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। চট্টগ্রামে একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাটালিয়ন ২০ বালুচ আর তারা ২০:১ অনুপাতে ছিল।

বিদ্রোহ দমন করার জন্য চট্টগ্রামে ছিল কুমিল্লায় এইচকিউ ৫৩ ব্রিগেড (ব্রি. ইকবাল শফি), কুমিল্লায় ২৪ এফএফ লে. ক. শাহপুর খান), চট্টগ্রামে ২০ বালুচ (লে. ক. এ এইচ ফাতিমি), এবং ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট লে. ক. ইয়াকুব মালিক)।

২৬ মার্চ রাতে ২৫ এফএফ করাচি থেকে এসে চট্টগ্রামে যায় ২০ বালুচকে আরো শক্তিশালী করার জন্য। লগ এরিয়া কমান্ডার এম এইচ আনসারীকে চট্টগ্রাম এলাকায় সৈন্যদের কমান্ড করার জন্য বলা হয়, যতক্ষণ মে. জে. খাদেম হুসেইন রাজা চট্টগ্রামে না আসে। মে. জে. খাদেমের সাথে আসেন সিও ২ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন লে. ক. সুলেমান। ২ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের এক কোম্পানি চট্টগ্রামে পেরণ করা হয়।

ব্রিগেডিয়ার শফিকে আদেশ দেওয়া হয় ২৪ এফএফ সহ চট্টগ্রামে যেতে, যাতে ২০ বালুচের উপর চাপ কমে যায়। তিনি ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টকে কুমিল্লায় রেখে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হন। কুমিল্লাতে আসার আগ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক ছিল। কিন্তু ৮ ইস্ট বেঙ্গল ২৮ মার্চে সেখানে একটি রোডব্লক দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল। তিনি আগাতে পারেন নি। ২২ এফএফ এর একটা কোম্পানি রোডব্লকটাকে সরাতে চেষ্টা করলে, তাদের উপর বিদ্রোহীরা ঝাপিয়ে পড়ে। লে. ক. শাহপার খান তার দ্বিতীয় কোম্পানিকে নিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে যায়। উপকূলে অবস্থিত নৌবাহিনীর একটা গানবোটও এ যুদ্ধ যোগ দেয়। এ গোলাগুলিতে শাহপার মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দেশের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ব্রি. ইকবাল শাফি ২৪ এফএফ এর দায়িত্ব নেন। লে. ক. সুলেমানকে আদেশ দেওয়া হয় ২৪এফএফ এর সাথে রোডব্লক সরিয়ে ফেলার জন্য। ২৯ মার্চ বিকাল ৫টায় ২ কমান্ডো ব্যাটালিয়নের গাজী কোম্পানির উপরও হামলা চালানো হয়। লে. ক. সুলেমান, ক্যাপ্টেন সিকান্দার, সুবেদার আল্লাদীন এবং আরো ১৯জন প্রাণ হারান। ২৯ মার্চে রোড ব্লক টি সরিয়ে ফেলা হয়। এবং পরের দিন ইকবাল শাফি চট্টগ্রামের কাছেই চলে আসেন। ৩১ মার্চ তিনি চট্টগ্রামে পৌছান এবং সেখানকার গ্যারিসনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১ এপ্রিলে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলসের হেডকোয়ার্টার দখলে নেওয়া হয়। একই দিন বিমানবাহিনীর আক্রমণে সেই গোপন বেতার কেন্দ্রটিও ধ্বংস করা হয়। ১০ এপ্রিলের মধ্যে ৩৩ বালুচ চাঁদপুর নদীবন্দরকে সাফ করে ফেলেছিল, আর ১২ এফএফ লাকসামকে নিয়ন্ত্রণে আনলো।

১১ এপ্রিল পর্যন্ত ৮ ইস্ট বেঙ্গল চট্টগ্রামের আশেপাশে প্রতিরোধ চালিয়ে গেল। চট্টগ্রামের পূর্বে অবস্থিত কর্ণফুলি নদীর তীরে কালুরঘাট এলাকায় একটা প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। জিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলক্রসিং ও ফেরিঘাট দখলে রেখেছিলেন। তিনি নদীর সামনে একটা কোম্পানি মোতায়েন করেন পাকিস্তানীদের পথে বাঁধা দেওয়ার জন্য। ৩ কমান্ডো ব্যাটালিয়ন প্রচন্ড হামলা চালানো বিদ্রোহীদের সরানোর জন্য।

মেজর জিয়া তার ইউনিটকে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে যায়। এক কোম্পানি যায় রাঙামাটি। আরেক কোম্পানী যায় কাপ্তাই, এক কোম্পানি যায় কক্সবাজার। অবশেষে ১১ এপ্রিল জিয়া সীমান্তের ওপারে ভারতে যান, তার প্রাক্তন শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্য।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার: ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) অবস্থিত ছিল চট্টগ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে নতুনপাড়া ক্যান্টনমেন্টে। একজন বাঙালি অফিসার, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এর কমান্ডে ছিলেন। তার অধীনে ছিল ২৫০০ অস্ত্রধারী, যারা প্রায় সবাই বাঙালি ছিলেন।

তারা সবাই মিলে বিদ্রোহ করলে, পশ্চিম পাকিস্তান বেকায়দায় পড়ার কথা। মজুমদারকে অতি গোপনে সরিয়ে নিতে তারা কৌশল নিল। মিলিটারি অ্যাকশনের কয়েকদিন আগে জেনারেল খাদেম হোসেইন রাজা প্লেনে করে হাজির হলেন। এসে তিনি মজুমদারকে ঢাকায় স্থানান্তর করলেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের দায়িত্ব নিলেন লে. ক. শিগ্রী। এতে ২০ বালুচের জন্য অ্যাকশন নিতে সুবিধা হল এবং ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে ১১ টায়, শফিউল্লার হিসাবে ১০০০ বাঙালিকে হত্যা করা হয়, যখন তারা সেন্টারে ঘুমিয়ে ছিল।

www.pathagar.com

১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট: ঢাকায় অবস্থিত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করা হয়। কিন্তু তার আগেই সংঘর্ষে ১০ জন মৃত্যু বরণ করে।

ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস্

ঢাকার পিলখানায় ইস্ট বেঙ্গল রাইফেল্স- এর ১০০০ সদস্যকে নিরস্ত্র করা হয়। হতাহতের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

মিলিটারি অ্যাকশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাজশাহী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। রাজশাহীতে অবস্থিত ২৫ পাঞ্জাব (লে. ক. এমএইচ মালিক)- এর দুইটি কোম্পানিকে ইপিআর ঘেরাও করে। জেনারেল টিক্কা আদেশ করেন যে, সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় রাজশাহীতে নিশ্চিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের সব চাইতে বড় শহর রাজশাহী এবং সেখানে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী ছিল। সব বিপ্লবীদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা থেকে ১৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত রাজশাহী। ঢাকা ও রাজশাহীর মাঝে ছিল দুটি বড় নদী- গঙ্গা ও যমুনা। রাজশাহী ভারতের সীমান্তে অবস্থিত। তিনটি আলাদা আলাদা দল রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একটি দল সড়ক পথে ৭/৮ এপ্রিল রাতে আসতে থাকে। আরেকদল নৌকাযোগে এগোতে থাকল। তৃতীয় দলটি হেলিকপ্টারযোগে রাজশাহীতে গিয়ে নামে।

২৭ বালুচের একটা কোম্পানি কুষ্টিয়াতে অবস্থান করছিল। এবং জনগণের ক্ষোভ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না। এটি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। এপ্রিল ১৫, অবশেষে ১৩ এফএফ কুষ্টিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনে।

আরো সৈন্য

জেনারেল টিক্কা খান বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদ্রোহ দমন করার জন্য তার আরো সৈন্য দরকার। তিনি হেড কোয়ার্টার্স সিএমএলএ এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে প্রতিবেদন পাঠান। এবং আরো সৈন্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। ১ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন একটি করে ব্যাটালিয়নে এ সৈন্যরা আসতে থাকে। কিন্তু তারা সাথে কোন ভারী অস্ত্র আনে নি। এবং তাদের ডাইরেক্ট সাপোর্ট আর্টিলারী ছিলনা। এতে তাদের কাজের ক্ষতি হয়, বিশেষ করে যখন একটি যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছিল।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবারগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত যেতে থাকে। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ৯ ইফ্যান্ট্রি ডিভিশন এবং ১৬ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ইস্ট পাকিস্তানে আসে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এ তিনটি অসম্পূর্ণ ডিভিশনের দায়িত্ব ছিল নিম্নরূপঃ

৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন

এইচকিউ	কুমিল্লা	মে. জে. শওকত রিজা
দায়িত্ব		মেঘনার পূর্ব দিক
৩১১ ব্রিগেড	সিলেট	ব্রি. ইফতেখার রানা
১১৭ ব্রিগেড	কুমিল্লা	ব্রি. খুশী মুহম্মদ খালেদ
৫৪ ব্রিগেড	চট্টগ্রাম	বি. মুহম্মদ ইকবাল শফি

১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন

এইচকিউ	ঢাকা	মে. জে. এম রহিম খান
দায়িত্ব		ময়মনসিংহ-ঢাকা- যশোর এলাকা
২৭ ব্রিগেড	ঢাকা	ব্রি. নূর আহমদ হুসেইন
১১৭ ব্রিগেড	ময়মনসিংহ	ব্রি. এুহম্মদ আতিফ
৫৭ ব্রিগেড	ঢাকা	ব্রি. জাহানজেব আরবাব
১০৭ ব্রিগেড	যশোর	ব্রি. মুহম্মদ হায়াত

১৪ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন

এইচকিউ	নাটোর	মে. জে. নজর হুসেইন
দায়িত্ব		যমুনা ও গঙ্গা নদীর মাঝে
২৩ ব্রিগেড	রংপুর	ব্রি. আবুদ্দাহ মালেক
২৪ ব্রিগেড	বগুড়া- নাটোর	ব্রি. আব্দুল নাঈম

এপ্রিল আর মে জুড়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা রোড ব্লক সরাতে থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনীদের আটক করে, নদী বন্দর আর যোগাযোগ কেন্দ্রগুলোকে দখল করে, পাহাড় চূড়া থেকে বিদ্রোহীদের তাড়িয়ে দেয়। রাস্তা ও রেল লাইন থেকে বিদ্রোহীদের সরিয়ে দেয়। তাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

www.pathagar.com

অপারেশনগুলো কষ্টকর ছিল। কারণ, মুক্তিবাহিনী ছোট ছোট নদীর উপরের পুলগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে। মেঘনা নদীর পূর্বে বিস্তির্ণ এলাকা তিনপাশে ভারত দ্বরা আবর্তিত এবং ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীকে গোলা বারুদ ও অস্ত্র সরবরাহ করে।

সীমান্ত বন্ধ রাখার জন্য ছোট ছোট ইউনিট গঠন করা হয়। বার বার টহল দিয়ে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে যায়। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরে মালামাল আনার জন্য রেল, সড়ক ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের দরকার ছিল। স্থানীয় সহায়তা ছাড়া নৌকা পাওয়া সম্ভব ছিল না। আর স্থানীয় জনগণ কোন রকম সহযোগিতা করছিল না। মাইন, হামলা, স্থানীয় জনগণের অসহযোগিতা আর ভারতের হস্তক্ষেপ, এসব পরিস্থিতিকে আরো কঠোর করে ফেলে। ইপিআর, ইবিআর আর পুলিশের বিদ্রোহীরা ঘন ঘন জঙ্গলে আর ভয়ঙ্কর নদীগুলোতে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। এগুলোকে খুঁজে খুঁজে সাফ করতে হয়। কাউন্টার ইনসারজেন্সি অপারেশন চালাতে সৈন্যদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। পরিস্থিতি ছিল বৈরী। কিন্তু এ বৈরী অবস্থায় ইউনিট থেকে দূরে দূরে থেকে সৈন্যদের মনোবল দুর্বল হতে থাকে। নিরস্ত্র নাগরিকদের গণহারে হত্যা করাও তাদের মনোবলকে দুর্বল করে। একজন সৈন্য দায়িত্ব শেষে যখন বাড়ি ফিরে গেলেন, তার স্ত্রী তাকে দেখে চমকে উঠে বললো, 'তোমার চোখে রক্ত!'

আহত-নিহত

২৫ মার্চের পর যে গৃহযুদ্ধ হয়, তাতে দুই পক্ষের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কারণ, এটি একটি যুদ্ধে পরিণত হয় এবং সমগ্র জনগণ বিদ্রোহের পক্ষে ছিল । তাছাড়া বাইরের শক্তির মদদ ছিল।

মুজিব দাবি করেন যে, ৩০ লাখ লোককে মারা হয়েছিল সামরিক ক্রাকডাউনে। ভারতীয়রা নিহতের সংখ্যা ১০ লাখে নামিয়ে আনে। জেনারেল টিক্কা খান স্বীকার করেন ৩৪০০ লোক নিহত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানকারী মিশনারীরা বলেন ৩০ হাজার। পশ্চিমা লেখকরা বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী একহাজারের বেশি শিক্ষককে হত্যা করেছে।

এ গণহত্যার দায়ভার নিতে হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, ইপিআর, ইবিআর- এর বিদ্রোহীদের। একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু কিছু সদস্য উন্মাদ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এলোপাতাড়িভাবে গুলি ছুঁড়তে থাকে, গামে গ্রামে আগুন

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে দেয় এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। অন্যদিকে বিদ্রোহীরা ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছা সেবকরা কোন ফেরেস্তা ছিলেন না। তারাও অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, শুধু ২৬ মার্চের পর না, তার আগেও।

বগড়ার শান্তাহার এলাকায় ১৫০০০ এর বেশি নাগরিককে উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হয়। মাদের কে নিজ সন্তানের রক্ত পান করতে বাধ্য করা হয়। চট্টগ্রামে মুক্তি বাহিনী ১০ হাজার লোককে হত্যা করে। পাবনার কাছাকাছি সিরাজগঞ্জে মুক্তিবাহিনী ৩৫০ জন নারী ও শিশুকে ঘর বন্ধ করে আগুন পুড়িয়ে হত্যা করে। ময়মনসিংহে ২০০০ পরিবারের একটা কলোনি ধ্বংস করা হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নারীদের ধর্ষণ করে হত্যা করে।

আগস্টে পাকিস্তান সরকার শ্বেতপত্র তৈরি করে। সেটাতে ঘটনা বেশির ভাগ সত্য ছিল। বা বিদেশী প্রেসও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ভারতীয় পত্রিকা স্টেটসম্যান লেখে,' এটা ভীতির কারণ যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা লাখ লাক অবাঙালির উপর হামরা চালাচ্ছে।' দি টাইমস অব লন্ডন লেকে, 'জানা যায় যে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান শরণার্থী যারা দেশ ভাগের সময় পূর্ব বঙ্গে স্থায়ী হয়েছিল, তাদেরকে ক্ষুব্ধ বাঙালিরা নির্বিচারে হত্যা করে।'

একটি ইউএসআইডি প্রকল্পের প্রকৌশরী লেনন লানসডেন বলেন যে, দুই সপ্তহব্যাপী চট্টগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগণ বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে জবাই করছিল। বাঙারিদের হাতে মোহাজীরদের ধর্ষণ, লুট ও গণহারে হত্যা সমন্ধে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ, সিলন ডেইলি নিউজ এবং ওয়াশিংটন ইভেনিং স্টার।

জানা যায়, ১ লাখ এর বেশি হত্যাকান্ড ছিল আওয়ামী লীগ কর্মী ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিশোধের ফলাফল। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা, যারা শেখ মুজিবের ভক্ত, তারা এ সংখ্যাকে কমিয়ে দেয়। তারা মিলিটারি অ্যাকশনকে গণহত্যা বলে আখ্যায়িত করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চায় যে পাকিস্তান আর্মি বিদ্রোহ দমনকালে যে সকল হত্যাসহ ইত্যাদি পরিচালনা করে, তার জন্য পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিৎ।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালি অফিসারগণ দ্বিধাবোধ করেন। একদিকে ছিল পকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্য অন্য দিকে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ তাদের পদে থাকলেন, যদিও তাদের মন পড়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে তাদের আপনজনদের সাথে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর ডিজি ব্রি. আব্দুল হাফিজ বলেন যে, তিনি (তখন মেজর) এবং ৫/৬ জন অন্য বাঙালি অফিসার শিয়ালকোটে বসে ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনবার জন্য। লে. আহমেদুল হক বিদেশী কোন রেডিওতে ভাষণ শোনার সময় তা রেকর্ড করেন। সরকারি মিডিয়ায় তা প্রচার হয়নি। হাফিজ বলেন যে, শেখ মুজিবের ভাষণ ছিল মুগ্ধ করার মত, 'ক্লাসিক' এবং এ ভাষণটি শুনে তার প্রাণের ভিতরে উৎসাহ জাগে।

কিন্তু তারপর দিন, ২৫ মার্চ মিলিটারি অ্যাকশন ঘটে। হাফিজ সংবাদপত্রে খবরটি পড়ল। তিনি স্তব্ধ হলেন। তিনি তার বাঙালি বন্ধুদেরকে ফোন করেন এবং রেডিওর খবর শুনতে থাকেন। তিনি যখন প্রেসিডেন্টের ঘোষণা শুনলেন যে, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সামরিক শাসন আরো জোরদার করা হয়েছে। তখন তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে অনেকক্ষণ হাটলেন, আর ভাবলেন কি করা উচিৎ?

বাঙালি অফিসারগণ পরদিন তার বাসায় জড়ো হল। তারা বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ৩ ইস্টবেঙ্গলকেও নেওয়ার সিন্দান্ত নিল। এ রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল শিয়ালকোটে, ভারতের সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে। তারা ঠিক করল ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিযে পাকিস্তান আর ভারত দখলকৃত কাশ্মীরের মাঝামাঝি, সীমান্তের নিকটে মারালায়। তারা তখন সীমান্ত পার হয়ে ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগে ৩ ইস্ট বেঙ্গলকে খায়রানে পাঠানো হয়। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা হয়তোবা আঁচ করতে পারল যে তারা পালাবার পরিকল্পনা করছে। মেজর তাহের কোয়েটা ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে সিনিয়র ট্যাকটিক্যাল কোর্স করছিলেন, যখন তিনি মিলিটারি ক্রাকডাউন সম্পর্কে শুনলেন ব্রি. হাফিজের ন্যায়, তিনিও বিস্মিত হলেন এবং তার কক্ষের বাইরে পায়চারি করতে থাকেন। লরেন্স লিফশুলজ পরে তার সাক্ষাৎকার নিলে তিনি বলেন যে,

www.pathagar.com

তিনি কোয়েটায় সব বাঙ্গালি অফিসারদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধ যোগ দিতে বলেন।

মেজর জিয়াউদ্দীন এবং আবু তাহের জিএইচকিউ থেকে সিয়াকতে যান পাকিস্তান সেনাবাহিনী ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে। শিয়ালকোটে অবস্থিত ১৪ প্যারা ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর, মেজর মঞ্জুর ছিলেন প্রথম বাঙ্গালি অফিসার যিনি সবার আগে পাকিস্তান থেকে পালিান। তিনি তার পরিবার ও ব্যাটম্যানকে নিয়ে আগষ্ট মাসে সীমান্ত পার হলেন। তার ব্রিগেডের অপারেশন প্ল্যান সাথে নেন এবং এটা ভারতীয়দের খুব কাজে আসে, যখন তারা শাখারগড় হামলা করে। তিনি তার গাড়ি রেখে গিয়েছিলেন। সাতদিন পর একই স্থান থেকে আরেক বাঙ্গালি অফিসার পালিয়ে যায় ভারতে। তিনি তার বিএসএ মোটর সাইকেল পাকিস্তানে রেখে যান।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ব্রিগেডিয়ার হাফিজ বলেছেন যে, "এটা আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত এবং বাংলাদেশ তখন তার শ্রেষ্ঠ ফর্মে ছিল।" কিন্তু ভারত যে মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করত এবং প্রশিক্ষণ দিতো, তা তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি চেয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা নিজেরাই দেশ স্বাধীন করবে।

লে. জে. ওয়াসিউদ্দীন জাতীয় গণপরিষদ স্থগিত করা সম্পর্কে বলেন, "এটা আমাদের মুখে চড় মারার সমান"। তিনি তখন মুলতানে একটা কোর কমান্ড করছিলেন। তাকে যখন এ গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বদলি করা হয়, তিনি পদত্যাগ করেন এবং অন্যান্য আটক বাঙ্গালি অফিসারদের সাথে যোগ দেন।

মিলিটারি অ্যাকশনের ফলাফল

৩১ মে'র মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ এবং অন্যান্য প্যারা মিলিটারি বাহিনীর বিদ্রোহকে দমন করা হয়। সরকারের কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় সব বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) পশ্চিম পাকিস্তানীদের দখলে চলে আসে এবং মাঝের এলাকাগুলোকে সাফ করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনী, প্যারামিলিটারি বাহিনী এবং পুলিশ থেকে অস্ত্র গোলাবারুদসহ বিপুলসংখ্যক বাঙ্গালি সেনা ওপারে ভারতে পালিয়ে যায়। এরা মূলত মুক্তিবাহিনী গঠন করে। প্রবাসে কর্মরত ১৩০ জন বাঙ্গালি কুটনীতিকও বিদ্রোহ করে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করাকে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলো সমালোচনা করে। আর মিলিটারি অ্যাকশনের সাথে কথিত গণহত্যা আরো কঠোর

www.pathagar.com

সমালোচনার সম্মুখীন হয়। পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃত্বের প্রতি, বিশেষ করে পাঞ্জাবি কর্তৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর প্রতি তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে মিলিটারি অ্যাকশন সফল হয়েছিল এবং তখন শুধু দরকার ছিল রাজনৈতিক আলোচনা পুনরায় শুরু করা, কিন্তু আসলে পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, তা থেকে ফেরা সম্ভবপর ছিলনা। যারা এতদিন দোটানায় ছিল, বা পাকিস্তানের প্রতি বেশি দুর্বল ছিল, তারাও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেতে থাকে। রাওয়ালপিন্ডি শাখা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা বলেন যে, তিনি ২৬ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানি ছিলেন। তারপর থেকে তিনি বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী হন। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় মানিক মিয়ার ছেলে মঈনুল হোসেন মিলিটারি অ্যাকশন সমন্ধে বলেন, "সে দিনই পাকিস্তান শেষ হয়ে যায়"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তালুকদার মুনিরুজ্জামান বলেন যে, তিনি ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। কিন্তু তারপর আর নয়। প্রফেসর শামসুল হক (পরবর্তীতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী) বলেন যে, মিলিটারি অ্যাকশন এর কোন যুক্তি ছিল না। ইনাম চৌধুরী একজন মিতচারী অভিজ্ঞ বাঙালি আমলা বলেন যে, মিলিটারি ক্র্যাকডাউন আরো নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। শুধু চরমপন্থীদের টার্গেট করা উচিৎ ছিল।

মিলিটারি অ্যাকশনের আগে ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিক সবাইকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তারা কলকাতায় চলে যায়। ভারত তাদেরকে এসকর্ট করে এবং তারা পশ্চিম বাংলা থেকে ঘটনাগুলো কভার করতে থাকে। ঢাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাদের প্রতিবেদন অতিরঞ্জিত হতে থাকে। জেনারেল টিক্কা খান স্বীকার করেন যে, বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে দেওয়াটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তবে করাচির ডিফেন্স জার্নালের সম্পাদক ব্রি. এ আর সিদ্দিকী, তৎকালীন ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারের জনসংযোগ কর্মকর্তা এ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন তারা বেশি দেখে ফেলতো। তিনি আভাস দেন যে, তারা থাকলে আসল হতাহতের প্রতিবেদন পাঠাতো।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে সঠিক চিত্রটি সিএমএলএ হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়নি। তারা হতাহতের বিস্তারিত বিবরণও দেয়নি। আর যা দিয়েছিল, তাও ঘটনা ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক কমিয়ে বলা হয়। ৩০ ও ৩১ মার্চের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ঢাকা এবং অন্যান্য শহরের পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। মিলিটারি অ্যাকশনের পরে জনগণের মনোভাব সম্পর্কে গোয়েন্দা

www.pathagar.com

সংস্থাগুলো কোন স্টাডি করেনি। কোন রকম তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন করা হয়নি।

মিলিটারি অ্যাকশন নেওয়া হয়েছিল মূলত সরকারের কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপন ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য। এ অ্যাকশনটি বিশেষত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ইত্যাদি থেকে বিদ্রোহীদের অপসারণ করার জন্য দেওয়া হয়। এটা ছিল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কিন্তু অবশেষে তা সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে গেল।

শান্তির প্রচেষ্টা

মিলিটারি অ্যাকশনের পর সামরিক প্রশাসন বাঙালিদের ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করে। তারা মেরামতের কাজে লেগে যায়। মানসিক বিপর্যস্ততা দূর করার চেষ্টাও করে। তারা জনগণের আনুগত্য, আস্থা ও সহযোগিতা পেতে চেষ্টা চালায়। তারা জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সেনাবাহিনী জনগণের জান মাল রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মিলিটারি অ্যাকশনের প্রথম পর্যায়ের পর, গভর্নর এবং জোন বি এর সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান নবাগত ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার লে. জে. আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজিকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশ দেন। ৭ জুন ১৯৭১ তারিখে পেশকৃত এ নির্দেশে বলা হয়, 'এটি খুবই জরুরি যে, যেন শাস্তিমূলক কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হয়। যদি শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতেই হয়, তবে তা লিখিতভাবে পেশ করতে হবে ব্রিগেডিয়ার বা তার উর্ধ্বের কোন কর্মকর্তার দ্বারা ।' এটি ছিল জেনারেল টিক্কার আদেশ। শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হয়। যারা ভারতীয় প্রচারণায় ভুল পথে গিয়েছিল, তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। তথা কথিক গণহত্যা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে ভারতীয় প্রচারণা বিদেশে পাকিস্তানের ভাবমূর্তির যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা দেওয়া হয়।

ইস্টার্ন কমান্ডকে জেনারেল টিক্কার নির্দেশে বলা হয়, 'সংখ্যালঘু জনগণকে আশ্বস্ত করতে হবে যে তারা পাকিস্তানের অন্য যে কোন নাগরিকের মত সমান অধিকার নিয়ে থাকতে পারবে। তাদের ধর্মকর্ম পালনেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তাদের উপসনালয়গুলোকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।" তিনি এ নির্দেশটির ব্যাপক প্রচার চান। সীমান্তের নিরাপত্তার স্বার্থে সিলেট-ভারত সীমান্তের পাঁচ মাইল এলাকায়

www.pathagar.com

জনগণকে সরাতে হল। টিক্কা বলেন, ' এ সুযোগে শত্রুপক্ষের লোকজন ছদ্মবেশে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পরতে পারে। যারা ফেরত আসবে তাদেরকে ভালো করে নিরীক্ষা করতে হবে।'

জেনারেল টিক্কা বলেন, 'আমাদের আচরণ হতে হবে ন্যায়সঙ্গত, দৃঢ় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু হায়! তা হবার ছিল না। সংখ্যালঘুদের তাড়ানোর কাজ চলতেই থাকে।

জেনারেল টিক্কা পূর্ব পাকিস্তানে বাণিজ্যিক তৎপরতা পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেন। তিনি অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন চলাচলের উপর জোর দেন।

কমান্ডার হারুন ইবনে আলীকে মাত্র কিছুদিন আগেই পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন নৌ বাহিনীর অফিসার। তাকে বলা হয় মালামাল পরিবহনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। পাট রপ্তানির জন্য সোনালী আঁশকে বন্দরে নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। হারুন প্রতিদিন অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের চেয়ারম্যান আব্দুর রশীদ এবং রেল ও সড়ক পরিবহন বোর্ডের সচিব কাজী জালালের সাথে বৈঠক করেন। রশীদ ও জালাল দুজনই বাঙালি ছিলেন।

হারুন বলেন যে, তারা তাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল এবং বাণিজ্যিক পরিবহন সব রুটেই চলতে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কোস্টারযোগে খাদ্য শস্য অভ্যন্তরীণ রুটের সর্বত্রই আনা নেওয়া হয়। পাট বোঝাই লঞ্চ বিভিন্ন এলাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে নেওয়া হয়। আইডব্লিউটি বেশি পরিমাণে পাট রপ্তানী করতে থাকে।

হারুন কী কী অগ্রগতি সম্পন্ন করলেন জেনারেল টিক্কা সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। এভাবে এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সবকিছু ঠিকভাবে চলছিল।

মে মাসের মাঝামাঝি পুরো পূর্ব পাকিস্তানে সরকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। দোকানপাট খোলা হল, মিল কারখানা চলতে থাকলো। স্কুল কলেজও খোলা হয়। টিভি ও বেতার কেন্দ্রগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। এমন কী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জগদেব সিংও স্বীকার করেন যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কর্তৃত্ব জোরালো হতে থাকে। তিনি বলেন, 'ভারত যখন নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পড়ল, পাকিস্তানীরা সীমান্ত পর্যন্ত চলে আসে।' কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি ঘৃণা থেকেই গেল।

www.pathagar.com

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

অপারেশন সার্চলাইটের আটটি লক্ষ্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাস্তবায়ন হল। তাও আংশিকভাবে। ছয়টি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মধ্যে কয়েকটি নিরস্ত্র করা হয়। যারা অস্ত্রসহ ভারতে চলে গেল তারা মুক্তিবাহিনী গঠন করে।

শুধু দুজন চরমপন্থী আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হল। আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর আরো কড়া নজরদারী করা উচিৎ ছিল। যদি বেশিরভাগ প্রভাবশালী নেতাদের গ্রেফতার করা হতো, তাহলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের পক্ষে সংগঠিত হওয়া কঠিন হতো। যদিও সব বড় বড় মহল নিয়ন্ত্রণে ছিল, তবে গ্রাম-গঞ্জ ছিল বিদ্রোহীদের দখলে। সেনাবাহিনীর চলাচল ছিল সীমিত এবং নিরাপত্তা ছিল দুর্বল।

রেডিও টিভি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসলেও, ভারতের মাটিতে অনেক গোপন রেডিও স্টেশন থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তাই পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা তখনও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যাচ্ছিল।

সামরিক আইন যথেষ্ট কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। আসলে গৃহযুদ্ধ চলা অবস্থায় সামরিক আইনের কোন তাৎপর্য থাকে না। প্রশাসনকে কার্যকর করা হলেও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যাচ্ছিল না। কারণ, সীমান্ত বন্ধ করা যায় নি। একটা নতুন সিভিল প্রশাসনকে গঠিত করবার পরিবেশ করা যাচ্ছিল না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নমনীয় সদস্যদের নিয়ে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো গঠন করা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

তথাকথিত পাঞ্জাবী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জোরপূর্বক দমন করবার সিদ্ধান্তটি স্থানীয় এবং বিদেশি সংবাদপত্রে স্থান পায়। রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত সিএমএলএ এইচকিউ-এ যারা ছিলেন, তারা মিলিটারি অ্যাকশনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদের কাছে সরকারের কর্তৃত্বকে পুনরায় স্থাপন করা ছিল অতিজরুরি। এটা অস্বীকার্য যে ২৫ মার্চে এসে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা স্থবির অবস্থায় ছিল। মুজিব ও তার সমর্থকদের একটি বিকল্প সরকারই ক্ষমতায় ছিল। এভাবে চলতে দেয়া যায় না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় ছিল। তবে এ কঠোর সিদ্ধান্ত নেবার আগে, পরিস্থিতি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা উচিৎ ছিল। এ পদক্ষেপের ভাল-মন্দ দুইদিক যাচাই করে আরো

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। মিলিটারি অ্যাকশন -এর প্রতি বাঙ্গালিদের কি প্রতিক্রিয়া, তা নিয়ে কোন মূল্যায়ন হয় নি। তারা যারা মধ্যপন্থী অবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাদেরকেও বিবেচনায় আনা হয় নাই। মিলিটারি অ্যাকশনের ফলে ওরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তা সঠিকভাবে নিরুপন করা হয় নাই। বাঙ্গালিরা যে সব ছেড়ে ভারতে চলে যাচ্ছিল, তারও তাৎপর্য ঠিক মত বিশ্লেষণ করা হয় নাই। বন্ধু দেশগুলোর প্রতিক্রিয়াও ঠিক মত যাচাই করা হয় নাই। ভারত যে পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিচ্ছিল, তাও ঠিক মত বিশ্লেষণ করা হয় নাই।

আমি জনাব ভুট্টো এবং অন্যান্যদের সাথে একমত পোষণ করিনা যে, মিলিটারি অ্যাকশনের পরে, সাধারণ ক্ষমা ও নির্বাচিত এমএনএ নিয়ে সরকার গঠন করা হবে,পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখা সম্ভব ছিল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জেনারেল ইয়াহিয়াকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। তিনি ইয়াহিয়াকে সহজে ছাড়বেন না, তা ছিল স্পষ্ট। তিনি এখন সারা পৃথিবীকে দেখাতে পারছেন যে এক কোটি শরণার্থী ভারতের ঘাড়ে এসে পড়েছে। কারণ তারা পাকিস্তানী বাহিনীর অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য ছিল। এ সুযোগে সে পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পরিকল্পনা পৃথিবীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কাজে লেগে যায়। ইসলামাবাদ যতই চাল চালতে চেষ্টা করুক না কেন, ইন্ধিরা গান্ধী তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ভুলটা ছিল যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দূর দৃষ্টি সহকারে কূটনীতি করতে পারে নি এবং এ জন্য এই বিপর্যয় এড়াতে পারে নাই। তারা ক্রাইসিস কূটনীতি অবশেষে হাতে নিলেও, তা ফলপ্রসূ হয় নি।

অবশ্য যারা নির্দেশ পালন করেছিল, তাদের সবাইকে কসাই বা চেঙ্গিস খাঁ বলে আখ্যায়িত করলে ঠিক হবে না। তারা ছিল সৈন্য, রাজনৈতিক কলহের ক্রসফায়ারে তারা পড়ে যায়। যুগযুগ ধরে রাজনৈতিক ভুল তাদের পক্ষে মোকাবেলা সম্ভব ছিল না। আবেগকে আরো নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিৎ ছিল। এ কথটা বলা যত সহজ পালন করা তত সহজ নয়, তারপরেও নিয়ন্ত্রণে থাকা অপরিহার্য ছিল।

একটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ দীর্ঘকাল চলতে থাকলে, ভদ্রতার মুখোশ বেশিক্ষণ রাখা যায় না। এ অস্বাভাবিক পরিস্তিতিতে স্বাভাবিক আচরণ করার জন্য অনেক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। উচিত ছিল দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের জঙ্গিদেরকে সরিয়ে ফেলা। বাছবিচারহীন হত্যা থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। এ জন্যই তো বাঙালি উপায় না পেয়ে ভারতে পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পর্যায়ে, আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা, আর শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে কোন সমাধানে আসা যাবে, আশা করা উচিত হয় নাই। এতে অখন্ডতা নিশ্চিত করা সম্ভব ছিল না। আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করা উচিত ছিল না। সমঝোতার জায়গা রাখা দরকার ছিল। সীমিত মিলিটারি অ্যাকশনের পর তাহলে পুনরায় আলোচনায় বসা যেত।

ঢাকা থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে চরম ভুল। এতে পাকিস্তান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। আগস্টে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা অকার্যকর ছিল। কারণ , এটাকে লোক দেখানো ছাড়া আর কিছু মনে করা হয়নি।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
পাকিস্তানের ভাঙ্গনে ভারতের ভূমিকা

ইতিহাসের প্রান্তি

ভারতের হিন্দুরা সহজে উপমহাদেশের বিভক্তিকে মেনে নেয় নি। তারা এর বিরোধীতা করে। যখন এর আর কোন উপায় ছিল না, তখনমাত্র তারা এটাকে মেনে নেয়। সে সময়ের ধ্বংসযজ্ঞে ১০ লাখ লোকমারা যায় এবং ৪০ লাখ লোককে নিজ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর দাগ কেটে যায়। স্বাভাবিকভাবে ভারতের নেতৃত্বে এবং জনসাধারণের মধ্যে এ 'ভুল' টাকে ঠিক করার কিছুটা হলেও একটা আকাঙক্ষা থেকে যায়।

এ্যা ভারতকে বিভক্ত করা হল। কতগুলো ধর্মান্তরিত লোক দ্বিজাতি-তত্ত্বকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করে। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয় হিন্দুদের সম্মানিত নেতা মহাত্মা গান্ধী, যাকে আন্তর্জাতিকভাবে 'এ্যাপোসলি অব নন ভায়োলেন্স' বলা হয়, ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে ইস্ট বেঙ্গল কংগ্রেস পার্টির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে তিনি বলেন যে, ইস্ট বেঙ্গল কংগ্রেস কমিটি যেন কখনও ইস্ট বেঙ্গলকে বিভক্ত হিসেবে বিবেচনা না করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতার স্থপতি, জওয়াহারলাল নেহ্‌রু যোশেফ করবেলকে বলেন, 'একদিন পাকিস্তান অনিবার্যভাবে ভারতের সাথে এক হবে।' ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এস রাধাকৃষ্ণ মনে করেন যে দেশ বিভক্তি এক চরম ভুল যরি জন্য ভারতের অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। তিনি বলেন, এ দুই রাষ্ট্রের আবার এক হতেই হবে- তা প্রয়োজন এবং অনিবার্য। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) সভাপতি এবং পরবর্তীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি, বলেন, 'আমি নিশ্চি যে, এ বিভক্তি ক্ষণস্থায়ী।' এআইসিসি'র আরেক নেতা আচার্য্য কৃপানি তিক্ততার সঙ্গে বলেন, 'কংগ্রেস এবং সমগ্র জাতি অখণ্ড ভারতের দাবি ছাড়ে নি। ভারত যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা অখণ্ডতা না পাওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না।' ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নামকরা রাজনীতিক সর্দার

www.pathagar.com

প্যাটেল কায়েদ-ই- আযমের উপর এমন বিক্ষুব্ধ ছিলেন যে, যখন কায়েদ-ই-আযম ১৯৪৭ সালের ৭ আগষ্ট করাচিতে চলে যান, তিনি বলে উঠলেন,' ভারতের শরীর থেকে বিষ চলে গেছে।' উত্তর প্রদেশের গভর্নর মিসেস সরোজীনি নাইডু বিশ্বাস করতেন যে, 'একদিন না একদিন ভারত আবার এক হয়ে যাবে।" জওয়াহারলাল নেহ্রুর বোন মিসেস বিজয় রক্ষী পন্ডিত কোনদিন ভারতের ভাঙ্গনকে মেনে নেন নি। অন্যদের মত তারা বাধ্য হয়ে তা মেনে নিয়েছেন। কারণ, 'এর বিকল্প ছিল বৈদেশিক শাসন।' বম্বের মুখ্যমন্ত্রী বি. জে. খের বলেন, 'ভারত বিভক্ত হলেও, তা হবে সাময়িক এবং শেষ পর্যন্ত ভারত আরো নিবিড়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে।।' সংসদ সদস্য সুব্রামানিয়াম স্বামী স্বীকার করেন যে, ভারতের মূলধারা পাকিস্তানকে ভারতের অংশ করতে চায়।

পাকিস্তানের পলিটিক্যাল স্টাডির লেখক কিথ কালার্ড বলেন যে, 'অনেক ভারতীয় আছেন যারা পাকিস্তানের সৃষ্টিকে ভুল মনে করেন, আর এ ভুল ঠিক করা সম্ভব।'

কায়েদ- ই- আজমও লক্ষ্য করলেন যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের অনুভূতিকে পাকিস্তানবিরোধী করার জন্য নেতিবাচক প্রচারণা চালু রাখে। ২৮ মার্চ ১৯৪৮ সালে ঢাকা রেডিও তার ভাষণ প্রচার করে। তিনি বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক সংগঠন এবং সংবাদপত্র, যারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল, তারা এখন পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের উস্কানি দিচ্ছিল। এসব কথা অবশ্য আবেগপূর্ণ ছিল। কারণ, বক্তব্যগুলো ছিল ঠিক দেশ বিভক্তির পরপর। কিন্তু ইনস্টিটিউিট অব ডিফেন্স এ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক এ্যানালাইসিস (আইডিএসএ)-এর প্রধান, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি কে. সুব্রামানিয়াম ৩১ মার্চ ১৯৭১ সালে বলেন, " ভারতের বুঝতে হবে যে পাকিস্তানের ভাঙ্গন আমাদের স্বার্থের পক্ষে, এ সুযোগ আর কোনদিন আসবে না।"

দেশ বিভাগের পরপর ভারত প্রিন্সসলি স্টেটস- এর স্বায়ত্বশাসন কেড়ে নেয়। এবং ভারতের ভেতরে অঙ্গিভূত করা হয়। যে সব প্রিন্স প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্ট করে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশী অ্যাকশন নেওয়া হয়। ৪০টি প্রিন্সলি স্টেটের সাথে হায়দারাবাদ ও জুনাগড়কে একত্রিত করা হয়। কাশ্মীরর বিতর্কিত অংশকে ভারতের অংশ বলে গণ্য করা হল। সিকিম তার স্বাধীন পরিচয় হারিয়ে ফেলে। পর্তুগীজ এনক্লেভ গোয়াকের ভারতের মধ্যে আনা হল। নেপালকে ভারতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় এবং ভুটানকে খবরদারির মধ্যে রাখা হল। পাকিস্তানের সেনা প্রধান স্যার ক্লানডেড অচোনিক বলেন, "আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, বর্তমান

www.pathagar.com

ভারতীয় মন্ত্রীসভা যতটা সম্ভব পাকিস্তানের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে।”

ভারতের স্বাধীনতার কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে নমনীয় করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তাননের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা ছিল বিপদমুক্ত। যদিও ১০ লাখ হিন্দু পশ্চিম থেকে পূর্বে যায় খুব বেশি হিন্দু পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় নি। পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার মধ্যে ২০% ছিল হিন্দু। এদের মধ্যে খুব বেশি পশ্চিমবঙ্গে যায়নি। একটি বড়সংখ্যা পূর্ব বঙ্গে থেকে যায়, তারা ছিল একটি প্রেসার গ্রুপ। অনেকে তাদের পরিবারকে কলকাতায় পাঠালেও নিজেরা ঢাকায় বসবাস করে। সীমান্তের উপর দিয়ে তারা ঘন ঘন যাওয়া আসা করে। এতে সীমান্ত আরো ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। হয়। পাকিস্তানের অর্থনীতিকে আরো দুর্বল করার জন্য পাট, চাল এবং স্বর্ণ চোরাচালান বড় আকারে শুরু হয়। এ বেআইনি চোরাচালান বন্ধ করার জন্য মেজর জেনারেল উমরাও খান ১ অপারেশন ক্লোজ ডোর’ শুরু করেন।

১৯৪৯ সালে জে বি মিত্তার , পূর্ব পাকিস্তানের একজন হিন্দু, ৩৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তোলেন। এর লক্ষ্য ছিল ‘প্রবাসী’ পূর্ববঙ্গ সরকারকে শক্তিশালী করা। তারা সীমান্তের ওপার থেকে এসে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে থাকে। ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার পূর্ববঙ্গের রাজনীতির প্রতি একটু বেশিই কৌতুহলী ছিলেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন, যদি কোন দলের নীতি ভারতের পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে তারা যেন কোন একটি নির্দিষ্ট দলকে সমর্থন না দেয় ।

আগরতলা ষড়যন্ত্র

১৯৬৩ সাল থেকে ভারত পাকিস্তান সেনা বাহিনীর বাঙালি সদস্যদেরকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুযোগ নিয়ে তারা নৌবাহিনীর কিছু সদস্যকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এদের দিয়ে তারা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদাকরা। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে– এ ছিল তাদের মূল মন্ত্র। তারা রাজনীতিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করে, বিশেষ করে শেখ মুজিবের সঙ্গে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবও একই মনোভাব পোষণ করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ভারতে যান এবং ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন। সুব্রামানিয়ামও বলেন যে, মুজিব ঘন ঘন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তখনও রাজনীতিকে রাজপথে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন নি। তিনি আশা করেছিলেন যে, ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আইয়ুব খান নির্বাচিত হবেন না। তিনি ভাবলেন একটা গণতান্ত্রিক সিভিলিয়ান সরকার ক্ষমতায় আসলে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার দিকে নজর দেয়া হবে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আইয়ুব খান বিজয়ী হলে মুজিব হতাশ হয়ে পড়েন।

তিনি তখনই মনস্থির করেন যে পূর্ব বাংলাকে অসাংবিধানিক উপায়ে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে হবে। তিনি উপলব্ধি করলেন এর জন্য দরকার হবে ভারত থেকে মানসিক, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য। ১৯৬৬ সালের আগস্টে বিদ্রোহীরা শেখ মুজিবের সাথে তার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে দেখা করে। ওদের কর্মকান্ড আরো বাড়িয়ে দেয়ার জন্য মুজিব তাদের উৎসাহ দেন। তিনি তাদের আশ্বস্থ করেন যে, সময় হলে ভারত তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

১৯৬৬ সালে ভুট্টো ছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের উস্কানি দিচ্ছে। ৯ জুন ১৯৬৬ সালে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বালতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ১১ ভারত ভেবেছে যে, তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে যেখানে তারা তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।" তিনি খুব একটা ভুল ছিলেন না। জুলাই ১৯৬৬ তে পূর্ব পাকিস্তানের এক বাঙালি নাগরিক আইএসআই এর কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান লে. ক. মুহম্মদ আমীর খানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জানান যে, এ নতুন কর্মকান্ডের মূল ব্যক্তিটি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (পাকিস্তান নৌবাহিনী)। আরো যারা জড়িত ছিলেন, তিনি তাদের নাম উল্লেখ করেন- জাতীয় গণপরিষদের স্পিকার ফজলুল হক চৌধুরী এবং মেজর রউফ (ঢাকায় আইএসআই তে কর্মরত)। তবে এ বক্তব্যকে পুরোপুরি প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না।

আমীর খান যখন এ খবর ডিজি, আইএসআই মে. জে. মুহম্মদ আকবর খানকে দেন, জেনারেল আকবর খান উত্তরে বলেন, " এ গুলো সব মিথ্যা কথা।" আইএসআই প্রধান এ বিষয় নিয়ে কথা বলেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক নাসির হুসেইন রিজভীর সাথে এবং তারা সিদ্ধান্ত নেন ব্যাপারটা তদন্তের জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে পাঠানোর জন্য। আইবি'র ডেপুটি ডিরেক্টর সাঈয়ুদকে

www.pathagar.com

ঢাকায় তিনমাসের জন্য পাঠানো হয়। তার প্রতিবেদনে বলা হয় যে যারা খবর দিয়েছিল, তারা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাদের দেয়া তথ্য সঠিক নয়। তারপরেও কমান্ডার মোয়াজ্জেম এবং অন্যান্য সন্দেহভাজন সরকারি কর্মকর্তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়। যাতে তারা কোন কিছুতে জড়িত হতে না পারে।

এর মধ্যে কর্ণেল আমীর পূর্ব পাকিস্তানে আবার যাওয়া আসা করতে থাকে এবং তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কথোপকথন রেকর্ড করেন। তাদের কথায় বোঝা যায় যে, তারা বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা করেছিল। খবর পাওয়া গেল যে, তারা ঘন ঘন ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবং সীমান্ত পার হয়ে আগরতলায় গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর শেখ মুজিব এবং অন্য বাঙালি নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের এবং গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. পি এন ওঝাকে যখন একটা তালিকা দেওয়া হয়, তখন ভারতীয়রা তাদের সম্মতি জানান। সেই তালিকাভুক্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিদ্রোহীদের বের হয় জন্য। সেনাবাহিনীর ভেতরে হতাশ সেনা সদস্যদের সঙ্গে ওঝা যোগাযোগ রাখেন। এবং সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালে আশ্বস্থ করেন যে ভারত প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করবে। তবে তখনও সরবরাহ শুরু হয়নি। ওঝা অজুহাত দেন যে, ভারতের নির্বাচন সামনে ছিল। শুধুমাত্র যখন ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত, তখন এ অস্ত্র সরবরাহ আবার বিবেচিত হয়।

ওঝা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বলেন আগরতলাস্থ গোয়েন্দা সংস্থার কাছে একটা প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য। ওঝাকে আবার যোগাযোগ করা হলে, একটা সময়, তারিখ, স্থান এবং কোর্ড ওয়ার্কস ঠিক করা হয়, আগরতলায় যাবার জন্য। ১২ জুলাই ১৯৬৭, ষড়যন্ত্রকারীরা ভারতীয়দের সাথে বৈঠক করে। জুনিয়র নন কমিশনড অফিসারদের (এনসিও) প্রতিনিধি দলটিকে দেখে ভারতীয়রা কিছুটা নিরাশ হয় এবং বৈঠক ব্যর্থ হয়।

লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রীর লেখা এক পত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্রের তথ্য প্রমাণ রয়েছে। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে এ চিঠি প্রকাশিত হয় 'পূর্ব দেশ' পত্রিকায়। চিঠিতে লেখা হয়, প্রিয়তম, "তুমি আমার সাথে আর নও। বাংলাদেশের জন্য তোমার প্রচেষ্টা আমার মনে আছে। আমার মনে আছে তুমি করাচি থেকে ঢাকায় আসো ছুটিতে। ছদ্মনামে তুমি ভারত দূতাবাসের ফার্স্ট

www.pathagar.com

সেক্রেটারি পি এন ওঝার সাথে দেখ করো, আগরতলা সীমান্তে অন্যান্য ভারতীয় ও বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের সাথে। তুমি অস্ত্র এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য ভারতীয়দের সাথে আলাপ করো।"

আরো তদন্তের পর, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করার জন্য আদেশ দেন। ৪৬ ইস্ট বেঙ্গলের সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তারা গোয়েন্দাদের বলেন যে, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা তাদেরকে জানিয়েছে যে, একটা নির্দিষ্ট দিনে ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সব বিমান ও নৌ রুট বন্ধ করবে। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে যে চার্জ করা হয়, তা হল যে তারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম দ্বারা পরিকল্পনা করেছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য। ৩৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং ১১ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তাদের মধ্যে ছিল শেখ মুজিবুর রহমান; শামছুর রহমান (সিএসপি), রুর‍্যাল একাডেমির পরিচালক ফজলুল কাদের সিএসপি, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, পাকিস্তান নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হক।

এরা যখন গ্রেফতার হয়, শেখ মুজিব তখন আগে থেকেই জেলে। তখন সন্দেহ করা হয় মুজিব আসলে আগরতলা ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন কিনা। এমনকি, জেনারেল আকবরও নাকি বলেছিলেন যে, মুজিব জড়িত ছিলেন না। তার নাম দিয়েছিলেন গভর্নর মোনায়েম খান এবং তাকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অনেকেই জানতেন যে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের পেছনে থেকে মুজিব এসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর মুজিব বলেন যে, তার স্বপ্ন পূরণ হলো।

বিশ্বস্থ সূত্র অনুযায়ী তিনি বেশ অনেক দি ধরে ভারত থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ পাচ্ছিলেন এবং এগুলো লুকিয়ে রাখতেন। বিচ্ছিবাদীদের সাথে কোনরকম সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত। জি. ডব্লিউ চৌধুরী মুজিবের উদ্ধৃতি দেন। মুজিব বলেছেন, "হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য হয়ে আমি কিভাবে পাকিস্তানকে ভাঙার স্বপ্ন দেখতে পারি?" তার বাসায় কায়েদ-ই আযমের ছবি ছিল না, ছিল সোহরাওয়ার্দীর ছবি।

ভারতের লেখকরা স্বীকার করেন যে ১৯৬৭ সালে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছিল আগরতলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় পূর্ববঙ্গকে 'মুক্ত' করা, কিন্তু পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষরা ঠিকভাবে ব্যাপারটা মোকাবেলা করতে পারেনি।

www.pathagar.com

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঠিকমত মোকাবেলা হয় নি। মামলাটাকে যতটা সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিচালনা করা উচিৎ ছিল। এবং দোষীদের যথার্থ শাস্তি দেয়া উচিত। খোলামেলাভাবে মামলাটাকে পরিচালনা করা, যেখানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা শেখ মুজিবও জড়িত ছিল, তার পর আবার তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, এসব মুজিবকে আরো বীরের পরিচয়ে পরিচিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সংবাদপত্র এটাকে ফলাও করে বাঙালিদেরকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আরো দূরে ঠেলে দিল। আগরতলা ষড়যন্ত্র এবং মুজিবের অব্যহতি তাকে 'বঙ্গবন্ধু'তে পরিণত করল বললেন, ফরমান। "আগরতলার মধ্য দিয়ে আইয়ুব মুজিবকে 'শহীদের' পর্যায়ে নিয়ে গেলেন বললেন পিপিপি -এর অন্যতম নেতা আব্দুল হাফিজ কারদার।

তারপর আটকাবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু আরো তোলপারের সৃষ্টি করল। তিনি আগরতলা মামলার আসামী ছিলেন এবং তার মৃত্যুর খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তানে হৈচৈ লেগে যায়।

শরণার্থী

মিলিটারি অ্যাকশনের পর বিরাট সংখ্যক শরণার্থী ভারতের পশ্চিম বঙ্গে যেতে থাকে। ২৭ মার্চ ১৯৭১ এ ভারতের লোকসভা রেজ্যুলেশন পাশ করে বিদ্রোহীদেরকে পূর্ণ সাহায্য, সহায়তা ও আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে। মিলিটারি অ্যাকশনের ৫দিন পর, দিল্লির সাপ্রু হাউজের বাগানে একটি বৈঠক হয়। পূর্ব পাকিস্তানের এ পরিস্থিতিতে ভারতের কি ভূমিকা থাকবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এ বৈঠকে। এখানে সুব্রামানিয়াম প্রথম বলেছিলেন, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের জাতিকে ভেঙ্গে দিয়েছে। আমাদের স্বার্থে এ সুযোগকে হাতছাড়া করা যাবে না। বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে আমাদের সমর্থন করতে হবে।"

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সুব্রামানিয়ামকে ডেকে বললেন, "তুমি আমাদেরকে একটা লজ্জাজনক অবস্থায় ফেলেছো।" কিন্তু তা সত্ত্বেও, ৩১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে পার্লামেন্টের দুপক্ষই রেজ্যুলেশন গ্রহণ করল। এবং পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যাকশনকে 'এক ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি' বলে আখ্যায়িত করে, এবং বলে যে, "এটা একটা গণহত্যা বা জেনোসাইড।"

শরণার্থীর সংখ্যা এককোটি বলে গহণ করা হলেও, এ সমস্যাকে আরো অনেক বেশি ফলাও করে দেখানো হয়, পাকিস্তানকে বেকাদায় ফেলার জন্য। সুব্রামানিয়াম

www.pathagar.com

ভুল বলেন নি, তিনি যখন বললেন যে, "এ ক্ষীণ জলধারা শীঘ্রই মহাপ্লাবনে পরিণত হবে। এক কোটি তিন লাখ শরণার্থী ভারতে চলে আসবে, কারণ এটাই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের জনসংখ্যা।" নাম করা ভারতীয় কলামিস্ট এবং লেখক কলদীপ নায়ার লেখেন, "যারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে ৮৫% ছিল হিন্দু, যারা এমনিতেই পশ্চিম বঙ্গে চলে আসতো ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর।" এ শরণার্থী সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে ভারত পার্শ্ববর্তী দেশে ঢুকে পড়ে। অনেক দেশেই বিভিন্ন কারণে পাশের দেশে আশ্রয় নেয়, কিন্তু কোন সময় এর ফল প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ হয় না।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বে জনমত গড়ে তোলবার জন্য ভারত বলে যে, বাঙালি শরণার্থীর কারনে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু তারা তখন যা খরচ করেছিল, তার থেকে বহুগুন খরচ করে পাকিস্তান ১১ বছর ধরে আফগানিস্তানে শরণার্থীদের জন্য। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভার দুই বিলিয়ন ডলার আর ভারতের খরচ ৩০০ মিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে নি। অথচ ভারত দাবি করেছে যে, তারা ৬৬৬.৬৭ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এটাকে আরো বড় করে দেখানোর জন্য, বিমান ও রেল ভাড়ার উপর বাড়তি ৫০% ভাড়া আরোপ করে। আবার অন্যদিকে ভারতের সংসদ সদস্যরা তাদের সরকারকে বলে যেন তারা শরণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে আশ্রয় দেয়। ৩১ মে ১৯৭১ সালে লোকসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় জ্যোতিময় বসু সরকারকে অনুরোধ করেন যেন সরকারি কর্মকর্তারা সীমান্তে শরণার্থীদের আসায় বাঁধা না দেয়।

ভারত দাবি করে যে শরণার্থীর কারণে তারা বাধ্য হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালে যখন শরণার্থীর কোন চিহ্নই ছিল না, তখন থেকেই ভারত তার সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে মোতায়েন করতে থাকে।

যদি শরণার্থী বিষয়টি এত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ভারতের উচিত ছিল জাতিসংঘের কাছে সহায়তা চাওয়া, যেমন করেছিল পাকিস্তান। এমনকি পরিস্থিতি নিরূপণ করার জন্য যখন জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠাতে চেয়েছিল ভারত তাতে রাজি হয় নি। নয়াদিল্লী ইউএন হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস প্রিন্স করিম আগা খানকেও শরণার্থী শিবিরে যেতে দেয় নি। ভারত ইউএন মহাসচিব উথান্ট এর মধ্যস্থতাতে রাজি হয় নি। যখন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতি হয় এবং বিশ্ব নানা দেশে চেষ্টা করে শরণার্থীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত থাতে

www.pathagar.com

বাঁধা দেয়। ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব টি কে কাউল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জুলাইয়ের ১৬ তারিখ বলেন যে, ভারত তাদের সীমান্তের এপারে ইউএন কর্মকর্তাদের আসতে দেবে না, এমনকি শরাণঅর্থীদের সাহায্যার্থের জন্যও নয়।

তিনি বলেন, তাদের ভূমি থেকে গেরিলা তৎপরতা বন্ধের কোন প্রস্তাবে তারা রাজি হবে না। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানতে চায় শরণার্থীদের কী কী প্রয়োজন, ইন্দিরা গান্ধী প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান। এমনকি আলীপুরের এমপি শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত অভিযোগ করেন যে ডেনমার্ক, কানাডা ও ইউএন থেকে আগত ত্রাণসামগ্রী কলকাতার দমদম বিমান বন্দর থেকে ছাড়ানো হচ্ছিল না। নভেম্বর ১৯৭১- এ পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সমাধানের যে পরিকল্পনা করেন ইয়াহিয়া, শরণার্থীদের পূর্ণ সম্মানসহ ফেরত নেওয়াসহ, ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে।

কে সুব্রামানিয়ামও স্বীকার করেন যে ভারত শুধু শরণার্থীর কারণে পাকিস্তানকে ভাঙ্গে নি। ‘‘এটা বললে একেবারে হাস্যকর হবে।’’ তিনি বললেন, ‘‘ভারত যুদ্ধে গেল কারণ তারা বিশ্বাস করত যে পাকিস্তানকে ভাঙা ভারতের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের পক্ষে যাবে।

সুব্রামানিয়াম স্বীকার করেন যে, ভারত সীমান্ত বন্ধ করার চেষ্টা করে নি। বরঞ্চ শরণার্থীদের আসার জন্য অনুমতি দিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘‘এ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।’’ দেখা যায় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ৩৯ হাজার বাংলাদেশী শরণার্থীকে বাঁধা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল, যখন তারা আসামে ঢোকার চেষ্টা করে।

দিল্লিস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ এন্ড এ্যানালাইসিস (আইডিএসএ) এবং ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার খরচ হিসাব করে, তারা বলে যে, প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার খরচ হবে এক বছরে। এর থেকে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করলে খরচ অনেক কম পড়বে।

ইন্দিরা গান্ধী বেশ সফলতার সাথে বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বর্বর এবং ফ্যাসিবাদী হিসেবে তুল ধরলেও , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য স্থানে অনেকেই ছিলেন যারা এই লোহ নারীর কথা শতভাগ বিশ্বাস করে নি। ইলিনয় -এর শিকাগোতে অবস্থিত এসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ- এ বক্তৃতা প্রদানকালে

www.pathagar.com

থমাস বি মারটন ৩০ মার্চ ১৯৭১-এ ভারতকে তাদের কুমতলবের জন্য ধিক্কার দেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন পৃথিবীর কোথাও কোন দেশ অন্য আরেক দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে ব্যবহার করে নি, সে দেশে আক্রমণ করার জন্য। তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের সংকটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারত এটাতে জড়িয়ে পড়ে, যখন একটা শরাণার্থীও ভারতে যায় নি। এটা নিশ্চয় তারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে করে নি।’’ আশঙ্কা প্রকাশ করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স বলেন, ‘‘যদি প্রত্যেক রাজনৈতিক সমস্যার জন্য সেনাবাহিনীকে মোতাযেন করতে হয়, তাহলে যদ্ধের কোন শেষই হবে না।’’

ভারতের প্রচারণা

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ভারতের জন্য একটি মহাসুযোগ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানীদের অবহেলা করার জন্য জনগণ সামরিক শাসনকে দায়ি করেছিল। এবং এ সুযোগে ভারত প্রচারণা শুরু করে যাতে পূর্ব পাকিস্তান উদ্বুদ্ধ হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্যুত হয়।

অল ইন্ডিয়ায় রেডিও আঞ্চলিক স্বয়ত্তশাসনের জন্য মুজিবের ছয়দফা দাবিকে বারবার প্রচার করতে থাকে। পাশের অভ্যন্তরীণ খবরের তুলনায় এটা অনেক বেশি ছিল। বাঙালি এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য অল ইন্ডিয়া রেডিও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের শোষণ সম্পর্কে সুপরিকল্পিত প্রচারণা চালাতে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এআইআর এর কলকাতা কেন্দ্র একটি প্রোগ্রাম প্রচার করে, যার নাম ‘এপার বাংলা- ওপার বাংলা।’ এতে বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রামকে খোলাখুলি সমর্থন দেওয়া হয়। (তারা তখন ভাবতে পারে নি যে ২০ বছর পরে তারা একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যখন কাশ্মীরিরা তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে এবং পাকিস্তান তাদেরকে নৈতিক সমর্থন দেবে)। বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলোকে বলা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতীয় নেতা হিসেবে তুলে ধরা, যিনি তার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন।

১৯৭০ সালে শুড়ে ভারত পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরতে থাকে এবং বলে যে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুব্রামানিয়াম বলেন যে চারদিকে উল্লাস ছিল। ভারত পাকিস্তান সম্পর্কে একটা নতুন দ্বার খুলে গেল। কাশ্মীরকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ছোট

www.pathagar.com

করা হবে। পাকিস্তানের বাজার ভারতের পণ্যেও জন্য খোলা হবে। যখন ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন না, ভারত হতাশ হল। তারা জাতীয় পরিষদের স্থগিতাদেশকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করল এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের জন্য উস্কানি দিতে থাকল। মিলিটারি অ্যাকশনের পর কলকাতার সংবাদপত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেনাবাহিনী যদিও অবশ্যই ভুল করেছিল, এসব প্রচারণা ছিল অতিরঞ্জিত। আকাশবাণী বেতার কেন্দ্রও একাজে লিপ্ত থাকে। এপ্রিল ১৯৭১ -এ হিন্দুস্তান টাইম পত্রিকার হেডলাইনে বলা হয় যে, ঢাকা সরকারের দখলের বাইরে চলে গেছে।

১৯৬৯ সালে মহারাজ কৃষ্ণান রাশগোত্রকে ওয়াশিংটনে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। মিসেস তাকে তাকে নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে বোঝানোর জন্য যেন তিনি তার পাকিস্তানপন্থী অবস্থান পরিহার করেন। রাশগোত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাকস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা সমন্ধে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিবেনগুলো একত্রিত করে দুইটি বই আকারে প্রকাশ করেন-একটা লাল বাই আরেকটা সবুজ বই এবং তিনি ইউএস কংগ্রেসে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মিডিয়ায় বই দুটি সরবরাহ করেন। তিনি এডওয়ার্ড কেনেডিসহ ৪০জন মার্কিন সিনেটরকে শরণার্থী শিবির প্রদর্শনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তারা বিশ্বাস করল যে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ যৌক্তিক হবে।

দিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক স্পোকসম্যান এস কে সিং পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যাকশন সম্পর্কে তথ্য জমা করতে থাকেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাস থেকে পাঠানো খবর, টেক্সট এসব নিয়ে তারা ‘বাংলাদেশ ডকুমেন্টস’ নামে দুইটি বই তৈরি করে। তিনি একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা তুলে ধরেন। বিদেশী দূতাবাস এখান থেকে তথ্য নিয়ে যার যার দেশে প্রতিবেদন পাঠায়। ফলে বিশ্ব ওই একতরফা খবর পেল।

সিং পরবর্তীতে জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও কানাডা সফর করে শরণার্থী বিষয়টিকে বড় করে প্রচার করেন। তিনি তাদের সহায়তা চান। তার আসর উদ্দেশ্য ছিল তাদের সহানুভূতি পাওয়া, যেন ভারত যখন সেনাবাহিনী পুর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালাবে, তারা তখন এটাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে বিবেচনা করবে।

মিলিটারি অ্যাকশনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্তান টাইমস মুক্তিবাহিনীর সফলতার প্রতিবেদন প্রচার করতে থাকে, তাদের নৈতিক সাহস দেয়ার জন্য। এবং আরো

www.pathagar.com

বাঙালিকে মুক্তবাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করা। বলা হয় যে, টিক্কা খান নিহত হয়েছেন এবং বিপুলসংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। পত্রিকাটি বলে যে, তিনটি ক্যান্টনমেন্ট মুক্ত করা হয়েছে। ভারতের মিডিয়া বলে যে, চট্টগ্রাম থেকে মুজিব মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

মুজিব তখন পাকিস্তানে আটকাবস্থায় ছিলেন, কিন্তু পত্রিকা তাকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখে," মুজিব রক্তের বদলে রক্তের জন্য ডাক দিয়েছেন।" কুলদ্বীপ নায়ার বলেন, "পত্রিকাগুলো এমন সব লড়াইয়ের প্রতিবেদন দিতে থাকে, যে সব লড়াইয়ের অস্তিত্বই ছিলনা।"

কলকাতায় রেডিও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার করার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং এখান থেকে অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার হয় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তাদের হামলার কাহিনী। কলকাতার পাকিস্তান দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী বিদ্রোহ করে প্রবাসে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস স্থাপন করেন। এটা ছিল বাংলাদেশের বাস্বস্বাধীনতার আট মাস আগে। এদিকে আবার ভারত খেয়াল রাখে যে পূর্ব বঙ্গের সাথে পশ্চিমবঙ্গের বেশি মিল না হয়। তারা স্বাধীন বাংলার (পশ্চিম বঙ্গসহ) আশঙ্কা করেন।

পশ্চিমা লেখকগণ পাকিস্তানের দুর্বল প্রেস প্রচারণাকে দায়ি করেন। তারা সংবাদ পত্রকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেনি। ভারত আন্তর্জাতিক মহলে এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। এভাবে বাংলাদেশের জন্য ভারত বিশ্বের সমর্থন অর্জন করে। তাই ইউএনজিএ যখন কেস ফায়ার-এর নির্দেশ দেয়, এর রেজ্যুলেশনের দিকে কেউই নজর দেয় নি। ভারত সফরতার সঙ্গে দ্রুত সামরিক বিজয় অর্জন করে, বিশ্ব মনোভাব পরিবর্তনের আগেই।

গঙ্গা ঘটনা

ভারত 'গঙ্গা' নামের একটি ভারতীয় ফকার বিমান ছিনতাই করিয়ে পাকিস্তানকে দায়ি করে। দিল্লী থেকে শ্রীনগর যাবার পথে বিমানটিকে ছিনতাই করে লাহোরে আনা হয় ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। এতে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ হয়। এটি একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং আইসিএও বিরোধী। মুসলিম দেশগুলো ভারতকে অনুরোধ করে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার জন্য। কিন্তু ভারত সিদ্ধান্তে অনড় থাকলো। তাই পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পিআইএ

www.pathagar.com

বিমান অনেক পথ ঘুরে কলম্বোর উপর দিয়ে আসতে হয়, সহায়তা পৌঁছাতেও তাই অনেক বিলম্ব হয়।

বাহিনী বৃদ্ধি

যোসেফ অ্যাসলপ লেখেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পশ্চিম বঙ্গে আরো ছয়টি ডিভিশন পাঠানো হয়। তিনি বলেন, " নিরস্ত্র বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে আনার অজুহাতে তারা এ বাড়তি সৈন্যকে পশ্চিম বঙ্গে মোতায়েন করে।" সাধারণত পশ্চিম বঙ্গে ৭ হাজার সেনা সদস্য মোতায়েন থাকে; মার্চ ১৯৭১ এ এটা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ হাজার এ দাঁড়ায়। এটি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যাকশনের আগের কথা। বিএসএফ এর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। এবং তাদের ব্যাটালিয়নের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫টিতে।

কিছু পশ্চিমা লেখক ভারতের সাথে একমত পোষণ করে যে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ নাগাদ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের ধারে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন বৃদ্ধি পায় কারণ পূর্ব পাকস্তানে পাকিস্তানী সেনাদের বৃদ্ধিকে তারা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। কিন্তু এ তর্কের কোন যুক্ত নেই। কারণ, ১. পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধিকরা হয় ১ মার্চ ১৯৭১। এর পরে গণপরিষদ স্থ্ডস্ হবার কারনে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতি হয়। আর সীমান্তের কাছাকাছি ভারতীয় সৈন্য বৃদ্ধি করা হয় ১ মার্চের আগেই; ২. পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল কারণ পূর্ব পাকিস্তরন তাদের ছিল শুধু একটা স্কোয়াড্রন এফ ৮৬ বিমান। কয়েকটা, কয়েকটি পদাতিক ডিভিশন মাত্র, আর ছিল না কোন আর্টিলারি বা ইঞ্জিনিয়ার সাপোর্ট।

বিখ্যাত ব্রেকলি ইউনিভারসিটির সেশন ৩ লিও রোজ -এর পক্ষে বিশ্বাস করে যে ১৯৭১ এর মাঝামাঝি এসে পাকিস্তানের ক্ষমতা ছিল পূর্বে ও পশ্চিম প্রান্তে ভারতের উপর আক্রমণ চালানো, এতে বোঝা যায় যে লেখকরা হয় ভারতের পক্ষে ছিল অথবা তাদের সামরিক জ্ঞান ছিল শূন্য।

পূর্ব দিকে ভারত তার বিমান বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। মিলিটারি অ্যাকশন এর পর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যারা বিদ্রোহ করল। তাদের সাতে হাত মিলায় ভারতীয় বিএসএফ। তারা পূর্ব পাকিস্তানে আএমন চালায়। ইন্ডিয়ান আর্মি আফটার ইন্ডিপেনডেন্টের্ লেখক মেজর প্রাভাল স্বীকার করেন যে মধ্য-এপ্রিলের

www.pathagar.com

আগেই বিএসএফ সমর্থিত মুক্তি বাহিনী তৎপরতা চালাতে থাকে। তাদেরকে নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করা হয় ভারত থেকে।

সমুদ্রে তৎপরতা:

২ এপ্রিল ১৯৭১ ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ একটা পাকিস্তানী জাহাজ 'ওসান ইনডর‍্যানস'কে হয়রানি করে ভারতীয় নৌ ঘাঁটি দ্বারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে। জাহাজটি বাধ্য হয়ে করাচিতে ফেরত যায়। তিনদিন পরে একই পাকিস্তানী জাহাজ সাফিনা-ই-আরব চট্রগ্রামের দিকে রওনা দিলে, ভারত পথে বাঁধা দেয়। ভারত গ্রাউন্ড টু এয়ার মিসাইল অনুশীলন করাতে পিআইএ-কে আরো অনেক দূরে ঘুরে পূর্ব পাকিস্তানে যেতে হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষক লিও রোজ সঠিক ছিলেন না যখন তিনি বলেন "২৫ মার্চের পর বেশির ভাগ ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাগণ দূরত্ব বজায় রাখল কারণ তাদের মতে এটা ছিল একটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। মিলিটারি ক্রাকডাউন এর মাত্র পাঁচদিন পরে ভারতীয় পার্লামেন্ট একযোগে বাঙালিদের জন্য সমর্থন প্রকাশ করে। ইন্দিরা গান্ধী বলেন "সরকারের নিয়ন্ত্রণে সব আছে। নিজ সময় মত পদক্ষেপ নিবে" এবং প্রবাসী সরকারকে সমর্থন দেয়।

১ এপ্রিলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, ভারতীয়রা যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে তাতে উপমহাদেশে আরো উত্তেজনা বাড়াবে যা আন্তর্জাতিক সংকটে পরিণত হতে পারে, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির শুক্লা মনে করেন যে, মুচব ভারতের যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী জিয় বিজয় সিংহ নাহাভ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই তাকে সর্বত্মক সাহায্য করা উচিৎ। তার কেন্দ্রীয় সরকারও যদিও কিছুটা দ্বিধায় ছিল এ ব্যাপারে।

ভারত দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একদিকে তারা বিদ্রোহীদের উৎসাহ দেয়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বলে যে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ দরকার। মে মাসের শেষে এসে ভারত বুঝতে পারল যে, তারা হস্তক্ষেপ করলেও বাইরের কোন শক্তি তেমন ভ্রুক্ষেপ করবে না। লি রোজ বলতে চেয়েছিলেন ভারত আওয়ামী লীগকে সহায়তা করেছে, যাতে ইসলামাবাদ একটি রাজনৈকি সমাধানে উত্তীর্ণ হয়। মুজিবের ছয় দফা ভারতের পক্ষেই ছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে ভারতের

www.pathagar.com

উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পরবে। কিন্তু তা হবার ছিল না। এবং তারা সামরিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হলো। মে মাসের শেষে এসে নয়া দিল্লীর কাছে স্পষ্ট হল যে সবাই ভারতের হস্তক্ষেপ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ বন্ধ হবেনা।

উগ্র বক্তব্য

জয়া প্রকাশ নারায়ণ খোলা খুলি ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থণ করেন। তিনি নিজের লোকদেরকে তিরস্কার করেন, যদি তারা বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত না হয়। তার মতে, ''বাংলাদেশের পরাজয় ভারতের পরাজয়ের সমান।'' সুব্রামানিয়াম বলেন,'' ১৯৭১ সালে বর্তমানে যুগে বাংলাদেশে সবচাইতে বড় গণহত্যা ঘটেছে, আর ভারত তুলনাহীন আতিথেয়তা দেখিয়েছে লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থীর প্রতি। ''

এটা সত্য যে বাঙালি বিদ্রোহী এবং সরকারি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা নির্দোষ নারী পুরুষ ও শিশুসহ হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়। এ সবই ঠিক কিন্তু সুব্রামানিয়ামের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয় যখন তিনি লেখেন, ''সবচাইতে বড় হত্যা।'' তিনি ভিন্নভাবে জার্মানির হাতে গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের নির্মম গণহত্যাকে ভুলে গেলেন? তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বরা হিরোশিমা আর নাগাসাকির হাজার হাজার নাগরিকদের গণহত্রা; পল পট শাসকদের হাতে ক্যাম্বোডিয়ার গণহত্যা; ইরানী বিপ্লবের সময়ের কত প্রাণ হারিয়ে যায়। সুব্রামানিয়াম অনেক নাম করা বুদ্ধিজীবী, কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। যারা তাঁর ভারত মাতাকে ভেঙ্গেছে, তাদের প্রতি তাঁর অন্তরে ঘৃণা রয়েই গেল। তিনি সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের কট্টর সমালোচনা করেন। 'মুক্তির সংগ্রামে'র কথা লিখতে হলে, শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ ছিল না। মুক্তি সংগ্রামে আছে আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, আসামে, প্যালেস্টাইনে আর দক্ষিণ আফ্রিকায়।

কুলদীপ নায়ার বলেন, ''সুযোগটা আসলো যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পশ্চিম বঙ্গে আশ্রয় নিল, পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। তখনই মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অ্যাকশনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়।''

www.pathagar.com

পদক্ষেপ

কলকাতায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠনে ভারত উৎসাহ ও অনুমতি দিয়েছিল। এপ্রিল ১৯৭১ এ স্থানটির নাম দেয়া হয় মুজিবনগর (৮ থিয়েটার রোড, কলকাতা) ভারতীয় সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞগণ তথাকথিত স্বাধীনতার ঘোষণা রচনা করেন এবং ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ আওয়ামীলীগ নেতারা তা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেদেশ প্রবাসী সর কারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সহিত জেনারেল ইয়াহিয়ার বৈঠকে বাঁধা দেয় ভারত। তারা চায় যে শুধু নয়া দিল্লীর মাধ্যমে সব যোগাযোগ হবে। ইন্দিরা ছিলেন রাগী, একগুয়ে এবং কোন রকম সমঝোতার পক্ষপাতী নয়। তিনি যা পরিকল্পনা করেছিলেন, তিনি তাই-ই করবেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আহবান জানিয়েছিল শেখ মুজিবর রহমানের জন্য ফান্ড যোগাড় করা। বিহারের মূখ্য মন্ত্রী ক্রাপুরা ঠাকুর ২৫ লাখ রুপির দান ঘোষণা করে বলেন যে এটা, "বাংলাদেশে অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ করবার জন্য," ৫ এপ্রিল ১৯৭১ ন্যাশনাল হেরাল্ডে সুব্র্যামানিয়াম একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন"ইষ্ট পাকিস্তান ক্রাইসিস "। এতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আক্রমনের জন্য ভারতকে উৎসাহ প্রদান করেন। লন্ডন টাইমস ও তার উদ্ধৃতি প্রকাশ করে যেখানে তিনি বলেন যে ভারতের উচিত পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করে নেওয়া এবং বাংলাদেশের একঠা অস্থায়ী সরকার সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা। ভারতীয় দূতরা বিভিন্ন দেশে জানিয়ে দেয় যে হয়ত ভারত জাতীয় স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

নিয়ন্ত্রণে থাকার পরামর্শ

লিও রোজ যে ভারতের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল সি, রাজ গোপাল আচার্য্য (১৯৪৭-১৯৫০); প্রাক্তন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রদান জেনারেল কারিয়াপ্পা এবং ১৯৭১-এ তামিল নাড়ুর মূখ্যমন্ত্রী এম. করুনাইডু ভারতকে বিচ্ছিনতাবাদীদেরকে সাহায্য দানের বিরুদ্ধে সাবধান করে, কারণ একই দাবি ভারতে উঠতে পারে।

আমলারাও সাবধান করে দেন, বাংলাদেশকে সাহায্য করার ফলাফল কি হবে তার সমন্ধে। তারা মুসলিম রাষ্ট সমূহের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সমন্ধে ব্যাখ্যা দেন। তারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের প্রতিক্রিয়া সমন্ধে ইঙ্গিত করেন। তারা বলেন যে, সমগ্র বাঙালীরা হয় এক ঐক্যবদ্ধ বেঙ্গল দাবি করতে পারে, আবার একটা নতুন মুসলিম

www.pathagar.com

রাষ্ট্র উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল তারা সামরিক হস্তক্ষেপে যাবে কিনা, তখন ভারতের উত্তর ছিল হ্যাঁ।

যুদ্ধের সংকেত

এক দিকে ইয়াহিয়া চরম সিদ্ধান্ত নিলেন মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার; অন্যদিকে মার্চ ১৯৭১-এ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর বিজয় হয়। তিনি শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন নি; পার্লামেন্টে তিনি দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও লাভ করেন। তিনি যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের ভাঙন বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

৩ জুলাই ১৯৭১। ডিএসএর এক সেমিনারে জয়াপ্রকাশ নারায়ণ সভাপতিত্ব করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য ছিলেন সংবাদপত্রের সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, মিসেস বিজয়লক্ষী পণ্ডিত এবং আর কে নেহ্রু। সুব্রামানিয়াম তার বক্তব্যে বলেন, "ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া আরো সস্তা এবং মানবিক হবে।" জেনারেল বি এন সরকার জ্যাকপট অপারেশন প্লান উপস্থাপন করেন, যা লন্ডন টাইমসে প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্ববঙ্গের দখলের কথা বলেন- যার জন্য তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে পশ্চিম বঙ্গে পাঠানো হয়।

লিও রোজ যদিও বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণে ভারত প্রস্তুত ছিল না বা পশ্চিম পকিস্তানের পাল্টা আক্রমনের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তার কথাগুলো ছিল সম্পূর্ণ ভুল। ২৮ এপ্রিল ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমনের কথা বলে। কেননা ইয়াহিয়ার কারণে পূর্ব পকিস্তানে ভারতপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে নি।

মন্ত্রিপরিষদের এক সভায় ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস. এফ. এইচ জে (স্যাম) মানেকশ উপস্থিত ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী তাকে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানে যেতে প্রস্তুত থাকেন।" মানেকশ উত্তরে বলেন, "তার অর্থ হবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়া," ইন্দিরা গান্ধী এর জবাবে বলেন, "এতে আমাদের আপত্তি নেই।" তার সেনাবাহিনী প্রস্তুতির জন্য অরো সময় চায়। তারা প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে, শত্রু পক্ষের সমন্ধেও তথ্য জোগাড় করে তাদের অবস্থান, ক্ষমতা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন ছিল ফসল কাটার সময় এবং সৈন্যরা ঘামের ফসল তুলতে য়ায়। তারপর পূর্ব পাকিস্তানের বহু নদীনালা মোকাবেলার

www.pathagar.com

জন্য অবকাঠামোগত পরিকল্পনাও দরকার ছিল। বেঙ্গলে সামরিক তৎপরতা বর্ষার কারণেও বিঘ্নিত হয়। শীতকাল হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রযোজ্য। মুক্তিবাহিনীকে তখনও একটি দক্ষ গেরিলা বাহিনতিতে পরিণত করা যায় নি। আবার চিনের ব্যাপারেও আশঙ্কা ছিল। তাই মানেকশ ইন্দিরাকে পরামর্শ দেন ইন্দিরাকে অপেক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি নভেম্বরকে আরো উপযুক্ত সময় মনে করেন। তখন হিমালয়ও তুষারে ঢাকা পড়বে। চিন এদিকে সহজে এগিয়ে আসবে না। জেনারেল ডি কে পালিততাকে সমালোচনা করেন এবং বলেন যে আরো আগে আক্রমণ হলে লঅখ লাখ হিন্দু হত্যা বন্ধ করা যেত।

ভারত আসলে আক্রমণকারী হিসেবে নিজেকে প্রদর্শিত করতে চায় নি। তারা নিজেদেরকে উদ্ধারকারী হিসেবে প্রদর্শিত করতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত ছিল পাকিস্তানকে ভাঙার। ইলাস্ট্রেটড উইকলি অব ইন্ডিয়ার প্রধান সম্পাদক খুশবন্ত সিং বলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানকে ভাঙার পরিকল্পনা করেন এবং তা বাস্তবায়নও করেন।

ব্রিগেডিয়ার জগদেব সিং, যিনি ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৪র্থ ইডিভয়ার কোরে যোগ দেন আসামের তেদজপুরে, তিনি বলেন, কোর ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ ছিল ত্রিপুরা থেকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করার জন্য অবকাঠাসো তৈরি করা। তারা সিলেটকে টার্গেক করে। তারা নভেম্বর ১৯৭১ এ আক্রমণটা পরিচালনার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু তার অনেক আগে থেকে মিলিটারি অ্যাকশনের পর থেকে পরিকল্পনা চতে থাকে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্মরণ সিং বলেন, "যদি আওয়ামী লীগ গ্রহণযোগ্য কো রাজনৈতিক সমাধান করতে না পারে, তাহলে ভারত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।" হিন্দু জঙ্গী সংগঠন জনসংঘের নেতা ঠাকুর প্রসাদ বলেন, "যতদিন পাকিস্তান ধ্বংস না হয় এবং ভারতের সঙ্গে এক না হয়, ততদিন বিশ্রাম দেওয়া যাবেনা।"

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোররহি দেশাই ইতালির বিখ্যাত সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচিকে বলেন, ইন্দিরা গান্ধী হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যকে মুক্তি বাহিনীর সাজে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করেন এবং ৫ হাজার ভারতীয় সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ফালাচি লেখেন যে, যখন ভারতের সেনাপ্রধান জ্ঞিাসা করলেন সেনাদের ব্যারাকে ফেরত পাঠানো হবে কিনা, ইন্দিরা নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানে আক্রমণ চালাতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল কে ঝা হেনরি কিচিঞ্জারকে জানান যদি তাদের শর্ত না মানা হয় তাহলে বছরের শেষে তারা পদক্ষেপ নেবে। ভারত স্বীকার

www.pathagar.com

করে, ২১ নভেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে। লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধী স্বীকার করেন স্থানীয় ভারতীয় সেনা কমান্ডার বগুড়াতে মুক্তিবাহিনীর সাহায্যার্থে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এরপর থেকে নিয়মিত আক্রমণ চরতে থাকে। কলাকাতার এক জনসভায় ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, ''ভারতীয সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করা এবং ভারত পাকিস্তানকে টুকরা টুকরা করে ফেরবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক কর্ণেল বলেন যে, ভারত ঢুকে পড়ল কারণ মুক্তিবাহিনী তাদের সাহায্য চেয়েছিল। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং যখন ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করেন যে, তাদের উস্কানি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী জবাব দিলেন, ''আমাদের দুর্বল করার মত উপদেশ আমরা গ্রহণ করতে পারবো না।" ভারতীয় লেখকরা ও কিছু বিদেশী লেখক যদিও বলে থাকেন যে যুদ্ধ ৩ ডিসেম্বরে শুরু হয়, আসলে ২১ নভেম্বর ভারতের প্ররোচনায় শুরু হয়।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে বোঝাতে চেষ্টা করেন পাকিস্তান একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র, যা এমনিতেই ভেঙে যাবে। ভারত শুধু ভুলটাকে শুদ্ধ করেছিল। ইন্দিরা বলেন, ''পাকিস্তান গড়ে উঠেছে ভারতের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে। বালুচিস্তান বা এনডব্লিউএফপি, কোনটাই আসলে পাকিস্তান নয়।" তার শীর্ষ স্থানীয় রাজনৈতিক উপদেষ্টা পি এন হাকসার তাকে এ ব্যাপারে সমর্থন করেন। ইন্দিরা গান্ধী শুধু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি চান পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে যাক।

লে. জে. আপ্পানের দুই কোরকে পশ্চিমে স্থানান্তর করা হয় ঢাকার পরাজয়ের পর। কিসিঞ্জারের মতে, ভারত অনেক আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছিল। মিসেস ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্থ রাষ্ট্র সফর করেন কোন সমাধানে উন্নীত হওয়ার জন্য নয়; তার অ্যাকশনকে ধুম্রজালে লুকানোর জন্য।

সর্বাতবমক যুদ্ধ শুরু হলে, ভারত দাবি করে যেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশ দেশ থেকে সরে যায়। কিসিঞ্জার বলেন, ''মুক্তি ছাড়া তারা আর কিছুতেই রাজি ছিল না।" জেনেভার আন্তর্জাতিক মহল বলেন, ''এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ নীতি যা আন্তর্জাতিক নীতিকে ভঙ্গ করে। একটা গৃহযুদ্ধে তৃতীয় পক্ষকে নিরপেক্ষ থাকতে হয়।"

www.pathagar.com

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি

ভারতের আশঙ্কা ছিল যে, তাদের পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রচেষ্টায় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে চিন অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা ভয় পায় যে, সামরিক হস্তক্ষেপ বিলম্ব হলে আওয়ামী লীগ হয়তো ভেঙ্গে যাবে। ভারতীয়রা এটাও বুঝতে পারল পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরাজিত করতে পারবে না। ভারতের ডেপুটি ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস (ডিডিএমও) বলেন, "সামরিক বাহিনীকে বাংলাদেশে পাকিস্তানী শক্তিকে দুর্বল করতে বছরের পর বছর সময় লাগবে।" তাদের ভয় ছিল যে আওয়ামী লীগের ভারতপন্থী নেতারা সংগ্রামের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

বড় ধরনের সফিস্টিকেটেড অস্ত্র মোতায়েনের ফলে অঞ্চলের কৌশলগত ভারসাম্য বদলে যেতে পারে। সুপার পাওয়ারস স্যাংমনও দিতে পারে। যুদ্ধ অতি দ্রুত শেষ নাও হতে পারে। এসব বিবেচনার করে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তি করেন।

৭ আগষ্ট ১৯৭১ মস্কো মস্কো এবং নয়াদিল্লীর মধ্যে একটি শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে বলা হয় যে, " In the event of either party being--- to an attack or threat --- the high contracting parties shall immidietely enter into mutual unsultations in order to remove such threats and to take effective measures to ensure peare and security of their countries."এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে মোরারজি দেশাই বলেন, "স্বার্থ রক্ষার্থে ইন্দিরা গান্ধী শয়তানের সাথেও চুক্তি করতে পারে।"

১৯৫৯ সালে থেকে ভারত-সোভিয়েত চুক্তি হওয়ার কথা ছিল। বিশেষ করে যখন পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কমিউনিস্টবিরোধী জোটে একত্রিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী যখন এ ধরনের চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেন, লিওনি ব্রেজনেভও এগিয়ে আসলেন। কারণ এতে মার্কিন চীন- পাকিস্তান ঐক্যের একটি প্রতিরোধ পাওয়া গেল।

এ চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই বিপুল সংখ্যক সোভিয়েত কর্মকর্তা নয়া দিল্লীতে আসেন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণের পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণের জন্য। এদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন এয়ার মার্শাল পি. এস. কুটাকভ। সোভিয়েতের সাথে যাতে চুক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতিবাচক মনোভাব পোষণ না করে, রাসগোত্রা মার্কিন সেক্রেটারি

www.pathagar.com

রজার্সকে বলেন, "আপনাদের সাথে একই চুক্তি স্বাক্ষর করার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।" সে নিজেও এটা আন্তরিকভাবে বলেন নি। আর মার্কিনীরাও এটাকে গ্রহণ করে নি।

চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে আগষ্ট মাসে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবহিত করর যে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে। এটা কোন গোপন তথ্য ছিল না। ভারত ইউএসএসআর- থেকে আরো সামরিক সহায়তা চাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই ফিরাইয়ুবিন অক্টোবর ১৯৭১ ভারত সফরে আসেন। এবং পাকিস্তানের প্রতি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করেন। পরে কুটাকভও দিল্লিতে গিয়ে অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে চুক্তি করেন।

সোভিয়েতরা পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বললেও তারা তাদের ঘনিষ্টতম এশিয় মিত্রকে সমর্থন করে, এ মুসলিম রাষ্ট্রটিকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য। ভারত নিশ্চয়ই বাংলাদেশ জন্মের ধাত্রী। কিন্তু এ অপারেশনকে সহজতর করে তুললো তার বড় মিত্র।

ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইন্দিরা গান্ধী সিক্সনের কাছে চিঠি দেন। তিনি চুক্তির কথা উল্লেখ না করে, অভিযোগ করেন যে পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট উপমহাদেশে আরো উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। কিসিঞ্জার বলেন যে এ বছরের উপরে ভারত এ চুক্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে মস্কো সফর কালে ইন্দিরা ও কোসিজিন সম্পূর্ণ দোষ ইয়াহিয়ার কাঁধে দেন।

ভারতের নীতি

যখনই বড় আকারের উত্তেজনা, উদ্বেগ ও আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখা যায়, ক্ষমতাশীল প্রতিবেশীরা অনিবার্য ভাবে সুযোগ সন্ধানে থাকে। ভারতের বেলাও তাই হল। পূর্ব পকিস্তানের সংকটকে ভারত দক্ষতার সাথে মোকাবেলা। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পকিস্তান থেক বিচ্ছিন্ন করা। তাই তারা গঙ্গা হাইজ্যাক ঘটনা ঘটায় এবং ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ তাদের আকাশ সীমানায় বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে তার পশ্চিমা মিত্রদের থেকে রিচ্ছিন্ন করা। ইয়াহিয়া যখন জাতীয় অধিবেশন স্থগিত করলে ইন্দিরা এটাকে পুঁজি করে

www.pathagar.com

অন্তর্জাতিক মহলে পকিস্তানের নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালান। তার চারিত্রিক স্পষ্টবাদী ভঙ্গিতে সে বলে যে পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে বিকাশিত হতে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানে সামরিক শাসন বিরাজ করছিল। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে নারাজ। এগুলো পশ্চিমা গনতান্ত্রিক বিশ্বকে প্রভাবিত করে।

মুসলীম দেশসমূহে যেখানে গণতন্ত্র ছিলনা, সে গণহত্যা বিষয়টি ব্যবহার করে। তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করেন অতিরঞ্জিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকান্ড উপস্থাপনের জন্য। অনেক মুসলীম নেতাও প্রভাবিত হয়। তিনি তাদেরকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হন যে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ হতে চাচ্ছে না।

সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য অজুহাত সৃষ্টি করবার জন্য তিনি ব্যবহার করেন শরনার্থী সমস্যা। এমনভাবে তা উপস্থাপন করেন, যেন তা ভারতের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে সে মুক্তিবাহিনীকে সামরিক সহায়তা দিতে থাকে। অধ্যায়-৪ এ তা বিস্তারিত দেয়া আছে।

তার বড় ভয়ের জায়গা ছিল চীন, পাকিস্তানের ঘনিষ্টতম মিত্র। চীনকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় উত্তীর্ন করবার জন্য তিনি উঠে পরে লেগে যান। সোভিয়েত উনিয়নের সাথে চুক্তি সাক্ষর করে তিনি চীনের সীমান্তকে বন্ধ করলেন বৈকি। সত্যি এটি একটি অতি বুদ্ধিমানের কাজ করলেন। চুক্তি সাক্ষরের পর, ইন্দিরা গান্ধী মানেকশকে নির্দেশ দেন পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক অ্যাকশনে যাবার জন্য।

পাকিস্তানে সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতৃত্বকে প্রভাবিত করবার জন্য তিনি ১০ আগষ্ট ১৯৭১-এ চিঠি লেখেন সব সরকার প্রধানদের কাছে। তিনি অনুরোধ করেন যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী অভিযোগে বিচার করা না হয়।

অক্টোবর ও নভেম্বর ১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরো ১২ টি রাস্ট সফর করেন তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে পাকিস্তানে উপনিবেশিক সরকার ছিল এবং এটা বিচ্ছিন্ন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণের জন্য তিনি যুক্তি উপস্থাপন করছিলেন।

পাকিস্তানকে দুর্বল করবার জন্য ভারত তার নীতিকে ছয়টি ধাপে বাস্তবায়ন করে:

ধাপ-০১ (জানুয়ারী ১৯৭১-ফেব্রুয়ারী ১৯৭১):

শেখ মুজিবের ছয়দফা পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দুর্বল করবার

www.pathagar.com

ক্ষমতা রাখে,তাই ভারত এটাকে সমর্থন করে। আওয়ামী লীগ ও ভারতের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তাই দক্ষিন এশিয়ায় ভারতের স্বার্থের বিরোধিতা করবে না। গঙ্গা হাইজ্যাকিং ঘটনা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করল তাদের উপর বিমান চলাচল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে।

ধাপ-০২ (মার্চ ১৯৭১):

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার ব্যাপারে ভারত নিবিড় প্রচারণা চালায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে। তারা বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক পর্যায় নিয়ে যায়, বিশ্বকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রভাবিত করবার জন্য, আর পূর্ব পাকিস্তানে অওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ার জন্য। তারা পূর্ব পাকিস্তানে নাশকতামূলক তৎপরতা চালায় আর মুক্তি বাহিনীর তথাকথিত সফলতার প্রতিবেদন দিয়ে মনস্তাত্বিক যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

ধাপ-০৩ (এপ্রিল-অক্টোবর):

ভারতের মাটিতে মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান ও অস্ত্র সজ্জিত করে তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করা। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধরত পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল ও চেতনা দুর্বল করবার জন্য মনস্তাত্বিক যুদ্ধ চলতে থাকে।

ধাপ-০৪ (নভেম্বর ১৯৭১):

ভারত সক্রিয় ভাবে অস্ত্র গোলাবারুদ ও বিমানবাহিনীর সহায়তা দিয়ে মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করে পাকিস্তানী সীমান্ত ঘাঁটিকে দখল করবার জন্য আর ভারতের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করা।

ধাপ-০৫ (নভেম্বর ১৯৭১-১৬ ডিসেম্বর):

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে যাওয়া সীমিত বিমান ও আর্টিলারী সাপোর্ট নিয়ে, বিভিন্ন দিক দিয়ে, বিভিন্ন ব্রিগেড দিয়ে আক্রমণ করা।

ধাপ-০৬ (০৩ ডিসেম্বর - ১৬ ডিসেম্বর):

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধে নামা যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও ইমেজ ধ্বংস করা, পশ্চিম পাকিস্তানেও।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

অন্যান্য দেশের ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাঃ ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই, পাকিস্তান-মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সম্পর্কের সুদিনের ইতি ঘটে। কারণ, ওয়াশিংটন ভাবে যে, যুদ্ধটা শুরু করেছিল ইসলামাদ। তার আগমন পর্যন্ত, পাকিস্তান ওয়াশিংটনের প্রিয়পাত্র ছিল, কারণ পাকিস্তান ছিল মার্কিন সমর্থক কমিউনিস্টবিরোধী জোটের সদস্য। তারপরও তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে, তার লোক দেখানো ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কারণে মার্কিন কংগ্রেসে অনেক ভারত ভক্ত ছিল। এ জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭১ সংকট নিয়ে স্বাভাবিকভাবে হোয়াইট হাউসে এবং প্রশাসনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেস উভয়ই পাকিস্তানের সামরিক সরকারের উপর অখুশি ছিলেন। তবে তারা এটাকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু পাকিস্তানে মিলিটারি ক্রাকডাউন-এর পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রচারণা, ভারতে লাখ লাখ শরণার্থীর প্রবেশ, প্রবাসী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তানে সহিংসতার ঘটনায়, ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি করে। নামকরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদক এবং মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এ্যান্ডারসন লিখেন যে পাক-ভারত যুদ্ধ আসলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে শুরু হয়। তারপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, যাতে দক্ষিণ এশিয়ার দুই শত্রু বাংলাদেশ বিষয়ে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়।

১৯৭১ সালের মার্চের মার্কিনী ক্ষমতাসীন মহলে কোন সন্দেহ ছিল না যে শেষ অবধি পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঘটবে। তবুও কংগ্রেসর সাথে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন দ্বিমত পোষণ করেন। কিভাবে উপমহাদেশের পরিস্থিতি মোকাবেলা করা উচিৎ, এ নিয়ে ছিল তাদের দ্বন্দ্ব। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভারতের প্রতি তাদের সহানুভূতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দমন করার জন্য তারা

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে শাস্তি দিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে চেয়েছেন ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী বলেন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যপারে তারা যেন ''শতভাগ সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়'', অর্থাৎ সম্পূর্ণ সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। আগা হিলালী বলেন যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিশ্চিত করেন যে ইয়াহিয়ার সরকারকে কোন রকম অস্বস্তিকর অবস্থার শিকার না হয় । মন্দালি এবং সিনেটর ক্লিফোর্ড একটি বিল উপস্থাপন করেন যাতে পাকিস্তানের জন্য মার্কিন সব সামরিক সাহায্য করে, যতদিন বাংলাদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উপর পাকিস্তান সরকার আক্রমণ বন্ধ না করে। বিলটিতে বলা হয়, যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য দাতা দেশসমূহকে একই আহবান জানায়। বিশ্বের সব চেয়ে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেস উপেক্ষা করে। একদিকে নয়াদিল্লি পূর্ব পাকিস্তানে নাশকতামূলক তৎপরতা ঘটানোর জন্য সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের অনুমোদন ছাড়াই নিজ মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানকে ৩৫ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়। অর্থনৈতিক সাহায্যও কমিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার উপর চাপ দেওয়া হয়, যেন শরাণার্থীদের জন্য মানবিক সাহায্য ছাড়া পাকিস্তানকে সব রকমের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হয়। দ্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভলোপমেন্টকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আহবান জানায়, 'গৃহযুদ্ধ' চলাকালে যেন পাকিস্তানকে কোন সাহায্য না দেওয়া হয়। নিক্সন এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিলনা। তিনি শুধু তার প্রশাসনের প্রতি একটা নোট পাঠালেন, ''সবাইকে আহবান জানাচ্ছি; ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করবেন না।'' কিন্তু এ আহবানে কেউই সাড়া দেন নি। কিসিঞ্জার অভিযোগ করেন যে, প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নির্দেশ দিতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২০ জুলাই ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল ইয়াহিয়াকে চিঠি যোগে জানান যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইয়াহিয়ার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন... তিনি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে চান। যদিও মার্কিন জনগণ, সংবাদপত্র এবং কংগ্রেস ক্ষুব্ধ ছিল। কারণ, সামরিক সহিংসতা এবং ভারতে শরণার্থী সমাগম নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি বন্ধু দেশগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন যেন তারা জনগণের চাপে প্রভাবিত না হয়। তিনি জাতিসংঘে তার

www.pathagar.com

প্রতিনিধি দলকে সহযোগিতা করার জন্যও আহ্বান জানান।

হোয়াইট হাউস এবং কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল ব্যক্তিগত বিরোধ। সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম রজার্স এবং কিসিঞ্জার পরস্পরকে অপছন্দ করতেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রশ্নের আগেই তার বেশ কয়েকটি ব্যাপারে তারা দুজন বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন কোন সময় মিসেস গান্ধীকে পছন্দ করতেন না। তার মতে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন অহংকারী, উদ্ধত এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ। কিসিঞ্জার বলেন, "তার সাথে দেখা করার পর, নিক্সন যা যা মন্তব্য করতেন, তা প্রকাশযোগ্য নয়।"

নিক্সন এবং কিসিঞ্জারের মতে, পাকিস্তানকে দুর্বল করা হলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য নিয়ে ভারতের পক্ষে পাকিস্তানে আগ্রাসন চালানো খুব সহজ হবে। তাতে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে ক্যাপিটাল হিলের সপ্তম তলায় বসে রজার্স এবং তার সহকর্মীরা ভারতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা মনে করেন যে গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানী সামরিক শাসকরা এ পরিস্থিতির জন্য দায়ি ছিলেন ।

১৯৭০ এর নভেম্বরে যখন ইয়াহিয়া জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে যোগ দিতে মুক্তরাষ্ট্রে আসেন; নিক্সন তাকে তাকে চীনা নেতৃত্বের সাথে গোপনে বৈঠকের আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করেন। মার্কিন ও চীনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য নিক্সন উচ্চ পর্যায়ের বেঠক চেয়েছিলেন।

চৌন এন লাই প্রস্তাব করেন যেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন সরাসরি বৈঠকের জন্য পিকিং সফরে আসেন। এ ধরনের বৈঠকের প্রস্তুতির জন্য নিক্সন প্রস্তাব করেন প্রথমে চৌ এন লাই ও কিসিঞ্জার যেন গোপন বৈঠক করেন। কিসিঞ্জার যাতে করে ইসলামাবাদ থেকে গোপনে পিকিং যান এ জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগ নেন। জাকার্তা এবং দিল্লী থেকে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ইসলামাবাদে আসেন ১৯৭১ সালের ৮ জুলাই ৮। এটাকে গতানুগতিক সফর দেখানো হয়। কিন্তু তিনি অন্য কাজের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং সাথে ছিলেন তার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মী।

হাথিয়াগলি গভর্নমেন্ট হাউসে বসে ১৯৭১ সালের ৯ জুলাই নিজ হাতে নোট প্যাডে ইয়াহিয়া কিসিঞ্জার সম্পর্কে লিখেন, একদিন আগে কিসিঞ্জার নয়াদিল্লীতে "তিক্ততা এবং বৈরিতার সম্মুখীন হন এবং নিশ্চিত হন যে ভারত যুদ্ধের জন্য

www.pathagar.com

প্রস্তুতি নিচ্ছিল।" তিনি আরো লিখেন, "বৈরীতা শুরুর জন্য ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। কিন্তু ভারত তা উপেক্ষা করে। ভারতে সংবাদপত্র এবং সিনেটের পাকিস্তানবিরোধী মনোভাবকে সুবর্ণসুযোগ হিসেবে গণ্য করে।"

ইসলামাবাদে থাকাকালে বলা হয় যে কিসিঞ্জার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং নাথিয়াগলিতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। ৯ জুলাই খুব ভোরে অন্ধকারের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা প্রধান মেজর জেনারেল উমর কিসিঞ্জারকে গাড়িতে করে চাকালায় পাকিস্তান বিমানঘাঁটিতে নিয়ে যান। সেখানে চীনা পাইলটরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অন্ধকারের মধ্যে পিএএফ (পাকিস্তান এয়ার ফোর্স) বিমান আকাশ ভেদ করে পিকিংয়ের দিকে চলে যায়।

সকাল বেলায় কিসিঞ্জারের মত দেখতে একজনকে সবার সামনে দিয়ে নাথিয়াগলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিসিঞ্জারের এই 'ডাবল' এর সাথে যারা ছিলেন তাদেরকেও তার সহকর্মীর মত দেখায়। আন্তর্জাতিক প্রেসের সামনেই তাদেরকে নাথিয়াগলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অতি গোপনীয়তা রক্ষা করে কিসিঞ্জার পিকিং থেকে ফেরত আসেন। এতে মার্কিন-চীন বন্ধুত্ব পুনস্থাপিত হয়। নিক্সন ইয়াহিয়ার প্রতি এতোই কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি নিজ হাতের লেখায় ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছে চিঠি লিখেন। তিনি সচেতন ছিলেন যে উপমহাদেশে পাকিস্তান ছিল একমাত্র দেশ যে ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, মার্কিনী সহায়তায়। ভারতের সামরিক শক্তির সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উপমহাদেশের এ দুই শত্রুর মধ্যে যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। এতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ধ্বংস হবে এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কমে যাবে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ এতো গভীর ছিল যে, যদিও নিক্সন পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন, ওয়াশিংটন সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ (ডব্লিউএসআরজি) বলে, যদি চীন-ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন ভারতকে সামরিক সাহায্য প্রদান করে। তারা পাকিস্তানের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বকে কোন গুরুত্বই দিল না।

এদিকে নিক্সন রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হবার জন্য ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন । ১৯৭১ সালের ২৮ মে তারিখে তিনি ইয়াহিয়ার কাছে চিঠি লিখেন এবং বলেন যে, অতি তাড়াতাড়ি যেন সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান

www.pathagar.com

করা হয়। তার বোঝা উচিৎ ছিল আওয়ামী লীগকে যেভাবে ইন্দিরা গান্ধীর কোলে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানকে তার কাছে হস্তান্তর করা ছাড়া এর কোন রাজনৈতিক সমাধান ছিল না।

ডনক্সন ইন্দিরা গান্ধীর কাছেও চিঠি লিখেন। তিনি শরণার্থীদের খরচ চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন শরাণার্থী সমস্যা ইন্দিরার জন্য মূল সমস্যা ছিল না। তিনি সেই দিনের অপেক্ষায় ছিলেন, যেদিন তার দেশের কৃতজ্ঞ জনগণ পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য তার মাথায় মুকুট পুড়িয়ে দেবে এবং যে পাকিস্তানের জন্মের ব্যাপারে তার পিতা অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। ইন্দিরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন পাকিস্তানকে আক্রমণ করার জন্য, যে যা-ই বলুক ।

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই পক্ষে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিসিঞ্জার মনে করেন এতে বৈরীতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু নীতি বিশ্লেষকরা মিসেস গান্ধীর কথা বিশ্বাস করেন। মিসেস গান্ধী বলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে চুক্তির ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমে গেছে। কিসিঞ্জারের কাছে এটি ছিল বারুদে দিয়াশলাই ফেলার সমান।

একদিকে ভারত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য পুনরায় চেষ্টা চালাতে থাকে, যাতে যুদ্ধ এড়ানো যায়। আওয়ামী লীগের নিম্ন পর্যায়ের একজন নেতা কাইয়ুমের সাথে যোগাযোগ করে কলকাতাস্থ মার্কিন দূতাবাস। কাইয়ুম বলেন, তার দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ছেড়ে দিতে পারে যদি শেখ মুজিবকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ ম্যাকফারল্যান্ড প্রায়শই রাওয়ালপিন্ডিস্থ প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়া আসা করেন তার সাথে জেনারেল ইয়াহিয়ার ভাল বোঝাবুঝি ছিল। তাই তিনি গোপনে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে বেশ সহজেই ইয়াহিয়াকে রাজি করালেন। কিন্তু কলকাতাস্থ মার্কিন কনস্যুলেট যখন আবার ইয়াহিয়ার অবস্থান জানানোর জন্য কাইয়ুমের সাথে দেখা করে, কাইয়ুম আরো কিছু শর্ত উপস্থাপন করেন। শুধু মুজিবকে ছেড়ে দিলেই হবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে যেতে হবে এবং জাতিসংঘকে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

www.pathagar.com

যদিও মার্কিন প্রতিনিধি দেখা করতে চান বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে। তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় ভীবষ্যতের সব আলোচনা হবে দিল্লির মাধ্যম। ভারতের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ মার্কিন কনস্যুলেটকে জানায়, সব বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়নও অংশগ্রহণ করবে। এসব যুক্তিহীন দাবি দেখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, ভারত ও সোভিয়েতের সহায়তা পেয়ে আওয়ামী লীগ তাদের সামনে নিশ্চিত বিজয় দেখতে পাচ্ছিল, তাই রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি তাদের কোন আগ্রহই ছিল না।

কিসিঞ্জার যখন বললেন ভারতের উচিৎ হবে না যুদ্ধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত এলকে ঝা এ কথাটি গ্রাহ্যই কররেন না, যদিও এর আগে নিক্সন বলেছিলেন যে যদি ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্রতি তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেবে। ২৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট যোশেফ সিসএকা ঝা-কে প্রস্তাব দেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের নেতারা যেন সরাসরি বৈঠকে বসেন। কিন্তু এ প্রস্তাবকেও ঝা গ্রাহ্য করলেন না। ভারতের রাষ্ট্রদূত বুঝে গেলেন যে এতো দিনে নিক্সনও বুঝতে পারলেন পূর্ব পাকিস্তানকে আর ধরে রাখা যাবে না। এটি আর পাকিস্তানের অংশ হিসেবে থাকছে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ছয় দফা মেনে নেওয়ার জন্য এখন থেকে ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকবে। এদিকে তখন ভারতের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা, তাদের সামরিক বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং দ্বিজাতি তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা। পাকিস্তানকে ভাঙার সম্ভাবনা এবং একটি পরাশক্তির সমর্থন পেয়ে, ভারত তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিপরীতে কোন প্রস্তাব মানতে রাজি ছিল না।

তারপর নিক্সন চেষ্টা করেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোঝনো ভারতকে যুদ্ধে না যাবার জন্য প্রভাবিত করা। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সাথে তিনি ওয়াশিংটনে দেখা করেন এবং বলেন, "ভারতকে যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা উচিৎ।" ৯ অক্টোবর সোভিয়েত ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনাতোলি দোব্রিনিনের সাথে কিসিঞ্জার বৈঠক করেন এবং তিনি দেশ দুটির যুদ্ধে না জড়ানোর উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছিলেন।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেস, জনগণ এবং মিডিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন

www.pathagar.com

করছে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিভীষিকা ছড়াচ্ছিল এবং ভারতকে শরণার্থীর বোঝা বহন করতে হচ্ছিল। ২২ অক্টোবর ওয়াশিংটন পোস্ট লিখে, ''শান্তির প্রতি হুমকির জন্য পাকিস্তান প্রায় সম্পূর্ণভাবে দায়ি। কারণ শরণার্থীর মাধ্যমে পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা ভারতের কাঁধ ঠেলে দিয়েছিল। পাকিস্তানকে বাধ্য করতে হবে তার নিজ লোকের উপর অত্যাচার করা বন্ধ করার জন্য।" পার্শ্ববর্তী দেশের পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভারত তার নিজের স্বার্থ আদায় করছিল বা তারা যে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান আর অস্ত্র সরবরাহ করছিল, তা নিয়ে কেউ ভ্রূক্ষেপ করেনি। পশ্চিমা লেখকরা শুধু ভারতের প্রচারণায় প্রভাবিত হচ্ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিযার উপর চাপ দিতে থাকে তার সরকারকে আরো বেসামরিক ও মানবিক দেহারা দেবার জন্য। তিনি পরামর্শ দেন, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক গভর্নরের বদলে একজন বেসামরিক গভর্নর বসানো হয়। ড. আব্দুল মোতালেব মালেক যিনি ইয়াহিয়ার কেবিনেটের সদস্য ছিলেন, গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এ গৃহযুদ্ধরত প্রদেশে তিনি নামে মাত্র গভর্নর ছিলেন। ইয়াহিয়া খানকে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়, তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন না। বিশেষ আদালতের প্রেসিডেন্ট ব্রি. রহিমউদ্দীন খান এ মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। ১১ জন সিনেটর এবং ৫৪ জন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস এর সদস্য চেয়েছেন যেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেন শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করেন। ১১ আগস্ট রজার্স রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীকে এ কথা জানান। ফারল্যান্ড মুজিবকে হত্যা না করার পরামর্শ দেন। এবং বলেন, তাকে মারা হবে না।

ইন্দিরা যখন ওয়াশিংটনকে নিক্সনের সাথে দেখা করেন, নিক্সন তাকে জানান যে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনায বসতে রাজি আছেন। কিন্তু ইন্দিরা এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

৩০ অক্টোবর যখন ছোট ছোট ভারতীয় সেনা ইউনিট সীমান্ত পার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে থাকে, হোয়াইট হাউস তখন উদ্বিগ্ন হন, কারণ এতে যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পাক-ভারত সীমান্তের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে, যুদ্ধের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। পাক-ভারত সীমান্তের পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকলে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিক্সন কড়া চিঠি পাঠায় নয়া দিল্লি, মস্কো এবং ইসলামাবাদের কাছে। কিসিঞ্জার বলেন মার্কিন সিনেট নয়া দিল্লির কাছে চিঠি পাঠাতে বিলম্ব করে, যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোন দ্বিধা ছাড়া প্রতিবেশি দেশে

www.pathagar.com

আক্রমণ চালাতে পারে। মিসেস গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে উপদেশ দেন তিনি যেন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহবান না করেন। কারণ এতে সমস্যা সমাধানে আরো বাঁধা আসবে। একদিকে নিক্সন চেয়েছিলেন রাজনৈতিক সমাধান, আর অন্যদিকে মিসেস গান্ধী তার সেনাবাহিনীকে কাজে লাগাতে চান। দুইপক্ষই জানতেন পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবে। ভারতের লৌহমানবী চাচ্ছিলেন পাকিস্তানের গর্ব পদদলিত করতে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাকে সমর্থন করে। এমন কি নভেম্বরের ২৪ তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি স্থান দখল করে, তখনও রজার্স বলেন, " আমাদের কাছে কোন তথ্য নেই যে ভারত বাস্তবে সশস্ত্র আক্রমণে জড়িত কি না।"

রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কিটিং কিন্তু নয়াদিল্লিতে বসে সব খবর নিচ্ছিলেন। তিনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য। ২২ নভেম্বর তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে খবর পাঠান তাতে বলেন, শীঘ্রই যুদ্ধ হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টও বুঝতে পারে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত পার করেছে। কেননা ছয়টি ভারতীয় ডিভিশনকে পশ্চিম বঙ্গে মোতায়েন করা হয়। ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে তারা অবকাঠামোন নির্মাণ করতে থাকে। আর তাদের সেনাবাহিনী ঘন ঘন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম লক্ষ্য করে শেলিং করতে থাকে।

ভারত প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে তার সেনাবাহিনী প্রবেশ করালে ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সিক্সনের কাছে চিঠি পাঠান। তিনি নিক্সনের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ চান। তিনি বলেন, তার সেনা বাহিনীর গলায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং তিনি নিক্সনের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন।

১৯৫৯ সালে করাচিতে পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি করেছিল এই মর্মে যে পাকিস্তান শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হলে তার সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসবে। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেস বলে যে তারা শুধুমাত্র এগিয়ে যাবে যদি পাকিস্তান কোন কমিউনিস্ট দেমের আক্রমণের শিকার হয়। কিসিঞ্জার কিন্তু বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিজ্ঞা করেছিল পাকিস্তানের সাহায্যে আসবে, এমনকি ভারত আক্রমণ করলেও। কিন্তু এ করাচি চুক্তিকে কোনই গুরুত্ব দেওয়া হলো না। পরিস্থিতি বদরে যাওয়ার সাথে সাথে পরাশক্তিসমূহও তাদের অবস্থান বদল করে। ১৯৫৯ সারের ৫ মার্চ আঙ্কারায় সম্পাদিত মার্কিন-পাকিস্তান চুক্তির ধারা-১ এ বলা হয়, "পাকিস্তানের অনুরোধে সাহায্যের জন্য সামরিক বাহিনীর ব্যবহারসহ মার্কিন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়া আবেদনের পর প্রেসিডেন্ট নিক্সন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং রুশ প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কসিজিন- এর চিঠি পাঠিয়ে পরামর্শ দেন, তারা যেন পরিস্থিতির আর অবনতি না ঘটিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হয়।"

তিনি ইয়াহিয়াকেও সতর্ক করেন পশ্চিম থেকে যেন আক্রমণ না করা হয়, সেজন্য তিনি ইয়াহিয়াকেও সতর্ক করেন। মস্কোতে মার্কিন রাষ্টদূত জেকব বীম সোভিয়েত মন্ত্রনালয়ে দুইবার যেয়ে অনুরোধ করেন রাশিয়াকে, যেন যুদ্ধে বাঁধা দেয়। মার্কিন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ট নেতা ম্যানসফিল্ড চেয়েছিলেন যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পদক্ষেপ নেয়। তিনি বলেন ,"আগামীকাল নয়, আজকেই নিরাপত্তা পরিষদে পদক্ষেপ নিতে হবে।" কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান ব্যাপারটিকে উপস্থাপন করে নি।

কিছু যুদ্ধ সরনজাম বন্ধ করে নিক্সন ভারতের প্রতি তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। ভারতের পররাষ্টমন্ত্রী শ্রী স্মরণ শিং লোক সভাকে জানান যে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতির কারণে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরিস্থিতির কারনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিসেম্বর ১, ১৯৭১ থেকে সব গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ করেছে।

তাঁর দেশের ধ্বংস চোখের সামনে হবে আর তিনি চুপচাপ বসে থাকবেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান ও সামরিক প্রধানের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তিনি সব পরামর্শ উপেক্ষা করে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ চালান। তিনি আশা করেন এতে পূর্বে চাপ কমিয়ে আনবে। তিনি বলেন, "ঐ মহিলা (ইন্দিরা) যদি ভাবে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে, আমি তা গ্রহণ করিনা। সে যদি যুদ্ধ চায়, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত," কথাগুলো সাহসী বটে, কিন্তু ফাঁকা।

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যখন যুদ্ধ শুরু হয়, তখন নিক্সনের প্রধান উদ্বেগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানও যেন ভেঙ্গে না যায়। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেশনেভ এর কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ জানান তিনি যেন সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ মেনে চলেন যাতে উপমহাদেশের সংকট শীঘ্রই সমাধান হয়। ৬ই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কাছে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যে স্থগিত করে, যার মূল্যে যথাক্রমে ১১.৫ মিলিয়ন ডলার ও ৮৭.৬ মিলিয়ন ডলার ছিল। ওয়াশিংটন পোস্ট এ পদক্ষেপকে সমালোচনা করে বলে যে এটা "বিভ্রান্তিকর ও হাস্যকর।"

নিক্সন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য। তিনি সোভিয়েত কৃষি মন্ত্রী ভ্লাদিমির ম্যাটসকেচিভকে বলেন, "ভারতের

www.pathagar.com

সাথে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তি রয়েছে, পাকিস্তানের সাথে আমাদেরও চুক্তি রয়েছে, তোমাদের উপলব্ধি করা উচিত একটা যুদ্ধ বিরতি ও রাজনৈতিক সমাধান কতটা জরুরি।"

সোভিয়েত নেতৃত্ব নিক্সনের কথায় বেশি গুরুত্ব দেন নি, কারণ তারা জানতেন একদিকে আমেরিকা ভিয়েতনামে তখনও জড়িত ছিল, অন্য দিকে মার্কিন প্রশাসন পাক ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা বিভক্ত ছিল।

ডিসেম্বর ৯ তারিখে পাকিস্তানের লাহোর রেডিও একটি রহস্যজনক ঘোষণা দিল এ মর্মে, মার্কিন সরকার তাদের সপ্তম নৌ বহরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের আরো কাছে অনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ততদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট বুঝতে পেরেছে যে কয়েক দিনের মধ্যে ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে সক্ষম হবে এবং তারপর তারা তাদের আরো সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে পাঠিয়ে আজাদ কাশ্মীর দখল করতে চেষ্টা করবে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দুর্বল বানিয়ে ফেলবে। এটা প্রতিহত করবার জন্য নিক্সন নৌবাহিনীর এক বহর পঠান। রিয়ার এ্যাডমিরেল জি, ডব্লিউ, কুপারের নেতৃত্বে টার্স ফোর্স ৭৪ এর মধ্যে ছিল একটি ৯০,০০০ টন ইউএসএস এন্টারপ্রাইস জাহাজ। এটি একটি নিউক্লিয়ার পাওয়ারড জাহাজ যার সাথে ছিল ৫০০০ সৈন্য, ৭৫ বিমান এবং ৫টি হেলিকপ্টার,একটি হেলিকপ্টার বাহী জাহাজ,একটি সাপ্লাই জাহাজ,একটি অয়েল ট্যাংকার, তিনটি গাইডেড মিসাইল ড্রেসট্রয়ার, এবং চারটি গান ড্রেসট্রয়ার এ টার্স ফোর্স কে বঙ্গপোসাগরে পাঠানো হচ্ছিল। অজুহাত ছিল যে পূর্ব পাকিস্তানে ৭৫ মার্কিন নাগরিক ছিল, তাদের বাচানোর জন্য। ইতিমধ্যে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০ জন ইউএন কর্মকর্তা সহ ৪৩৭ বিদেশিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটি বৃটিশ বিমানযোগে নিয়ে যাওয়া হয়, জাতিসংঘের সহযোগিতায়। সোভিয়েত সামরিকবাহিনী গোপন সূত্রে জানতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গপোসাগরে সপ্তম নৌ বহর পাঠাচ্ছে এবং তারা এ খবরটি ভারতকে জানিয়ে দেয়। নীতি পরিকল্পনা কমিটির প্রধান ডি.পি ধর এবং মানিকশ সঙ্গে সঙ্গে মস্কো যান। তারা পররাষ্ট মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তা ভেঙ্কটেসভারানকে সাথে নিল।

যখন ধর প্রেসিডেন্ট বেশনেভ এবং প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কসিজিনকে সপ্তম বহরের কথা বলেন, কসিজিন বলেন, "তোমরা চিন্তা কর না; আমাদের জাহাজ মার্কিনী বহরের পিছনে আছে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ পদক্ষেপ নিয়ে ভারতকে বুঝিয়ে দিল যে উপমহাদেশে মার্কিন স্বার্থ হুমকির সম্মূখীন হলে, তারা সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে। তারা ইয়াহিয়াকে

সাহস দিতে চেয়েছিল। যুদ্ধ যখন শেষ হয়, নৌ বহরটি তখনও ১,১০০ মাইল দূরে ছিল। তার পরদিন এটাকে থামানো হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণ বন্ধ করতে মার্কিন নৌ বহর কোন ভূমিকা পালন করে নি, যদিও এতে মিসেস গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট ব্রেশনেভ কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন।

যদিও নিক্সন ও কিসিঞ্জার পাকিস্তান ভাঙ্গন বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তারা পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন কেননা সেটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভূ-রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রশ্ন করলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি চান কিনা, তাহলে এ ব্যাপারে আমেরিকা এগিয়ে আসবে,তারা পূর্ব পাকিস্তানকে ধরে রাখবার আশা ছেড়ে দিয়েছিল।

পাকিস্তানের ইর্স্টান কমান্ড যখন যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেয়, তখন কিসিঞ্জার ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত জেনারেল এন এ এম রাজাকে বলেন, যেন পাকিস্তান পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রদেশেই যুদ্ধ বিরতি দাবি করে। কিসিঞ্জারের মতে, তা করা না হলে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানকেও ভাঙ্গতে চেষ্টা করবে। মস্কোকেও জানানো হয় ভারত যুদ্ধবিরতি যেন গ্রহণ করে। সোভিয়েত বলে পশ্চিমে ভারতের কোন পরিকল্পনা ছিল না। জ্যাকব এ্যান্ডারসন বলেছিল যে নিক্সন পাকিস্তানপন্থী ছিলেন বলে বঙ্গপেসাগরে পরাশক্তির সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। এতে বোঝা যায় যে জ্যাক এন্ডারসন ব্যাক্তিগতভাবে নিক্সনবিরোধী ছিলেন এবং ভারতের পক্ষে ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন বা সোভিয়েত স্বার্থ কোনটাই হুমকির সম্মূখীন ছিলনা। অথচ এন্ডারসন আনবিক বিস্ফোরণের আশঙ্কা করছিলেন। এটা দুঃখজনক যে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত লেখকরা ব্যক্তিগত হীনমন্যতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারে না।

যুদ্ধ শেষে উলিয়াম রজার্স, যিনি নিক্সনের পাকিস্তানপন্থী অবস্থানের বিরোধীতা করেন। বুঝতে পেরেছিলেন সামরিক শক্তি দিয়ে রাজনৈতিক মোকাবেলা ঠিক নয়। ৫ জানুয়ারী ১৯৭২ তিনি বলেন, “যদি প্রত্যেক রাজনৈতিক সমস্যার জন্য সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে হয়, তাহলে যুদ্ধের কোন শেষ নেই,”

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাঃ পাকিস্তান সিইএনটিও ও এসইএটিও যোগ করলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তাদের সম্পর্কের অবনতি হয় কারণ এ দুইটি সংস্থার উদ্দ্যেশ্যই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিহত করবার জন্য। পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার ভূখণ্ডের ভিতরে ভি টু স্পাই প্লেন ব্যবহার করতে দিয়েছিল তাই

ক্ষুব্ধ হয়ে নিকিতা ক্রুসচেভ পেশয়ারের চারপাশে লাল কানিবর দ্রাগ দিলেন। চীনের সাথে পাকিস্তানের বন্ধুত্ব ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিক্ষুব্ধ করে। মে ১৯৬৯ সালে যখন নিক্সন পাকিস্তানে আসেন,তিনি ইয়াহিয়াকে হুশিয়ার করেন যে মস্কো এবং পিকিং উভয়েরই সাথে বন্ধুত্ব সহ্য হবে না।

ষাটের দশকে ইসলামাবাদ ব্রেশনেভের এশিয়ান সিকিউরিটি প্লান প্রত্যাখান করে এবং ওয়াশিংটনের পক্ষে থাকে। তার শত্রুর সাথে বন্ধুত্বের কারণে রাশিয়া পাকিস্তানের উপর ক্ষুব্ধ থাকে। তারপরেও প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী পাকিস্তান ভাঙ্গাঁর ব্যাপারে ভারতের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতেন না যদি ইয়াহিয়া খান মার্চ ১৯৭১-এ তার পরামর্শ মেনে চলতেন। তিনি ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করবার জন্য।

তারপরেও যখন ইয়াহিয়া পদগর্নীর আহ্বান না মেনে জোর করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে দমন করবার পদক্ষেপ নিলেন, সোভিয়েতরা তখনও পাকিস্তানকে সরাসরিভাবে দোষারোপ করে নি। এমনকি, জুন মাসের শেষ পর্যন্ত কোসিজিন মস্কোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে বলে এসেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের যা ঘটছে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ধরিে ধীরে এ মনোভাব বদলাতে থাকে। যখন তারা কিসিঞ্জারের জুলাই ১৯৭১-এর ইসলামাবাদ থেকে পিকিং-এর গোপন সফর সম্মন্ধে জানতে পারে,তারা ভারতের পক্ষে চলে যায়। তাই তারা খুব সহজেই ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মৈত্রী ও সহোযোগীতার চুক্তি সাক্ষর করল যাতে চীন সহজে পাকিস্তানকে সামরিক সহোযোগিতা না দেয়। ইয়াহিয়ার পদক্ষেপ নিক্সন ও কিসিঞ্জারকে পাকিস্তানের আরো নিকটে আনলেও, এটা মস্কোকে ভারতের আরো কাছে ঠেলে দিল, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন যে মার্কিন-চীন সম্পর্কের উন্নয়নের কারনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতকে আরো দৃঢ়ভাবে সহায়তা করে।

দক্ষিন এশিয়ার সোভিয়েতের স্বার্থ তখন ছিল মার্কিন সমর্থিত সোভিয়েত বিরোধী জোট ভাঙ্গাঁ; মার্কিন-চীন এর সম্ভাব্য বন্ধুত্বে বাধাঁ দেওয়া; এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে মার্কিন ও চীনের প্রভাব বন্ধ করে ভারতকে তার বলয়ে নিয়ে আসা।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সোভিয়েতরা ভারতকে পূর্ণ সহোযোগিতা দান করে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করবার জন্য। আর ইয়াহিয়ার মিলিটারি ক্রাকডাউন ছিল উত্তম কৈফিয়ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ইয়াহিয়ার রূঢ় মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরো নেতিবাচক করে তুলে। পদগর্নীর এপ্রিল ২,১৯৭১-এর চিঠির উত্তরে তিনি

লেখেন ,"পাকিস্তান তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কোন দেশের হস্তক্ষেপকে অনুমতি দিবে না," কিন্তু অন্য দিকে ইয়াহিয়া নিয়মিত ভাবে মার্কিন দূত যোশেফ ম্যাকফারল্যান্ডের সাথে বৈঠক করেন।

প্রাথমিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় নি, ভারতে সামরিকভাবে পাকিস্তানের সম্মূখীন হয়। পদগর্নী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেন এবং বলেন উনি যেন তার দাবি শেখ মুজিবের মুক্তি পর্যন্ত সীমিত রাখে। তিনি আশঙ্কা করেন যে এ যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমানবিক যুদ্ধে যেতে হবে। তিনি চাচ্ছিলেন রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে। তিনি এ সমস্যায় জড়াতে চান নি, এমনকি, জুন ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্ব-ঘোষিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির একটা চিঠিও তিনি গ্রহণ করেন নি। সে চিঠিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন করা হয়।

সেপ্টেম্বরে মিসেস গান্ধী মস্কোতে যান এবং প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কসিজিনের সাথে দেখা করেন। কসিজিন তখন ইন্দিরা গান্ধরী সাথে একমত হন ইয়াহিয়াকে দোষারোপ করার ব্যাপারে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন নি, যদি পাকিস্তান বা চীন ভারতকে আক্রমণ করে, তারা সাথে সাথে বিমানযোগে ভারতকে অস্ত্র পাঠাবে। তারা তাকে বিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

একমাস পর, অক্টোবর ১৫ তারিখে প্রেসিডেন্ট পদগর্নী ইরানে জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন এবং ইয়াহিয়ার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। ইয়াহিয়া প্রস্তাব করেছিলেন, যদি ভারত মুক্তিবাহিনীকে সাহায্যে করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তারা সীমান্ত থেকে তাদের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে আনবে। এক সপ্তাহ পরে পদগর্নী নয়া দিল্লীতে এসে তার সমর্থন পুনরায় ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে আন্তর্জাতিক মহল থেকে।

২২ নভেম্বর যখন ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করে, সোভিয়েতরা তাদের ক্ষমতা বলে নিরাপত্তা পরিষদকে যুদ্ধবিরতি দেওয়ার আহ্বানকে বন্ধ রাখে। নবেম্বর ২৬-এ জাপান নিরাপত্তা পরিষদের সভার আহবান জানালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাও বন্ধ করে। কিসিঞ্জার বলেন, মস্কো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করল শুধুমাত্র ভারতের পছন্দসই রাজনৈতিক সমাধান হলে, তারা যুদ্ধেরবিরতি সমর্থন করবে। ডিসেম্বর ১০ তারিখে ডি পি ধর ও মানিকশ মস্কোতে গেলে, কসিজিন জানতে চানপশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের মনোভাব। ব্রেশনেভ ভারতকে চাপ দিতে

www.pathagar.com

থাকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি বন্ধ করার জন্য। কারণ, জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ভারত-পাকিস্তান বিরোধে সম্পূর্ণ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পাশে রইল। জ্যাক এন্ডারসন বলেন, নিউইয়র্কে রুশ এ্যাটচি চীন এ্যাটাচি চাউ কুয়ান চী কে বললেন যদি চীন এ যুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপের কথা ভাবে, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়াও হবে। চীনকে চাপে রাখবার জন্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সেনা মোতায়েন করে সিয়ানকিয়াং সীমান্তের নিকটবর্তী। নয়া রুশ রাষ্ট্রদূত ভারতকে আশ্বস্ত করে যদি আক্রমণ চালাতে যায়, তারা চীনকে সিয়ানকিয়াং সীমান্তে আক্রমণ করবে।

যখন দেখা গেল শীগ্রই ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে তাদেন নিয়ন্ত্রণে আনবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাসিলি কুজেতজভ নয়া দিল্লীতে আসেন এ বিরোধের সন্তোষ জনক সমাপ্তি নিশ্চিত করবার জন্য। তারা ভারতকেও বুঝালো যে দক্ষিণ এশিয়ায় রাশিয়ার আগ্রহ রয়েছে।

চীনের ভূমিকা: ১৯৬৫ পাক-ভারত যুদ্ধের পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে সাহায্যে দান করা বন্ধ করে। এতে নয়া দিল্লীর চেয়ে ইসলামাবাদ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তাদের অস্ত্রাগার বেশিরভাগ মার্কিনী অস্ত্র দ্বারা পূর্ণ ছিল, আর ভারতের মাত্র ১০ ভাগ অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসত। ওয়াশিংটনের এ সিদ্ধান্তের ফলে পাকিস্তানকে অন্য দিকে তাকাতে হলো।

জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন আইয়ুব সরকারের বানিজ্যমন্ত্রী ছিলেন । ১৯৬০ সালে তিনি চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সফল হন। পাকিস্তানের সাথে চীনের বন্ধুত্ব দৃঢ় হতে থাকে, যদিও তাদের সরকার পদ্ধতি ও আর্থ সামাজিক অবস্থা ছিল ভিন্ন। প্রত্যেক ফোরামে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে। বিপুর সংখ্যক সামরিক পণ্য সরবরাহ করে পাকিস্তানকে। চীন ও ওয়াশিনটনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবার ব্যাপারে পাকিস্তান ভূমিকা পালন করে। সব সময় পাকিস্তান চীনের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে আসে।পূর্ব পাকিস্তানে অস্থিতীশীল অবস্থার বিপক্ষে ছিল চীন কারণ তাতে ভারত, সোভিয়েত ও আমেরিকার নজর এদিকে পরবে। মাওলানা ভাসানীকে পরামর্শ দেন তিনি যেন আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে বিরত থাকেন কারণ, "এতে রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারত আরো বেশি শক্তিশালী হবে।"

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের ক্রান্তিলগ্নে যখন ভারত সফলতার সহিত পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে, চীন ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সরকারকে দৃঢ়তার সহিত সমর্থন দিতে থাকে। চীনে পাকিস্তানের মিলিটারি এ্যাটাচি ব্রিগেডিয়ার ইফতেকার স্মরণ করে যে চু-এন-লাই চীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কায়সারের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন কারন কায়সার মুজিবপন্থী ছিলেন। অন্যদিকে এ চীন নেতা পাক মিলিটারি এ্যাটাচির সাথে একাধিক বার দেখা করেন এবং জানান যে তারা চীনের সমর্থনের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে। চু-এন-লাই ইয়াহিয়া খানকে রাজনৈতিক সমাধানে উপনিত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে থাকেন। এপ্রিল ১১, ১৯৭১-এ লিখিত চিঠিতে তিনি বলেন, তিনি পকিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতার সমর্থন করেন। তিনি ভারতের কট্টর সমলোচনা করেন এবং বলেন চীন পাকিস্তানকে সাহায্যে দান করবে। এ সাহায্যে কি আকারে থাকবে তার উল্লেখ ছিল না। রেডিও পিকিং এর বাংলা বিশেষজ্ঞ আনোয়ার হোসেন দাবি করেন, 'পাকিস্তান টাইমস' চু-এন-লাই-এর সম্পূর্ণ চিঠি প্রকাশ করে নি। যে বাক্যটা বাদ রয়ে গেল, তা ছিল,"পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে"।

জেনারের ইয়াহিয়ার ব্যাক্তিগত প্যাডে জুলাই ১৪, ১৯৭১ তারিখে লেখা ছিল যে তিনি প্রত্যাশা করেন যে পাক-ভারত যুদ্ধ হলে, চীন পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তিনি লেখেনে, "চু-এন-লাই কিসিঞ্জারকে বলেছেনে, যদি ভারত পকিস্তানকে আক্রমণ করে, চীন চুপ করে বশে থাকবে না, পাকিস্তানের সাহায্যে চীন এগিয়ে আসবে।"

জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পিকিং-এ যান ৬-৮ নভেম্বর ১৯৭১-এ। ভুট্টোসহ এ দলে ছিলেন ইয়াহিয়ার বিশেষ দূত;পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল রহিম খান; চীফ অব জেনারের স্টাফ মে. জে. গুল হাসান খান; পাকিস্তান নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এ্যাডমিরেল রশিদ আহমেদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুলতান আহমেদ খান। আরো ছিলেন ফরেন অফিসের ডিরেক্টর জেনারের ড.এম এ ভাট্টি এবং আরো কয়েকজন পরিচালক এদের মধ্যে তাবারক হোসেন নামক একজন বাঙালীও ছিলেন।

ভূট্টো আর চু-এন-লাই-এর মধ্যেকার বৈঠকে কি কথোপকথন হয় তা জানা না গেলেও, অন্যান্যদের সাথে বৈঠকের বিবরণ রেকর্ড করা হয় এবং প্রতিনিধিদল ইসলামাবাদে ফেরত আসলে, তার সারমর্ম প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হয়। চীন খুব সচেতন ছিল যেহেতু চীন-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

www.pathagar.com

রেখেছিল। তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পক্ষে ছিল। চু-এন-লাই স্বীকার করলেন পাকিস্তানে অতি কঠিন সময় পার করছিল, তবে তিনি ইয়াহিয়াকে বারবার রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হতে বলেন, সামরিকভাবে নয়। তিনি জাপানি এ্যাডমিরাল ইয়ামা মোটোকে নিয়ে নির্মিত এক ইংরেজী ফ্লিম ও পাঠিয়েছিলেন কারণ এ ছায়াছবিতে সামরিক তৎপরতার বিকল্পে রাজনৈতিক সমাধানকে দেখানো হয়। এমনকি তিনি প্রতিনিধি দরকে স্পষ্ট করে বলেন, "আমরা যেভাবে ১৯৬৫-এ তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলাম, তা এখন সম্ভবপর নয়।"

১৯৭১-এ চীনের দশা কী ছিল, তা ভারতের বোঝা উচিত ছিল। কালচারাল র‍্যাভুলেশন (১৯৬৫-১৯৬৮) মাত্র শেষ হলো। চু-এন-লাই নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছিলেন। চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে কোল্ড ওয়ার তখন তুঙ্গে। চীনের সীমান্তে রুশ সৈন্যরা বিপুল সংখ্যায় অবস্থান নিয়েছিল। রাশিয়া পারমানবিক অস্ত্রও প্রস্তুত রাখলো। মস্কো স্পষ্টভাবে চীনকে সাবধান করে দিল পাক-ভারত যুদ্ধে জড়ানোর ব্যাপারে। আর চীন সবে মাত্র নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হল। আন্তজাতিক রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে চীন তার নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে চাইল।

সামরিকবাহিনী প্রধানদের মধ্যে আলোচনা কালে, মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় চীনের সীমান্তে কিভাবে সোভিয়েত সৈন্যকে মোতায়েন করা হয়। রুশরা সংখ্যায় ও যেমন অধিক ছিল, তাদের অস্ত্র ও ছিল অনেক উঁচু মানের। চীন বার বার বলে সংঘর্ষ যেন পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ থাকে।

চীন পাকিস্তানকে মিগ, হাইড্রোফুয়েল এবং যুদ্ধ জাহাজ সরবরাহ করে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারেও আশ্বাস প্রদান করে।

চীনের অ্যাকটিং পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি-পিং-ফে বলেন যে পাকিস্তান আক্রমনের সম্মুখীন হলে, চীনের সরকার ও জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে পূর্ণ সহোযোগিতা দিবে। তিনি কঠোরভাবে ভারতের সমালোচনা করেন। কিন্তু কোন সময় চীন বলে নেই, পাকিস্তানের পক্ষে তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তারা বারবার জোর দেয় আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে উপনীত হবার জন্য।

পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের জন্য ভোঁজ-এর সময়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,"চীন সরকার ও জনগন সবসময় পাকিস্তানের সরকার ও জনগনকে সমর্থন করবে

www.pathagar.com

তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বা রক্ষার্থে।" কোন সময় তিনি বলেন নি চীন সামরিক হস্তক্ষেপ করবে পাক ভারত যুদ্ধে। ভুট্টোও এ কথা না বললেও তিনি ইঙ্গিত করলেন যে ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে, চীন ভারতের সামনে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

পিপিপি চেয়ারম্যান পাকিস্তানে ফেরত এসে একটা আবছা বক্তব্য রেখে বললেন, পাক-ভারত যুদ্ধ হলে চীন পাকিস্তানে পূর্ণ সমর্থন দিবে। এ সমর্থন নৈতিক সমর্থন বা রাজনৈতিক সমর্থন না শারীরিক সমর্থন, তা তা তিনি বিস্তারিতভাবে বলেন নি। অবশ্য সুলতান মাহমুদ খান এ লেখককে স্পষ্টভাবে বললেন যে জেনারেল ইয়াহিয়াকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, পাক-ভারত যুদ্ধ হলে, চীন সামরিক ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না।

পাকিস্তানের টাক্সিলা শহরে হেবি মেকানিক্যাল কমপ্লেক্স উদ্বোধন কালে, চীন মন্ত্রী লি শি চিন আকাশে অনেক পায়রা উড়িয়ে দিয়ে শান্তির বানী দিলেন, যুদ্ধের নয়। ভারত অবশ্য চীনকে নিয়ে চিন্তায় ছিল। ৮ ডিসেম্বরের 'পিপলস ডেইলী' ভারতকে সর্তক করে বলে, যদি পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের উদাহরণ অনুসরণ করা হয়, তাহলে ভারতের প্রতিবেশী কোন দেশ সৈন্য পাঠিয়ে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ বা শিক-ইস্তা ইতরী করতে পারে। এ খবর পেয়ে কাটমুন্ডুতে ভারতের মিলিটারি এ্যাটাচি সীমান্তে চীনের সেনাবাহিনীর তৎপরতার দিকে তিক্ত দৃষ্টি রাখেন।

পাকিস্তানের আগেই, তাদের গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে ভারত জানতে পারলো যে চীন পাক-ভারত যুদ্ধের বিরোধীতা করে। তাই কিসিঞ্জারের সতর্ক বানী যে চীন এ যুদ্ধে যোগ দিবে, কোন গুরুত্ব পেল না।

নভেম্বর ২৩, ১৯৭১-এ যখন ভারত সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে, জাতিসংঘে চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া নিউইয়র্কে এক গোপন স্থানে কিসিঞ্জারের সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন যে চীন নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষ নিবে, কিন্তু ব্যাপারটা নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হবে কিনা, এ ব্যাপারে তারা পাকিস্তানকে অনুসরণ করবে।

নিরাপত্তা পরিষদে যখন পাক-ভারত বিরোধ নিয়ে বিতর্ক হতে থাকে, তখন চীন বার বার বলে যে উভয় দেশ যেন তাদের সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে। হুয়াং হুয়া কিসিঞ্জারকে বলে, "যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হলে আগ্রাসীর দিকে পরিস্থিতি যাবে। আলোচনার আগে ভারত তার সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে আনতে

www.pathagar.com

হবে।" কিসিঞ্জার বলেন, হুয়াং হুয়ার আশংকা ছিল যে এ রুশ-ভারত জোট এভাবে ভবিষ্যতে আরো দেশকে খণ্ডিত করবার চেষ্টা চালাতে পারে।

চীন যুদ্ধের দায়ভার সম্পূর্ণ ভারতের উপরে রাখে। ৬ ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'পিপলস ডেইলির' এক লেখায় ভারতের সমালোচনা করে বলা হয় যে তারা অন্যায়ভাবে পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে সমর্থন করছে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে।" এ লেখায় বলা হয় "ভারত নিজ ভূখণ্ডে বাংলাদেশের একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করে এবং তথাকথিত মুক্তি যোদ্ধাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠায়। এখন প্রত্যক্ষ হামলার মাধ্যমে তারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে।"

চীনের নেতৃত্ব স্পষ্ট করে বলেছে তারা ভারতকে সামরিকভাবে মোকাবেলা করতে পারবে না, তবুও ডিসেম্বর ১০, ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া নুরুল আমীনকে বলেন, তাদের জন্য সাহায্যে আসছিল এবং ৭২ ঘন্টার মধ্যে চীনা সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্তের উত্তর-পূর্বে মোতায়েন হবে। জেনারেল গুল হাসান একই খবর দিলেন লে. জে. নিয়াজিকে। তাকে নাকি এ খবর দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন চীফ অব স্টাফ জে. আবদুল হামিদ। হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সৈন্যদের মনোবল শক্ত রাখার জন্য এ খবরটি দিতে থাকে, কিন্তু মিথ্যা খবর দিয়ে একটি সেনাবাহিনীর মনোবল ধরে রাখা যায় না। মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস নষ্ট হয়।

১৬ ডিসেম্বর ইস্টান্য কমান্ড পূর্ব পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ করে। চীন সরকার তখনও ভারতীয় নেতৃত্বকে তাদের বর্বর হামলার জন্য কট্টর সমালোচনা করে। ভারতকে 'expansionist power' হিসেবে বর্ণনা করে, চীন বলে দেশটা এখনও 'অখণ্ড ভারতের' স্বপ লালন করে।' চীন ভারত সম্পর্কে আরো জানায়, ''তারা শুধু পূর্ব পাকিস্তানকে দখল করতে চায় নি, তারা সম্পূর্ণ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। সময় মত এটা বন্ধ না করলে, ভারত আশে পাশের আরো দেশের সাথে এমেনই আচরণ করবে।

১৬ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের কাছে প্রেরিত চিঠিতে চীন সরকার অভিযোগ করে, ১০ ডিসেম্বর ভারতের সেনাবাহিনী সিকিম সীমান্ত পার হয়ে চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে । তারা নির্দেশ দেয় যেন, ভারত অবিলম্বে এ বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধ করে। এ হুমকির মাধ্যমে চীন ভারতকে আজাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করার ব্যাপারে সাবধান করে এবং পশ্চিম পাকিস্তারে সাথে যুদ্ধও যেন বন্ধ করে। পাকিস্তানকে ভাঙ্গা হয়ত বন্ধ করতে পারে নি চীন, কিন্তু সম্পূর্ণ পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে

www.pathagar.com

প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। বাংলাদেশ যখন জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে, চীন এর ভেটো করে। এটা তার পাকিস্তানের প্রতি সৌহার্দের পরিচয়। জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে একটা সামরিক প্রতিনিধি দলকে চু-এন-লাই বলেছিলেন যে যতদিন পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান না করে, চীনও ততদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে না।(এ লেখক সে প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন)।

যুক্তরাজ্যঃ প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাগুলোকে যুক্তরাজ্য পাকিস্তানের অভ্যান্তরীণ ঘটনা হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু মিলিটারি ক্রাকডাউনের এর পরে এবং ভারতে লাখ লাখ শরণার্থী যাবার পরে, এডওয়ার্থ হিথ এবং স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম এর বক্তব্য পাকিস্তানের চাইতে ভারতের পক্ষে যেতে থাকে। তারা ভারতকে প্রশংসা করতে থাকে, পাকিস্তানের প্ররোচনার মুখে নিজেদেরকে সংযত রাখবার জন্য। এ ধরনের মনোভাব খুবই দুর্ভাগ্যজনক কারণ ভারত আসলে হামলা চালাচ্ছিল এবং মুক্তিবাহিনীকে প্রশ্রয় দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করাচ্ছিল।

সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে যুক্তরাজ্য পাকিস্তানের উপর আরো চাপ দিতে থাকে। তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দায়ি করে সহিংসতার জন্য, কিন্তু বাঙ্গালী গেরিলাদের ধংসাত্মক কর্মকান্ড নিয়ে কিছু বলল না । বৃটিশ প্রেস পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে।

বাংলাদেশ নামে দেশের অস্তিত্বের আগেই যুক্তরাজ্য তার ভূ-খণ্ডে এ দেশের নামে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করতে অনুমোদন দেয়। লন্ডনে অনেক বাংলাদেশি অফিস খুলতে থাকে। বৃটিশ লেবার পার্টি বৃটিশ সরকারের উপর চাপ প্রযোগ করতে থাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে তাড়া দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। তারা পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়টিকে জাতিসংঘে উপস্থাপন করতে বলে কারন শান্তি হুমকির সম্মুখীন ছিল।

ইরানঃ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর পূর্ব পাকিস্তান যে সব শর্ত আরোপ করেছিল, তা নিয়ে ইরানের শাহেন শাহ মোটেও খুশি ছিলেন না। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাহেদী বলেন, “শাহ মনে করেন যে যদি পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়, তারা এমন অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়বে যে তাদের দেশ ধ্বংস হবে।” শাহেন শাহ চেষ্টা করেন জেনারেল ইয়াহিয়া এবং প্রেসিডেন্ট পদগর্নীকে একত্রিত করে বৈঠকে বসানো যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে একটা সমাধানে আসতে পারে। ফার্সি সাম্রাজ্যের ২,৫০০ তম বর্ষপূর্তিতে ইরানে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একত্রিত হয়,

www.pathagar.com

ইরানের ঐতিহাসিক পারসিপোলিস শহরে পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা সমঝোতায় পৌছতে পারত। সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র ক্ষমতা রাখতো ভারতকে পাকিস্তান ভাঙ্গার ব্যাপারে বাঁধা দেবার। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এ বৈঠককে গুরুত্বই দেন নি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্ভাব্য ভূমিকার দিকে নজর দেন নি।

মুসলিম উম্মাহ: পাকিস্তানী সমাজের কিছু অংশ প্রত্যাশা করলেও কোন মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন দেয় নি এ ক্রান্তিলগ্নে। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটলো যে একই ধর্মের হয়েও, অনেকে পূর্ব পাকিস্তানের আগুনে নিজেদের আঙ্গুল পোড়াতে চায় নি।

একটি দেশ তার মিত্র থেকে শুধুমাত্র সাহায্যে আশা করতে পারে যদি মিত্র দেশের স্বার্থও জড়িত থাকে অথবা দুই জনেরই কমন শত্রু থাকে। আসল প্রয়োজন হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি ঐক্য।

www.pathagar.com

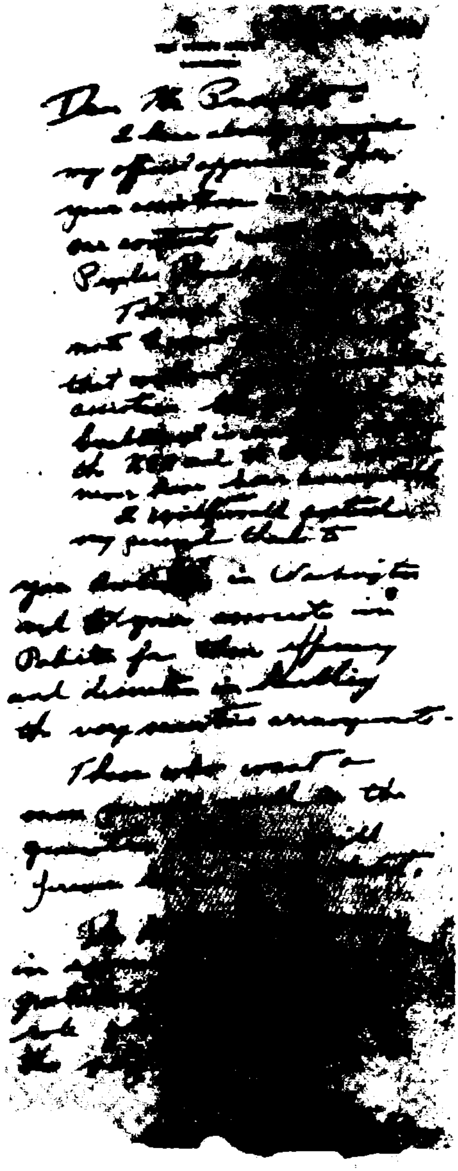

জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খানকে রিচার্ড নিক্সনের স্বহস্তে লেখা ব্যক্তিগত পত্র

www.pathagar.com

গভর্নমেন্ট হাউস, ঢাকা

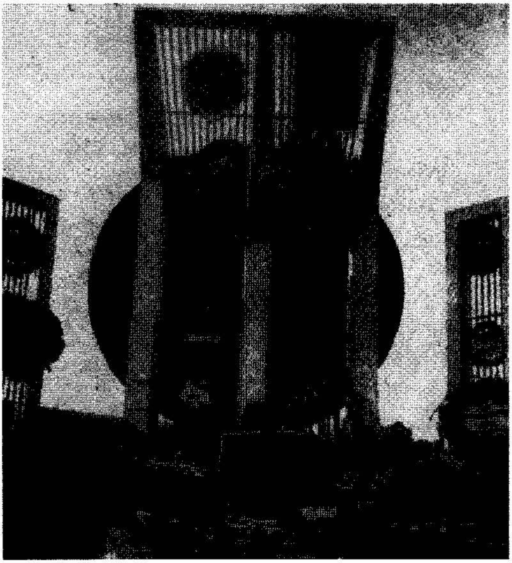

শহীদ মিনার, ঢাকা

www.pathagar.com

লে. জে
আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড

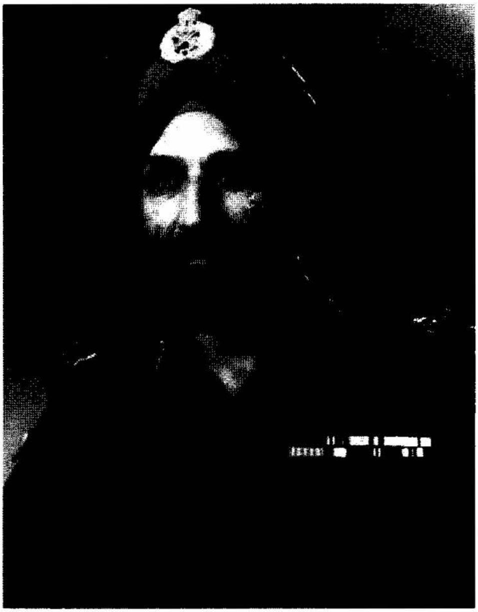

লে. জে জগজিৎ সিং অরোরা
জিওসি ইন চার্জ, ইস্টার্ন
কমান্ড, ইন্ডিয়ান আর্মি

www.pathagar.com

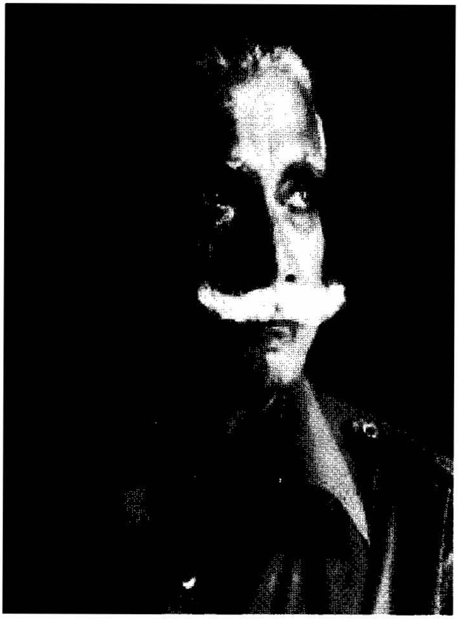

কর্ণেল আতাউল গনি ওসমানী
সর্বাধিনায়ক, মুক্তিবাহিনী

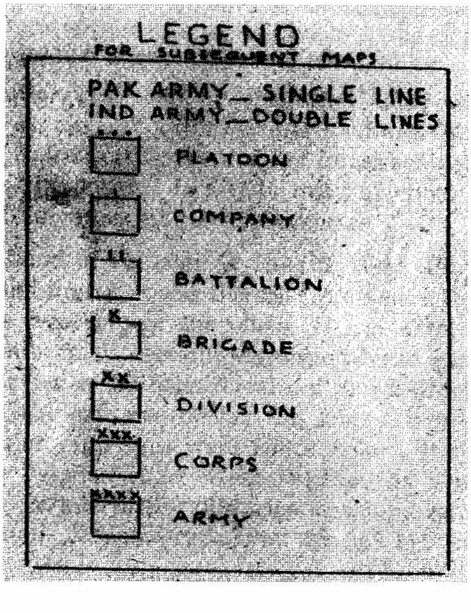

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৭১ : প্রাচ্যের নাটক

কৌশলগত অভিযান

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে, পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে সমন্বিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল। এর জন্য দুইটি উপায় ছিল- হয় দুই প্রদেশের জন্য আলাদা আলাদা সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, অথবা কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কম সৈন্য মোতায়েন করা।

যদি আলাদা আলাদা সেনাবাহিনী গড়ে তোলা হত, তাহলে পাকিস্তানকে ভাঙতে গিয়ে ভারতের নিজের অনেক মূল্য দিতে হত। অর্থনৈতিকভাবে এটি অবশ্য ধরে রাখা সম্ভব ছিলনা এবং এতে জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হত। ফলে দেশ ভেঙে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিল।

আর যদি কোন এক অঞ্চলে কম সেনাবাহিনী নিয়োজিত হত, সে অঞ্চলটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠার সম্ভাবনা বেশি। ভারত ওই দুর্বল সীমান্তে তাদের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করতে পারত। আসলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের যেমন শক্তি ছিল তেমন ছিল দুর্বলতাও ।

পাকিস্তানের মূল অংশ ছিল পশ্চিমে। পাঞ্জাব ছিল দেশের শস্যভান্ডার। আর এখান থেকে আসে সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এ অঞ্চলে গণ্যমান্য ব্যক্তির সংখ্যাও বেশি। এটি ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। যোগাযোগও ছিল এ অংশে নিয়ন্ত্রণে। বলা যায় এটাই ছিল রাজধানীর প্রবেশদ্বার। দক্ষিণে সিন্ধের খোলা জমি দিয়ে সরাসরি করাচী মহানগরে যাওয়া যায়। পাকিস্তানের বৃহত্তম শহর করাচী। এখানে সব বড় বড় শিল্প কারখানা রয়েছে। এটাই ছিল বহিঃবিশ্বের সাথে সংযোগ স্থল। পশ্চিম পাকিস্তানের উল্টো পাশে ছিল ভারত এবং ভারতের সেনা মোতায়েন ছিল কাশ্মীরে। ভারত দখলকৃত কাশ্মীর গ্রান্ড- ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই অবস্থিত। সেনা চলাচলের জন্য ভারতের ভুখণ্ড সুবিধাজনক ছিল।

www.pathagar.com

ওদিকে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য তেমন হুমকি ছিল না। দুশ্চিন্তার স্থান থেকে পূর্ব পাকিস্তান দূরে অবস্থিত ছিল। ভারতের সৈন্য বেশির ভাগ পশ্চিমের দিকে মোতায়েন ছিল। আর পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দুও ছিল, যাদের আত্মীয়-স্বজন সীমান্তের দুইপাশে বসবাস করত। পূর্ব পাকিস্তানে কারণ ছাড়া আক্রমণ করলে, আন্তর্জাতিক মহল সেটাকে ভালো চোখে দেখবে না। বিশেষ করে চীন কড়া প্রতিক্রিয়া দেখাবে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানে তার অনেক সমর্থক ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান প্রতিরক্ষার জন্য উত্তম স্থান। এত বড় বড় নদী মোকাবেলা করা শত্রু পক্ষের জন্য মুশকিল ব্যাপার ছিল। বছরের বেশিরভাগ সময় এ দেশের ভূখন্ড, দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়া, বিস্তারিত সামরিক তৎপরতার জন্য উপযোগী ছিল না। দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল এবং সুন্দরবন গেরিলা তৎপরতা ছাড়া মোটেও উপযুক্ত নয়। যেহেতু পূর্বে তেমন কোন আক্রমনাত্মক পরিকল্পনা ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যাও বেশি দরকার ছিল না।

ভৌগলিক দিক দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের অনেক সুবিধা ছিল। এ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মাঝখানে অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম শুধু একটা সরু অংশ দিয়ে সংযুক্ত ছিল। ওখানে সেনা মোতায়েন করলে, এ সরু পথটা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা যায়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের গর্ব কলকাতা মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমানবাহিনী সহজেই আক্রমণ করতে পারত। আর ১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট কলকাতার মত বড় শহরের দিকে পদাতিকবাহিনী এগিয়ে গেলে, তা নিঃসন্দেহে আতংক সৃষ্টি হবে। বিচ্ছিন্নতাবদী নাগা আর মিজোদেরকে উস্কানী দেওয়া যেত নয়া দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। হিমালয়ে যখন তুষারপাত কম, তখন চীন ভারতকে সীমান্তের কাছে নিযন্ত্রণে রাখতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানেও কিছু দুর্বলতা ছিল। কিছু কিছু অঞ্চল একেবারে ভারতের ভূখন্ডে ঢুকে গিয়েছে, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা ভারতের জন্য খুব কঠিন নয়। যেহেতু রেল ও সড়ক পথ ভারত ঘেঁষে ঘেঁষে বিচ্ছিন্ন করা বেশ সহজ ছিল। পানিও প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিছু ক্ষেত্রে। আর বিমানের সুযোগ কম থাকাতে শত্রুর হুমকি মোকাবেলাও কঠিন হয়ে পড়ে।

পশ্চিম পাকিস্তান ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ছিল অবাঙালীদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নীতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। বাঙালীরা এতে সন্তুষ্ট ছিল না।

www.pathagar.com

সৈন্যবাহিনী বণ্টন

সামরিক দৃষ্টিতে বাহিনী বণ্টন নির্ভুল ছিল। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে স্পষ্ট ছিল যে, ভারতের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ করা বেশি সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু জাতীয় কৌশল নির্ধারণ করতে হলে, শুধু সামরিক দিক বিবেচনা করলে ঠিক হবে না; নাগরিকদের উপর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রভাবকেও বিবেচনায় আনা আবশ্যক।

শান্তিকালে সৈন্য মোতায়েন করলে শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না, দেশ গড়ার কাজও সম্পন্ন হয়। এতে সেনানিবাসের ভিতরে ও আশেপাশে অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সামরিক বাহিনীর তৎপরতার দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় ঠিকাদার, দোকানদার, মিস্ত্রীসহ অনেকেই। সৈন্যদের চাহিদা পূরণে বেসামরিক লোকজনও সেনানিবাসের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে, আয় করতে থাকে। প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বেশি লাভবান ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি সেনানিবাস থাকতে, পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। রাজনীতিবিদরাও পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে। ১৯৪৭ দেশ ভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র একটি ব্রিগেড ছিল। পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বৃদ্ধি পেলে পূর্ব পাকিস্তানে এক পদাতিক ডিভিশন নিয়োগ করা হয়।

১৯৬২ ভারত-চীন যুদ্ধের পরে, ভারত তার সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করতে থাকে। তারা পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের দিকে আরো নজর দিতে থাকে। বঙ্গোপসাগরে দুইটি নৌ-বহর অবস্থান করে। পূর্ব পকিস্তানের কাছাকাছি ভারত বিমান ঘাঁটি স্থাপন করে। পূর্ব সীমান্তের কাছে অবকাঠামো উন্নয়ন হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যে সরু যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তার পড়ে ভারত। পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে যেতে পারছিল না বলে তারা ইসলামাবাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়।

১৯৬৫ সালে, পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও পূর্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে তোলার কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি কেন্দ্রের এ অবহেলাকে কাজে লাগালো বাঙালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব প্রদেশের অবস্থা উত্তপ্ত হতে থাকে। তার কারণ ছিল বাঙালী নেতাদের ঘনঘন গ্রেফতার, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে ঠিকমত পরিচালনা না করা, ফিল্ড মার্শাল

www.pathagar.com

আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সামরিক শাসনকে বজায় রাখা, সেখানে বাঙালী প্রতিনিধিত্ব ছিল অপ্রতুল; তার স্বাতন্ত্রের জন্য আন্দোলন ত্বরান্বিত হওয়া এবং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, এ ঘটনার পেছনে হাত ছিল ভারতের।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা

এরপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর আরো জোর দিতে হয়। কিন্তু তখনও কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারেনি, যে শত্রু সমর্থিত বিদ্রোহ দমনের জন্য একটা পদাতিক ডিভিশন ও নামমাত্র নৌ বাহিনী আর বিমান বাহিনী যথেষ্ট ছিল না।

শুধুমাত্র ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রসাশক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করে, তখন পূর্ব পাকিস্তানে আরো সেনা মোতায়েন করবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশেষে ঢাকায় স্থাপন করা হলো একটি কোর হেডকোয়ার্টার।

লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খান ছিলেন রামপুর নবাব পরিবারের সদস্য। তিনি ছিলেন সামরিক কৌশলের বিশেষজ্ঞ। তিনি যেকোন সামরিক সমস্যা বুঝতেন এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। নতুন করে গঠিত থ্রি কোর-কে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয় । থ্রি কোর পরবর্তীতে ইস্টার্ন কমান্ড নামে পরিচিত হয়। কোয়েটায় অবস্থিত কমান্ড এ্যান্ড স্টাফ কলেজের প্রধান প্রশিক্ষক জেনারেল ইয়াকুব। পরে তাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ করা হয়। তারপর তিনি লন্ডনের ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে কোর্স করেন। অনেকে মনে করেন, তিনি অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ফিরে আসার সময় তিনি ওভার কোয়ালিফাইড ছিলেন। তার সাথে যারা লন্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, তারা যার যার দেশে বড় বড় সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন। কিন্তু ইয়াকুব খানকে দেওয়া হয় একটা মাত্র ডিভিশন আর বাড়তি কিছু সৈন্য।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সামরিক পরিস্থিতি বুঝে উঠতে তার এতটা সময় ব্যয় করা উচিৎ ছিল না। তিনি সচেতন ছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে ভারত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের নদীমাতৃক বাঁধাসমূহ তাদের নিজেদের সৈন্যদের জন্যও বাধা ছিল। আর যোগাযোগ মাধ্যম ছিল দুর্বল।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রদেশের মধ্যে যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চই সচেতন ছিলেন। বেশির ভাগ বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ক্ষিপ্ত ছিল, বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের উপর। সরকারবিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে এবং স্পষ্ট ছিল যে, কিছুদিনের মধ্যে কাউন্টার ইন্সারজেন্সি দেওয়ার দরকার হবে। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী আতাউর রহমানকে গভর্নর এডমিরাল এস, এম আহসানের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ জানতে চায় পশ্চিম পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী কবে চলে যাবে; আর প্রদেশটি নিজের ভবিষ্যত সমন্ধে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

দেশের এ পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে আক্রমণ আসলে তা প্রতিহত করা কঠিন। তাই এ উত্তেজনা কমানো জরুরি ছিল।

কলকাতায় অবস্থিত ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের চার এবং তেইশ নম্বর কোর এর ছিল আটটি ফ্রন্ট লাইন ডিভিশন, এর মধ্যে পাঁচটি চীনের দিকে মুখোমুখি ছিল। আর তিনটি পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে মোতায়েন ছিল। এদের মধ্যে কিছু নাগা ও মিজো এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে নিয়োজিত ছিল। শীতে যখন হিমালয়ের অলি-গলি তুষারে জমে যায়, তখন চীনের দিক থেকে হুমকি কমে যায়। তখন পাঁচ ডিভিশনের অন্তত দুইটি ওখান থেকে সরানো যায়। অবশ্য তাদেরকে নতুন পরিবেশে নিয়োগ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।

সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে বিভিন্ন ইউনিটকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করাও সম্ভব ছিল। তাই কোন যুদ্ধ হলে, বেশ শক্তিশালী শত্রু পক্ষের সাথে লড়াই করবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন ছিল। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীতে তেমন প্রস্তুতি ছিল না।

জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য এ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া মুশকিল ছিল। সব শক্তি সীমান্তে নিয়োগ করলে, অন্য স্থান দুর্বল হয়ে পড়বে। আর ঢাকার চারপাশে সেনা মোতায়েন করলে, শত্রু সেনারা সহজে দেশে ঢুকে যাবে। এতে ঢাকাও দখল করতে সক্ষম হত। কোর কমান্ডার এজন্য তার বাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। সম্ভাব্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করেঃ

ক. কনটিনজেন্সিঃ ভারতের সাথে ছোটখাটো সংঘর্ষ, মনোবল ও সম্পদ বৃদ্ধি করবার জন্য।

খ. কনটিনজেন্সিঃ একটি বড় বিদ্রোহ যেখানে ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে।

www.pathagar.com

ক. কনটিনজেন্সি: এ পরিস্থিতিতে সৈন্যদের সামনের দিকে অবস্থান নিতে হবে, সীমান্তের বরাবর, পূর্ব পাকিস্তানের যেকোন স্থানের বিদ্রোহ দমন মোকাবেলার জন্য এবং বিদ্রোহীদের ভূখণ্ডের কোন অংশকে দখল করা থেকে প্রতিহত করা।

খ. কনটিনজেন্সি: এ পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ সৈন্যকে ঢাকার ভিতরে ও আশেপাশে নিয়োগ করা দরকার। এর বাইরে ছোট ছোট ইউনিট শত্রুর প্রবেশকে প্রতিহত ও বিলম্ব করবে যাতে তারা রাজধানী দখল না করতে পারে। ক. কনটিনজেন্সি থেকে খ. কনটিনজেন্সিতে পরিবর্তন করবার জন্য সময়ের দরকার ছিল।

আগষ্ট ৯, ১৯৬৯-এ কমান্ডার-ইন-চিফ এরকমই একটি আদেশ দিয়েছিলেন- "পূর্বে যতটা সম্ভব শত্রু পক্ষকে নিষ্ক্রিয় কর, কিন্তু নিজেদের ধ্বংস থেকে রক্ষা কর।"

নভেম্বর ১২, ১৯৬৯-এ হেডকোয়ার্টার ইস্টার্ন কমান্ডকে নির্দেশ দিত, যে তিন কোর পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। তারা কিছু ধারণা উপস্থাপন করল:

(১) ভারত আমাদের আক্রমণ করার অন্ততঃ সাতদিন আগে আমরা সতর্কবাণী পাব;

(২) যুদ্ধাবস্থার জন্য ভারত প্রথম উদ্যোগ নিবে;

(৩) শক্তিশালী আক্রমণ হবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, সেহেতু পশ্চিমে যুদ্ধের জন্য বেশি শক্তি মোতায়েন করতে হবে;

(৪) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ বন্ধ থাকবে;

(৫) চীন প্রতিবাদ করবে রাজনৈতিক ব্যক্তব্যের মাধ্যমে এবং

(৬) অন্ততঃ তিনমাসের পূর্ণ সামরিক অপারেশনের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরবর্তীতে দেখা যায়, এ ছয় ধারণার মধ্যে চারটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। গোয়েন্দা সংস্থা বেশ আগে থেকে সরকারকে সতর্ক করল ভারতের আক্রমণ সম্পর্কে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বাভাবিক যোগাযোগ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ২১ নভেম্বর পাকিস্তানে আক্রমণ করে ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করল। চীন শুধুমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

দুইটি ধারণা ভুল ছিল। ভারতের মূল আক্রমণ পশ্চিমে ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানের দিকে ছিল। পশ্চিমে পাকিস্তান আক্রমণ চালালে, তখন মাত্র ভারত পাল্টা আক্রমণ করবে। পূর্ব পাকিস্তান আত্মসমর্পনের পর মাত্র ইন্দিরা গান্ধী স্থির করল এ শত্রুকে শেষ করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়ে তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ থেকে বিরত রাখল। আর একটি ভুল ছিল যুদ্ধের সময় সম্বন্ধে। ধারণা ছিল যুদ্ধ তিন মাস চলবে, কিন্তু যুদ্ধটা মাত্র ছাব্বিশ দিন চলে।

১৯৭০ এর গ্রীষ্মকালে আর্মড ফোর্স ওয়ার কোর্স (এএফডব্লিউসি)-এর ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে ভিজিট করে। জিওসি ১৪ ডিভিশন, মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা তাদের উদ্দ্যেশ্যে দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, যদিও ১৯৬৫ এর তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা এখনও অপ্রতুল। আর্মার, আর্টিলারি, আর ইনজিনিয়ার সাপোর্ট কম ছিল। শত্রু পক্ষের অধিক শক্তিশালী বিমান ও নৌ ক্ষমতা ছিল। তিনি বলেন যে, তিনি একটি সমাধান উদ্ভাবন করেছিলেন যেখানে ভূমি দখলে রাখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে শত্রুর উপর আক্রমণ চালানো এবং কিছু কিছু স্থানে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তিনি চলন্ত প্রতিরোধ পরিকল্পনা করেছিলেন কারণ তার মতে স্থিতিশীল স্থানে থাকলে, ধ্বংস অনিবার্য হবে। তিনি ঢাকার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। তার মতে,"পূর্ব পাকিস্তান মানেই ঢাকা" ঢাকার পতন হলে সব শেষ। কিন্তু জেনারেল রাজা শুধু ঢাকার জন্য কিছু পরিমান আর ময়মনসিংহের জন্য সম্পদ বণ্টন করেন তিনি প্রিয়েমটিভ স্ট্রাইক এর পক্ষে ছিলেন না। তিনি আলোচনার জন্য কিছু হাতে রাখতে চেয়েছেন।

আক্রমণকারীরা বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কারণ, ডিফেন্ডারদের চলাচলে সুবিধা ও এয়ার কভার ছিল অপ্রতুল। তাদের যথেষ্ট সেনা সম্পদ ছিল না।

অপারেশনাল প্ল্যান

হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পাওয়ার পরে, ১৪ ডিভিশন ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত নির্দেশনা উপস্থাপন করেন:

(১) সেনাদেরকে কিছু কালক্ষেপণ করবার জন্য তৎপরতা চালাতে হবে,

(২) যেকোন মূল্যে ঢাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;

www.pathagar.com

(৩) প্রধান প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সরিয়ে আনলেও কিছু সংখ্যক দলকে রেখে যেতে হবে, যাতে শত্রুরা এগিয়ে আসলে এ দলগুলো তাদেরকে হয়রানি করতে পারবে;

(৪) ছোট ছোট ট্যাকটিক্যাল আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে;

(৫) মূল পরিকল্পনা থেকে সরে যাওয়া যাবে না।

অনেক দেরী ও অতি অপ্রতুল

মার্চ ১৯৭১-এর মিলিটারি অ্যাকশনের পর পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পন্ন বদলে যায়। বাঙালী ইউনিটগুলো বিদ্রোহ করে ভারতে চলে যায়। সাধারণ নাগরিক ভয়ে চুপ থাকলেও, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর ক্ষিপ্ত ছিল।

ভারত মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য দিতে পারে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বৈরী মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে বলে আরো সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়। বিমানযোগে শ্রীলংকা হয়ে ৭ ইনফেন্টারি ডিভিশন এবং ১৬ ইনফেন্টারি ডিভিশনের সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে আসে। এ নতুন দুই ডিভিশন অস্ত্র ছাড়াই আসে। তাদের কিছু পদাতিক অস্ত্র ছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট ছিল না। কোর সিগন্যাল ব্যাটালিয়নকে মার্চ ১৯৭১-এ আনা হয়।

৭ এপ্রিল ইস্টার্ন থিয়েটারের (প্রাচ্যের নাটক)- এর ক্ষমতা জেনারেল টিক্কা খানের হাত থেকে লে. জে. আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজির হাতে যায়। নিয়াজি অনেক পদকপ্রাপ্ত একজন সেনা কর্মকর্তা। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পদক পান। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে হিলাল-ই-জুরাত পদকে ভূষিত হন। ৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে তিনি মিসর, ইরাক, প্যালেস্টাইন, বার্মা, মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাভায় ভ্রমণ করেন। তাই নতুন পরিবেশে যুদ্ধ করা তার জন্য কঠিন ছিল না। কিন্তু তার অনমনীয় মনোভাব তার কর্মতৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অরো ক্ষতিগ্রস্ত করে তার অহংকারী মনোভাব। তার মিয়াওয়ালী ব্যাকগ্রাউন্ড এবং সীমিত শিক্ষার কারনে হয়ত সে সংকীর্ণ সামরিক মনোভাব পোষণ করে।

তার কর্মক্ষেত্রে নিয়াজি ভালো রিপোর্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে ইস্টার্ন কমান্ড তার হাতে থাকবে, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সিংহ ছিলেন, কিন্তু নিম্ন পর্যায়ের। তিনি সাহসী ছিলেন, কিন্তু শত্রুর শক্তিকে অনুমান করতে পারতেন না। কিন্তু এপ্রিল ১, ১৯৭১-এ জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে

www.pathagar.com

পাঠানোর মতো কাউকে পাচ্ছিলেন না। শোনা যায়, অনেক কর্মকর্তাকে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সবাই তা নাকচ করে দেয়।

নিয়াজি যখন পূর্ব পাকিস্তানে আসেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তখন সীমান্তে জড়ো হতে থাকে। মে ১৯৭১-এ এসে এ পূর্ব প্রান্তে সব কিছুকে শান্ত মনে হয়।

কিন্তু এ শান্ত পরিবেশ সত্যিকার পরিস্থিতির চিত্র ছিল না। সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন ছাড়াই, নিয়াজি স্রেফ তার সাহসিকতার উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা করতে থাকলেন। অপারেশনাল ইনস্ট্রাকশন নম্বর ও তিনি পেশ করলেন অন্তত ৩০ দিন যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এতে নয়টি শক্তিশালী স্থানে সেনা মোতায়েন করা হয়। আর ২৫ টি সুরক্ষিত স্থান নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সৈন্য সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ঢাকা ছিল কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এ রাজধানী রক্ষার্থে আর সৈন্য রইল না।

আগষ্ট ১৯৭১-এ হেডকোয়ার্টারের কাছে ইস্টার্ন কমান্ড নতুন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা পাঠায়। এতে বলা হয় সব বড় বড় শহরকে সুরক্ষিত দূর্গ হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং বিশেষ করে ঢাকাকে, যেকেন মূল্যে রক্ষা করা হবে। তাছাড়া পূর্বে ত্রিপুরার উপর হামলা চালানো হবে, উত্তরে শিলিগুড়িকে আক্রমণ করা হবে; আর পশ্চিমে কৃষ্ণনগরের উপর এ হামলা চালানো হবে। হেডকোয়ার্টার এ পরিকল্পনা অনুমোদন করে। সথে আরো বলে যেন কলকাতাকে হুমকি দেওয়া হয় আর ফারাক্কাও দখলে আনা হয়।

আক্রমণমূলক হামলার জন্য প্রস্তুত থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু যথার্থ অস্ত্র গোলাবারুদ ও এয়ার সাপোর্ট ছাড়া তা একেবারে বোকামি। সে সময়ের হেডকোয়ার্টারের সামরিক নেতৃত্ব বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনী ছিল অতি দুর্বল। এ অবস্থায় এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিকল্পনা করা ছিল স্রেফ ইগো এর বাহাদুরি। অবাক ব্যাপার হলেও, পূর্ব পাকিস্তানের স্থানীয় কমান্ডারগণ ও জেনারেল হেডকোয়ার্টারের কমান্ডারগণ ইস্টার্ন কমান্ডের ক্ষমতা নিয়ে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতে থাকলো, তারা ভাবলো ইস্টার্ন কমান্ড খুব সহজেই আওয়ামী লীগের বিদ্রোহীদের দমন করতে পারবে। সামনে যে 'ভূমিকম্প' অপেক্ষমান তা তারা বুঝতেই পারেনি। তারা দেখলো চারিদিক শান্ত, সীমান্ত পর্যন্ত সহজেই যাওয়া যাচ্ছে। তারা হিসেবে নেয়নি, যে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, ইস্টার্ন থিয়েটারে সামরিক ভারসাম্য ছিল না। ভারত তার বিমানবাহিনী দিয়ে আকাশকে দখলে রেখেছিল, নৌবাহিনীর বাঁধাও আসছিল এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন পাকিস্তান থেকে সরে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

অভিযানের কৌশল

ততোদিন পর্যন্ত ইস্টার্ন কমান্ডের প্রতি রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল, যেন তারা পূর্ব পাকিস্তানের কোন অংশকে মুক্তিবাহিনীর দখলে না যেতে দেয়। আর বাংলাদেশের কোন অস্থায়ী সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থান করতে না দেয়। নিয়াজির ভয় ছিল যে মুক্তিবাহিনী ঠিক তাই করবে। তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন, যেন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানের এক ইঞ্চি জমি দখল না নিতে পারে, এটাই ছিল তার লক্ষ্য। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যে তিনি বিদ্রোহীদের বাঁধা দিতে পারবেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেননি যে ভারত সেনাবাহিনী পূর্ণ ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করবে।

কিন্তু যখন ভারত তার সেনাবাহিনীকে বিপুল সংখ্যায় সীমান্তের কাছে মোতায়েন করতে থাকলো, তখন জেনারেলগণ বুঝতে পারলো যে বাস্তব চিত্রটি অন্য রকম। জিএইচকিউ থেকে নির্দেশ আসলো ছোট ছোট সৈন্য দল দিয়ে সীমান্ত রক্ষা করা। ঢাকাকেও রক্ষা করতে সৈন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

কী কী হুমকি সামনে থাকতে পারে, তা নিয়ে মূল্যায়ণ চলতে থাকে। ৩২টি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন ছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৮টা পদাতিক ডিভিশিন এবং পাঁচ থেকে ছয় আর্মাড রেজিমেন্ট প্রস্তুত রাখে। তাছাড়া ছিল এক লক্ষ মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানের অপ্রতুল ভারী অস্ত্র, প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, বিমান সামর্থ ও নৌক্ষমতা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

হুমকির মূল্যায়ন

ভারতের হুমকিকে ইস্টার্ন কমান্ড এভাবে মূল্যায়ন করেছিলঃ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুরকে আক্রমণ করবার জন্য ভারত প্রস্তুত রেখেছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন। একটি পদাতিক ব্রিগেড এবং দুইটি মুক্তি বাহিনী ব্রিগেড। তারা আরো অনুমান করে, দুইটি পদাতিক ডিভিশন রংপুর ও হিলিকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল আর দুইটি পদাতিক ডিভিশন যশোর আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত ছিল, একটা বা দুইটা আর্মার রেজিমেন্টসহ। নিয়াজি সঠিকভাবে অনুমান করতে পারলো, ঢাকাকে তারা পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করবে। তা সত্ত্বেও তারা বেশি সামরিক শক্তিকে পশ্চিম সীমান্তে জড়ো করলেন।

www.pathagar.com

নিয়াজি যদিও অনুমান করলেন, মধ্য নভেম্বরে হামলা আসতে পারে, তিনি ভাবতে পারেননি যে ভারত বড় আকারের আক্রমণ চালাবে। তার পরিকল্পনা ছিল তিনি মুক্তিবাহিনীকে মোকাবেলা করবেন। আর ভারত মুক্তিবাহিনীকে সীমান্তের ওপার থেকে সাহায্য করবে।

ধারণা করা হয় ভারতীয় নৌবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে সহজে নৌ অবরোধ দিতে পারবে। ভারত কাজে লাগাতে পারবে এগারটি বিমানবাহিনী স্কোয়াড্রন, একটি বোম্বার স্কোয়াড্রন। যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল একটি স্কোয়াড্রন। এ স্কোয়াড্রনের বিমানগুলো ছিল নিম্নমানের। দুই একদিনের বেশি পাকিস্তান বিমানবাহিনী টিকতে পারত না। ইস্টার্ন কমান্ডের ছিল তখন মাত্র একটি পূর্ণ পদাতিক ডিভিশন এবং দুই আংশিক ডিভিশন। তখন ভারতের সাথে ক্ষমতার অনুপাত ছিল স্থলে ২:৪ এবং আকাশে ১:১১। আর সমুদ্রে ভারতের পূর্ণ দখল ছিল।

অনির্ধারিত ব্যবস্থা

এ অপ্রতুল সামরিক ক্ষমতাকে ঢাকার জন্য ইস্টার্ন কমান্ড নিজেদের সৈন্য শক্তি সামর্থ সমন্ধে ভুল ধারণা দিতে থাকে, শত্রুদের জন্য ততটা নয়, নিজ লোকদেরই উদ্দ্যেশ্যে। তারা অনির্ধারিতভাবে বিভিন্নস্থানে সেনা মোতায়েন করতে থাকে। তাই একটি নতুন ৩৬ ডিভিশন তৈরী হয়। যাদের লোকবল বেশির ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্রন্টিয়ার অঞ্চল থেকে আসা এবং তাদেরকে বলা হয় ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস (ইপিসিএএফ)। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মে. জে. জামশেদ খান, প্রাক্তন ইপিসিএএফ কমান্ডার। এর ছিল একটি মাত্র ব্রিগেড। তিনি আরো আটটি ব্যাটালিয়নের জন্য আবেদন জানান। প্রযুক্তির সাপোর্ট চান। তারা কয়েকটি স্থানীয় নৌকায় চলাচল করে। ৭৩ ব্রিগেড তাদেরকে দেওয়া হলেও, তা তেমন ক্ষমতাশীল ছিল না। এর নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদের আর ছিল তিনটির বদলে মাত্র দুইটি ব্যাটালিয়ন।

সেপ্টেম্বরে চট্রগ্রামে ৭১ ব্রিগেড স্থাপন করা হয়। এতে ছিল একটি মাত্র পদাতিক ব্যাটালিয়ন যা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এটাকে বাহ্যিক দিক থেকে অরো শক্তিশালী করার জন্য যোগ দেয় দুই ইউনিট প্যারামিলিটারি ফোর্স, একটি মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন, কিছু রাজাকার এবং আরো কয়েকজন। তারা এটাকে ব্রিগেডের ন্যায়

www.pathagar.com

রূপ দিতে চেয়েছে। একটা কমান্ডো ব্যাটালিয়নকেও এর সাথে যোগ করানো হয়। এর নেতৃত্বে ছিল ব্রিগেডিয়ার আতা মুহম্মদ মালিক। তিনি ঢাকাস্থ সামরিক আইন প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। এবং তিনি দক্ষ গার্নার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। একই মাসে সিলেটে ৩১৩ (এ্যাডহক) ব্রিগেড স্থাপন করা হয়। মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে এসে এর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন বি. এম. সালিমুল্লাহ। এর ছিল একটি ব্যাটিলিয়ন আর কিছু অনিয়মিত ইউনিট। ১৮ নভেম্বর ৩৯ (অ্যাডহক) ডিভিশন স্থাপিত হয় মে. জে. এম রহিম খানের নেতৃত্বে। কোন রকম শ'খানেক প্যারামিলিটারি সৈন্য দ্বারা খুলনায় ৩১৪ (অ্যাডহক) ব্রিগেড গড়ে তোলা হয়। সেখানে ক্ষমতা দেখানোর জন্য। ৩৪ ব্রিগেডকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। বালুচিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা ব্রি. নওয়াব আহমেদ আশরাফকে ২৭ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করা হয় ঢাকার প্রতিরক্ষা সংগঠিত করবার জন্য। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে পৌছলে নিয়াজি তাকে বলেন, রাজধানীর প্রতিরক্ষার জন্য কোন সৈন্য ছিল না। তার সুবিধার্থে ৩৪ ব্রিগেডকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। তিনি নাটোরে একটা ভাগের নেতৃত্ব দেন। এটা একটা অতি দুর্বল সামরিক সমন্বয়ের উদাহরণ।

এসব অ্যাডহক ইউনিট গঠন কাগজে কলমে ভালো লাগলেও এতে ইস্টার্ন কমান্ডের ক্ষমতায়নে কোন ভূমিকা রাখা হয়নি।

শত্রুপক্ষকে দুর্বল করার যুদ্ধ

অক্টোবর নাগাদ ভারত মুক্তি বাহিনীকে আয়তনে বৃদ্ধি, অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করে তুলেছিল, যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণে সাহায্যে করতে পারে। ভারতের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা, তাদেরকে সীমান্তের কাছে আনা যেখানে ভারত সমর্থিত মুক্তিবাহিনী তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। তাদেরকে সংখ্যার দিক থেকে ক্ষতি করতে পারে, ক্ষয় সাধন করতে পারে, মনোবল ভাঙ্গতে পারে আসল যুদ্ধের আগেই।

অক্টোবর ১৯৭১-এ শুরু হয় মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা যশোর-ঝিনাইদহ সেক্টরে আক্রমণ। সিলেট-ব্রাহ্মনবাড়িয়া সেক্টরে ১৪ ডিভিশন এবং কুমিল্লা সেক্টরে ৩৬ (অ্যাডহক) ডিভিশনও হামলার শিকার হয়। অবশ্য সব আক্রমণ সফল হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়। কিন্তু এসব আক্রমণের লক্ষ্য ছিল পকিস্তান সেনাবাহিনীকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা এবং

www.pathagar.com

সীমান্তে ব্যস্ত রাখা। এ উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। বর্ষার শেষে পূর্ব পাকিস্তানে ভারত ও পাকিস্তানের অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়। বিলম্বে হলেও জিএইচকিউ ইস্টার্ন কমান্ডকে নতুন অপারেশনাল পরিকল্পনা পেশ করতে নির্দেশ দেয় ১৫ নভেম্বরে। এটি ছিল ভারত দ্বারা পূর্ণ আক্রমণের মাত্র ছয় দিন আগে। মে. জে. জামশেদ এবং চীফ অব ষ্টাফ ব্রি. বাকির সিদ্দিকী রাওয়ালপিন্ডি যান এবং সেখানে নতুন অপারেশনাল প্ল্যান উপস্থাপন করেন। ইস্টার্ন কমান্ড কিন্তু তাদের পরিকল্পনার তেমন পরিবর্তন করেনি। তারা তখন বদ্ধপরিকর ছিল মুক্তিবাহিনীকে কোন অংশ জমি দখল করতে না দেয়ার ব্যাপারে। যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। জেনারেল নিয়াজি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন শত্রুকে সীমান্তে প্রতিহত করা আর ঢাকাকে প্রতিরক্ষা করা। কিন্তু এত সীমিত সংখ্যক সেনা নিয়ে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গেলে অপরটি ভেস্তে যায়। তিনি ঠিক করলেন ঢাকাকে নিরাপত্তাহীন রাখার জন্য কিছু ধারণা দেওয়া, যে পূর্ব পাকিস্তানে আরো সৈন্য আসবে। জেনারেল নিয়াজির বোঝা উচিৎ ছিল এরই মধ্যে ছোট ছোট এনক্লেভ মুক্তি বাহিনীর দখলে চলে গিয়েছিল এবং তারা চাইলে সেখানে একটা অস্থায়ী সরকার সেখানে স্থাপন করতে পারত। ১২ অক্টোবরে এসে নিয়াজি ৭,৭০০ কিলোমিটার হারিয়ে ফেলেছিলেন।

নিয়াজি তখনও বিশ্বাস করতেন যে বিলম্ব করলে তারা ঠিকমত প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারবে। তিনি আরো আটটি ব্যাটালিয়ন পাঠাতে বলেন যাতে তারা ঢাকাকে নিরাপদ রাখতে পারে আর সীমান্ত প্রতিরক্ষা করতে পারবে। হেডকোয়ার্টার রাজী হলেও অবশেষে তারা মাত্র দুইটি ব্যাটালিয়ন প্রেরণ করে।

পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণের মাত্র দুই দিন আগে, তথা ১৯ নভেম্বর, পরিকল্পনা বা কৌশল পরিবর্তন করা হয়নি। নিয়াজি বলেন, রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমাধান ছেড়ে যাওয়া ছিল সরকারি সিদ্ধান্ত, সেনা কমান্ডার এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তার ভাষ্য হাজার হাজার অনুগত পাকিস্তানীদের পরিত্যাগ করা ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং তা রাওয়ালপিন্ডিতে নেওয়া উচিত ছিল। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তার সেনাদেরকে ৭৫% প্রাণহানি হলে তখন তারা সরে যাবে। এরকম নির্দেশ সহজে দেওয়া যায়, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। শুধুমাত্র কমান্ডাররা যদি সৈন্যদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকে তখন তা সম্ভব।

www.pathagar.com

সৈন্য মোতায়েন (নভেম্বর ১৯৭১)

দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর (যশোর)

এইচকিউ ৯ পদাতিক ডিভিশন	যশোর	মে. জে. মুহম্মদ হুসেইন আনসারী
৫৭ পদাতিক ব্রিগেড	ঝিনাইদহ	ব্রি. মঞ্জুর আহমেদ
১০৭ পদাতিক ব্রিগেড	যশোর	ব্রি. মোহাম্মদ হায়াত
৩১৪ (অ্যাডহক) ব্রিগেড	খুলনা	ব্রি. ফজলে হামিদ
৩ (ইন্ডিপেন্ডেন্ট) আর্মড স্কোয়াড্রন		
৪৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ		লে. ক. মোগল
৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ		লে. ক. এম শরিফ
২১১ মর্টার ব্যাটারী, গোলন্দাজ		
২১ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট		লে. ক. ইমতিয়াজ ওয়ারেখ
খুলনা নৌ ঘাঁটিতে ৮ গানবোট		

লক্ষ্যঃ যেকোন মূল্যে যশোর রক্ষা।

উত্তর সেক্টর (বগুড়া)

এইচকিউ পদাতিক ডিভিশন (নাটোর)		মে. জে. নজর হুসেইন শাহ
২৩ পদাতিক ব্রিগেড	রংপুর	ব্রি. আকতার আনসারী
২০৫ পদাতিক ব্রিগেড	বগুড়া	ব্রি. তাজাম্মুল হুসেইন মালিক
৩৪ পদাতিক ব্রিগেড	নাটোর	ব্রি. মীর আব্দুল নাঈম
৯৩ (অ্যাডহক) ব্রিগেড		ব্রি. এন. এ আশরাফ
২৬ ক্যাভালরী		লে. ক. বুখারী
৪৮ ফিল্ড রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ		লে. ক. মঞ্জুর
৮০ ফিল্ড রেজিমেন্ট, গোলন্দাজ		লে. ক. তারেক
১১৭ মর্টার ব্যাটারী		মেজর ইমতিয়াজ
৩৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (আরডব্লিউএস)		লে. ক. আমীর মুহম্মদ খান

লক্ষ্যঃ দিনাজপুর, সৈয়দপুর, রংপুর ও রাজশাহীতে শক্তিশালী দূর্গ গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সেক্টর (ঢাকা)

এইচকিউ ৩৬ (অ্যাডহক) ডিভিশন	ময়মনসিংহ	মে. জে. জামশেদ খান
৯৩ (অ্যাডহক) পদাতিক ব্রিগেড	ময়মনসিংহ	ব্রি. আব্দুল কাদের

লক্ষ্যঃ যে কোন মূল্যে ঢাকা প্রতিরক্ষা করা।

উত্তর-পূর্ব সেক্টর (সিলেট)

এইচকিউ ১৪ পদাতিক ডিভিশন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	মে. জে. কাজী আব্দুল মজিদ
২৭ পদাতিক ব্রিগেড	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রি. এম সাদউল্লাহ
২০২ (অ্যাডহক ব্রিগেড)	সিলেট	ব্রি. মুহম্মদ সালিমুল্লহ
৩১৩ পদাতিক ব্রিগেড	মৌলভিবাজার	ব্রি. ইফতেখার রানা
৮ (ইন্ডিপেনডেন্ট) আর্মড স্কোয়াড্রন		
৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট (গোলন্দাজ)		লে. ক. এম. এ. কে.জাহিদ
সেকশন, ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট		
২১০ মর্টার ব্যাটারী গোলন্দাজ		
পি-১,৩৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (আরডব্লিউএস)		

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

এইচকিউ ৩৯ (অ্যাডহক) ডিভিশন	চাঁদপুর	মে. জে. এম. রহিম খান
১১৭ পদাতিক ব্রিগেড	কুমিল্লা	ব্রি. মুহম্মদ আতিফ
৫৩ পদাতিক ব্রিগেড	ফেনী	ব্রি. আসলাম নিয়াজি
৯১ (অ্যাডহক) পদাতিক ব্রিগেড	ধুমঘাট	ব্রি. মিয়া তাসকিনউদ্দীন
৯৭ পদাতিক ব্রিগেড	চট্টগ্রাম	ব্রি আতা মুহম্মদ মালিক
আর্মার	শুন্য	
৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট গোলন্দাজ (দুই ব্যাটারী)		লে. ক. সেলিম মালিক
১৭১ মর্টার ব্যাটারী		

লক্ষ্যঃ কুমিল্লা, চাঁদপুর, লাকসাম এবং চট্টগ্রামকে প্রতিরক্ষা করা।

www.pathagar.com

মন্তব্য

সীমান্ত বরাবর সেনাবাহিনীর কোম্পানীগুলোকে হালকাভাবে মোতায়েন করা হয়। কিন্তু এতে অনেক দুর্বলতা ছিল। যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। আর শত্রু পক্ষ ছিল চারপাশে।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে ছিল মাত্র একটি স্কোয়াড্রন, যার ছিল ১২ টি এফ ৮৬। এয়ার অফিসার কমান্ডিং (এওসি) ইনাম উল হকের ছিল ঢাকায় মাত্র দুইটি বিমানবন্দর, তেঁজগাও আর কুর্মিটোলা।

ফ্লাগ অফিসার কমান্ডিং ইস্ট পাকিস্তান রিয়ার অ্যাডমিরাল মুহম্মদ শরীফের কোন নৌবাহিনীর জাহাজ ছিল না চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর রক্ষার্থে। পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর ছিল মাত্র কয়েকটি গান বোট।

সীমান্তের ওপারে

১৯৪৭ সালে আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ইন্ডিয়াতে লে. ক. মানেকশ ছিলেন ইয়াহিয়া খানের সিনিয়র। তারা ছিল সহকর্মী। চব্বিশ বছর পর ভারত সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তাকে নির্দেশ দেওয়া হল। তার এ পুরোনো সহকর্মীর দেশ ভাঙ্গার জন্য। মানেকশ ছিলেন খুবই সতর্ক জেনারেল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতেন না। প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধে যাননা। এপ্রিল ১৯৭১-এ যখন ইন্দিরা গান্ধী তাকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করতে তৈরী হতে বলেন। তিনি জবাব দেন, “আপনি যদি আমাকে এখনই আক্রমণ করতে বলেন আমরা শতভাগ ব্যর্থ হব। কিন্তু আমাকে কিছু সময় দিলে আমরা শতভাগ সফল হব।”

এ কাজের জন্য তাকে সময়, সম্পদ ও ইক্যুপমেন্ট দেওয়া হয়। তিনি বলেন, “আমি যা যা চেয়েছি তা তা পেয়েছি। আমি টাকা পেয়েছি তারপর সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে ট্যাংক আর বিমান নিয়ে আসলাম।”

তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। তাদের সময় স্থির হল নভেম্বর। তবে সীমান্তে তাদের সেনা সতর্ক ছিল তখন থেকেই। সবার ছুটি বাতিল হল। পাহাড়ী ডিভিশনগুলোকে পদাতিক ডিভিশনে পরিবর্তন করা হল। ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডে আরো দুটি ডিভিশন যোগ করে শক্তিশালী করা হল। মুক্তিবাহিনীকে সংগঠিত করা, ভারতে সেনাবাহিনীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য তাদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়া

www.pathagar.com

হল। শত্রু পক্ষকে দুর্বল করার জন্য সবসময় সীমান্তে তাদেরকে ব্যস্ত রাখা হয়। অবকাঠামোগত প্রস্তুতি নেওয়া হল, মনস্তাত্বিক যুদ্ধ পরিচালিত হয় শত্রুপক্ষের মনোবল দুর্বল করবার জন্য।

কিছু ভারত সেনা কর্মকর্তা স্বীকার করবেনই না, যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তান দখলে আনা। কিন্তু অনেক সামরিক বিশ্লেষক বলেন, যে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যে মিশন দিয়েছিলেন ভারত সেনাবাহিনীকে তার উদ্দ্যেশ্য ছিল ঢাকা দখল করা।

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী

শান্তির সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে সীমান্তে ভারত মোতায়েন করে তিন পদাতিক ডিভিশন, কলকাতা হেডকোয়ার্টারের অধীন। কিন্তু ভারত যখন সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব পাকিস্তানের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নেয়ার ব্যাপারে তখন তারা তাদের ইস্টার্ন থিয়েটারকে আরো শক্তিশালী করতে থাকে। তারা পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম আর ত্রিপুরাতে আরো সৈন্য প্রেরণ করে। মানেকশ সিদ্ধান্ত নিলেন একটা নতুন কোর হেডকোয়ার্টার গঠন করা এবং চীনের সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা। উত্তর পূর্ব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলা করবার জন্য যে সকল সৈন্যকে মোতায়েন করা হয়েছিল লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা তাদেরকে প্রত্যাহার করে আনলেন।

আগষ্ট ১৯৭১-এ এলাহাবাদ থেকে ৪ পদাতিক ডিভিশনকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আনা হল। সেপ্টেম্বর নাগাদ পুরো ডিভিশন পানাগাড়ে এসে জমা হয়। ১২ অক্টোবরে তারা পূর্ব পাকিস্তানের আরো কাছে আসে। আসলে, সেপ্টেম্বরে মে. জে. মেহিন্দর সিং বারার নির্দেশ পেলেন আক্রমণ করবার জন্য। মিরুত থেকে ৭ মাউন্টেন ডিভিশনকে পরিবর্তন করে পদাতিক ডিভিশনে পরিণত করা হয়। তাদের সাথে ছিল মাসিপুরে গড়ে তোলা ৫৭ ডিভিশন। বেরেলি থেকে ৬ পদাতিক ডিভিশন এবং রাঁচী থেকে ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকেও পূর্বে পাঠানো হয়।

হেলিকপ্টার দ্বারা কোম্পানিগুলোকে আরো শক্তিশালী করা হলো। এক রেজিমেন্ট হবার ক্রাফট-এর ও ব্যবস্থা করা হল নদী পারাপারের জন্য।

তার "মিশন উইথ এ ডিফারেন্স" বইতে লে. জে. কাটফালিয়া স্বীকার করেন, যে ভারত সেনাবাহিনী সেপ্টেম্বর মাসে সেনা মোতায়েন শুরু করে যুদ্ধের প্রস্তুতির

www.pathagar.com

জন্য। মে. জে. ডি কে পালিতও লেখেন, "নভেম্বরে এসে তিন কোর সেনা প্রস্তুত ছিল বাংলাদেশ অপারেশনের জন্য।"

পশ্চিমা লেখকরা মনে করতে পারেন, এ সেনা প্রস্তুতি ছিল নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু তা আসলে নয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রচারণাকালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করা।

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন

হেডকোয়ার্টার, ইস্টার্ন কমান্ড কলকাতা		লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা (সেনাবাহিনী কমান্ডার)
	দক্ষিণ পশ্চিম সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার ২ কোর	কৃষ্ণনগর	লে. জে. টি, এস, রায়না
	৭ পদাতিক ব্রিগেড, শিকারপুর	ব্রি. জৈল সিং
	৪১ পদাতিক ব্রিগেড, বেহরামপুর	ব্রি. এ,এইচ ই, মিচিগেন
	৬২ পদাতিক ব্রিগেড, বেহরামপুর	ব্রি. রাজেন্দ্রনাথ
৯ পদাতিক ডিভিশন		মে. জে. দালবীর সিং
	৩২ পদাতিক ব্রিগেড, গোবর ডাঙা	ব্রি. তেওয়ারী
	৪২ পদাতক ব্রিগেড, কৃষ্ণনগর	ব্রি. জে এস গোরায়া
	৪৫ পদাতিক ব্রিগেড, পানাগাড়	
	৩৫০ পদাতিক ব্রিগেড, বনগাঁও	ব্রি. এইচ. সিন্ধু
	৪৫ প্যারা বিগ্রেড, কলকাতা	
বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স		
অতিরিক্ত সহায়ক শক্তি	১ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারি (১৩০ এমএম)	
	১ লাইট ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট (পিটি সেভেনটি সিক্স)	
	১মিডিয়াম ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট (টি ফিফটি ফাইভ)	
	উত্তর পূর্ব সেক্টর	
হেডকোয়ার্টার ৩৩ কোর	শিলিগুড়ি	লে. জে থাপান
২০ মাউন্টেন ডিভিশন	বালুরঘাট	মে. জে. লাচমান সিং লেল
	৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড, ইসলামপুর	ব্রি.জি, এস শর্মা
	১৬৬ মাউন্টেন ব্রিগেড, বালুরঘাট	ব্রি. আর. এস. পান্নু
	২০২ মাউন্টেন ব্রিগেড, রায়গঞ্জ	ব্রি. এফ, পি, ভাট্রি
	৩৪০ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. জাগিন্দর সিং বক্সি
	৬৩, ক্যাভালরি রেজিমেন্ট, জলপাইগুড়ি	
	বিএসএফ ৫ ব্যাটালিয়ন	

www.pathagar.com

৬ মাউন্টেন ডিভিশন		মে. জে. পি সি রেড্ডি
	৯ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. টিরাথ বর্মা
	৭১ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. কাথফালিয়া
	৬৯,ক্যাভালরি বিএসএফ ৪ ব্যাটালিয়ন	

কেন্দ্রীয় সেক্টর

১০১ কমিউনিকেশন জোনগোহাটি		মে. জে. গুরবক্স সিং গিল
মে. জে. জি, সি, নাগরা		
৬৩ মাউন্টেন ব্রিগেড		
৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড		ব্রি. এইচ, এস, খের
১৬৭ মাউন্টেন ব্রিগেড		ব্রি. ইরানী
বিএসএফ		২ টা ব্যাটালিয়ন

পূর্ব সেক্টর

হেডকোয়ার্টার ৪ কোর	আগরতলা	লে. জে. সাগাত সিং
৮ মাউন্টেন ডিভিশন		মে. জে. কৃষ্ণা রাও
	৫৯ মাউন্টেন ব্রিগেড, ধিরমানগর	ব্রি. সি, এ কুইন
	৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড, শাহান কাইলা	ব্রি. আর সি ভি আপ্তে
	আর্মড স্কোয়াড্রন	
২৭ মাউন্টেন ডিভিশন		মে. জে. বি এফ গনজালিস
	৩৭ পদাতিক ব্রিগেড	
২৩ ডিভিশন		মে. জে. আর, ডি, হিরা
	৬১ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. পান্ডে
	৮৩ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. বি, এস, সান্ধু
	১৮১ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. ওয়াই, সি, বাক্সি
	৩০১ মাউন্টেন ব্রিগেড	ব্রি. হারিন্দর সিং সোধী
	বিএসএফ, ১৭ ব্যাটালিয়ন	
	সিআরপি, ১ ব্যাটালিয়ন	
	টু অ্যাডহক ডিভিশন অব লাইট আর্মার (পিটি ৭৬)	
	ওয়ান মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারি (৫.৫ ইনচি)	

www.pathagar.com

মোট শক্তি

পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা প্রায় চার লাখ।

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিমানবাহিনীর শক্তি:

১১ টি স্কোয়াড্রন: ৪টি হান্টার স্কোয়াড্রন
১টি সুখই এসউ ৭ স্কোয়াড্রন
৩টি ন্যাট স্কোয়াড্রন
৩টি ২ স্কোয়াড্রন

পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর চারটি বিমানবন্দর ছিল।

ভারতীয় নৌবাহিনী

বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ভারতীয় নৌবাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল বিশাখাপাটনামে এবং নেতৃত্বে ছিলেন ভাইস এ্যাডমিরাল এন. কৃষ্ণান।

এ বহরে ছিল: এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, বিক্রান্ত (৪৭ টি বিমান)

ওয়ান স্কোয়াড্রন এলিজ, ৩ স্কোয়াড্রন সি হক, ওয়ান হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন, ৮টি ফ্রিগেট, ২টি সাবমেরিন, ৩টি ল্যানডিং শিপ ট্যাংক।

আপেক্ষিক শক্তি

	ভারতীয় সেনাবাহিনী	পাকিস্তান সেনাবাহিনী	অনুপাত
কোর হেডকোয়ার্টার	৩	১	৩:১
পদাতিক ডিভিশন	৮	৩	২.৫:১
পদাতিক ব্রিগেড	২৮	৯	৩:১
পদাতিক ব্রিগেড	১	০	১:০
পদাতিক ব্যাটালিয়ন	৭২	৩৪	২.৫:১
আর্মার রেজিমেন্ট	৬	১	৬:১
ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মড স্কোয়াড্রন	৩	১	৩:১

www.pathagar.com

আর্টিলারি রেজিমেন্ট	৪৬	৬	৮:১
এ এ রেজিমেন্ট	৪	১	৪:১
প্যারা মিলিটারি ফোর্স (ব্যাটালিয়ন)	৩২	১৩	৩:১
মুক্তিবাহিনী	১০০,০০০		
বিমানবাহিনী স্কোয়াড্রন	১১	১	১১:১
নৌবাহিনী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার	১		
ড্রেসট্রয়ার/ফ্রিগেট	৮		
ল্যান্ডিং শিপ ট্যাংক	৩		

ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ড

সেনাবাহিনীতে ৩৫ বছর কর্মরত থাকার পর লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরাকে তার জীবনের সবচাইতে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ঝিলাম জেলায় কালার নিকটে একটি গ্রামে ১৯১৮ সালে তার জন্ম। তিনি ১৯৩৮ সালে ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন পেয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এ যোগ দেন। (দেশ ভাগের পর এটাই একমাত্র পাঞ্জাব রেজিমেন্ট যা ভারতে রয়ে যায়) দেরাদুন একাডেমিতে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সহপাঠী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মায় যুদ্ধ করেন এবং ১৯৪৮-এ তিনি ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ১ প্যারা ব্যাটালিয়ন-এর নেতৃত্বে ছিলেন। ১৯৬৫ পাক-ভারত যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি ডিরেক্টর, মিলিটারি ট্রেনিং ছিলেন।

এ লম্বা সুন্দর, অনেক পুরস্কৃত কর্মকর্তা অরোরা জুন ১৯৬৯ সালে ইষ্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছিলেন। আর ইয়াহিয়ার ক্রাকডাউনের পরে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালাবে। তাই মে ১৯৭১-এ যখন ইস্টার্ন কমান্ডকে সীমান্তের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা আক্রমণের পরিকল্পনা আরো জোরদার করতে থাকে।

১৯ আগষ্ট, ১৯৭১ তারিখে আরোরা নয়া দিল্লীস্থ আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পান (১) ইস্টার্ন থিয়েটারে যতটা সম্ভব পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে ধ্বংস করা; এবং (২) পূর্ব পাকিস্তানের বড় অংশ দখল করা। যখন এ লেখক অরোরাকে প্রশ্ন করেন, অরোরা ঢাকা দখলের সম্মন্ধে কোন মন্তব্য করেননি।

www.pathagar.com

MAP 2

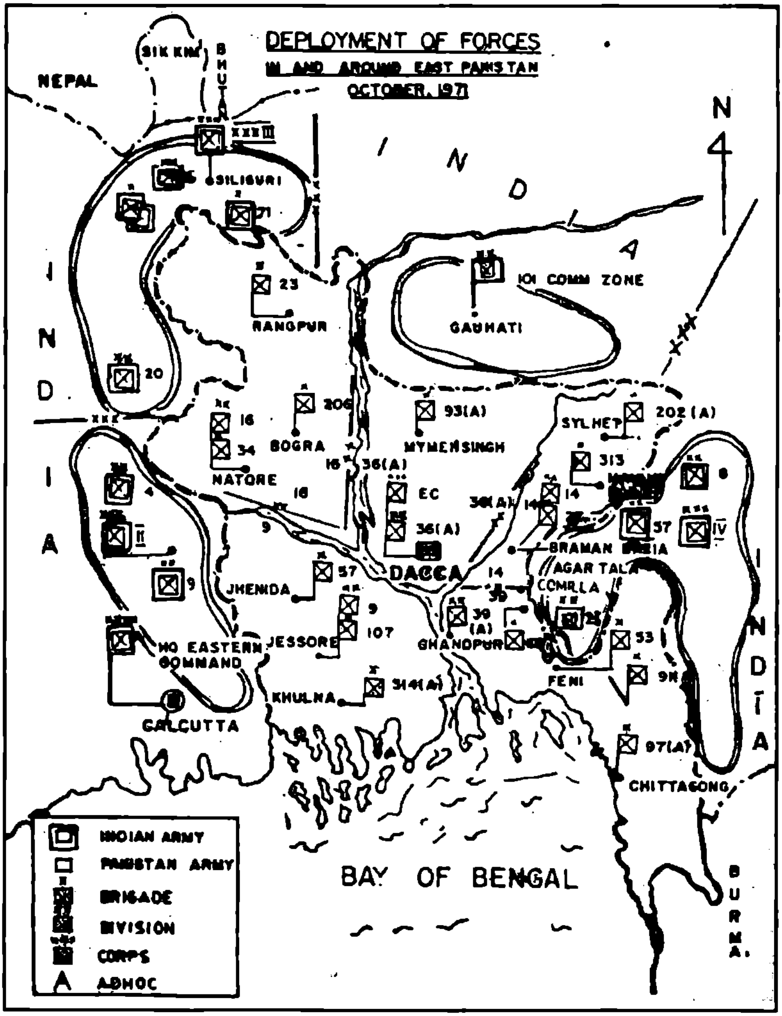
DEPLOYMENT OF FORCES
OCTOBER, 1971
NEPAL
SIKKIM
BHUTAN
INDIA
SILIGURI
RANGPUR
GAUHATI
101 COMM ZONE
BOGRA
NATORE
MYMENSINGH
SYLHET
DACCA
JHENIDA
JESSORE
KHULNA
CALCUTTA
HQ EASTERN COMMAND
CHANDPUR
COMILLA
AGAR TALA
FENI
CHITTAGONG
BAY OF BENGAL
BURMA
INDIAN ARMY
PAKISTAN ARMY
BRIGADE
DIVISION
CORPS
ADHOC

অরোরা ছিল ধীরস্থির কিন্তু আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা। তিনি কোন উগ্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতি সাবধানী। হেডকোয়ার্টার থেকে বার বার তাগাদা দিতে হয় এগিয়ে যাবার জন্য। তার এ অতি সাবধানতার কারণেই ইন্দিরা গান্ধী তাকে সাসপেন্ড করেন। আর সেনাবাহিনীর প্রধান পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়।

তার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল পশ্চিম দিক থেকে গঙ্গা নদী পর্যন্ত আসা। আর পূর্ব দিক থেকে মেঘনা পর্যন্ত আসা। পরের আক্রমণ সমন্ধে তিনি পরে নির্দেশ দিবেন বলে স্থির করলেন। অরোরা স্বীকার করেন, তাদের মনে ঢাকা টার্গেট ছিল কিন্তু তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেননি।

তিনি ঠিক করলেন, পূর্ব দিক থেকে বেশি চাপ প্রয়োগ করা হবে। কারণ, সে দিক থেকে ঢাকা বেশি নিকটে ছিল। শুধু একটি নদী পেরুলেই ঢাকা আসা যায়। ফেনীতে আক্রমণ করলে চট্টগ্রাম যাবার জন্য রেল ও সড়ক পথ বিচ্ছিন্ন হবে। পূর্ব পাকিস্তানের বড় অংশকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

এ পূর্ব সেক্টরে নৌবাহিনীও চট্রগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে বাধাঁপ্রাপ্ত করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ক্ষমতা রাখে। অরোরা আশঙ্কা করেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী উত্তর দিকে আক্রমণ করলে, আসাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই তিনি ওদিক থেকে আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর পশ্চিম আক্রমণ বগুড়াকে উদ্দেশ্য করে করা হয়। কারণ সে সেক্টরে বগুড়া ছিল কেন্দ্রবিন্দু।

পশ্চিম দিক থেকে অগ্রসর হলে দুটি নদী পার হতে হয় মধুমতি এবং গঙ্গা। কিন্তু এতে প্রদেশের উত্তর ভাগকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এতে শত্রু কলকাতায় আক্রমণ করতে ব্যর্থ হবে এবং সৈন্যরা চালনা দখল করতে পারবে।

অরোরা ভাগ্যবান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের তিন পাশেই ভারত ছিল এবং তারা এ তিন পাশ থেকেই অগ্রসর হতে পারে কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ ঢাকার দিকে। তার জন্য সুবিধা ছিল তাদের সংখ্যা বেশি ও অবকাঠামোগত সুবিধা থাকায় এবং বিমানবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকাতে।

অরোরা বলেন, সময় তাদের পক্ষে ছিল। কারণ, জুন নাগাদ তারা বুঝতে পারলো যুদ্ধ হবেই। তিনি বলেন, "সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্রুত আক্রমণ সারতে হল, আন্তর্জাতিক মহল বাঁধা দেওয়ার আগে।" তিনি নিজেকে তিনসপ্তাহ বা তারও কম সময় দিলেন অপারেশন শেষ করবার জন্য।

www.pathagar.com

অপারেশনের ধারণা

জেনারেল অরোরা স্থির করলেন বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করতে থাকবে ঢাকাকে মূল লক্ষ্যে রেখে। তার অপারেশনাল ধারণা ছিল এরকম:

ক) মুখোমুখি আক্রমণ এড়ানো;

খ) শক্তিশালী স্থানগুলো এড়িয়ে যাওয়া;

গ) প্যারা ড্রপ দ্বারা অপারেশন দ্রুত করা;

ঘ) বিভিন্ন স্থান বিচ্ছিন্ন করবার জন্য মুক্তিবাহিনী ও বিদ্রোহীদের ব্যবহার করা;

ঙ) পাকিস্তানী সৈন্যদের ঢাকায় ফিরে যেতে বাঁধা দেওয়া এবং

চ) ১২ বা ১৫ দিনের মধ্যে ঢাকায় পৌঁছনো যাতে তার আগে জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি করাতে না পারে।

আক্রমণের পরিকল্পনা (মানচিত্র -৩)

পূর্ব দিক থেকে প্রধান প্রচেষ্টা। চাঁদপুর, দাউদকান্দি এবং ভৈরব বাজার দখল করতে অগ্রসর হবে ৩ ডিভিশনসহ কোর এবং সাথে থাকবে মুক্তিবাহিনীর একটি ব্রিগেড। মূল লক্ষ্য হবে দ্রুততম সময়ে ঢাকা দখল করা।

দুইটি মধ্যম প্রচেষ্টা, একটি পশ্চিম দিক থেকে আর একটি উত্তর দিক থেকে। দুইটি ডিভিশন সহকারে যশোর ও বগুড়া সেক্টরে প্রবেশ করা।

দুইটি ভিন্নমুখীকরণ প্রচেষ্টা। একটি ব্রিগেড ময়মনসিংহের দিক থেকে দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া।

জেনারেল অরোরা স্বীকার করেন, বর্ষার পরপরই ৩ ডিসেম্বরের অনেক আগেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালাতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার ভাষ্য, তিনি এটা করলেন সীমান্তে বসবাসকারীদের মনোবল রক্ষার্থে। তার নিজের সৈন্যদের তৈরী করবার জন্য এবং প্রধান আক্রমণ চালানোর জন্য কিছু কিছু স্থান দখল রাখা। এ সব ছোট ছোট আক্রমণ মৌখিক নির্দেশে পালন করা হয়। তার অপারেশনাল নীতির মধ্যে ছিল সীমান্তের ওপার থেকে গুলি করা তারপর পাকিস্তান ভূখণ্ডে ঢুকে

www.pathagar.com

MAP 3

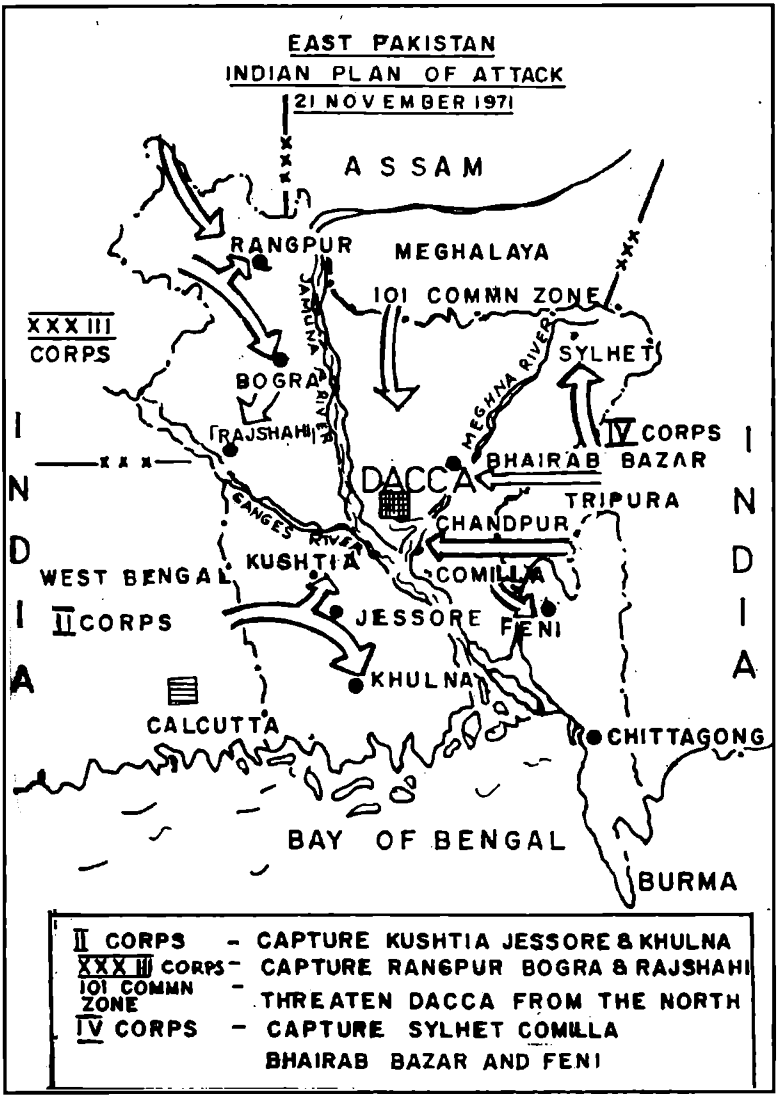

www.pathagar.com

পরা। ২১ নভেম্বরে বগুড়াতে ভারত ও পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে এ ধরণের একটি সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক নজরে আসে।

তিনি বলেন, "রাজনৈতিক নির্দেশ ছিল যে পাকিস্তান প্রবেশ কালে কোন ভারতীয় সৈন্য যেন আটক না হয়। কারণ, তখন আন্তর্জাতিক মহল থেকে ভারত আক্রমণ চালাতে বাঁধা প্রাপ্ত হবে।" ভারতীয় সৈন্য আটক হলে প্রমাণ পাওয়া যেত তারা অক্টোবর থেকেই আক্রমণ চালাতে শুরু করে।

২০/২১ নভেম্বর রাতে, মুক্তিবাহিনীকে সাথে নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ণশক্তিতে পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করে। এ আক্রমণ সীমান্তবর্তী সংঘর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না বা বিদ্রোহীদেরকে সহায়তা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানী সীমান্ত পোস্টগুলোর উপর ব্রিগেড আকারের হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানীদের পালানোর পথ বন্ধ রাখতে মুক্তিবাহিনীকে পেছন দিকে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এ কাজটি স্বাভাবিক সময়ে অনেক কঠিন হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৭১ সালে এসে মুক্তিবাহিনী শুধুমাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহযোগিতাই পাচ্ছিল তা নয়; তারা জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল।

নভেম্বরে সামরিক পরিস্থিতি

পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন মূল আক্রমণ শুরু হয়, রক্ষণভাগ (পাকিস্তান) তখন সামরিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। তাদের সৈন্যরা ছোট ছোট দলে সীমান্ত বরাবর নিয়োজিত ছিল। আটমাস ধরে তারা বিদ্রোহীদের কাউন্টার-ইনসারজেন্সি আক্রমণ চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পরে। তাদের শক্তি ছিল সীমিত। তাদের যথেষ্ট আর্টিলারি রেজিমেন্ট ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে মাঝারি অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়নি, আর পদাতিক ডিভিশনের যথেষ্ট ফিল্ড বন্দুকও ছিল না। আর্মার ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটগুলো ছিল দুর্বল। ইস্টার্ন কমান্ডে কোর সিগন্যালের দায়িত্বরত ব্রিগেডিয়ার আরিফ রাজা বলেন, তাদের সিগন্যাল যোগাযোগ রেডিও সেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাও বিদ্রোহীরা বাঁধাপ্রাপ্ত করেছিল।

দ্বিতীয় সারির সৈন্যরা ঠিক মত অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। বিদ্রোহীরা যোগাযোগের যন্ত্রপাতির বড় অংশই ধ্বংস করে দিয়েছিল। সাবোটাজ তৎপরতা দ্বারা অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিমান যোগে সহায়তা ছিল অপ্রতুল। নৌ অবরোধ এবং ভারতস্থ আকাশ সীমানায় নিষেধাজ্ঞার ফলে, পূর্ব পাকিস্তানকে

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল। আটটি ব্যাটালিয়নের আসার কথা ছিল কিন্তু মাত্র দুটি ব্যাটালিয়ন আসতে পেরেছিল। ঢাকাকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট সৈন্যও ছিল না।

হিলি যুদ্ধ

পরিণতি যা-ই হোক না কেন, পূর্ব পকিস্তানকে রক্ষা করার মত সামরিক প্রস্তুতি অপ্রতুল হলেও সাহস ও মনোবল নিয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল। এ রকম সাহসের উদাহরণ দিতে হলে, ১৬ পদাতিক ডিভিশনের ২০৫ পদাতিক ব্রিগেডের কথা স্মরণ করতে হয়, যারা বগুড়া-হিলির প্রতিরক্ষায় উত্তর-পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিল।

হিলি একটি ছোট শহর। মাত্র কয়েক হাজার লোক এখানে বসবাস করে। বিদ্রোহীদের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের কারণে বেশির ভাগ লোকজন নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। শহরটা ঠিক পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। ভারতের সীমান্ত ছিল মাত্র কয়েক গজ। দেশ ভাগের আগে কলকাতা থেকে উত্তর বঙ্গের রেল লাইন হিলির উপর দিয়ে যেত। হিলি ভারতের এতই কাছে ছিল যে অনেক মাটির ঘরের জানালা খুললেই ভারত চোখের সামনে পরে।

হিলি ও যমুনা নদীর মাঝে ভারতের একটি অংশ অবস্থিত। এটা শত্রু পক্ষের জন্য খুব সুবিধাজনক ছিল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার জন্য।

নভেম্বরে হিলির চারপাশের স্থান ছিল শুকনো ও সমতল। কোন জলাশয় ছিল না আক্রমণ বাঁধা দেওয়ার জন্য। ভারতের সবদিকে সুবিধা ছিল। কিন্তু হিলি প্রতিরক্ষায় পাকিস্তানী ব্রিগেড শেষ পর্যন্ত সাহসের সাথে টিকে থাকলো।

২০৫ ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রি. তাজাম্মুল হুসেইন মালিক যিনি সেপ্টেম্বর ১৯৬৫-এ ৩ বালুচের কমান্ডিং অফিসার পদে লাহরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবেশ প্রতিহত করেছিলেন। এবার তিনি তাদের বগুড়ায় প্রবেশ প্রতিহত করবার জন্য দায়িত্ব নেন।

তাজাম্মুল ছিলেন অভিবক্ত ভারতের চাকওয়াল জেলার। ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭-এ তিনি ৭ম রাজপুত রেজিমেন্টে যোগ দেন। তার দৃঢ় মনোবলের জন্য তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পরিচিত ছিলেন। বৈরী পরিবেশে এটাই ছিল তার শক্তি ও সাহসের উৎস। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন ভূ-খণ্ড রক্ষার্থে। তিনি কিছুতেই প্রত্যাহার করে বগুড়ায় পিছু হটে যাবেন না।

www.pathagar.com

২০৫ ব্রিগেডের ছিল তিনটি ডিভিশন-ফোর ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট (লে. কর্নেল সাইদ আখলাক আহমেদ আব্বাসী, পরে লে. ক. মমতাজ; এইট বালুচ (লে. ক. বেগ) এবং ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (লে. ক. আমীর নওয়াজ) এদের সহায়তায় ছিল ৪০ ফিল্ড রেজিমেন্ট (লে. ক. তারেক) এবং কতগুলো হালকা ট্যাঙ্ক। এরা ১৬ ডিভিশনের মাঝে অবস্থান করে। এক পাশে ২৩ ব্রিগেড আর অন্য পাশে ৩৪ ব্রিগেড। পিছনে ছিল যমুনা নদী। শত্রুকে বাঁধা দিতে ব্যর্থ হলে ১৬ ডিভিশন দুই ভাগে বিভক্ত হবে।

তাজাম্মুলকে নির্দেশ দেওয়া হলো সীমান্তের যত কাছাকাছি সম্ভব অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুকে প্রতিহত করা। তাদেরকে নবাবগঞ্জ-মহেশপুর-খেটিয়ালে আসতে দেয়া যাবে না। তাই তাকে বেশ সামনে অবস্থান করতে হলো। যুদ্ধ হবে শক্তিশালী বগুড়া দুর্গের বেশ দূরে।

তিন ব্যাটালিয়নসহ ব্রিগেডটি প্রায় ১০০ কিলোমিটার স্থানে অবস্থান নেয়। কিন্তু শত্রু আক্রমণ করলে তাদের পিছনে তেমন সাপোর্ট ছিল না। হিলির চারপাশে ছিল তাদের প্রধান শক্তি। ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার ছিল মহেশপুরে।

১৬ পাকিস্তান ডিভিশনের বিরুদ্ধে ভারতের আক্রমণের পরিকল্পনা

লে. জে. এম, থাপান এর নেতৃত্বে ৩৩ ভারতীয় কোরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যমুনা ও গঙ্গা (পদ্মা) নদীর মাঝের এলাকায় অবস্থিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা। তার ছিল দুইটি মাউন্টেন ডিভিশন ও একটি আর্মড ব্রিগেড। ২০ মাউন্টেন ডিভিশনকে বলা হয়, পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হিলি-গোরঘাট-গাইবান্ধা-বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে, আর ৬ মাউন্টেন ডিভিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয় উত্তর থেকে দক্ষিণে পঞ্চগড়-দিনাজপুর ও রংপুর এর দিকে অগ্রসর হতে। বগুড়ায় ওরা মিলিত হবে।

মে.জে. লাচমান সিং লেহল(৪৮) একজন আর্টিলারি অফিসার। তিনি পাঞ্জাবের হোসিয়াপুর জেলার লোক। আর সেনা জীবন শুরু হয় ১৯৪৩-এ মাউন্টেন গার্নার হিসেবে, ১৯৭১-এ তিনি ২০ মাউন্টেন ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। তিনি লেখককে বিস্তারিত বিবরণ দেন হিলিতে তার তৎপরতা সম্বন্ধে। দিল্লী জিমখানায় বসে তিনি এ সবের বর্ণনা দেন। তিনি বলেন ১৯৬৭ তে হিলিতে আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করা হয় যখন জগজিৎ সিং অরোরা ছিলেন সেখানে

www.pathagar.com

কোর কমান্ডার। কিন্তু হিলি নিয়ে আসল পরিকল্পনা হয় যে ১৯৭১-এ যখন আর্মি কমান্ডার জেনারেল অরোরা তাকে বলেন, "অন্যরা কিছু না কিছু করছে তুমি প্রবেশ করো না কেন? কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন কাউকে আটক করে বন্দি হিসেবে না নেওয়া হয়।" তিনি বলেন স্থানীয় পুলিশ দারোগাও তাকে প্রশ্ন করলো তিনি কখন হিলি আক্রমণ করবেন।

লাচমান সিং বলেন তিনি মুখোমুখি আক্রমণের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তার সাথে একমত ছিলেন তার কোর কমান্ডার, কিন্তু অরোরা এ পরিকল্পনা জোর করে তার উপর ন্যাস্ত করে। "ইন্ডিয়ান আর্মি আফটার ইন্ডিপেনডেন্ট" বইয়ের লেখক মেজর প্রভাল এ তথ্য সমর্থন করেন।

দ্রুত বিজয় নিশ্চিত করার জন্য ২০ মাউন্টেন ডিভিশনকে অতিরিক্ত একটি পদাতিক ব্রিগেড দেওয়া হয়। এর সাথে আরো দুটি আর্মাড রেজিমেন্ট। ২০২ ব্রিগেডকে বলা হয়, পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে হিলিকে দখল করবার জন্য। আরো দখল করবে পলাশবাড়ী ও গোরাঘাট। সেখানে তারা ৭১ ব্রিগেডের সাথে মিলিত হবে। ৬৬ এবং ৩৪০ ব্রিগেড দিনাজপুরকে নিয়ন্ত্রণে আনবে। তারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পশ্চাতে অবস্থান গ্রহণ করবে যাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পশ্চাত পদ হয়ে বগুড়ায় ফেরত না যেতে পারে। সময় বেশি লাগলেও, পাকিস্তানীরা বগুড়ায় তাদের শক্তিশালী দুর্গে ফেরত যাবার আগে তারা ১৬ ডিভিশনকে ভাঙতে সক্ষম হলো।

যুদ্ধ শুরু

রাত একটায় (জিরো আওয়া) ২৪ নভেম্বরে ৪ গার্ড ব্যাটালিয়ন এর ২০২ ব্রিগেড হিলি আক্রমণ করে। সাত ঘন্টা ধরে আর্টিলারি ফায়ার চলতে থাকে, এতে শুধু গোলাবারুদ নষ্ট হয়, কোন সফলতা অর্জিত হয়নি। ভারতীয় আর্টিলারি কমান্ডার বোঝাতে ব্যর্থ ছিলেন। এ দীর্ঘ সময় শক্তিশালী অবস্থানের উপর হামলা চালালেও কোন লাভ হয় না। তাই স্যংখায় বেশি হলেও ভারতীয় সেনারা সহজে অগ্রসর হতে পারলো না। পাকিস্তানী ৪ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এর সি কোম্পানি সাহসের সাথে টিকে থাকলো। আর পাচ ঘন্টা হামলা চালিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি প্লাটুনকে ঘিরে ধরতে পারলো তাও ক্ষণিকের জন্য।

www.pathagar.com

চারপাশে শত্রুকে দেখেও সেকেন্ড লেফটেনেন্ট সেলিম বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। তার ব্যক্তিগত সাহস দেখে সৈন্যরা ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় সৈন্যদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করতে থাকে। হাবিলদার ইসাফখান ঝাঁপিয়ে পড়েন শত্রুদের উপর। যারা তার প্লাটুনকে ঘিরে ধরতে চেষ্টা করল। শত্রুরা সংখ্যায় বেশি হলেও তিনি তাদেরকে পিছনে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। যার জন্য তাকে দেওয়া হয় তাঘমা-ই-জুরাত পদবী। ভারতীয়রা তৃতীয়বারের মত আবার এ প্লাটুনে হামলা চালায়। আবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন সূর্য উঠে গিয়েছিল আর শত্রু পক্ষ আর হামলা না চালানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিল। তারা নিহত আহতদের দেখাশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো। ৪ গার্ড এ যুদ্ধে ১৩৯ জনকে হারালো, এর মধ্যে ছিল ৮ জন অফিসার ও ৪ জন জেসিও।

রাত নামার সাথে সাথে আক্রমনকারীরা আবার অগ্রসর হতে থাকলো। কিন্তু পাকিস্তানী ৪ এফএফ-এর প্লাটুনের হাতে তারা আবার পরাজিত হয়। ভোরের আলোয় দেখা যায় চারদিকে ভারতীয় সৈন্যদের লাশ। তাদের নেতাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার জন্য তাদেরকে বিদেশি ভূ-খণ্ডে প্রাণ দিতে হলো। বাকি ভারতীয় সৈন্যদেরকে পালাতে হলো।

সব মিলিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সেখানে অন্তত ৩০০ জনকে হারাতে হলো। এর মধ্যে ছিল তিনজন কোম্পানি কমান্ডার, দুই জন কোম্পানি অফিসার এবং পাঁচ জন জেসিও। পাকিস্তানের পক্ষে ৪ এফএফকে হারাতে হলো ১১ জন বীর সৈনিক। ২২ জন অহত হলেন। এদের মধ্যে ছিল সাহসী যুবক সেলিম, যুদ্ধের এক আদর্শের প্রতীক। ৪ এফএফ এর একটি প্লাটুনকে পরাজিত করতে না পেরে ভারতীয় সৈন্যরা উত্তর দিক থেকে এসে, তাদের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করতে চেষ্টা করে । কিন্তু পাল্টা আক্রমণে শত্রুরা আবার পরাজিত হয়। তবে লে. কর্নেল আব্বাসীর বাঙ্কারে আর্টিলারি শেল এসে পড়লে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনা হলে লে. কর্নেল মমতাজ তার স্থলে আসেন। তিনি ছিলেন ডিভিশনের জিএসও ওয়ান।

এ আংশিক বিজয়ে তাজাম্মুল সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি আবার পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দেন। শত্রুকে সীমান্তের দিকে ঠেলে দেবার জন্য। এ পাল্টা আক্রমণের ফলে ৪ এফএফ-এর বি কোম্পানী ২৭/২৮ নভেম্বর রাতে দখলকৃত গ্রামগুলোকে ফেরত নিতে সক্ষম হয়। ৩০ নভেম্বর ভারতীয়রা ৫ গাড়োয়ালদের দিয়ে আবার হামলা চালায়। তাদের সাথে এবার ট্যাংকের স্কোয়াড্রন ছিল। তারা ৪ এফএফ এর উত্তরে রায়বাগ গ্রাম দখল করে। পাকিস্তানীদের জন্য ফের পাল্টা আক্রমণ করা

www.pathagar.com

জরুরি হয়। এবার সি কোম্পানী এগিয়ে আসলো। তারাও ভারতীয়দের দেখালো যে মুখোমুখি আক্রমণে তারাও কোন অংশে কম ছিল না। ১/২ ডিসেম্বর রাতে ভারতের হাত থেকে তারা রায়বাগ গ্রামটিকে নিজের দখলে আনে। ভারতীয়দেরকে সীমান্তের ওপারে নিজ ভূখণ্ডে পালিয়ে যেতে হলো।

১৬৫ ও ২০২ ব্রিগেড চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলো হিলিতে পাকিস্তানী বাহিনীকে দুর্বল করবার জন্য কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। দশ দিন প্রচেষ্টার পরেও হিলিতে তারা ৪ এফএফকে পরাজিত করতে পারেনি। যদিও সংখ্যায় তারা অনেক বেশি ছিল। তাদের ছিল ছয় ব্যাটালিয়ন, পাকিস্তানের ছিল মাত্র একটি। ভারতের ৫ গাড়োয়াল হারালো ৬৫ সৈন্য, ৪ জন জে, সি, ও এবং ৪ জন অফিসার।

৫ ডিসেম্বর ভারতীয়রা হিলিতে ফের আক্রমণ চালায়। এবার সরাসরি হিলিতে আক্রমণের সাথে তারা উত্তর দিক থেকেও হামলা চালায়। চার চারটা আক্রমণের অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরেও সি কোম্পানী সাহসের সাথে লড়াই করে ভারতীয়দের প্রতিহত করতে থাকে। তার ইউনিটের জন্য সুবেদার গুল মুহম্মদ প্রাণ দিলেন। তিনি তার ইউনিটের মনোবলকে শক্ত করে রেখেছিলেন। মেজর অকরাম যার কোম্পানী আক্রমণের সম্মুখে ছিল। সিদ্ধান্ত নিলেন শত্রুদের ট্যাংক ধ্বংস করবার জন্য। তিনি একটি ৪০ এমএম চাইনিজ রকেট লঞ্চার এবং একজন সিপাহীকে নিয়ে শত্রু ট্যাংকের ১০০ গজ কাছে অবস্থান নেন। তিনি রকেট লঞ্চার দিয়ে ফায়ার করতে থাকেন এবং তিনটি ট্যাংক ধ্বংস করেন। চতুর্থ ট্যাংকে রকেট লঞ্চার মারতে গিয়ে তিনি মেশিন গানের গুলিতে নিহত হয়। যে ভূ-খণ্ডে তিনি রক্ষা করছিলেন। সে মাটি তার রক্ত দিয়ে ভিজে গেল। মেজর আকরামকে সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী দেওয়া হয় নিশান-ই-হায়দার। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসের, বীরত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে।

ভারতীয় ডিভিশন হিলিকে দখলে আনবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে, ভারতীয় লেখকরা যাই লেখেননা কেন, তারা হিলিকে দখলে আনতে পারেননি। তারা বার বার আক্রমণ করা সত্ত্বেও ৪ এফএফকে হটাতে পারেনি।

১৯ দিন কঠোর লড়াইয়ের পর, ১১ ডিসেম্বরে অবশেষে ৪ এফএফকে হিলি থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

এর মধ্যে শত্রু পক্ষ ফুলবাড়ি দিয়ে ৪ এফএফ-এর ১০ কিলোমিটার উত্তরে তাজাম্মুলের ব্রিগেডের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করে। তাজাম্মুল তখন হিলি রক্ষায় ব্যস্ত।

www.pathagar.com

চারপাশে শত্রুকে দেখে নতুন পরিকল্পনা করতে হচ্ছিল। তাজাম্মুল ৮ বালুচ থেকে একটি কোম্পানী এবং ১৩ এফএফ থেকে একটি কোম্পানী বের করে বাহাদুরিয়াতে বাঁধার সৃষ্টি করে। তারা বেশ শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করে। তারা শত্রুকে বিলম্ব করানোর জন্য আগেই দুই প্লাটুন সামনে প্রেরণ করে। তারা একদিন ধরে শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকে।

ভারতীয়দের আরো দুইদিন লাগলো বাহাদুরিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য। ৮ ডিসেম্বর বিকেল ৪ টায় তারা এলাকায় শেলিং শুরু করে। সিপাহী ফয়েজ এবং সিপাহী ইয়াকুব ট্যাংকের তলায় পরে মৃত্যু বরণ করেন। সুবেদার মাসকিল শাহ ট্রেঞ্চ থেকে বের হয়ে ট্যাংকের দিকে গুলি ছুড়তে থাকেন। তার হাতে ছিল ৭৫ এমএম রিকোয়েললেস রাইফেল। আর একটি ট্যাংকের শেল তাকে নিহত করে। সুবেদার শের আফজাল, মেজর সাবির কামালের আদেশে তার রাইফেল দিয়ে ৫০০ গজ দূরের শত্রুর ট্যাঙ্কে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। তিনিও ট্যাঙ্কের ফায়ারে মৃত্যু বরণ করেন। মেজর সাবির কামালও নিজের জীবন দিলেন। তাদের শত্রুর কথায় হয়ত তাদের সবচাইতে বড় সম্মান পাওয়া যায়। লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরা, কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড, বললেন যে এ বাহাদুরিয়ায় সবচাইতে কঠিন যুদ্ধ হয় পূর্ব পাকিস্তানে। তাদের ১৭ কুমাওয়ান-এর ৫৫ জন মৃত্যুবরণ করেন আর ২৭ জন আহত হয়।

মাত্র এক বছর সার্ভিসে থেকে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট শহীদ হারুন ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, শত্রুদের তোয়াক্কা না করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেরত যেয়ে তার সহযোদ্ধাদের লাশ নিয়ে আসেন, তাদেরকে সম্মানজনকভাবে দাফন দেওয়ার জন্য।

৮ গার্ড নতুন করে আক্রমণ চালায় ৯ ডিসেম্বরে। এটাকেও প্রতিহত করা হয়। পরের দিন ১৭ কুমাওন এবং ৮ গার্ড আবার ঠেলে সামনে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাহাদুরিয়ার প্রতিরক্ষা ছিল শক্তিশালী এবং এ দুই ভারতীয় ব্যাটালিয়ন অগ্রসর হতে পারেনি। ১০/১১ ডিসেম্বর রাতে তৃতীয় আক্রমণে ভারত সেনাবাহিনী কিছুটা অগ্রসর হতে পারল। ক্যাপ্টেন আশরাফ ও লেফটেন্যান্ট মুনির গুরুতর আহত হয়। ভারত দল তিনগুন বড় হলেও ৩ দিন ধরে এ বীর সৈন্যরা তাদের প্রতিহত করে। অবশেষে তারা কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলে যায়। ১৭ কুমাওন-এর ১৩২ জন নিহত হয়। এদের মধ্যে ছিল ৫ জন অফিসার ও ৪ জন জে সি ও।

জেনারেল লাচমান দেখলেন তাজাম্মুলের ব্রিগেডকে ঘিরে ফেলতে যেয়ে তাদের অনেক ক্ষতি হয় এবং বগুড়ায় অগ্রসর হতে বিলম্ব হতে থাকে। তাই সে তার

www.pathagar.com

সৈন্যদেরকে অবার পেছন থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়। তার সৈন্যরা আরো পূর্বে পীরগঞ্জ দখল করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা দক্ষিণে পলাশবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। যখন বাহাদুড়িয়ার যুদ্ধ চলতে থাকে শত্রুরা তাজাম্মুলের ব্রিগেডের পিছনে অবস্থান নেয় এবং রংপুর-বগুড়া সড়কে বসে থাকে।

একটা জিরো গ্রুপ সভা শেষে ৭ ডিসেম্বর জেনারেল নজর হুসেইন শাহ্, জিওসি ১৬ ডিভিশন এবং ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল বগুড়ায় অবস্থিত ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছিলেন রংপুর থেকে। বিকেল পাঁচটায় পীরগঞ্জে এসে তারা শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের সম্মুখীন হয়। তারা থেমে, লাফ দিয়ে তাড়াতাড়ি একটি ডোবায় নেমে যায়। ট্যাঙ্ক ফায়ার করতে শুরু করে কিন্তু ভাগ্যক্রমে দুই কমান্ডারের একজনও আহত হয়নি। নজর হুসেইন ও তাজাম্মুল পায়ে হেঁটে রংপুরে আসতে সক্ষম হন কিছু বাঙালীর সাহায্যে। তাজাম্মুল পরে শত্রুদের ভিতর দিয়ে যেয়ে তার ব্রিগেডে যোগ দিলেন হিলিতে।

৩৪ ব্রিগেডকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, ব্রিগেডিয়ার নাঈম এবং ব্রিগেডিয়ার নওয়াব আহমেদ আশরাফ একটি করে ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে ছিলেন। জেনারেল নজর নতুন করে ৩৪ ব্রিগেড মোতায়েন করেন। সে পর্যন্ত তাদের উপর কোন হামলা হয়নি। গোবিন্দগঞ্জের কাছে করোতোয়া নদীর তীরে ব্রিগেড দুটো অবস্থান গ্রহণ করে ৮ ডিসেম্বর শত্রুকে বগুড়ার দিকে অগ্রসর হতে বাঁধা দেওয়ার জন্য।

৯ ডিসেম্বর পলাশবাড়ী দখল করে শত্রুপক্ষ ৩২ বালুচের সাথে যোগাযোগ করে ১০ ডিসেম্বরে, বগুড়া যাবার পথে। ভারতীয় ব্রিগেড কমান্ডার শিক্ষা পেয়ে আর পাকিস্তানীদেরকে সামনাসামনি আক্রমণ করলেন না। কারণ, তারা আহত বাঘের মত লড়াই করে। এবার মুক্তি বাহিনীর সাহায্যে তারা ৩২ বালুচের পিছনে আসে। ১১ ডিসেম্বর তারা ব্যাটালিয়নের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করে যাতে তারা বগুড়ায় ফেরত না যেতে পারে। ইউনিটের শক্তি বল হারিয়ে গেল।

১১/১২ ডিসেম্বর জেনারেল নজর তার ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারকে আরো দক্ষিণে সরিয়ে আনলেন। বগুড়াকে তিনি তাজাম্মুলের হাতে রাখলেন। ব্রিগেডিয়ার তাজাম্মুল হিলি ছেড়ে তার সৈন্যদেরকে বগুড়ায় রাখলেন। ১২ ডিসেম্বরে ২০৫ ব্রিগেড এবং ৩২ বালুচ বগুড়ায় অবস্থান করে। ১৪ ডিসেম্বর তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। শত্রুপক্ষও ততোদিনে বগুড়ার রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলে। পিছনে শত্রু অবস্থান গ্রহণ করে ৬ গার্ডস, ২/৫ গোরখা, এবং ৪ মাদ্রাজ ব্যাটালিয়ন। সাথে ৬৩ ক্যাভার্লির একটি স্কোয়াড্রন। ১৫ ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ বগুড়া আক্রমণ করে।

www.pathagar.com

MAP 4

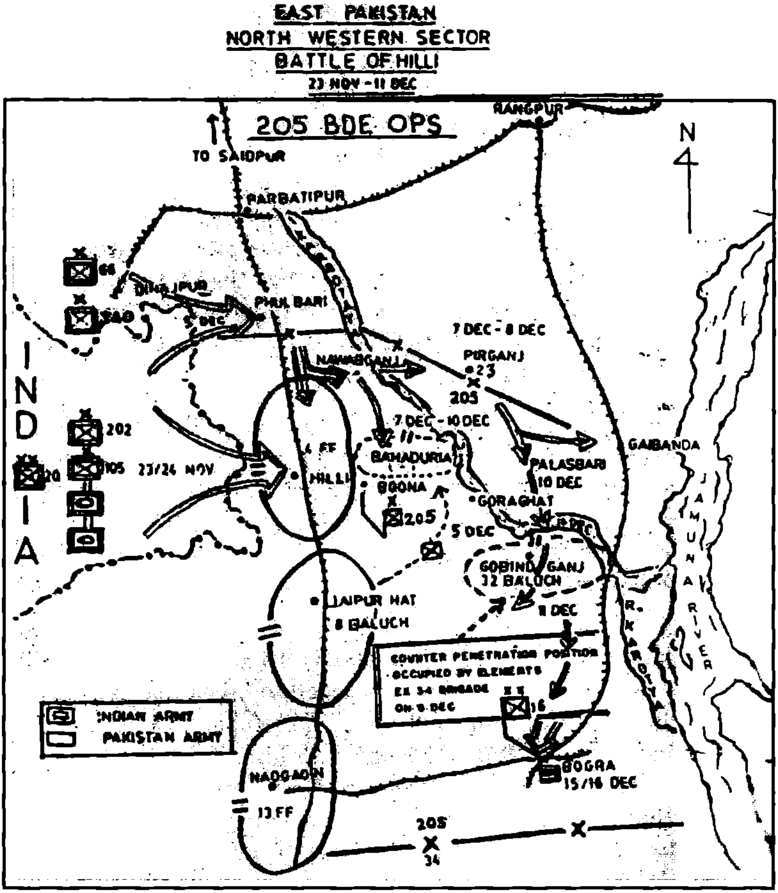
EAST PAKISTAN
NORTH WESTERN SECTOR
BATTLE OF HILLI
23 NOV - 11 DEC
205 BDE OPS
TO SAIDPUR
RANGPUR
PARBATIPUR
DINAJPUR
PHULBARI
5 DEC
NAWABGANJ
7 DEC - 8 DEC
PIRGANJ
205
7 DEC - 10 DEC
BAHADURIA
BOONA
HILLI
4 FF
202
105 23/24 NOV
GAIBANDA
PALASBARI
10 DEC
GORAGHAT
5 DEC
GOBINDGANJ
32 BALUCH
11 DEC
JAIPUR HAT
8 BALUCH
INDIA
N
JAMUNA RIVER
R. KARATOYA
COUNTER PENETRATION POSITION OCCUPIED BY ELEMENTS EX 34 BRIGADE ON 9 DEC
16
INDIAN ARMY
PAKISTAN ARMY
NAOGAON
13 FF
BOGRA
15/16 DEC
205
34

লড়াই চলতে থাকে যখন ১৬ ডিসেম্বর সকালবেলা ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার থেকে আত্মসমর্পণ করবার আদেশ আসে। ততদিনে ১৬ ডিভিশন তিন আলাদা ভাগে বিভক্ত ছিল। ২৩ ব্রিগেড রংপুরে ছিল। ২০৫ ব্রিগেড বগুড়ায় যুদ্ধরত ছিল, আর ৩৪ ব্রিগেডের কিছু অংশ ব্রিগেডিয়ার আশরাফের নেতৃত্বে রাজশাহীতে ছিল।

তাজাম্মুল আত্মসমর্পনের আদেশ জানিয়ে দিয়ে নিজে আত্মসমর্পণ না করে, সিভিল ড্রেস-এ ১৬/১৭ ডিসেম্বর রাতে বগুড়া থেকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কয়েকজনের সাথে রওনা দিলে মুক্তিবাহিনী তাদের আটক করে। প্রথমে তাকে মারধর করা হয়। তারপর যখন তারা জানতে পারল সে ব্রিগেড কমান্ডার, তখন তাকে না মেরে, ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি বালুচ ছিলেন বলে বেঁচে গেলেন। কারণ বালুচদের প্রতি বাঙালীদের দুর্বলতা ছিল। বালুচরা তাদেরকে এক সময় রক্ষা করেছিল।

একটি মাত্র পাকিস্তানী ব্রিগেডকে, খোলা আকাশের নিচে, পরাজিত করবার জন্য দরকার ছিল চারটি ব্রিগেড বিশিষ্ট ২০ পদাতিক ডিভিশন, দুই রেজিমেন্ট ও কোর আর্টিলারি এবং ২৩ দিন (২৩ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর)। পাকিস্তানীদের কোন স্থানীয় সমর্থন ছিল না। ছিল না কোন বিমান সহায়তা। মেজর প্রাভান লেখেন "হিলি ছিল কঠিন যুদ্ধের মধ্যে অন্যতম।"

২৩ ব্রিগেড (সৈয়দপুর-রংপুর সেক্টর)

প্রাথমিক দিকে এ ব্রিগেড কমান্ড করেন ব্রিগেডিয়ার আক্তার আনসারী। পরবর্তীতে এর দায়িত্ব নেন ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ শফি। শফি ছিলেন ছোট-খাট ফ্রন্টিয়ার অফিসার। স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিস-এ তিনি শিক্ষকতা করতেন, কিন্তু প্রথমে তাকে দুই শত্রুকে একই সাথে মোকাবেলা করতে হল- বাইরের শত্রু এবং অভ্যন্তরীণ শত্রু।

২৩ ব্রিগেডে ছিল:

৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (লে. কর্নেল সেলিম জিয়া)
২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (লে. কর্নেল এম, এইচ, মালিক)
৪৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (লে. কর্নেল মঞ্জুর)
২৬ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট (লে.কর্নেল হাকিম আরশাদ কোরেশী)

www.pathagar.com

কোম্পানী এক্স ৩৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট (রিচ অ্যান্ড সাপোর্ট)
স্কোয়াড্রন আর্মার এক্স ২৯ ক্যাভালরি (লে.কর্নেল বুখারী)
৪৮ ফিল্ড আর্টিলারি প্রত্যক্ষ সহায়তা

ব্রিগেডের দায়িত্ব ছিল পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে পশ্চিমে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত। উত্তরে ফুলবাড়ী থেকে দক্ষিণে দিনাজপুর পর্যন্ত। তাদের দায়িত্ব ছিল দিনাজপুর, সৈয়দপুর ও রংপুরকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলা এবং রক্ষা করা।

২৩ ব্রিগেডের ট্রেইন ছিল সমতল এবং খোলা। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহমান তিস্তা নদী ব্যতীত, তেমন কোন বড় জলাশয় ছিল না। শীত মৌসুমে মাটি ছিল শক্ত, ট্যাঙ্ক চালানোর উপযোগী। উত্তর-পশ্চিমে ভারতের এক খণ্ড জমি ঢুকে পড়ে, এটি ছিল পাচাগাড়, এটি ছিল দৈর্ঘ্যে ২৫ কি.মি. এবং প্রস্থে ৫ কি.মি.। সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে, ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত। আর একটি রাস্তা পশ্চিম সীমান্ত বরাবর চলে গেছে, এসব রাস্তা শত্রু পক্ষের জন্য সুবিধা ছিল আক্রমণ করবার জন্য।

নেপাল আর পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে সরু ভূ-খণ্ড আসামের সাথে ভারতের বাকী অংশকে যুক্ত করে। ইস্টার্ন কমান্ডের পর্যাপ্ত সৈন্য থাকলে এ স্থানটি ভারতের জন্য বিপদজনক।

মুক্তি বাহিনীর সহায়তায় ৭১ ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ব্রিগেড বাজানপুর আর বাউরায় অবস্থান গ্রহণ করে ৩১ অক্টোবর/১ নভেম্বর রাতে। তাই প্রধান যুদ্ধের অনেক আগেই পঞ্চগড়ের উত্তরের ভূ-খণ্ড পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যায়। ৭১ ব্রিগেডকে নির্দেশ দেওয়া হয় সৈয়দপুর দখল করবার জন্য। এর ছিল চারটি পদাতিক ব্যাটিলিয়ন: ৫ ব্রিগেডিয়ার; ৭ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি; ১২ রাজপুতানা রাইফেলস আর ২১ রাজপুত রেজিমেন্ট। ব্রিগেডটাকে দুইটি আর্মাড রেজিমেন্ট এবং ডিভিশনাল আর্টিলারি দেয়া হয়। প্রায় ২০০০ থেকে ৩০০০ মুক্তি বাহিনী রিক্সা করে, সাইকেল করে এবং নিজ কাঁধে করে ওদের ভারী মাল বহন করে। পালিত লেখেন, "স্থানীয় লোকজন সবরকমের তথ্য উপস্থাপন করত।" আর বিমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ভারতীয়দের।

১৯/২০ নভেম্বরে পঞ্চগড়ে অবস্থিত ৮ পাঞ্জাবে প্রথম বড় রকমের হামলা হয়। হামলাটি ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় হামলা চালানো হয়। এটি ছিল ২২ নভেম্বর, আরও তিনটি ব্যাটালিয়নে হামলা চালায়। মোট তিনদিন লাগলো গ্রেনডিয়ারস, রাজপুতানা রাইফেলস্ ও রাজপুত রেজিমেন্টকে পঞ্চগড় দখল করতে। পঞ্চগড়

www.pathagar.com

২৯ নভেম্বর দখলকৃত হয়, কিন্তু তারা পাকিস্তানী সৈন্যদেরকে আটক করতে পারে নি। আরো পাঁচ দিন লাগলো ভারতীয়দের ঠাকুরগাঁও পৌছতে। আবারও পাকিস্তানীদের আটক করা গেলনা।

শত্রু পক্ষের কমান্ডার অনিচ্ছাকৃত হলেও স্বীকার করতে বাধ্য হন, যে সেকেন্ড লেফটেনেন্ট তাহির আশরাফ ও ৪৮ পাঞ্জাবের মেজর মুসলেহউদ্দীন ছিলেন বীর সৈনিক।

৮ পাঞ্জাবের বি কোম্পানী নাগেশ্বরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা ছিল অন্যান্য ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন। তেমন কোন আর্টিলারি সাপোর্ট ছিল না, তারপরও তারা ভারতের ৪ রেজিমেন্ট এর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। নয়দিন ধরে (২১-৩০ নভেম্বর) ভারতীয়রা এ সাহসী দলকে পরাজিত করতে চেষ্টা করে। ভারতীয়রা ছিল ওদের থেকে চারগুণ শক্তিশালী। ১ ডিসেম্বর ব্রাভো কোম্পানীর সৈন্যরা ঠাকুরগাঁও চলে আসে।

৮ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানীর সাহায্যে ৩৪ পাঞ্জাব ও তিনটি শত্রু ব্যাটালিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করে ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁয়ের সামনে। পরে তারা পীরগঞ্জে সরে আসে। এ সংঘর্ষে ভারতীয় ৭ মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি হারায় ৭০ জন সৈনিক, তাদের কমান্ডিং অফিসার, অ্যাডজুডেন্ট এবং ফরোয়ার্ড অবজারভেশন অফিসারসহ। ৭ ডিসেম্বর তারা পীরগঞ্জ আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। রামসাগরে ৭ মাদ্রাজ ব্যাটালিয়নের একই ভাগ্য ঘটে। ৪ ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ হাতিবান্ধায় সীমান্ত পার করে। ৮ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী সারারাত ধরে তাদের প্রতিহত করে। তারপর তারা সরে আসে। ৫ ডিসেম্বর লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম আক্রমণ হয় এবং ৭ তারিখে দখল হাতছাড়া হয়।

অনেক আহত, নিহত, ক্ষয়ক্ষতির পর, ভারতীয়দেরকে ঠাকুরগাঁও এসে আবার সংগঠিত হতে হয়। আবার অগ্রসর হতে তাদের পুরো ছয়দিন লেগে গেল। এতে প্রতিরক্ষকরা সময় পেল সৈয়দপুরে সংগঠিত হবার জন্য। সৈয়দপুরের উত্তরে খানসামা গ্রাম ১১ ডিসেম্বরে দখলকৃত হয়। সৈয়দপুর থেকে ৯ কি.মি. দূরে নীলফামারী ভারতের হাতে চলে যায় ১১ ডিসেম্বরে। কিন্তু সৈয়দপুরে ব্রিগেডিয়ার শফির গ্যারিসন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকলো। জেনারেল অরোরা বলেন, যে ১৩ ডিসেম্বরে মানেকশ তাকে ফোন করে ধমক দিয়ে বলেন, "দিনাজপুর ও রংপুর এখনও পতন হয়নি।" অরোরা না শোনার ভান করেন আর বলেন, "আপনার কথাটি লিখে পাঠান"

www.pathagar.com

MAP 5

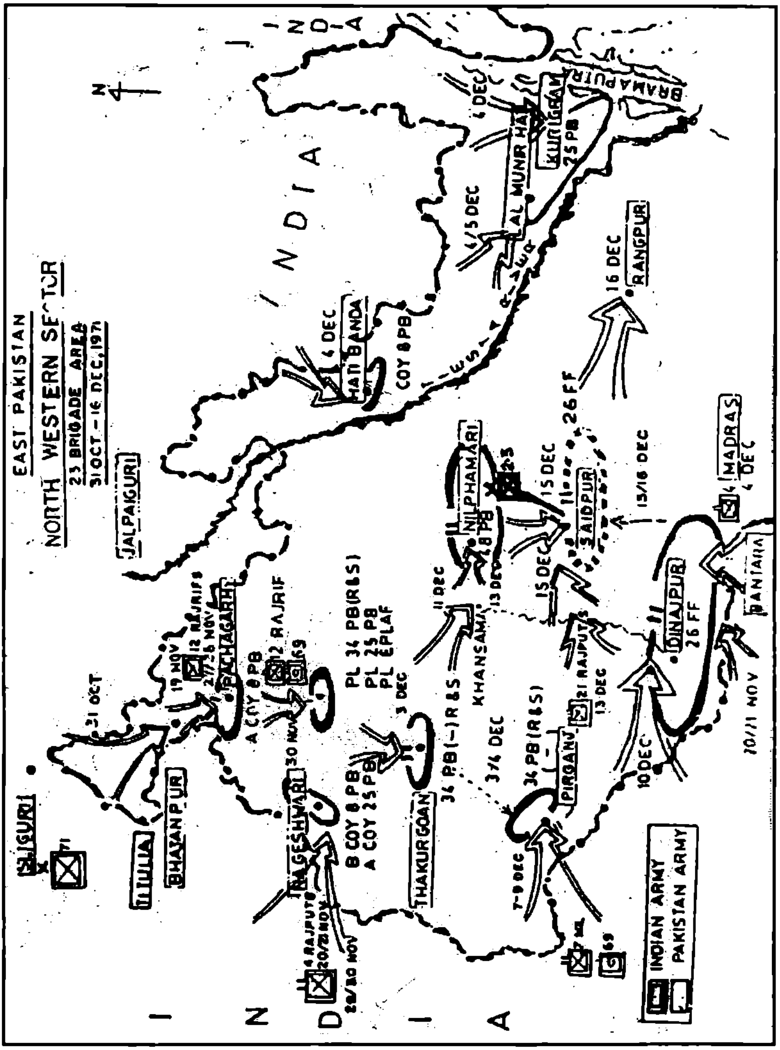
EAST PAKISTAN
NORTH WESTERN SECTOR
23 BRIGADE AREA
31 OCT - 16 DEC, 1971
INDIA
JALPAIGURI
HATIBANDA
4 DEC
COY 8 PB
KURIGRAM
25 PB
BRAMAPUTRA
4/5 DEC
RANGPUR
16 DEC
NILPHAMARI
SAIDPUR
15 DEC
26 FF
MADRAS
4 DEC
13/16 DEC
DINAJPUR
26 FF
PANTARA
10/11 NOV
PACHAGARH
BHAJANPUR
TITULIA
31 OCT
19 NOV
A COY 8 PB
30 NOV
THAKURGOAN
KHANSAMA
11 DEC
3 DEC
3/4 DEC
PIRGANJ
13 DEC
10 DEC
PL 34 PB (R&S)
PL 25 PB
PL EPCAF
B COY 8 PB
A COY 25 PB
34 PB (R&S)
RAGESHWARI
4 RAJPUTS
28/30 NOV
INDIAN ARMY
PAKISTAN ARMY

২৩ ব্রিগেড সেক্টরের তিনটি শহর দিনাজপুর, সৈয়দপুর ও রংপুর ১৬ ডিসেম্বর যুদ্ধ বিরতির আগ পর্যন্ত পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ তিন শহরে ভারতীয় সেনাবাহিনী অধিক শক্তিশালী হলেও, পাকিস্তানীদের পরাজিত করতে পারেনি। ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের ২৭দিন লাগলো সৈয়দপুর পৌঁছতে, বর্ডারের মাত্র ৪৮ কি. মি. দূরে।

দক্ষিণ সেক্টর

মেজর জেনারেল মুহম্মদ হুসেইন আনসারী ৯ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার ছিলেন। তিনি ছিলেন নম্র, ভদ্র, ধার্মিক গানার অফিসার। তিনি ভাওয়ালপুরের লোক ছিলেন। কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি অপারেশন এর সময় তাকে একটি পদাতিক ডিভিশনের কমান্ড দেওয়া হয়। তার দায়িত্বে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর, গঙ্গা থেকে পাক-ভারত সীমান্ত পর্যন্ত। যে কোন মূল্যে যশোর শহরকে বাঁচানো ছিল তাদের লক্ষ্য। গুরুত্বের দিক থেকে ঢাকার পরেই ছিল যশোর। তার অঞ্চলের একমাত্র বন্দর খুলনা ছিল যশোরের দক্ষিণে। ৯ ডিভিশনের ছিল মাত্র দুইটি নিয়মিত ব্রিগেড এবং একটি অ্যাডহক ব্রিগেড। তারা সীমান্তে মোতায়েন হয় যশোর ও খুলনার পাঁচটি প্রবেশপথ পাহারা দেবার জন্য।

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদের নেতৃত্বে ৫৭ ব্রিগেডের প্রথম দুইটি ব্যাটালিয়ন ছিল। তৃতীয় ব্যাটালিয়ন, ৫০ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ২৯ নভেম্বরে যোগ দেয়, ভারত আক্রমণের আটদিন পরে। তার ব্রিগেড ঝিনাইদহ প্রবেশের উত্তর পথ পাহারা দিচ্ছিল। ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ হায়াতের নেতৃত্বে ১০৭ ব্রিগেড যশোরের প্রবেশ পথ প্রতিরক্ষা করছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল আর্মড ফোর্স নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ফজল-ই-হামিদ একটি অ্যাডহক ব্রিগেড প্রতিষ্ঠিত করে। এটাকে কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান, তথা খুলনা ও সুন্দরবনে মোতায়েন করা হয়।

শত্রু সংগঠন

লে. জে. টি এন রায়নার নেতৃত্বে ভারতীয় ২ কোরকে ৯ পদাতিক ডিভিশনের বিরুদ্ধে মোতায়েন করা হয়। ২ কোর এর হেডকোয়ার্টার ছিল কৃষ্ণনগরে, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে ১৫ মাইল দূরে। তারা কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনায় আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ৯ ডিভিশনের

www.pathagar.com

ঢাকায় ফেরত যাবার পথে বাঁধা দেয়া। ২ কোর এর ছিল দুই পদাতিক ডিভিশন, ৪ মাউন্টেন ডিভিশন (মে.জে. মোহিন্দর সিং বারার) এবং ৭ মাউন্টেন ডিভিশন মে. জে. দালবির সিং)।

যশোর যুদ্ধ

পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোন থেকে জীবননগর, কোটচাঁদপুর ও কালিগঞ্জ হয়ে সুন্দরবন এবং বঙ্গপোসাগর নিয়ে ছিল যশোর সেক্টর। এর বিস্তৃতি ছিল প্রায় ১১২ কি. মি। পূর্বে ছিল গঙ্গা নদী। সীমান্তের ওপারে ছিল ভারতীয় নগরী কলকাতা। কলকাতায় বিপুল জনসংখ্যা ছিল, অনেকে খোলা আকাশের নীচে রাস্তার ধারে রাত কাটায়। ওদিকে কোন হুমকি আসলে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যুদ্ধের পরে জেনারেল দালবির সিং ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ হায়াতের কাছে স্বীকার করেন, যদি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কলকাতা শহরের তিন কিলোমিটার কাছে অগ্রসর হতো, জনগণ ভয়ে পালিয়ে যেত।

প্রায় ৭৫ গজ চওড়া ও ৩/৪ ফুট গভীর কপোতাক্ষ নদ উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে যায়, সীমান্তের পূর্ব দিক দিয়ে। পদাতিক বাহিনীর জন্য এটি একটি প্রধান বাঁধা কিন্তু ভারতীয়দের ছিল জলচর ট্যাঙ্ক পিটি ৭৬ । আরো পূর্বে ছিল ভৈরব ও চিত্রা নদী, যানবাহন চলাচলের জন্য এগুলোও ছিল বাঁধা। আরো ছিল বেশ কয়েকটি খাল বিল। এ সেক্টরে বেশ কয়েকটি নদী ছিল, রেল লাইন ছিল। এগুলো যশোর ও খুলনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। শান্তিকালে যশোরের জনসংখ্যা ৭৫,০০০ এবং এটি ভারত সীমান্ত থেকে মাত্র ২৪ কি.মি. দূরে। দক্ষিণে খুলনা পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এটি ছিল চালনা বন্দরের প্রবেশ দ্বার। এখান থেকে নৌ পথে ঢাকা যাওয়া সম্ভব-দূরত্ব ৩৫০ কি.মি।

সোয়ারী জেলার ছোট খাট ইউসুফ যাই পাঠান অফিসার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ হায়াত, মে ১৯৭১ তাকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয় যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরকারের কর্তৃত্ব পুনস্থাপনে ব্যস্ত। সাধারণ অবস্থায় একটি ব্রিগেডকে পরিচালনা করা উনার জন্য খুবই স্বাভাবিক। আর তখন সেখানে তার বিখ্যাত ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্ট এর ইউনিট নিয়োজিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল তিনি এবং তার সৈন্যরা বিরূপ পরিবেশে ছিলেন। স্থানীয় জনগণ শুধু অন্য ভাষায় কথাই বলে না, তারা তার শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে ছিল।

www.pathagar.com

তার দায়িত্ব ছিল যশোরকে দুর্গ হিসেবে গড়ে তোলা। কিন্তু আবার তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় সব বর্ডার অবজারভেশন পোষ্ট থেকে শত্রুকে দূরে রাখা।

যশোরের তিনটি প্রধান প্রবেশ পথ ছিল (১) উত্তরে, জীবননগর-মেহেরপুর-চৌগাছা-যশোর; (২) মাঝে বেনাপোল-ঝিকরগাছা-যশোর; এবং (৩) দক্ষিণে, সাতক্ষীরা-কলারোয়া-যশোর।

যদিও ইস্টার্ন কমান্ড অনুমান করল যে ভারত সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব সীমান্ত থেকে আক্রমণ করবে। কারণ এটাই ছিল ঢাকায় যাওয়ার নিকটতম পথ, তারা আশঙ্কা করলো যে শত্রু যশোরকেও আক্রমণ করতে পারে। কারণ এ গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল সীমান্তের কাছে। তাই এ সেক্টরে সবচাইতে শক্তিশালী ডিভিশনকে নিয়োজিত করা হয়। ১০৭ ব্রিগেডকে দেওয়া হয় শক্তিশালী পদাতিক, আর্মার ও গোলন্দাজ বাহিনী, খুলনাতে তাছাড়া প্যারা-মিলিটারি ফোর্স এবং চারটি গানবোট রাখা হয় ৯ ডিভিশনকে সমর্থন দেয়ার জন্য।

হায়াত তার সৈন্যদের এভাবে নিয়োগ দিলেন

জীবননগর অ্যাপ্রোচ	৩৮ এফএফ (লে.ক.সাঈদ উল্লাহ)
	৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট (লে.ক. শরিফ)
বেনাপোল অ্যাপ্যোচ	২২ এফএফ (লে.ক.শামসুজ্জামান)
	ব্যাটারি ফিল্ড রেজিমেন্ট
সাতক্ষীরা অ্যাপ্যোচ	১৫ এফএফ (লে.ক.ইউসুফ জিয়া)
	ব্যাটারি ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট

২১ পাঞ্জাবের (আর এস ব্যাটালিয়ন) কোম্পানীকে ব্রিগেড ফ্রন্টে মোতায়েন হয়

কালিগঞ্জ	আভ্যন্তরী নিরাপত্তা বাহিনী (লে.ক. খাটাক)
	মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন (লে.ক. ইহসান-উল-হক)
ডিভিশন্যাল রিসার্ভ	
৬ পাঞ্জাব	লে.ক. শরিফ মালিক
২১ পাঞ্জাব	লে.ক. লে.ক.ইমতিয়াজ ওয়ারাইখ
৩ ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মার স্কোয়াড্রন	মে.মাকসুদ আহমেদ
সেক্শন স্পেশাল সার্ভিসেস গ্রুপ	ক্যাপ্টেন আসিফ

www.pathagar.com

১০৭ ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী

৯ (ভারতীয়) পদাতিক	মে.জে. দালবীর সিং
৩২ পদাতিক ব্রিগেড	ব্রি. তেরয়ারী
৪২ পদাতিক ব্রিগেড	ব্রি. জে, এস, গরিয়া
৪৫ পদাতিক ব্রিগেড	
৩৫০ পদাতিক ব্রিগেড	ব্রি. এইচ সিন্ধু
৪৫ ক্যাভালরি রেজিমেন্ট পিটি ৭৬	
৬৫ ক্যাভালরি রেজিমেন্ট পিটি ৫৫	
৭ পাঞ্জাব (মটর ব্যাটালিয়ন)	
কোর আর্টিলারি মিডিয়াম রেজিমেন্ট (১৩০ এমএম)	

৯ ইন্ডিয়ান ডিভিশনের কাজ ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যশোর ও খুলনাকে দখল করা। দালবীর সিং মুক্তিবাহিনীকে দিয়ে ১০৭ ব্রিগেডের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য পাচ্ছিলেন। যুদ্ধের পরে ব্রি. তিওয়ারী ব্রি. হায়াতকে বললেন, তারা ব্রিগেড এবং অফিসারদের ছবিও পেয়েছিলেন।

১১ নভেম্বর ছোট খাট হামলা হামলা আরম্ভ হয় যখন জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানী চৌগাছা এলাকায় চাঁদপুর গ্রামের কাছে অবস্থান নেয়। ১২ নভেম্বর আর এক ভারতীয় সৈন্যদল সীমান্ত পার হয়ে মাসালির বর্ডার আউট পোষ্ট দখল করে। পরের দিন হায়াত ৩৮ এফএফ এবং ২২ এফএফ থেকে একটি করে কোম্পানীকে নির্দেশ দেয়, শত্রুকে ঠেলে ফেরত পাঠানোর জন্য। তার সৈন্যদের এ কাজে নেতৃত্ব দানকালে মেজর আনিস শহীদ হন। মেজর জেনারেল দালবীর সিং তাকে পূর্ণ সম্মান সহকারে দাফন করেন-এক সৈনিকের প্রতি আরেক সৈনিকের যথার্থ সম্মান।

২২ ও ২২ নভেম্বর রাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী পুরোপুরি শক্তি সহকারে ১০৭ ব্যাটালিয়নের জায়গায় ঢুকে পরে ৪২ ব্রিগেড কপোতাক্ষ নদী পার করে যশোরের ৩২ কি.মি. পশ্চিমে বায়রা গ্রামে। তারা গরীবপুর গ্রাম আক্রমণ করে। তাদের সাথে ছিল কয়েকটা ট্যাঙ্ক এবং এয়ার-টু-গ্রাউন্ড মিসাইল। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ নদীর উপর দিয়ে ২০০ ফুট সেতু নির্মান করলে, তার উপর দিয়ে তারা ট্যাঙ্ক নিয়ে যায়। পাকিস্তানের ৩৮ এফএফ তখন গরীবপুরে।

www.pathagar.com

হায়াত নির্দেশ পেয়েছিলেন এক ইঞ্চি জমিও যেন শত্রুর হাতে না পরে। শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করার নির্দেশ পান তিনি। তিনি শুধু এক কোম্পানী সম্পন্ন ২১ পাঞ্জাব নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। তাকে আক্রমণে সহায়তা করবার জন্য ছিল ৩ ইন্ডিপেনডেন্ট স্কোয়াড্রন, ২০১ ফিল্ড ব্যাটারী এবং ১২০ এমএম মটরস। ৬ পাঞ্জাবের মেজর ইয়াহিয়া হামিদ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। তারা গরীবপুর পুনরায় দখল করে। কিন্তু অনেক আহত নিহত হয়। ভারতীয়দের ১২ট ট্যাঙ্কের মধ্যে ১০টি ধ্বংস হয়। ১০৭ ব্রিগেডের জন্য এটি বড় ধরনের ক্ষতি। হামিদ কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজী ছিলেন না। তিনি গরীবপুরেই থাকলেন আর শত্রুকে প্রতিহত করতে থাকলেন। শত্রুর শক্তি তাদের প্রাথমিক অনুমানের চাইতে অনেক বেশি। এ জন্য জেনারেল আনসারী ৬ ও ২১ পাঞ্জাবকে প্রত্যাহার করে, কয়েক কিলোমিটার পিছনে আফ্রানুল্লাকে নিয়ে আসলেন, যশোর ক্যান্টনমেন্টের সামনে। ২২ নভেম্বর শত্রু গরীবনগরে ফেরত যায়।

একই দিনে পাকিস্তান বিমানবাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। চারটি এফ-৮৬ গরীবপুরে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালায়। ভারতীয় জিনএট বিমান পাল্টা আক্রমণ চালায় আর জঙ্গি বিমান যুদ্ধে পাকিস্তানের দুইটি জঙ্গি বিমান ধ্বংস হয়। পাইলটরা বেঁচে যায়। তারা প্যারাসুটে নিজ দেশের ভূ-খণ্ডে নামতে সক্ষম হলেও স্থানীয় লোকজন তাদের ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করে।

নভেম্বর ২৩ তারিখে ভারত বাহিনী ৩৮ এফএফ এর একটি কোম্পানীকে আক্রমণ করে চৌগাছা। কোম্পানীকে প্রত্যাহার করে আনা হয় আফ্রায়। কিছু অংশ গেল ঝিকরগাছায়।

যশোরের বিভাগীয় সদর দপ্তরে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রি. হায়াত এবং কর্নেল কে. কে, আফ্রিদি উভয়েই সুপারিশ করলেন তাদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য। যেহেতু ভারতীয়রা নদীর তীরে নিজেদের অবস্থানকে দৃঢ় করেছিল এবং যশোর আক্রমণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

হায়াত জিওসি এর কাছে আবেদন জানালেন ৬ পাঞ্জাব দেয়ার জন্য, যাতে আফ্রাতে বসে তারা শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। তিনি বলেন, জেনারেল আনসারীর কাছে তিনি অনুমতি চেয়েছিলেন এক ব্যাটালিয়ন প্রত্যাহার করে যশোর হতে নিয়ে আসা কারন ভারতীয়রা সেখানে আক্রমণ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জিওসি এ অনুরোধে সাড়া দেননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে সেখান থেকে

www.pathagar.com

MAP 6

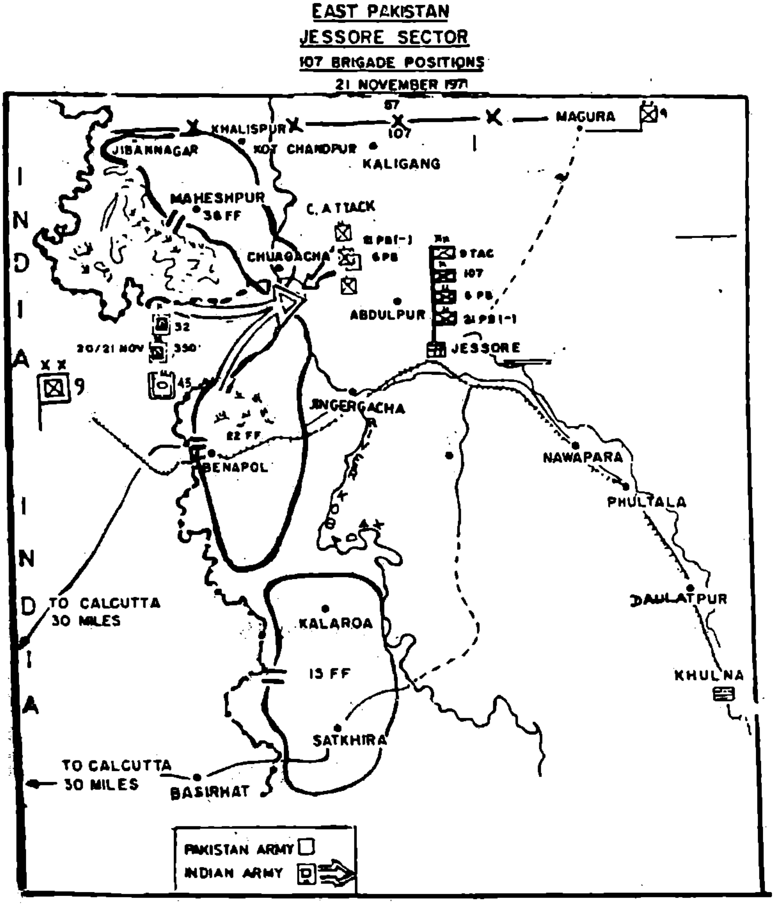
EAST PAKISTAN
JESSORE SECTOR
107 BRIGADE POSITIONS
21 NOVEMBER 1971
KHALISPUR
JIBANNAGAR
KOT CHANDPUR
KALIGANG
MAGURA
107
MAHESHPUR
38 FF
C. ATTACK
CHUAGACHA
6 PB
9 TAC
107
ABDULPUR
JESSORE
INDIA
X X
9
32
20/21 NOV
350
45
22 FF
JINGERGACHA
BENAPOL
NAWAPARA
PHULTALA
INDIA
TO CALCUTTA
30 MILES
KALAROA
DAULATPUR
15 FF
KHULNA
SATKHIRA
TO CALCUTTA
30 MILES
BASIRHAT
PAKISTAN ARMY
INDIAN ARMY

সৈন্য সরে গেলে, একটা ফাঁক সৃষ্টি হবে এবং এ ভূ-খণ্ডে বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে। তিনি আরও মনে করেন সৈন্য প্রত্যাহার করলে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে।

যশোরের কয়েক মাইল পশ্চিমে ব্রি. হায়াত সৈন্যদেরকে পুনরায় সংগঠিত করেন। তিনি ডান দিকে ৬ পাঞ্জাবকে রাখেন আর ২২ এফএফকে সংগঠিত করেন যেন শত্রুদেরকে করাকরিভাবে প্রতিহত করা যায়। ২৫ নভেম্বরে পাবনা থেকে ১২ পাঞ্জাব এসে ১০৭ ব্রিগেডে যোগ দেয় আফ্রা অবস্থানকে আরো শক্তিশালী করবার জন্য।

পাঁচ দিন শক্ত যুদ্ধের পরেও শত্রুপক্ষ জীবননগর দখল করতে পারেনি। ২৬ নভেম্বর গ্রামটি হুমকির সম্মুখীন হয়। সে রাতে একটা কোম্পানীকে আদেশ দেওয়া হয় হাসানদা থেকে জীবননগরে যাবার জন্য। কিন্তু তার আগেই ভারতীয়রা সেখানে শেলিং শুরু করে। তারা জীবননগর দখল করতে সক্ষম হয়। ৩৮এফএফ পেছনে সরে এসে খালিশপুরের পূর্বে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখানে ৫০ পাঞ্জাব তাদের সাথে যোগ দেয়।

হায়াত দাবি করেন, তিনি জিওসির কাছে আবার আবেদন করেন ১৫এফএফকে যশোরে ফিরিয়ে আনবার জন্য। তিনি আশঙ্কা করেন যে শত্রুরা সামনে আগাবে। কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আনসারী হায়াতকে বলেন, "তুমি সফলতার সঙ্গে শত্রুকে প্রতিহত করেছ। এখন দেখা যাক কি হয়।"

হায়াত সদর দপ্তরের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, "কোন সৈন্যকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে না। জিওসি চাইলে শুধু একটা কোম্পনী প্রত্যাহার করতে পারবেন। বর্তমানে যে যার অবস্থানে আছে, সেখান থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে ৭৫% নিহত-আহত হবার পর্যন্ত।"

হেলসায় ভারতীয় আক্রমণ

২১ পাঞ্জাব (দুই কোম্পানী বাদে), ১২ পাঞ্জাব এবং ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটি কোম্পানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মোহাম্মদপুর-হেলসাকে প্রতিরক্ষা করবার জন্য। মোহাম্মাদপুর-হেলসা ছিল যশোরের ১০ কি.মি. দূরে। যশোরে আসতে এটাই সবচাইতে দ্রুত পথ। মুক্তিবাহিনী থেকে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে, ভারতীয়

www.pathagar.com

MAP 7

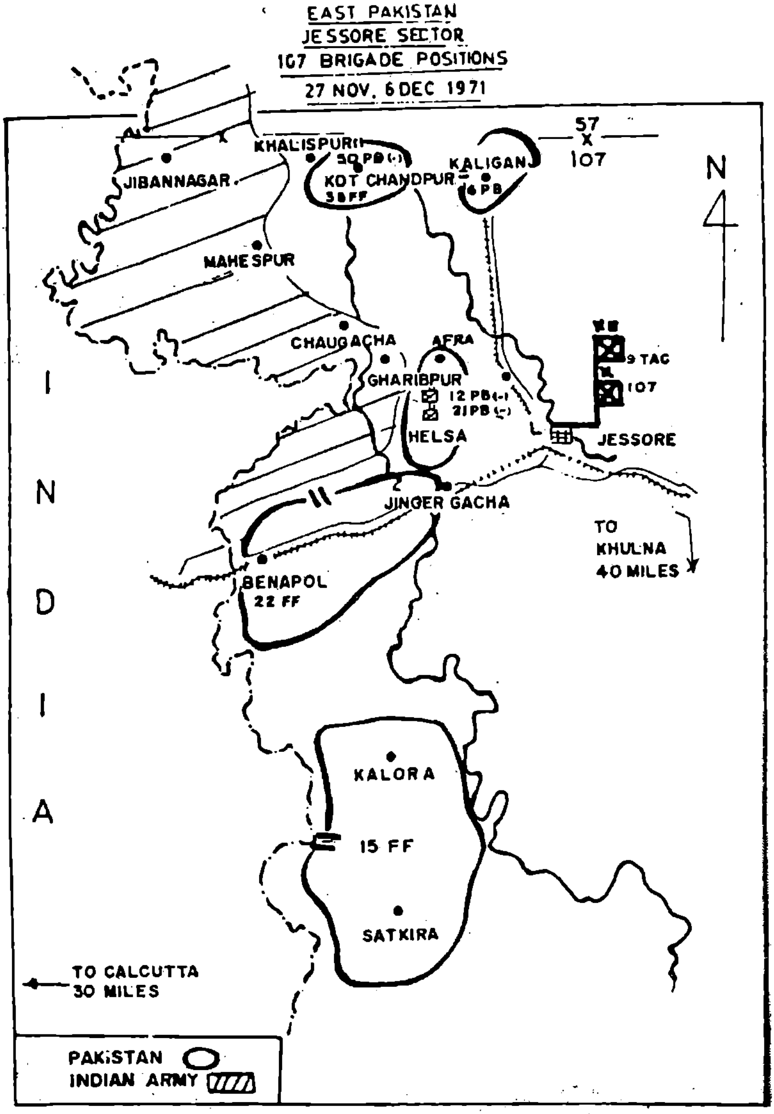

www.pathagar.com

বাহিনীর জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাটালিয়ন ২১ পাঞ্জাবের উপর হামলা চালায়। তুমুল লড়াই চলতে থাকে ২৭/২৮ নভেম্বর রাতে।

সন্ধা ৭:৩০-এর দিকে হেলসা এলাকার সব বাড়ীঘর তুমুল গুলি বর্ষণের শিকার হয়। দেড় ঘণ্টা থামার পরে বোমাবাজি শুরু হয়। রাত দশটায় শত্রুপক্ষ এগোতে থাকে। ২১ পাঞ্জাব পাল্টা গুলি ছুঁড়তে থাকে। শত্রু প্রায় ২০০ গজ কাছে চলে আসে। ২১ পাঞ্জাবের সুবেদার নেওয়াজ হক রাইফেল হাতে নিয়ে সাত রাউন্ড গুলি করেন। তার সাথে অন্যরাও যোগ দেয়। এতে শত্রুর আক্রমণ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের ৪২ লাশ মাটিতে পড়ে থাকে। শত্রুদের আক্রমণ বন্ধ হয়।

ভোর সাড়ে পাঁচটায়, ট্যাঙ্কসহ আক্রমণ পুনরায় আরম্ভ হয়। পাকিস্তানীরা আবার মনোবল নিয়ে শক্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকলো। বানসীলাল নামক একজন হাবিলদারকে ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়দের আক্রমণের বিবরণ দেন।

তার ভাষ্য মতে, ২৮ নভেম্বরের মধ্যে ১ জম্মু ও কাশ্মীর ব্যাটালিয়নের কথা ছিল ব্রন্দা ও কায়েমখোলা দখল করা। বিদেশী সাংবাদিক ও ফটোসাংবাদিক বানসী লালের কথা শুনে। তারা ভারতীয়দের লাশ দেখে, তাদের অটক করা অস্ত্র গোলাবারুদ দেখে। এটাই ছিল যথেষ্ট প্রমাণ যে ভারত আক্রমণ করেছিল, যদিও তারা সেটা অস্বীকার করে।

২৯ নভেম্বর জেনারেল নিয়াজি ১০৭ ব্রিগেডের কাছে যান। হায়াত তার কাছে সুপারিশ পেশ করেন, তাদের কিছু সৈন্যকে যশোরে ফিরিয়ে আনা হোক। কারণ শহরটি হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু নিয়াজি বলে উঠলেন, “না, না সেরা। তুমি কিছু বোঝো না। আরো ভূ-খণ্ড ছেড়ে দিলে, মুক্তিরা বাংলাদেশ ঘোষণা করবে।” নিয়াজির উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যরা যেন সাহসী ও স্থির অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু এর ফলে কমান্ডাররা নিজ সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে পারছিলনা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারছিল না।

www.pathagar.com

MAP 8

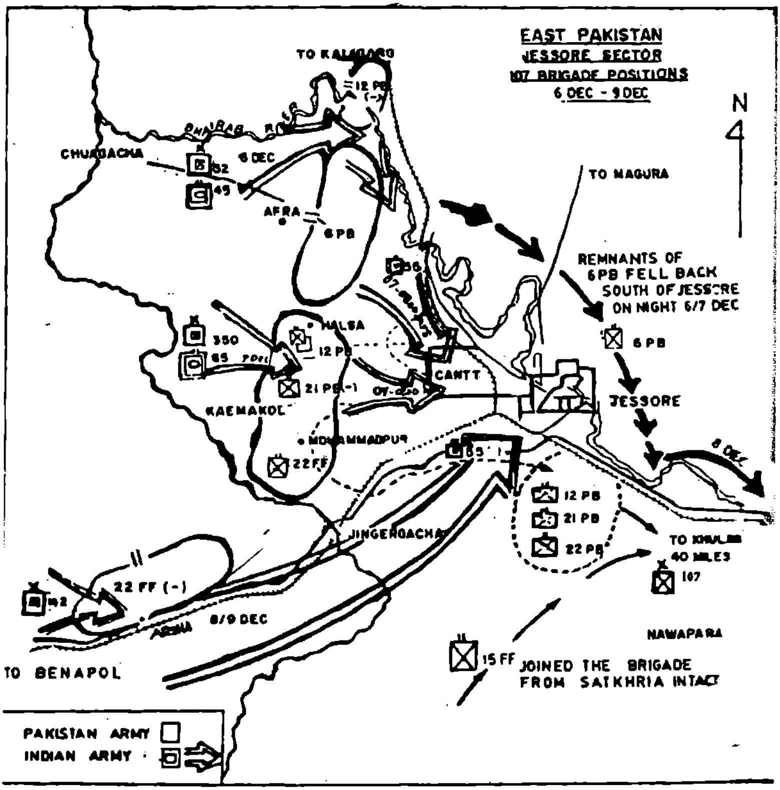
EAST PAKISTAN
JESSORE SECTOR
107 BRIGADE POSITIONS
6 DEC - 9 DEC
N
TO MAGURA
REMNANTS OF
6PB FELL BACK
SOUTH OF JESSORE
ON NIGHT 6/7 DEC
6 PB
JESSORE
CHUADACHA
6 DEC
AFRA
6PB
HALSA
12 PB
350
21 PB-1
CANTT
KAEMAKOL
22 FF
JINGERGACHA
12 PB
21 PB
22 PB
107
22 FF (-)
8/9 DEC
TO BENAPOL
NAWAPARA
15 FF
JOINED THE BRIGADE
FROM SATKHRIA INTACT
PAKISTAN ARMY
INDIAN ARMY

শত্রুরা এগিয়ে আসে

২৯ নভেম্বর ও ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে যুদ্ধ কিছুটা বিরতি হয় ১০৭ ব্রিগেডের দিকে। এ সময় উচিৎ ছিল যশোরে সেনা মোতায়েন করে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ১৫এফএফকে যশোরে আনা যেত। কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ কাজটা করা গেল না। তাই ভারতীয়রা যখন এগিয়ে আসলো, যশোরকে প্রতিরক্ষার জন্য কিছুই ছিল না।

৬ ডিসেম্বরে যশোরের দিকে পুনরায় রওনা দেন ভারতীয় সৈন্যদল। চৌগাছা-যশোর সড়কে ওরা আক্রমণ চালায়।

ওদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ১২ পাঞ্জাব ও ৬ পাঞ্জাব, যারা আফ্রাতে অবস্থান করছিল। ৬ ডিসেম্বরে ২ শিখ লাইট ইনফ্যানটরি ৭ পাঞ্জাবকে আক্রমণ করে। যশোর ছিল মাত্র ১০ কি.মি. দূরে। তখন যশোর হুমকির সম্মুখীন হয়। হায়াত সবদিক বিবেচনা করে অনুমান করলেন যে শত্রুর আগে তারা যশোরে পৌঁছতে পারবে না। পারলেও তারা সময় মত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন খুলনায় অবস্থান গ্রহণ করবার জন্য। মেজর প্রাভাল বলেন, এটি ছিল বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত। কারণ খুলনার বিল এলাকা শত্রু জন্য বাঁধা হয়ে দাড়াবে। তিনি হায়াতের দক্ষতার প্রশংসা করেন। ৭ ইন্ডিয়ান ইনফ্যানটরি ডিভিশন খুলনায় আটকে যায় এবং টাকার দিকে অগ্রসর হতে ব্যর্থ হয়।

খুলনায় প্রতিরোধ

১০৭ ব্রিগেডের বেশিরভাগ সৈন্য যশোরের উত্তরে প্রায় ১০০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন মতে তারা সময়মত যশোরে পৌঁছতে পারত না। তাই ভারতীয়রা বেশ খুশি হলেন যখন যশোরে এসে তারা কোন পাকিস্তানী সৈন্য দেখতে পেল না। আত্মসমর্পণের আগে এটাই ছিল একমাত্র বড় শহর যা তারা সফলতার সাথে দখল করতে পারলো। কিন্তু ভারতের জন্য এটা বেশ বাহাদুরী করবার সুযোগ ছিল। আন্তর্জাতিক মহলও বুঝতে পারল পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধের কি পরিণতি হবে।

খুলনায় ফেরত যাবার ব্যাপারে পাকিস্তানীদের মধ্যে কিছুটা সমন্বয়ের অভাব ছিল। কিন্তু হায়াত পরিস্থিতি সামলে নিলেন এবং যশোর থেকে ১২ কি. মি. দূরে খুলনার রাস্তায় নওয়াপাড়ায় অবস্থান নিলেন।

www.pathagar.com

MAP 9

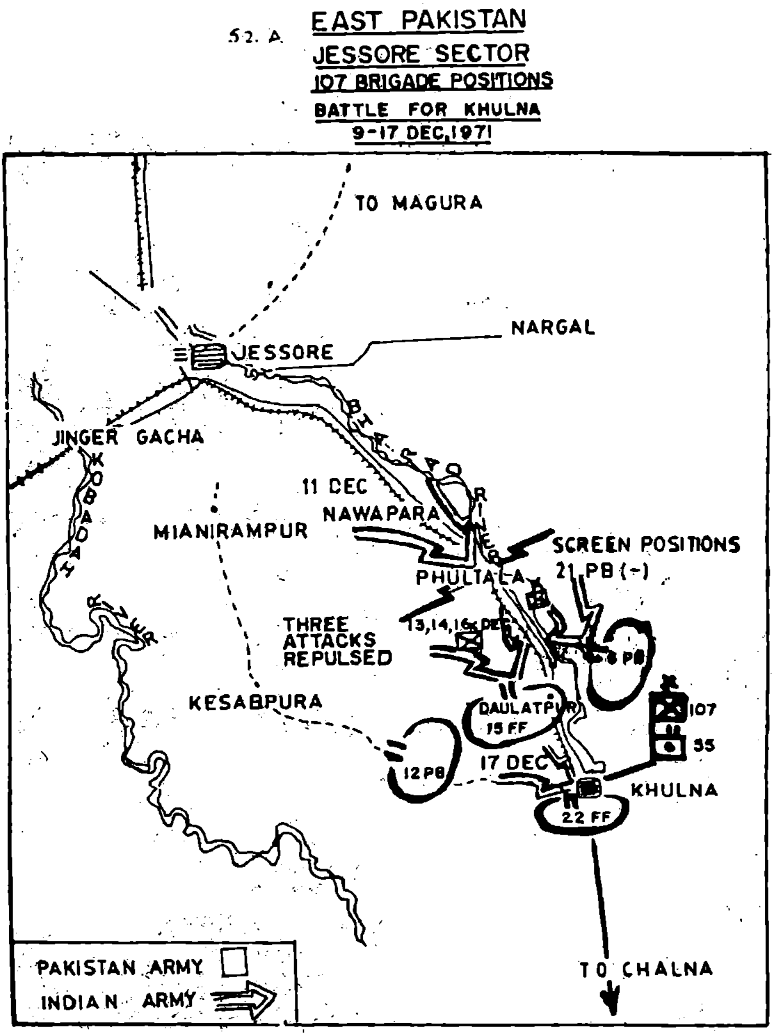

www.pathagar.com

২২ এফ এফ তখনও যশোরের বাইরে ওয়াই জংশনে। ৮ ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ ২২ এফ এফকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে ১০৭ ব্রিগেডকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু ২২ এফএফ এর হাতের অস্ত্র কাজে আসল। মেজর আজমত হায়াত শত্রুর উপর গুলি চালাতে নির্দেশ দিলেন। শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তিনি বেশ কয়েকটি শত্রু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে সক্ষম হন। এতে আক্রমণকারীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। সাহস ও মনোবল সহকারে মেজর হায়াত পরবর্তীতে জীবন দিলেন দেশের জন্য যে দেশ কিছুদিন পর বিদেশ হয়ে গেল।

খুলনায় আট কিলোমিটার দূরে হায়াত তার সৈন্যসহ অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সম্মুখে দুইটি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করেন এবং পিছনে একটি। রাস্তার বায়ে ছিল ১৫ এফএফ আর ডানে ৬ পাঞ্জাব। ১২ পাঞ্জাব মনিরামপুর সড়ক রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। আরো সৈন্যকে সম্মুখে পাঠানো হলো শত্রুর আগমনকে বিলম্ব করবার জন্য।

ব্রিগেডটি এবং শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে যুদ্ধ করবার সুযোগ পেল। কিন্তু তাদের ছিল মাত্র একটি ট্যাঙ্ক, কিন্তু পর্যাপ্ত অস্ত্র ছিল। তারা ১২ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শত্রুকে খুলনার বাইরে রাখতে সক্ষম ছিল। ভারতীয়দের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ইন্ডিয়ান আর্টিলারি রেজিমেন্ট এর একজন অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। পাকিস্তানের দুই সাহসী যুবক অফিসারকেও মেরে ফেলা হয়। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সালার ট্যাঙ্ক এর গুলিতে মারা যান। মেশিন গান চালানোর সময় ক্যাপ্টেন এ. ওয়াই আখন্দ প্রাণ হারান। ভারতের ১৩ ডোগরার মেজর ঠাকুর তার প্রসংশা করেন, "একটি কম বয়সী সৈন্যের শরীর থেকে থেকে রক্ত ঝরছিল তার পরও সে মেশিনগান চালাতে থাকে। তার গুলি শেষ হয়ে গেল। তিনি পানি চাইলেন কিন্তু আমি পানি নিয়ে আসার অগেই তাকে গুলি করে মারা হয়। তার পুরো হাত খুলে আসলো। তিনি বেহেস্তে গেলেন অন্য শহীদদের কাছে।" তার মৃতদেহ তল্লাশী করে ঠাকুর তার পরিচয় জানতে পারলেন, ক্যাপ্টেন আর্জুমান ইয়ার আখন্দ।

জেনারেল পালিত যাই বলেন না কেন, উইলিয়াম স্টুয়ার্ট যা-ই লেখেন না কেন, যশোর খুব সহজে পাকা আমের মত শত্রুর কোলে পরেনি। আসলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওখানে অবস্থান গ্রহণই করেনি; তারা খুলনায় অবস্থান নিয়েছিলেন। ভারতীয় ৯ পদাতিক ডিভিশন হতাশ হলো যখন তারা দৌলতপুর ও খুলনা থেকে ১০৭ ব্রিগেডকে তাড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়।

যদিও ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যুদ্ধ শেষ হয়, ১০৭ ব্রিগেড খুলনাকে দখলে রাখে ১৭ ডিসেম্বর সকাল ৮ পর্যন্ত। জেনারেল অরোরা স্বীকার করেন যে যুদ্ধ বিরতি

www.pathagar.com

ঘোষণার আগ পর্যন্ত তারা খুলনাকে দখল করতে পারেনি। একদিকে নদী ও অন্য দিকে বিল রেখে পাকিস্তানীরা সেখানে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অরোরা বলেন, "সেখানে দীর্ঘ যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা ছিল"

৫৭ ব্রিগেড (ঝিনাইদহ সাব সেক্টর)

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আহমেদ ছিল নম্র ভদ্র কাশ্মীরী অফিসার। তিনি স্টাফ পোস্টিং এর জন্য উপযুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাকে এ কঠিন পরিস্থিতিতে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে পাঠানো হয়। তিনি কোয়েটার ঐতিহ্যবাহী কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন এবং তার সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল।

৫৭ ব্রিগেডের ছিল মাত্র দুইটি ব্যাটালিয়ন, যেখানে তিনটি থাকার কথা ছিল। তাকে ৮০ কি.মি. দায়িত্ব দেয়া হয়। শত্রুকে তার মোকাবেলা করতে হলো সামনে থেকে, পিছন থেকে।

মঞ্জুর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার। তার ডানে ২৯ বালুচ হার্ডিঞ্জ/পাকশী সেতুতে অবস্থান গ্রহণ করে। বায়ে ১৮ পাঞ্জাব ঝিনাইদহকে প্রতিরক্ষা করে। তারা সেখানে দূর্গ গড়ে তোলে। দর্শনায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তার বায়ে ছিল ১০৭ ব্রিগেডের ৩৮ এফএফ।

উত্তরে একটি বড় নদী দ্বারা মঞ্জুরের পশ্চাৎভাগ রক্ষা পায়, দক্ষিণে তাদের সুরক্ষা দেয় ১০৭ ব্রিগেড। মধুমতি নদী উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ পূর্বে বয়ে যায়, তার ব্রিগেডের পূর্ব পাশে। যেখানে অবকাঠামো ভালো ছিল।

২৯ ক্যাভারলি থেকে ট্যাঙ্ক দিয়ে ৫৭ ব্রিগেডকে আরো ক্ষমতাসম্পন্ন করা হয় ২৯ নভেম্বরে। তাদেরকে দক্ষিণে ঝিনাইদহ প্রতিরক্ষায় পাঠানো হয়।

৫৭ ব্রিগেডের বিপক্ষে ছিল ভারতের ৪ মাউন্টেন ডিভিশন। ৭, ৪১ ও ৬২ ব্রিগেড ছাড়াও, এ ভারতীয় ডিভিশনকে আরো ট্যাঙ্ক ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দেয়া হয়, যাতে মঞ্জুরের ব্রিগেডকে তারা আক্রমণ করতে পারে।

ধর্মদা ছিটমহল

১৫ নভেম্বরে জেনারেল বারার এগিয়ে আসেন ২১ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে হামলা চালানোর জন্য। প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পাঁচদিন লাগলো । মুক্তিবাহিনী তথ্য দিয়ে

www.pathagar.com

তাকে সাহায্যে করে। তারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্ক তাকে তথ্য দেয়। এ তথ্য হাতে নিয়ে, আকাশে বিমান পর্যবেক্ষণের সহায়তায়, বারারের জন্য আক্রমণ সহজ ছিল। পাকিস্তানের জন্য পরিস্থিতি বৈরী ছিল। তাদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন ছিল।

জেনারেল বারার কাজটাকে আরো সহজতর করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে অবস্থান নেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ধর্মদা এনক্লেভ তার নজরে পরে।

নভেম্বর ১৯৭১ এর প্রথম সপ্তাহে ভারতের ১ নাগাল্যান্ড ব্যাটালিয়ন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় কুষ্টিয়া অঞ্চলে। তারা এ এনক্লেভ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর এনক্লেভ থেকে শত্রুকে অপসারণ করবার সিদ্ধান্ত নেন।

৯ নভেম্বরে এ লড়াই হয়। যুদ্ধ করে ২১ পাঞ্জাবের ডি কোম্পানীর ক্যাপ্টেন মুহম্মদ ইমতিয়াজ এর নেতৃত্বে। আট কি.মি. দূরে অবস্থিত ধাংমারকায় কোম্পানী কমান্ডারকে ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় জানানো হয় যে মুক্তি বাহিনীসহ ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে এবং মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্বে অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুক্তিবাহিনীকে এলাকা থেকে অপসারণ করবার জন্য কোম্পানীকে আদেশ দেয়া হয়। এ কাজের জন্য ৩.৭ আর্টিলারির ১২ রাউন্ড দেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিবাহিনীকে ভয় দেখানো। ৯ নভেম্বর মধ্যে রাতে কোম্পানী এগিয়ে যায়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় দুই প্লাটুন নিয়ে ডি কোম্পানী বের হয়ে পরে। শত্রু পক্ষের ৩০০ গজ কাছে আসলে, তাদের উপর আর্টিলারি, মর্টার ও মেশিনগান ফায়ার হতে থাকে। লে. জি. এম সিপরা'র প্লাটুন প্রবল আক্রমণের শিকার হয়। তার প্ল্যাটুনের জেসিও নায়েক/সুবেদার আকরাম গুরুতর আহত হন। সাহসী কমান্ডার সিদ্ধান্ত নিলেন সম্মুখে এগিয়ে যাবার । এতক্ষণে কোম্পানীর তিন ভাগের একভাগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তারা "নারাই হায়দার!" ডাক দিয়ে এগিয়ে চলে। তারা শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রায় ২২ জন তাদের লক্ষ্যে পৌছাল এবং শত্রু পক্ষ পালাতে বাধ্য হয়। নায়েক ইয়াকুব উন্মাদের মত ডান হাত উঁচু রেখে তাদের পিছনে ছুটলেন। শত্রু বাঙ্কার এর ১০ গজ দূরে ল্যান্স নায়েক মেরহদী পড়ে যান, তার হেলমেটের ভেতর দিয়ে ১০টি গুলি ভেদ করে মাথায় আঘাত করে। ল্যান্স নায়েক শের মুহম্মদ শত্রু বাঙ্কারের উপরে বসে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার আদেশ দেন। সুবেদার আইয়ুব চিৎকার দিয়ে ঘোষণা দিয়ে শত্রুদের বোঝালেন যে তারা পুরো ব্যাটালিয়ন সেখানে

www.pathagar.com

হাজির। শত্রুরা পালাতে থাকলে ২৯ বালুচ এর একটা কোম্পানি তাদের উপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে আরো দুর্বল করে দেয়।

এ অপারেশনে প্রথমবারের মত পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে ভারতের ১ ন্যাগাল্যান্ড ব্যাটালিয়নের ছয়জনকে আটক করা হয়। জানা যায়, ১ নাগাল্যান্ড ব্যাটালিয়নের দুইটা কোম্পানি সেখানে ছিল। পাঁচদিন ধরে তারা সেখানে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এর সাথে জড়িত ছিল ১০০ জন মুক্তিবাহিনীর সদস্য। এ অপারেশনে শত্রুর দুইজন অফিসার নিহত হন এবং ডি কোম্পানিও অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু শত্রুকে তারা তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন ইমতিয়াজ ও অন্যদের পদকের জন্য সুপারিশ করা হয়।

ফোর মাউন্টেন ডিভিশনের লক্ষ্য ছিল জেনারেল আনসারের নবম ডিভিশনের সদর দপ্তর, যা মাগুরার নিকটস্থ মধুমতি নদীর পাড়ে মধুমতি ঘাটে অবস্থান করছিল। তারা সিদ্ধান্ত নেয় ২ ডিসেম্বরের মধ্যে মধুখালিতে পৌছবে। তাদের অনেক বেশি সৈন্য ও অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও, বারবার বাঁধাগ্রস্থ হয়। যেভাবে তারা পরিকল্পনা করে রেখেছিল, সেভাবে দ্রুত এগোতে পারেনি।

ঝিনাইদহ যুদ্ধ

বারার-এর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ঝিনাইদাহ গিয়ে কালিগঞ্জের দিকে অগ্রসর হওয়ার। তারপর ঝিনাইদহের দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করে ১৮ পাঞ্জাবের পালানোর পথ বন্ধ করে দেয়া। সেখান থেকে তারা ঠিক করল কুষ্টিয়া আর মাগুরা গিয়ে পুরো ব্রিগেড ঘিরে ফেলবে। যাতে করে তারা গঙ্গা ও মধুমতি নদী পার হতে না পারে। তিনি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌছলেও তাদেরকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলতে পারেননি।

২৮ নভেম্বর ভারতের ফোর ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ডিভিশনের ৬২ ব্রিগেড দর্শনায় ১৮ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানিকে আক্রমণ করে। পরের রাতে দর্শনার কয়েক কি. মি. পূর্বে তারা উথলাই গ্রাম আক্রমণ করে। সেখানে ১৮ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানী অবস্থান করছিল। উথালায় চারদিকে মাইন পাতা ছিল, তাই তারা ট্যাঙ্কসহ এগোতে পারেনি। কয়েকটি ভারতীয় ট্যাঙ্কের উপর ফায়ার করা হলে, তারা অগ্রসর হতে পারেনি। উথালায় তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হলে, তারা পিছু হটে যায়। পুনরায় ৩০ নভেম্বর আক্রমণ চালালে, উথালায় ও তার পূর্বে আন্দলবাড়িয়া দখল করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

ভারতীয়রা কালিগঞ্জে এগোতে থাকলে, ১৮ পাঞ্জাব দর্শনা পুনরায় ২ডিসেম্বর তাদের দখলে নেয়, জেনারেল বারার শেষ অব্দি ৪ ডিসেম্বর দর্শনা দখল করার জন্য এক স্কোয়াড্রন ৪২ ব্রিগেডকে ব্যবহার করলেন।

১০৭ ব্রিগেডের ৩৮ এফএফ ও ঝিনাইদহ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ব্রিগেড বিভক্ত হলে, অনেকে ঝিনাইদহের দিকে চলে যায়। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ৪/৫ ডিসেম্বর ১৮ পাঞ্জাবকে ঝিনাইদহের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন । তাকে প্রথমে অনুমতি দেয়া হয়নি। পরে ৫/৬ ডিসেম্বর রাতে অনুমতি দেয়া হলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরমধ্যে ঝিনাইদহের দক্ষিণে কোটচাঁদপুর শত্রুর দখলে চলে যায় এবং তারা ঝিনাইদহের পথও বন্ধ করে রাখে।

১৮ পাঞ্জাব যখন ঝিনাইদহের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ছোট্ট গ্রাম উত্তর নারায়ণপুর থেকে তাদের উপর শত্রুপক্ষ গুলি বর্ষণ করে। ১৮ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার ভেবেছিলেন মুক্তিবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করছিল, তাই তিনি সরাসরি পাল্টা আক্রমণের হুমকি দেন। কিন্তু আসলে তার বিপক্ষে নিয়মিত ভারতীয় বাহিনী ছিল। ব্যাটালিয়নের চুয়াডাঙ্গায় ফেরত যেতে বাধ্য হয়।

মঞ্জুর তখন ১৮ পাঞ্জাবকে কুষ্টিয়া হয়ে ঝিনাইদহ রেলযোগে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু মুক্তিবাহিনী রেলপথ উড়িয়ে দিয়েছিল। রেলপথে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের সেতুগুলিও মুক্তবাহিনী ধ্বংস করে দিয়েছিল। এতে করে ২৯ বালুচ ব্রিগেড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু ৫৭ ব্রিগেড ৮ ডিসেম্বর ১৮ পাঞ্জাব ও ২৯ বালুচকে কুষ্টিয়ার চারপাশে মোতায়েন করতে সক্ষম হয়। এরমধ্যে জেনারেল বারার দক্ষিণ দিক দিয়ে ঝিনাইদহ আক্রমণের জন্য ৪১ ব্রিগেডকে ব্যবহার করেন। ৫৭ ব্রিগেডের কথা ছিল ঝিনাইদহ রক্ষা করা, কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে তাদের দেরি হয়ে যায়।

৭ ডিসেম্বর ভোর ১ টা ২৫ মিনিটে নবম ডোগরা ঝিনাইদহ আক্রমণ করে। সন্ধ্যা নাগাদ তারা খুব সহজেই ঝিনাইদহ নিয়ন্ত্রণে নেয়। তারা বলে, "পাকিস্তানিরা কঠোরভাবে যুদ্ধ করেছিল।" ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান নিরূপণের ব্যাপারে তারা পাকিস্তানী গোয়েন্দাদেরও প্রশংসা করে।

মধুমতি নদীর পারে মাগুরার দিকে ৬২ ব্রিগেড অগ্রসর হতে থাকে এবং ৮ ডিসেম্বর সেখানে পৌঁছায়। মাগুরায় কোন সৈন্য ছিল না, কারণ ৩৮ এফএফ সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নদীর পূর্বে দিকে চলে যায়। মাগুরা থেকে নবম ডিভিশনের সদর দপ্তরও চলে যায় ২২ কি. মি. দূরে ফরিদপুরের নিরাপদ স্থানে।

www.pathagar.com

কুষ্টিয়ার সংঘর্ষ

যখন তিনি ঝিনাইদহ যাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন, ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর তার ব্রিগেডকে কুষ্টিয়ায় সংগঠিত করতে থাকেন। ২৯ বালুচের দায়িত্ব ছিল ঝিনাইদহের পথে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, আর ১৮ পাঞ্জাবের দায়িত্ব ছিল হার্ডিং ব্রিজ দখলে শত্রুকে বাঁধা দেয়া। ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়ক তারা অবরোধ করে রাখে। তারা যতক্ষণ সম্ভব শত্রুর বিরুদ্ধে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। বেশিরভাগ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করল। ২২ রাজপুত তাদের ফাঁদে পড়ে এবং অনেক আহত-নিহত হয়। ৬জন অফিসারসহ ১১১জন রাজপুত মারা নিহত হয়। তারা ৫টি ট্যাঙ্ক হারায়- বলেন জেনারেল অরোরা। কুষ্টিয়া শত্রুমুক্ত করতে জেনারেল বারার অতিরিক্ত ব্রিগেডকে হুকুম দিলেন, কিন্তু তারা বিস্মিত হয়ে দেখলো সেখানে ৫৭ ব্রিগেডের বাকি সৈন্যরা অবস্থান করছে এবং শত্রু মোকাবেলার জন্য তাদের একটি ব্রিগেড যথেষ্ঠ ছিল না। অবশেষে কুষ্টিয়া দখলের চেষ্টায় এবং ৫৭ ব্রিগেডকে পরাজিত করার জন্য তাকে পুরো তিনটি ব্রিগেডকে ব্যবহার করতে হলো।

৭ নম্বর ব্রিগেড যখন দক্ষিণ দিকে থেকে আক্রমণ চালায়, তখন ৫৭ ব্রিগেডকে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হতে বাঁধা দেয়ার জন্য ৪১ ব্রিগেড পূর্ব থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করল। ৯ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী কুষ্টিয়া আক্রমণ করে। আকাশ শত্রু বিমানের দখলে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর যে একটি মাত্র স্কোয়াড্রন ছিল , তাকে একেবারে অকার্যকর করে দেয়া হল।

১০/১১ ডিসেম্বরে কুষ্টিয়া শত্রুর দখলে চলে যায়। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ৫৭ ব্রিগেড দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় গঙ্গা পার হয়ে কিছুটা বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৬ ডিভিশন মঞ্জুরের ব্রিগেডকে আর কোন নির্দেশ দেয়নি। তারা যুদ্ধের বাইরে থাকল।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা নেয়া হলো। কুষ্টিয়ায় যখন যুদ্ধ চলতে থাকে, ব্রিগেডিয়ার আশরাফের জিওসি তাকে হার্ডিঞ্জ উড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। তাদের আশঙ্কা ছিল ভারতীয় বাহিনী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দখলে নিয়ে নেবে। তারা ১৬ ডিভিশনকে দক্ষিণ দিক থেকে সামনে আনবে। আশরাফ কিন্তু দেখলেন যে ৫৭ ব্রিগেড ব্রিজের দক্ষিণে জীবনমরণ লড়াই করছিল। তিনি সিনিয়রদের আদেশ পালন করলে তারা সব শেষ হয়ে যেত। তিনি নির্দেশ অমান্য করবার সিদ্ধান্ত নিলেন, এতে পুরো ব্রিগেড পার হয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপধ স্থানে আসতে সক্ষম

www.pathagar.com

MAP 10

EAST PAKISTAN

SOUTH - WEST SECTOR

57 BRIGADE OPERATIONS

28 NOV - 17 DEC 1971

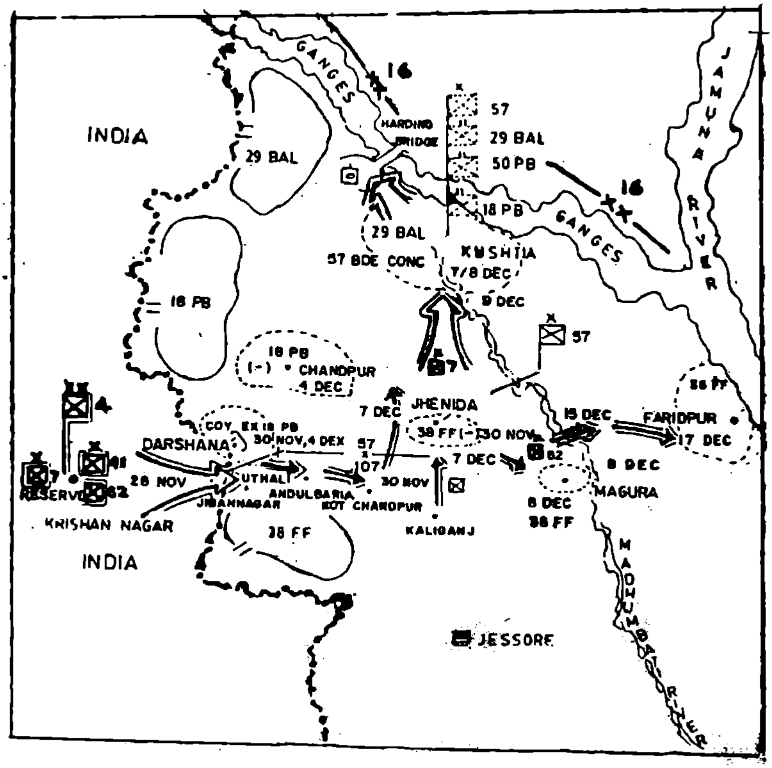

হয়। ১১ ডিসেম্বর রাত ১২:৩০ মিনিটে ভারত বাহিনী ব্রীজে আক্রমণ চালায় এর পশ্চিম পাশটা কিছুটা দখলে আনে।

জেনারেল বারার তখনও মধুমতি নদীর পশ্চিমে। তার চারদিন লেগে গেল তার সৈন্যদের পুনরায় সংগঠিত করতে। কিন্তু এ বিলম্বের কারনে প্রতিপক্ষরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। শুধু মাত্র যুদ্ধের পরে তাদের আটক করা সম্ভব হয়।

১৫ ডিসেম্বরে ৭ ও ৬২ ব্রিগেড নদী পার হয় নৌকা করে। অরোরা বলেন, "নদী পার হতে পেরে রায়না তার হারানো গৌরব ফিরে পেল," তারা দুই দিন পরে ফরিদপুর পৌছল, ততদিনে খেলা খতম।

উত্তর-পূর্ব সেক্টর

১৪ পদাতিক ডিভিশন পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর পূর্ব সেক্টর রক্ষা করছিল।এ দায়িত্ব সিলেট থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ৩২০ কি.মি.এর বেশি। এর দু পাশে ছিল মেঘনা ও সুরমা নদী। পূর্বে ছিল আন্তর্জাতিক সীমান্ত।

এ এলাকার জন্য তাদের ছিল দুই নিয়মিত ও একটি অ্যাডহক ব্রিগেড, পাচটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন। আরো ছিল প্যারা মিলিটারি বাহিনী ও মুজাহিদ কোম্পানী। আর ছিল কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত একটা স্কোয়াড্রন। জিওসি বললেন মাত্র চারটি ট্যাঙ্ক ছিল ও দুই রেজিমেন্ট ফিল্ড গান। তাদের অস্ত্র যন্ত্রপাতি অপ্রতুল ছিল। আর পূর্ব পাকিস্তানের আকাশে ভারতীয় বিমান বাহিনী ইচ্ছামত বিচরণ করছিল।

ভোপাল রাজ্যের মোটাসোটা মেজর জেনারেল কাজী আব্দুল মজিদ ছিলেন দয়ালু ভালো মানুষ। তাকে সেনাদের সংগঠিত করার বেশ কষ্টকর দায়িত্ব পালন করতে হয় বৈরী পরিবেশে। তার দায়িত্ব ছিল যেকোন মূল্যে সিলেট ও ভৈরব বাজার রক্ষা করা। এ কাজে তিনি তার আড়াই ব্রিগেডকে সামনে মোতায়েন করেন। সীমান্ত বরাবর পাঁচ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন ছিল।

ও দিকে ৪ কোর-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত লে. জে. সাগাত সিং কিন্তু ভালো অবস্থানে ছিলেন। তার কোর ছিল খুবই শক্তিশালী। এর ছিল তিনটি পদাতিক ডিভিশন (৮, ২৩ ও ৫৭), আর্টিলারি, হেলিকপ্টার ইত্যাদি। সবদিক দিয়ে সাগাত সিং প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক শক্তিশালী ছিলেন।

www.pathagar.com

২৭ ব্রিগেড (ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাব-সেক্টর)

মাত্র দুটি ব্যাটালিয়ন বিশিষ্ট ২৭ ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন ব্রি. সাদউল্লাহ। তার এলাকা ছিল মাধবপুর থেকে কুমিল্লার উত্তরে সালদা নদী। তার বায়ে ছিল ৩১৩ ব্রিগেড, আর ডানে ছিল ৩৯ (এ্যাড হক) ডিভিশন। আখাউড়া থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ১২ ফ্রন্টিয়ার্স রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিল। তার দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন ৩৩ বালুচ এর দায়িত্ব ছিল দক্ষিণ সেক্টর। তার সাথে ছিল ৭টি হালকা ট্যাঙ্ক এবং ২ মর্টারসহ এক ব্যাটারি গানস।

ব্রিগেড সদর ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ব্রিগেড সদর দপ্তর ও ১২ এফএফ এর মাঝে কোন সড়ক ছিল না। মেঘনার উপর ছিল রেল/সড়ক সেতু। দীর্ঘ এলাকার কারণে ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টকে ভাগ করা হলো। তাদের আক্রমণ করার ক্ষমতা অনেক কমে আসলো। এমনকি মাত্র একটি বন্দুক নিয়েও আগরতলায় গুলি করা হয়, কেবলমাত্র শত্রুকে একটু নাজেহাল করার জন্য। হাবিলদার ইয়াসিন, ইকরাম ও আজিজ এ গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মারা গেলেন।

২৮/২৯ নভেম্বরে ভারতীয় আইভি করপস লড়াই এ নেমে যায় ২৭ ও ৩১৩ বিগেডের বিরুদ্ধে। ৩০ নভেম্বর নাগাদ মে. জে. বি এফ গনজালেসের নেতৃত্বে ৫৭ ভারতীয় পদাতিক ডিভিশন ১২ এফএফকে আক্রমণ করে। ১ ডিসেম্বর সীমান্ত এলাকায় গঙ্গাসাগর গ্রাম শত্রুদের দখলে চলে যায়।

কাজী মজিদ এবং লে. কর্নেল ইয়াকুব মালেক ২ ডিসেম্বর আখাউড়ায় এসে ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহর সাথে দেখা করেন। তারা পরিস্থিতি সমন্ধে আলাপ আলোচনা করে এবং ব্রাহ্মবাড়িয়ায় অবস্থান নেয়ার পরিকল্পনা করেন। ১২ দিন ধরে ১২ এফএফ শত্রুকে প্রতিহত করে। অবশেষে ৫ ডিসেম্বর তারা পিছু গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান নেয়। ১২ এফএফ-এ একটি কোম্পানি ২ ডিসেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ তিনদিন ধরে ১২ রাজপুত ব্যাটালিয়নকে বাঁধা দিতে সক্ষম হয়। জেনারেল মজিদ বলেন, ৪ ডিসেম্বরে যখন ২৭ ব্রিগেড আখাউড়ায় প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়, তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডারকে বললেন, তিনি চাইলে ব্রিগেডকে সিলেট থেকে প্রত্যাহার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় না গিয়ে ঢাকায় যেতে পারেন। মজিদ বলেন, নিয়াজি এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নি এবং বললেন, যে কোন মূল্যে সিলেটে অবস্থান বজায় রাখতেই হবে। মজিদ বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানকালে তাদের পর্যাপ্ত নৌপরিবহন ছিল ঢাকায় যাবার জন্য এবং সেখানে

www.pathagar.com

MAP 11

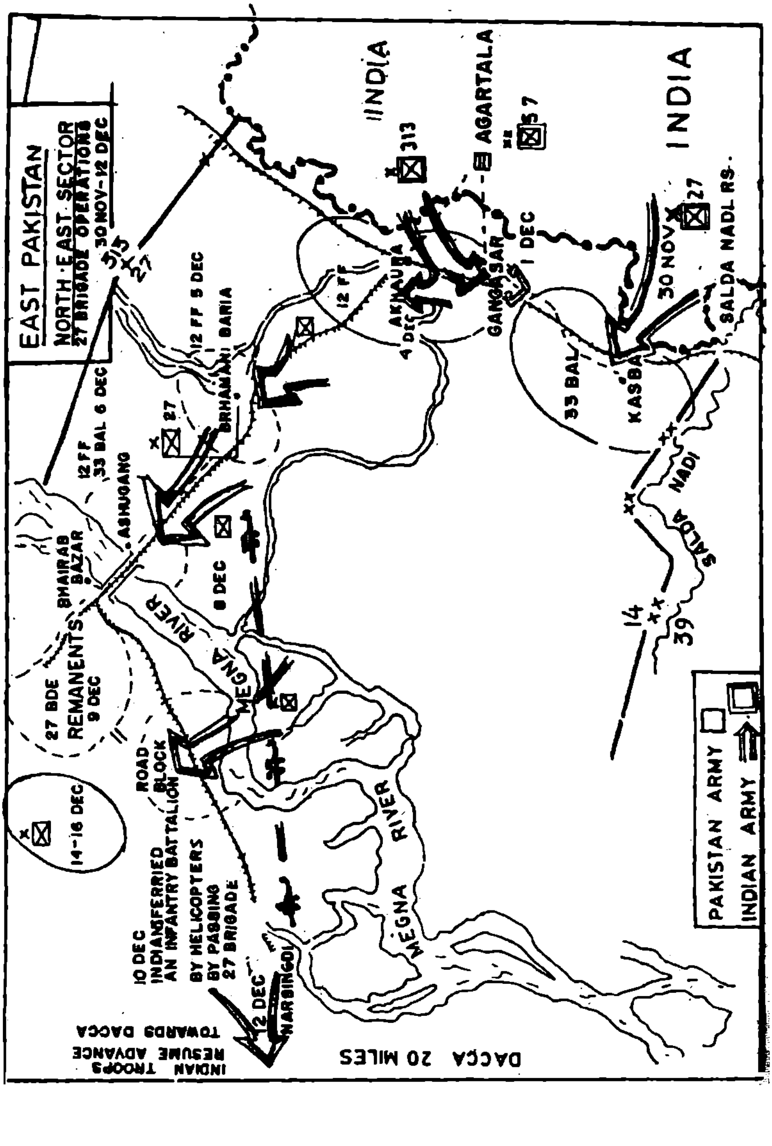
EAST PAKISTAN
NORTH-EAST SECTOR
27 BRIGADE OPERATIONS
30 NOV-12 DEC
INDIA
INDIA
AGARTALA
AKHAURA
4 DEC
GANGASAR
1 DEC
30 NOV
SALDA NADI RS.
12 FF
12 FF 5 DEC
BRHAMANBARIA
33 BAL
KASBA
SALDA NADI
12 FF
33 BAL 6 DEC
ASHUGANJ
BHAIRAB BAZAR
8 DEC
MEGNA RIVER
27 BDE REMANENTS 9 DEC
ROAD BLOCK
14-16 DEC
10 DEC
INDIAN FERRIED AN INFANTRY BATTALION BY HELICOPTERS BY PASSING 27 BRIGADE
12 DEC
NARSINGDI
MEGNA RIVER
INDIAN TROOPS RESUME ADVANCE TOWARDS DACCA
DACCA 20 MILES
PAKISTAN ARMY
INDIAN ARMY

শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণের জন্য। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর থেকে এরূপ কোন নির্দেশ পাওয়া গেল না।

৩৩ বালুচ সফলতার সঙ্গে কসবা প্রতিরক্ষা করে। তারপর প্রত্যাহার করে ১২ এফএফ-এ যোগ দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। যদিও ৩৩ বালুচ তাদের সহায়তার জন্য চলে আসে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১২ এফএফ সময়মত সংগঠিত হতে পারেনি। ৬ ডিসেম্বর তাদের উপর আক্রমণ আসলে, ২৭ ব্রিগেড আশুগঞ্জে চলে আসে, মেঘনা নদীর পূর্ব পাড়ের সড়ক/রেল সেতুর পাশে।

ভারতীয়রা আপ্রাণ চেষ্টা চালায় সদর দপ্তরকে ঘিরে ফেলতে যাতে ১৪ ডিভিশন ও ২৭ ব্রিগেড ভৈরব বাজারে না যেতে পারে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। লে. কর্নেল আফতাব (৩৩ বালুচ) শত্রুর উপর পাল্টা আক্রমণ করে এবং ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের একটি অংশ রাতের বেলায় মেঘনা পার হতে সক্ষম হয়।

ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে ঢাকায় বেশি সৈন্য না রাখাটা ভুল ছিল। জেনারেল নিয়াজি আতঙ্কিত হয়ে জেনারেল মজিদকে ফোন করেন। তিনি ঢাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবার জন্য তাৎক্ষণিক দুটি কোম্পানি পাঠাতে বলেন। মজিদ ৬/৭ ডিসেম্বর রাতে নৌপথে ১২ এফএফ-এর দুটি কোম্পানি ঢাকায় প্রেরণ করেন। তারা গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারেনি। পৌছতে পারলেও কোন লাভ হতো না। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার সাদউল্লাহ তার ব্রিগেডের বাকি যা সৈন্য ছিল, ভৈরব বাজারে তা সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শত্রু পক্ষ তাকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলে যায়। সাগাতের পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা হেলিকপ্টারে করে মেঘনা পার হয়ে, পাকিস্তানীদের ঢাকা যাওয়ার পথ অবরুদ্ধ করে। এ কাজের জন্য অরোরা তাকে ১৪টি হেলিকপ্টার দেন। হেলিকপ্টারে করে নদী পার করা শুরু করে তারা ৩ টা ৩০ মিনিটে। ৮-৯ ডিসেম্বর ৩১১ ইন্ডিয়ান ব্রিগেডের একটি পুরো ব্যাটালিয়ন প্রস্তুত ছিল। ১০ ডিসেম্বর বিশ্রাম নিয়ে তারা ভৈরব বাজার ও নরসিংদীর মাঝে অবস্থান গ্রহণ করে।

অস্ত্র গোলাবারুদ ও যানবাহনসহ ৭৩ ইন্ডিয়ান ব্রিগেড নৌকায় করে নরসিংদী ও ভৈরব বাজারের মাঝখানে অবস্থান নেয়। যেহেতু পাকিস্তানীরা তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি, ভারতীয় বাহিনী সহজেই মেঘনা পার হলো। ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের নায়েব সুবেদার ফাতেহ মুহম্মদ একমাত্র সৈন্য ছিলেন, যে নদী

www.pathagar.com

পারের সময় শত্রুর উপর গলি ছুঁড়তে থাকেন। কিন্তু নৌকা ডুবে গেলেও তারা মেঘনা পার হতে সক্ষম হয়।

১৪ ডিসেম্বর ২৭ ব্রিগেডকে ঢাকায় যেতে বাঁধা দেয়ার জন্য দুইটি ভারতীয় ব্রিগেড সড়ক অবরোধ করে এবং ভৈরব বাজারে তারা শেল ও বোমা মারতে থাকে। রাস্তা অবরুদ্ধ থাকায়, নৌযান ধ্বংস হওয়ায় ভারতীয়দের ঢাকা যাওয়ার পথে বাঁধা দেয়ার জন্য মজিদ ও সাদউল্লাহ্ কিছুই করতে পারেননি। হেলিকপ্টারের ব্যাপারে কিছু করার জন্য অনেক বিলম্বে জেনারেল নিয়াজি মজিদকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তখন আর কিছু করা সম্ভব ছিল না। ১২ ডিসেম্বর শত্রুপক্ষ নরসিংদী দখল করে। ১৩ ডিসেম্বর তারা শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে চলে আসে। পরদিন শত্রুরা নদী পার হয়। ১৫ ডিসেম্বর পূর্বদিক থেকে ভারতীয় সৈন্যরা (৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন) ঢাকায় প্রবেশ করে।

৫৭ ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ডিভিশন-এর মেঘনায় আসতে ১০দিন লেগে যায়। জেনারেল গঞ্জালেস বিশ্বাস করতে পারেননি যে, তার বিরুদ্ধে মাত্র একটি পাকিস্তানী ব্রিগেড ছিল। তিনি নাকি কাজী মজিদকে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তোমার দ্বিতীয় ব্রিগেড কোথায়, যা এ এলাকায় যুদ্ধরত ছিল? মজিদ উত্তর দিল, "খুঁজে বের কর!" কিন্তু দ্বিতীয় কোন ব্রিগেডই ছিল না। ২৭ ব্রিগেড একাই পুরো ৫৭ ইন্ডিয়ান ডিভিশনকে অগ্রসর হতে এক সপ্তাহেরও বেশি সময় বাধা দিয়েছিল।

৩১৩ ব্রিগেড (মৌলভীবাজার-সাব সেক্টর)

ব্রি. ইফতেখার রানা ৩১৩ ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন। তার মাত্র দুইটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন ছিল। তার দায়িত্ব ছিল মুন্সিগঞ্জ থেকে শমশেরনগর, ৬৪০ কি. মি. প্রতিরক্ষা করা। উত্তরের পথ পাহাড়া দেয় ৩০ এফএফ (লে.ক. আমীর মুক্তার) আর দক্ষিণ পথ পাহারা দেয় ২২ বালুচ (লে. ক. ইয়াসিন)।

২৮/২৯ নভেম্বরে ভারতীয়রা ৩১৩ ব্রিগেডের উপর হামলা চালায়। তারা আর এক দল পাঠায় ৩০ এফএফ এর পিছনে। সেখানে তারা মৌলভীবাজার-শমসেরনগর রাস্তায় অবস্থান করে। ২৯ নভেম্বরে রানা তার সামনের ব্যাটালিয়ন দেখতে যায়, ভাগ্য ভাল, সে ধরা পরেনি। তার জীপের উপর গুলি করা হয়।

৩০ নভেম্বর আর এক ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ৩০ এফএফ এর উপর হামলা চালায়। লেফটেনেন্ট জমির দেখতে পান যে ভারতীয়রা সবখানে ছিল। ২০ সেকেন্ড পরে

www.pathagar.com

সে নিজেই গুলি করতে থাকে ভারতীয়দের উপরে। শত্রুকে বাধ্য হয়ে পিছিয়ে যেতে হয়। জমির শত্রুকে দমন করতে গিয়ে নিজেই প্রাণ দিলেন। ভারতীয়রা তৃতীয় বারের মত ৩০ এফএফ এর উপর হামলা চালালে ক্যাপ্টেন খসরু মৃত্যু বরণ করেন।

একদিন পরে ৩০ এফএফ এর উপর আবার হামলা চালানো হয়। ১ ডিসেম্বর আবার আক্রমণ হয় আর এক কোম্পানীর উপরে। বীর সৈন্যরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোম্পানী কমান্ডার এহসান এবং আলতাফ সৈন্যদের মনোবল শক্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু শত্রুদের একটি শেল দুজন সাহসী অফিসারের প্রাণ কেরে নিল।

চারদিন ধরে রানা সীমান্তে শত্রুদের প্রতিহত করে এবং তারপরে, ৩ ডিসেম্বরে, সে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্যকে মৌলভীবাজারে মোতায়েন করেন। ডিসেম্বর ৮/৯ পর্যন্ত ভারতীয়রা ওদেরকে ওখান থেকে সরাতে পারেনি। ডিসেম্বর ১১ তারিখে ৩১৩ ব্রিগেড দুর্বল হয়ে সিলেটে আসে এবং ২০২ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা সেখানে নিরাপদ অবস্থানে ছিল।

২০২ (অ্যাডহক) ব্রিগেড (সিলেট সাব-সেক্টর)

চা বাগান আর আনারসের জন্য প্রসিদ্ধ, সিলেট ভারত সীমান্ত থেকে কয়েক কিলেমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে শায়িত আছে বিখ্যাত মুসলিম সাধক হযরত শাহ্জালাল।

ব্রিগেডিয়ার সেলিমউল্লাহকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয় মার্শাল ল দায়িত্ব পালনে। ১ অক্টোবর তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ২০২ ব্রিগেডের। এটাতে ছিল মাত্র একটি নিয়মিত পদাতিক ডিভিশন (৩৯ পাঞ্জাব)।

তার ব্রিগেড এলাকায় ইতিমধ্যে শত্রুপক্ষ মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে সীমান্তের এপারে বেশ কয়েকটি স্থান দখল করেছিল। অক্টোবর নাগাদ তারা উত্তর সীমান্ত বরাবর এসব এলাকা দখল করে। একজন বিদ্রোহী মেজরের নেতৃত্বে এক গেরিলা দল তাহিপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের দুই কোম্পানী অবস্থান গ্রহণ করে সুনামগঞ্জে। ৩ ইস্ট বেঙ্গল, যারা বিদ্রোহ করেছিল,ছাতকে অবস্থান গ্রহণ করে। একটি ভারতীয় ব্রিগেড অবস্থান গ্রহণ করে জৈন্তাপুরে। মুক্তিবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন অবস্থান নেয় কোম্পানীগঞ্জে আর ব্রিগেডিয়ার সি এ কুইনের ৫৯ ব্রিগেড

জকিগঞ্জে অবস্থান নেয়। এ সব শহর পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে ছিল। যুদ্ধ শুরু হবার অনেক আগেই ভারত ও মুক্তিবাহিনী এসব স্থান দখল করে।

সেলিমউল্লাহ্ তার কতিপয় সৈন্য দিয়ে সিলেটের পাঁচটি প্রবেশপথ পাহারা দেন। ব্রিগেড রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয় খাইবার রাইফেলস এর একটি কোম্পানী আর ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স এর দুই কোম্পানী। এই ছিল তার শক্তি, শত্রু মোকাবেলার জন্য।

কিন্তু এ ব্রিগেড দেখে শত্রু কিছুটা বিচলিত হয় বটে। তারা সিদ্ধান্ত নিল এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হবার জন্য। ৫/৫ গোরখা রাইফেলস চারকাই দখল করার চেষ্টা করে সীমান্তের কাছাকাছি, কিন্তু সেলিমউল্লার সৈন্য তাদেরকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঁধা দিতে সক্ষম হয়। ভারতীয়রা চেষ্টা করে হেলিকপ্টার যোগে ৭ ডিসেম্বর ৪/৫ গোরখা রেজিমেন্টকে পাকিস্তানী সেনাদের পিছনে নামাতে, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। তারা পালাতে বাধ্য হয় কিন্তু অন্য সৈন্যদলের সাথে তারা মাত্র ১৪ ডিসেম্বরে মিলতে সক্ষম হয়।

১০ ডিসেম্বরে ৩১৩ ব্রিগেড এসে সিলেটে আরো শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শাহ জালালের শহরে লড়াই খুব একটা হয় না। শাহজালালের আশীর্বাদ হয়ত ছিল তাদের উপর।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টর

পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ভৌগলিক কাঠামো ছিল মিশ্র-পাহাড়, সমতল ভূমি, বনভূমি, জলাশয় ইত্যাদি। এখান থেকে দ্রুততম সময়ে রাজধানীতে যাওয়া যায়। পূর্ব সীমান্ত থেকে ঢাকার দূরত্ব মাত্র ৮০ কিলোমিটার। দক্ষিণে ছিল অনেক খাল, নদী যার সমন্বয়ে গঠিত গঙ্গা-মেঘনা ব-দ্বীপ অঞ্চল। পাকিস্তান নৌবাহিনীর কোন জাহাজ সেখানে না থাকায় বঙ্গোপসাগর ছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর দখলে।

১৮ কি. মি. প্রশস্থ মেঘ

না নদী পশ্চিম দিক আক্রমণকারী ও প্রতিরোধকারী উভয়ের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রায় পুরোটাই ভারত দ্বারা ঘেরা। শুধু ৭৫ কি. মি. সীমান্ত রয়েছে বার্মার সাথে। এ স্থানে ভূকৌশল ছিল কিছুটা ভিন্ন।

www.pathagar.com

MAP 12

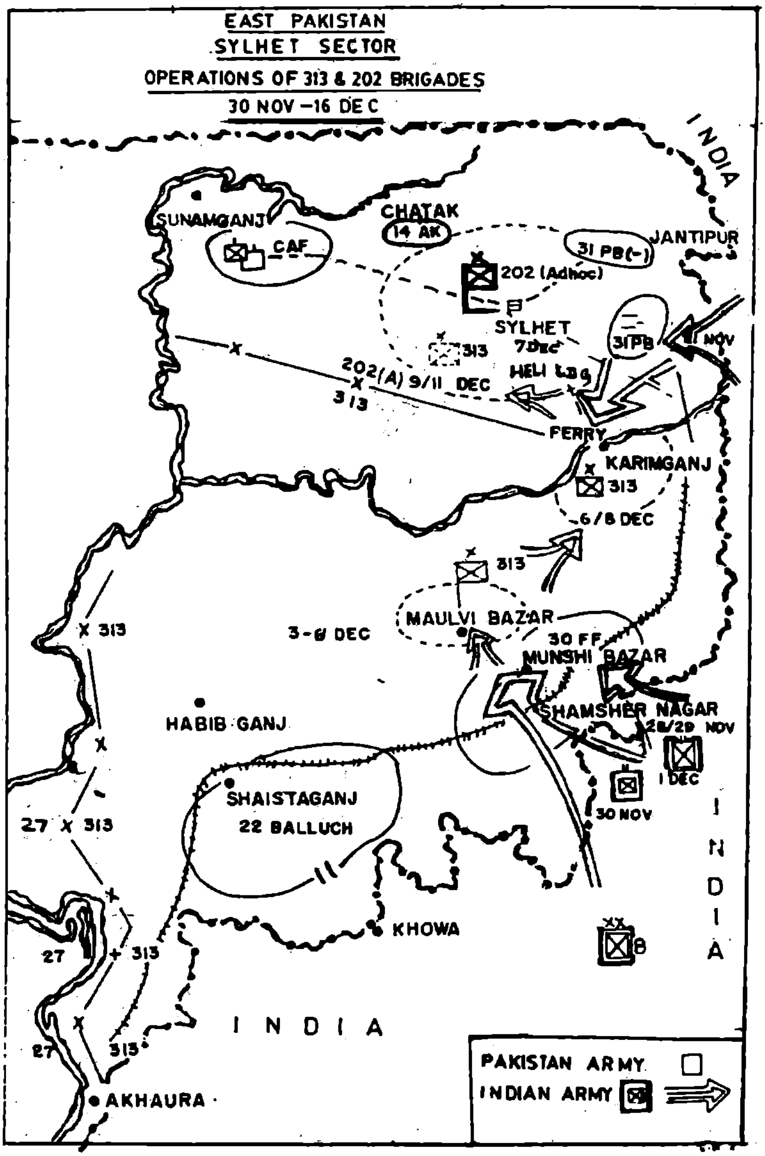

www.pathagar.com

যখন দেখা গেল যে পাক-ভারত যুদ্ধ আবার ঘনিয়ে আসছে, তখন ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার নতুন করে পরিকল্পনা করতে থাকে। তার অবস্থা ছিল বেশ কঠিন। তারপরও যতটা সম্ভব তিনি কৌশল তৈরি করতে থাকেন। অক্টোবরের শেষে আর নভেম্বরের প্রথম দিকে কয়েকটি ফরমেশন হেডকোয়ার্টার গঠিত হয়। কিছু ব্রিগেড ও ডিভিশনকে দাঁড় করানো হয়। তাই চারদিকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলেও অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতির ভীষণ অভাব ছিল। তারা ছিল মূলত কাগুজে বাঘ। তারা ততক্ষণে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ল। শত্রুরা বলতে পারল তারা পাঁচ পাঁচটি ডিভিশনকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছে। কিন্তু মূলত ছিল মাত্র ৩টি আংশিক ডিভিশন (৯, ১৬ এবং ১৪)।

মেজর জেনারেল মুহম্মদ রহিম খান ছিলেন রাওয়ালকোটের কাশ্মীরি অফিসার, যিনি ১৯৪৮ ও ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখন তাকে এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে হয়। তিনি ছিলেন কোয়েটার কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজের চিফ ইসট্রাক্টর। তার ছাত্রদের সাথে তিনি একাধিকবার পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন এবং এ প্রদেশের প্রতিরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি সচেতন ছিলেন যে যুদ্ধ হলে পূর্ব পাকিস্তানী শত্রুকে মোকাবেলা অনেক কঠিন হবে। মূল ভূ–খণ্ড রক্ষা করতে হলে অনেক খানি ভূ-খণ্ড হারাতে হবে।

১৮ নভেম্বর তাকে একটি সেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হল। ফেনীর দিকে অবরোধ গড়ে তুললে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কুমিল্লা ছিল সীমান্তের অনেক কাছে। এসব এলাকার প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে হলে, ঢাকা আবার বেশি দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু যতদিনে জেনারেল রহিম নবগঠিত ৩৯ (এ্যাডহক) ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, ভারতীয়রা তাদের আক্রমণ ততদিনে শুরু করলো। কৌশল পরিবর্তনের আর সময় বা সুযোগ ছিল না। তবুও যতটা সম্ভব তিনি সৈন্যদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেন।

উত্তরে সালদা নদী থেকে দক্ষিণে বার্মা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ৩২০ কি. মি. ছিল ৩৯ (এ্যাড হক) ডিভিশনের অধীনে। ২১ নভেম্বরে ৩৯ ডিভিশনকে নিম্নলিখিতভাবে মোতায়েন করা হয়।

www.pathagar.com

১১৭ ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর আতিফ)

ব্রিগেড সদর দপ্তর কুমিল্লায় অবস্থিত ছিল এবং এর দায়িত্ব ছিল সালদা নদী থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত। ঢাকার পথে দাউদকান্দি ও লাকসামও ছিল ব্রিগেডের অধীনে। পদাতিক বাহিনী থাকলেও অস্ত্র ছিল অপ্রতুল। ব্রিগেডিয়ার আতিফের ছিল মাত্র ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের ১৩টি আগ্নেয়াস্ত্র। তার দুই ব্যাটালিয়নকে তিনি রাখলেন ফেনী নদী ও সীমান্তের মাঝামাঝি অবস্থানে। ৩০ পাঞ্জাব কুমিল্লার দায়িত্বে ছিল আর ২৩ পাঞ্জাব লাকসামের প্রবেশ পথ প্রতিরক্ষা করছিল। দুই ইউনিটের মধ্যে কিছু ফাঁক ছিল। লাকসাম থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত ২৫ এফএফ মোতায়েন করা ছিল।

৫৩ ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার আসলাম নিয়াজি)

ব্রিগেড সদর দপ্তর ফেনীতে অবস্থিত ছিল এবং এর অধীনে ছিল চৌদ্দগ্রাম থেকে বিলোনিয়াসহ ফেনী। এর ছিল মাত্র দুটি ব্যাটালিয়ন। ১৫ বালুচ ছিল বেলুনিয়ায়। ৩৯ বালুচ ছিল চৌদ্দগ্রাম ও ফেনীর মাঝামাঝি। ২১ আজাদ কাশ্মীরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক ব্রিগেডকে এ ইউনিটের একটি করে কোম্পানী দেয়া হয়।

৯১ [এ্যাডহক] ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার মিয়া তাসকিন উদ্দীন)

ব্রিগেড সদর দপ্তর ছিল ফেনীর নদীর দক্ষিণে দামঘাটে অবস্থিত এবং এর দ্বায়িত্ব ছিল রামগড় করেরহাট এবং সমগ্র চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল যেখানে পাহাড় ও বন ছিল গেরিলা যুদ্ধের জন্য উত্তম কিন্তু যানবাহন চলাচলের জন্য বাঁধা)। এখানে কোন নিয়মিত ইউনিট ছিল না। এখানে মিশ্রিত ছিল রেঞ্জার, মুজাহিদ এবং সিভিল আর্মড ফোর্সেস। এ দুর্বল বাহিনীর জন্য কিছুটা সহায়তা দেয় ২৪ এফএফ এর দুইটি কোম্পানি।

৯৭ [এ্যাড হক] ব্রিগেড (ব্রিগেডিয়ার আতা মুহম্মদ মালিক)

ব্রিগেড সদর দপ্তর ছিল চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলও এর দায়িত্বে ছিল। ব্রিগেডের ছিল একটি নিয়মিত ব্যাটালিয়ন (৪৮ বালুচ), ২৪ এফএফ এর দুটি

www.pathagar.com

কোম্পানি, কতিপয় কমান্ডো, সিএএফ এর একটি দল, একটি মেরিন ব্যাটালিয়ন এবং কিছু মর্টার।

৩৯ (এ্যাড হক) ডিভিশনের তেমন কোন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি ছিল না। ব্রিগেডের থেকেও কম অস্ত্র ইত্যাদি ছিল তাদের।

দক্ষিণ-পূর্ব সেক্টরে ভারতীয় পরিকল্পনা

ভারতীয় ২৩ মাউন্টেন ডিভিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয় মেঘনা নদীতে বাঁধা সৃষ্টি করা এবং ফেনীতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে রাখা। এতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তানী সেনাদের সাথে লাকসামের যোগাযোগ বন্ধ হয়। কুমিল্লাকে পাশ কাটিয়ে তারা স্থির করল চাঁদপুর থেকে লাকসামের রাস্তায় বাঁধা দেবে।

একাজের জন্য ২৩ ডিভিশনকে চারটি ব্রিগেড দেয়া হয়। একটি ব্রিগেড চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থান করে, একটি ট্যাঙ্ক ইত্যাদিসহ বেলুনিয়ার ভিতর দিয়ে ফেনি নদীর রেল/সড়ক সেতুর দিকে অগ্রসর হয়। আর দুইটি ব্রিগেড কুমিল্লা-লাকসাম ও চৌদ্দগ্রাম- লাকসামের মাঝামাঝি আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

২১ নভেম্বর শত্রু পক্ষের আক্রমণ শুরু হয়। সীমান্ত পোস্ট আক্রমণ করা হয়। পাকিস্তানী বাহিনীর পেছনের ভাগে নাশকতামূলক তৎপরতা চালানোর জন্য মুক্তিবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১ ডিসেম্বর ২৩ পাঞ্জাবের একটি কোম্পানীর উপর আক্রমণের প্রচেষ্টা চালানো হলে কিফাইত নামে একজন আর্টিলারি পর্যবেক্ষক এর প্রতিরোধ করে।

কুমিল্লা সাব সেক্টর

৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু হয়। ৩০ পাঞ্জাব ও ২৩ পাঞ্জাবের মাঝখানে ফাঁকে কুমিল্লার দক্ষিণে শত্রুরা ঢুকে পড়ে। তারা লাকসামে যাবার পথ রুদ্ধ করে রাখে। ২৩ পাঞ্জাব তারপরও ৬ ডিসেম্বরে লাকসামে যেতে সক্ষম হয়। ৮ ডিসেম্বরে যদিও তারা সরে যায় এবং ভারতীয়রা শহরটাকে দখলে নেয়, ময়নামতিতে ৩০ পাঞ্জাব শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে এবং ১৬ ডিসেম্বরের যুদ্ধ বিরতির পর্যন্ত তাদেরকে দমন করা যায়নি।

www.pathagar.com

বেলুনিয়ায় ১৫ বালুচ খুব একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ, তারা সংখ্যায় ছিল কম। ২৫/২৬ নভেম্বরে শত্রুপক্ষ তাদের ভেদ করে কিন্তু তারা ফেনীতে যেতে সক্ষম হয়। মেজর জেনারেল আর জি হিরা পুরো নভেম্বর ধরে চেষ্টা করার পর অবশেষে বেলুনিয়া দখল করতে পারলেও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারেনি।

যেহেতু ঢাকার দিকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছিল, জেনারেল রহিম ফেনী প্রতিরোধ ছেড়ে তার সৈন্যদের লাকসাম আর কুমিল্লা প্রতিরোধে নিয়োজিত করলেন। বেগমগঞ্জে গেল ৫৩ ব্রিগেড প্রথমে ফেনীর ৩২ কি. মি পশ্চিমে ২৮ নভেম্বরে। তারপর ৫ ডিসেম্বর তারা লাকসামে ১১৭ ব্রিগেডের সাথে যোগ দেয়।

১১৭ ব্রিগেড বিভক্ত ছিল কারণ কুমিল্লায় ৩০ পাঞ্জাবকে পাশ কাটিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল।

চাঁদপুর সাব সেক্টর

আবার শত্রুপক্ষ লাকসামে ৫৩ ও ১১৭ ব্রিগেডের সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যায়। ব্রিগেডিয়ার হরিন্দর সিং সোধীর অধীনে ৩০১ ইন্ডিয়ান মাউন্টেন ব্রিগেড চাঁদপুর আর দাউদকান্দির দিকে অগ্রসর হয়। চাঁদপুরে কোন প্রতিরোধ ছিল না।

শত্রুপক্ষ খুশী মনে এগোতে থাকে এবং যেখানে পারে পাকিস্তানী সৈন্যকে ধরে ফেলে। তাদের পিছনে মুক্তিবাহিনীও অগ্রসর হয়। তারাও পাকিস্তানীদের আটক করে। ৬ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনী হবিগঞ্জ দখল করে। চাঁদপুর তখন প্রত্যক্ষ হুমকির সম্মুখীন। জেনারেল রহিম চাঁদপুর থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা ৬/৭ ডিসেম্বর সরে যাওয়া শুরু করে, কিন্তু প্রক্রিয়া ছিল অতি ধীর গতির। কারণ মেঘনা নদী পার হওয়ার জন্য কোন সেতু ছিল না। নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত যানবাহন ও ফেরির জন্য জেনারেল রহিমকে অপেক্ষা করতে হয়। আর সব বিচরণ রাতে আঁধারে করতে হয়, কারণ দিনের বেলায় শত্রুবিমান আকাশে টহল দিচ্ছিল। ৮/৯ ডিসেম্বর রাজাকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশসহ সব মিলিয়ে ৭০০ জন এবং ৩৯ (এ্যাডহক) ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার চাঁদপুর ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে চলে আসে। ঢাকার কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে মেঘনা নদীর পারে। জেনারেল রহিম এবং তার সাথে গানবোটে যারা ছিলেন, তারা সবার শেষে চাঁদপুর ছেড়ে চলে আসেন। যখন তারা নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি, তখন চারদিকে সুর্যের আলো ছড়িয়ে ছিল।

www.pathagar.com

MAP 13

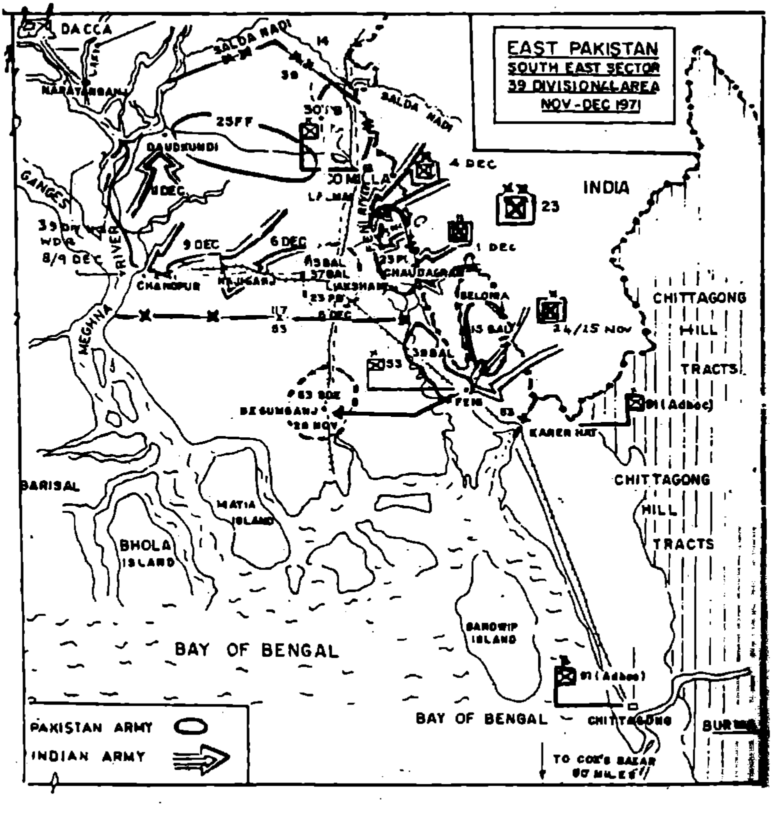
EAST PAKISTAN
SOUTH EAST SECTOR
39 DIVISIONAL AREA
NOV - DEC 1971
DACCA
SALDA NADI
DAUDKUNDI
GANGES
MEGHNA RIVER
CHANDPUR
COMILLA
INDIA
23
4 DEC
1 DEC
9 DEC
6 DEC
25FF
CHAUDAGRAM
BELONIA
LAKSHAM
24/15 Nov
FENI
KARER HAT
BEGUMGANJ
28 NOV
CHITTAGONG HILL TRACTS
BARISAL
BHOLA ISLAND
MATIA ISLAND
SANDWIP ISLAND
BAY OF BENGAL
91 (Adhoc)
CHITTAGONG
TO COX'S BAZAR
PAKISTAN ARMY
INDIAN ARMY

শত্রুবিমান সারসরি তাদের গানবোটের উপর গুলি ছুঁড়ে। জেনারেল রহিম আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এডিসি এবং একজন স্টাফ অফিসার ছাড়া সবাই আহত বা নিহত হন।

২০ নভেম্বর যে ৩৯ (এডহক) ডিভিশন গঠিত হয়েছিল তা ৯ ডিসেম্বর বিলীন হয়ে যায়। ৫৩ ও ১১৭ ব্রিডেগের কিছু সদস্য লাকসামে তখনও শত্রুদের প্রতিরোধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কুমিল্লার ব্যাটালিয়নের সাথে যোগ দেয়ার চেষ্টা করে। কেউ কেউ লালমাই যাওয়ার চেষ্টা করে। আবার কেউ যায় চাঁদপুরে। শত্রুদের পাশ কাটিয়ে যেতে এদের মধ্যে অনেকে সফল হয়। কিছু সৈন্য ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত লালমাই ও লাকসামকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ততদিনে ভারতীয় সৈন্যরা শীতালক্ষ্যা নদী পার হয়ে ঢাকার কাছে চলে আসে। পাকিস্তানে তখন যুদ্ধটা ছিল এমন যেন স্বাগত সিংয়ের কাছে নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ করতে না হয়। দামঘাট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯১ ও ৯৭ ব্রিগেডকে যুদ্ধের বাইরে রাখা হয়। তারা ঢাকা থেকে এতই দূরে ছিল যে শত্রুপক্ষ তাদেরকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ভারতীয় নৌবাহিনী যখন কক্সবাজারের কাছে নামতে চায়, তারা ব্যর্থ হয়।

সেন্ট্রাল সেক্টর (কেন্দ্রিয় সেক্টর)

৩৬ (এ্যাডহক) ডিভিশন ছিল মূলত ছলচাতুরী। যুদ্ধ শুরুর মাত্র দু'সপ্তাহ আগে জোরাতালি দিয়ে এটা গঠন করা হয়। মেজর জেনারেল মুহম্মদ জমশেদ খানকে যখন ৩৬ (এ্যাহক) ডিভিশন গঠন ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তিনি তখন সামরিক আইন সদর দপ্তরে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঝিলাম থেকে আগত লম্বা, সুদর্শন পাঞ্জাবী। তার বংশ যুগ যুগ ধরে সামরিক বাহিনীতে ছিল। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য এটাই যথেষ্ট নয়। তার কাছে ছিল মাত্র দুই ব্যাটালিয়ন বিশিষ্ট একটি ব্রিগেড। এ দুই তারকার জেনারেলের অধীন ছিল মাত্র দুতিনটি পদাতিক ইউনিট। তার অতি স্বল্প অস্ত্র গোলাবারুদ ছিল।

তার দায়িত্বে ছিল উত্তরে যমুনা-সুরমা নদীর মাঝখান থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত। অর্থাৎ ঢাকা পর্যন্ত। ভারতীয় বাহিনী এবং তাদের লক্ষের মধ্যে তেমন কোন বাঁধা ছিল না।

শত্রু পক্ষ তেমন শক্তিশালী না হয়েও তারা ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে রাজি হয়। তারা পাকিস্তানের কমান্ডারকে আত্মসমর্পণ করতে বলে।

www.pathagar.com

জামালপুর সাব সেক্টর

৯৩ (এ্যাডহক) ব্রিগেডের কমান্ডিং অফিসার ব্রিগেডিয়ার ফজলে কাদের লে. ক. সুলতানের ৩১ বালুচকে সীমান্তের কয়েক মাইল দক্ষিণে জামালপুর ও কমলাপুরের মাঝামাঝি স্থানে প্রেরণ করেন। তার দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন ৩৩ পাঞ্জাবকে হালুয়াঘাটে প্রেরণ করা হয়। মেজর গাফফার শাহ তার ১২টি মর্টার এ দুই ইউনিটের মাঝে সমান ভাবে ভাগ করেন।

বামদিকে ৯৩ ব্রিগেডকে প্রতিরক্ষা করে যমুনা নদী। ডান দিকে সুরমা নদীর ওপারে ছিল সেলিমউল্লাহর ২০২ (এ্যাডহক) ব্রিগেড-এর ১৪ পদাতিক ডিভিশন।

কাদের ভাবতে পারেনি, যে তিনি শত্রুকে বাঁধা দানে ব্যর্থ হলে ইস্টার্ন কমান্ডের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

গোহাটিতে সদর দপ্তর রেখে মে. জে. গুরবাক্স সিং গিল ভারতের ১০১ কমিউনিকেশন জোন কমান্ড করছিলেন। তার ছিল সাধারণ পদাতিক ডিভিশন-তিনটি ব্রিগেড এবং পর্যাপ্ত অস্ত্র গোলাবারুদ। যদিও তাকে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেয়া হয়নি। তার পরবর্তী কমান্ডার মে. জে. জি,এস, নাগরাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয় সবার আগে ঢাকার নিকটে আসার জন্য।

১৯ নভেম্বর ১০১ কমিউনিকেশন জোন তাদের কার্যক্রম শুরু করে, পূর্ব পাকিস্তানে ভারত খোলাখোলিভাবে প্রবেশের তিন দিনপূর্বে। ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন, কামালপুর আক্রমণ করে। ক্যাপ্টেন সিদ্দিকি তার মর্টারকে সামনে আনলো শত্রুকে মোকাবেলা করবার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত তার প্রায় সব মর্টার শত্রুর হাতে ধ্বংস হয়।

২৭ নভেম্বর ৩১ বালুচ পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং কামালপুর পুনরায় নিয়ন্ত্রণে আনে। ক্যাপ্টেন কুদ্দুস তার ফ্রন্টে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। জেনারেল খিলের কোন তাড়া ছিল না, অথবা সে তার সৈন্যকে নিরাপদ রাখতে চাচ্ছিলেন। ৩১ ডিসেম্বরে ৩১ বালুচ আর একটি পাল্টা আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন মেজর আইয়ুব কিন্তু শত্রুর গুলি তাকে নিহত করে। সেটি ছিল যুদ্ধের ১৩তম দিন। ৪/৫ ডিসেম্বর বক্সিগঞ্জ থেকে সৈন্যদল সরে আসে। তা জগরঘাট-কর্ণ-শেরপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। তিন দিন ধরে শত্রুকে প্রতিহত করে ৩১ বালুচ ৭ ডিসেম্বরে জামালপুরে অবস্থান গ্রহণ করে। ভারতীয় কমান্ডারের আরো তিন দিন লাগরো এদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য।

www.pathagar.com

৯/১০ ডিসেম্বরে ব্রিগেডিয়ার এইচ,ই, ক্লের জামালপুর আক্রমণ করেন। আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ১০ ডিসেম্বর ক্লের মনস্তাত্ত্বিক আক্রমনের চেষ্টা করে। তিনি লে. ক. সুলতানের কাছে চিঠি লেখেন, মে. জে. শওকত রিজার বই 'দি সেকেন্ড পাকিস্তান ওয়্যার অব ১৯৭১'-এ চিঠি স্থান পেয়েছে।

(প্রেরক ব্রি. হারদাত সিং ক্লের)

প্রতি:

কমান্ডার, জামালপুর গ্যারিসন

আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, আপনার গ্যারিসন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং পালাবার কোন পথ নেই।

অস্ত্রসহ একটি সম্পূর্ণ ব্রিগেড তৈরি হয়েছে এবং আর একটি সকাল নাগাদ আক্রমণ চালাবে। আর আমাদের বিমানবাহিনীকে তো দেখছেনই, সামনে আরো দেখতে পারবেন। আপনাদের অবস্থা আশাহীন। আপনাদের বড় কর্মকর্তাগণ সব পালিয়ে গেছেন।

আজ সন্ধ্যা ৬:৩০ টার আগে আপনার জবাব আশা করছি। তা না হলে, মিগসহ আপনাদের উপর আক্রমণ চালানো হবে।

আপনাদের আটককৃত সৈন্যরা যারা আমাদের হেফাজতে আছে, তারা আপনাদের অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন। তাদের সাথে ভালভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আশা করি এ চিঠির বাহকের সাথে আপনারাও ভাল ব্যবহার করবেন।

আপনার জবাবের অপেক্ষায়,

ব্রিগ. এইচ, এস, ক্লের
কমান্ডার
১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

www.pathagar.com

৩১ বালুচ কমান্ডিং অফিসারের জবাব :

ব্রিগেডিয়ার,

আশা করি ভাল আছেন। আমাদেরকে আত্মসমর্পণ করবার অনুরোধ জানিয়ে আপনার পত্র পেয়েছি। আমি বলতে চাই যে আপনি এখন পর্যন্ত যা লড়াই দেখেছেন, তা অতি সামান্য। লড়াই তো শুরুই হয় নাই। এ আলোচনা বন্ধ করে, চলেন, যুদ্ধ শুরু করি।

আপনার চল্লিশ গল্প অপ্রতুল। আরো প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ দেন।

আপনার দরকার ছিল না অনুরোধ করার, যাতে চিঠির বাহকের সাথে আমরা ভাল আচরণ করি। আপনি আমাদেরকে চিনেন না আশা করি উনি চা পছন্দ করেছেন।

মুক্তিবাহিনীদেরকে আমার ভালোবাসা দিবেন। কলমের বদলে আপনার হাতে বন্দুক দেখতে চায়। চলেন, যুদ্ধে নামেন।

আপনার বিশ্বস্ত

জামালপুরের কমান্ডার
(জে. শাওকাত রিজাস, মূলকপি, পৃষ্ঠা- ম্যানুস্ক্রিপ্ট ২৩৬, ২৩৭,২৩৮)
১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

সুলতান ক্লেরকে দেখাতে পারতেন তার অধীনে সৈন্যদের শক্তি, কিন্তু তার আগে ইস্টার্ন কমান্ড তাকে ঢাকায় আসার নির্দেশ দেন।

ক্লের খুব বেশি বাহাদুরী দেখাননি। তিনি ৩১ বালুচকে ঘিরে রেখেছিলেন কিন্তু নিজের সৈন্যকে নিরাপদে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১০/১১ ডিসেম্বর রাত্রে সুলতান তাদের ভেদ করে তার সৈন্য দলকে মধুপুরে ৩৩ বালুচের কাছে নিয়ে যায়। সে রাতে সুলতান ২০০ বেশি বীর সৈন্যকে হারান।

ব্রি. কাদির তার বাহিনীকে টাঙ্গাইলের চার দিকে মোতায়েন করেন। ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল নাগরার সৈন্যদল এবং কাদির তাদির মোকাবেলা করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দেখলেন আকাশ থেকে পারাট্রিপাররা নামছে কল্যাণখের ও টাঙ্গাইলের মাঝখানে। কিন্তু তারপরও সুলতান এগিয়ে গেল এবং ১২ ডিসেম্বরে ৩১ বালুচ কল্যাণখেরে আসেন। ১৩ ডিসেম্বর তারা ঢাকায় বাইরে টঙ্গী পৌছান। যুদ্ধ শেষ হবার পর্যন্ত তারা সেখানেই রইলেন।

www.pathagar.com

MAP 14

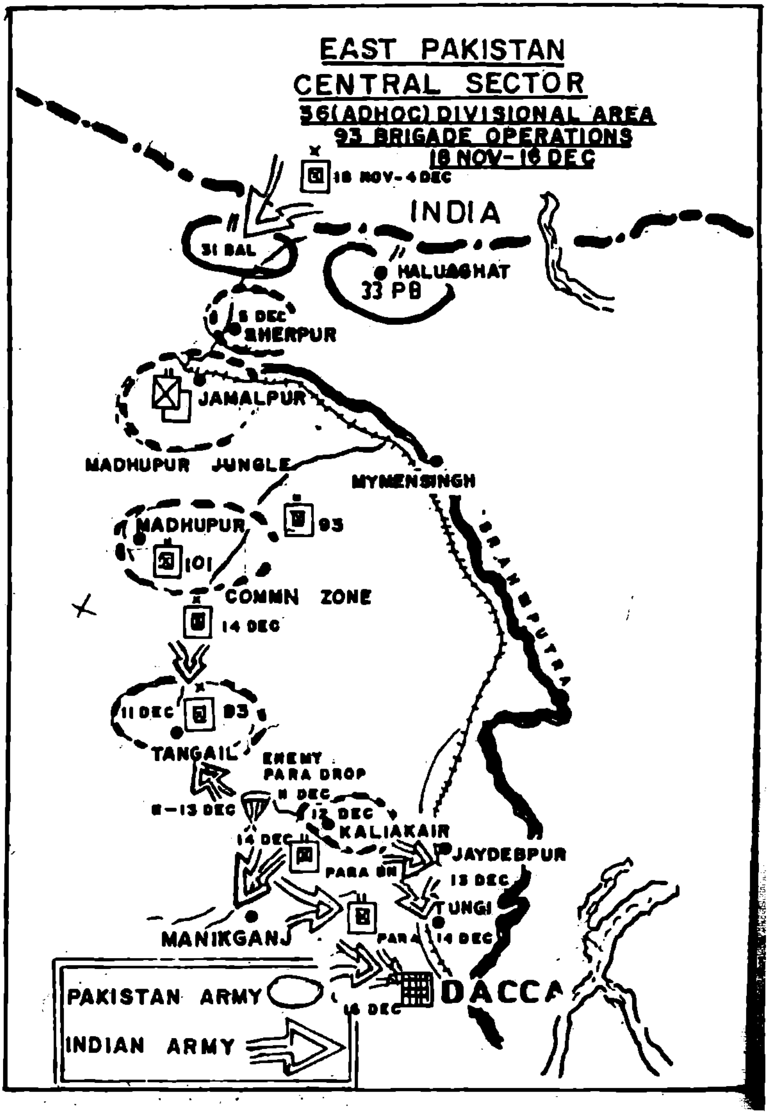

www.pathagar.com

দ্য ট্রাম্প কার্ড

জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ৩০০,০০০-এর অধীক সেনা ছিল। তার ছিল শক্তিশালী অস্ত্র গোলাবারুদ; আকাশ ছিল তার দখলে। আর ১০০,০০০ মুক্তি বাহিনী সদস্য তাকে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করছিল। ভারতীয় নৌবাহিনী সফলতার সহিত পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ অঞ্চলে অবরোধ সৃষ্টি করছিল। কিন্তু ২৪ দিন পার হবার পরও যখন তেমন কোন অর্জন হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। দিল্লী সদর দপ্তর থেকে অরোরাকে তাগাদা দেয়া হচ্ছিল। শত্রু ছিল সংখ্যায় কম, বিচ্ছিন্ন, তারপরও তার গতি এত ধীর কেন, এ নিয়ে তারা অসন্তুষ্ট ছিল।

অরোরাকে বলা হয় যত শিগগির সম্ভব ঢাকায় পৌছা, সেখানে পাকিস্তানীরা শক্ত অবস্থান নেওয়ার আগে। পাকিস্তানিদের একটি ব্রিগেড ঢাকায় ছিল, আর একটি ছিল আশুগঞ্জে এবং আর একটি রংপুর সেক্টর থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল।

অরোরা সিদ্ধান্ত নিল তারা প্যারা ব্রিজ দিয়ে তাদের ঢাকায় আগমনকে ঠেকানো। স্থির হলো তার প্যারা ব্রিজ টাঙ্গাইলে নামবে, কারণ, টাঙ্গাইল ছিল ঢাকার নিকট। তাছাড়া টাঙ্গাইলের আসেপাশে মুক্তিযোদ্ধা বাধা সিদ্দিকী ও তার দলবল ছিল।

১১ ডিসেম্বর দিন দুপুর আকাশ থেকে নেমে এল প্যারাট্রুপার (Paratrooper) দল। তাদের প্রথম কাজ ছিল সিদ্দিকীর সাথে যোগাযোগ করা আর ঢাকায় যাবার সব রাস্তা অবরোধ করা। কাদের সিদ্দিকী তিন দিন পাকিস্তানের ৯৩ ব্রিগেডের সাথে লড়াই করতে সক্ষম হয়।

জেনারেল নাগরা তার ব্রিগেড নিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়। তারা সেখানে ১৬ ডিসেম্বর পৌছায়।

ঢাকার প্রতিরোধ

ঢাকা প্রতিরক্ষার প্রাথমিক পরিকল্পনা ভাল ছিল, যদি তা বাস্তবায়িত হতো, তাহলে কয়েক সপ্তাহ, কিংবা কয়েক মাসের জন্য শত্রুকে ঢাকায় আসতে বাঁধা দেওয়া যেত। গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রার মাঝে অবস্থিত ছিল রাজধানী। এক একটা নদী কয়েক কিলোমিটার প্রশস্থ, পার হতে সময়ের ব্যাপার। তাও কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ স্থানে পার হবার ব্যবস্থা ছিল। বাঁধা ছাড়া একটি মাত্র পথ ছিল, উত্তর থেকে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের মাঝেখানে।

www.pathagar.com

ঢাকা টাঙ্গাইল ছিল ১৬০ কি. মি. প্রশস্থ আর ১০০ কি. মি. দৈর্ঘ্য। প্রতিরক্ষার জন্য চারটি লাইন ঠিক হল। আউটার লাইন ডিফেন্স ছিল ময়মনসিংহ - ভৈরব বাজার-দাউদকান্দি-চাঁদপুর-ফরিদপুর-পাবনা ও টাঙ্গাইল। ইনার লাইন অব ডিফেন্স ছিল ৩০ থেকে ৫০ কি. মি. দূরত্বে, জয়দেবপুর থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত। থার্ড লাইন অব ডিফিক্যাল্ট ছিল শহরের ঠিক বাইরে। আর ফোর্থ লাইন ছিল এলাকার ভিতরেই বিভিন্ন গড়ে তুলা দূর্গ ও শক্তিশালী স্থান। এ পরিকল্পনা শুধুমাত্র বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল যদি পর্যাপ্ত সৈন্য থাকতো আর যুদ্ধে শুরুর আগে তাদেরকে জায়গা মত মোতায়েন করা যেত। দুর্ভাগ্যবশত তা কিছু নীতির জন্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। মূল নীতি ছিল যেন কোন ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে মুক্তিবাহিনীরা স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করতে পারে।

কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ডকে নির্দেশ দেয়া হল, যেকোন মূল্যে ঢাকাকে প্রতিরক্ষা করা। প্রথম দিকে জেনারেল নিয়াজী ৫৩ পদাতিক ব্রিগেডকে প্রাদেশিক রাজধানীতে রেখেছিলেন রিজার্ভ হিসেবে। কিন্তু পূর্ব দিকে যখন হুমকি দেখা গেল আর ফেনী বিপদের সম্মূখীন হয়, নিয়াজি তখন তাদেরকে সেখানে প্রেরণ করলেন।

জেনারেল নিয়াজি দাবি করেন যে তাকে আটটি ব্যাটালিয়ন দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো পাঠানো হয়নি। ২১ নভেম্বরে যখন ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে, তখন যুদ্ধ করবার মতো কোন সৈন্য দল ছিল না ঢাকায়। ৩ ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধ আসলে শুরু হয়, তখনও ঢাকায় পর্যাপ্ত সৈন্য মোতায়েন ছিল না। ঢাকা কিছু ইউনিট পাঠানোর জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অনেক বিলম্বে শত্রুপক্ষের অবরোধের কারণে ১৬ ডিভিশন তাদের ব্যাটালিয়ন ঢাকায় প্রেরণ করতে ব্যর্থ হয়। ১৪ ডিভিশনের একই অবস্থা ছিল। যখন ৩৯ (এ্যাডহক) ডিভিশনকে ঢাকায় যেতে অনুমতি দেয়া হয়। তখন তার মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন ছিল। ৯৩ ব্রিগেড ও ঢাকায় পৌঁছতে পারেনি কারণ, টাঙ্গাইলে অবস্থিত প্যারাট্রুপার এবং মুক্তিবাহিনী তাদের বাঁধা দান করে। মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন (তাও দুই কোম্পানী কম) ঢাকায় আসতে সক্ষম হয়।

তাই, যখন জেনারেল নাগরা ঢাকায় প্রান্তদেশে পৌঁছান এবং নিয়াজীকে খবর পাঠান যে খেলা শেষ, তখন ঢাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। পোশাকধারী যে ২৬,২৫০ জন ঢাকায় ছিল, তাদের বেশির ভাগ ছিল সিঙ্গেল, সার্ভিস কোরস, মেইনটেনেন্স পরসোনাল, নার্সিং অডারলি, মুজাহিদ, রাজাকার আর পশ্চিম পাকিস্তান পুলিশের সদস্য।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

১৬ ডিসেম্বরে নিয়াজী মানিকশ-এর কাছে খবর পাঠান যে পূর্ব পাকিস্তানে শর্তসাপেক্ষ যুদ্ধ বিরতি গ্রহণ করতে রাজি। পূর্ব পাকিস্তানে ফের আর্মি এ্যাভিয়েশন স্কোয়াডোন এর কমান্ডার, মেজর লিয়াকত আসরার বুখারী, জেনারেল নিয়াজিকে বলেন যে সে অন্ধকার রাত বিমান যোগে তার দলকে বার্মায় নিয়ে যেতে প্রস্তুত। ভারতীয় বিমানের ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এয়ার কমোডর ইনামুল হক ভাবলেন যে সেটা সম্ভব হবে না। রিয়ার এডমিরাল শরিফ বললেন যে লিয়াকতকে চেষ্টা করবার সুযোগ দেয়া উচিত। তাতে অন্তত তাদের হেলিকপ্টার শত্রুদের হাতে যাবে না। জেনারেল নিয়াজি রাজি হলেন। লিয়াকতকে নির্দেশ দিলেন আহত মেজর জেনারেল রহিমকে সাথে নেয়ার জন্য কারণ তার মাধ্যমে তিনি কিছু জরুরি দলিল ইসলামাবেদ পাঠাবেন। তার সাথে কিছু নার্সও যাবে।

লিয়াকত স্থির কররেন যে ১৬ ডিসেম্বর রাত ৩টায় সে ঢাকায় থেকে হেলিকপ্টার যোগে রওনা দিবেন যাতে ভোরের আগে তারা বার্মায় নামতে পারবে। তারা আটটি হেলিকপ্টারে আরোহণ করে- চারটি এমআইএইট আর চারটি এ্যালুয়েটেল ৩টা পর্যন্ত লিয়াকত নার্সদের জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু তারা যখন আসলো না, তাদের ছাড়াই রওনা দিলেন, তারা বাতি ছাড়া, কোন রকম যোগাযোগ ছাড়া, উড়ে যেতে থাকলো।

সাতে তিন ঘণ্টা পরে, সূর্যদ্বয়ের সময়ে, লিয়াকত আকিয়াব (বার্মায়)-এ নামলেন। বার্মা কর্তৃপক্ষের সাথে কথপোকথনের পরে এবং পাকিস্তান দূতাবাসের সাহায্যে তারা ব্যাংককে যায় এবং সেখান থেকে করাচিতে। এ সাহসী দলনেতার কারণে এ ইভালুয়েশন সম্ভব ছিল। মোট ১৩৯ নারী ও শিশু এ আর্মি এভিয়েশন স্কোয়াড্রনের সাথে নিরাপদে পাকিস্তানে আসতে সক্ষম হয়।

আত্মসমর্পণ

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪:৩১ ঘটিকায় লে. জে. আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে সাক্ষর করেন। তাদের শত্রুর হাতে পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করেন। এর অনেক আগে থেকে কিন্তু এ সংঘর্ষ সমাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে ভারত বাহিনীর প্রবেশের পর থেকে সেখানে পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

মুক্তিবাহিনী তাদের নাশকতামূলক তৎপরতা বাড়াতে থাকে। পাকিস্তান বাহিনীর লোকবল কমতে থাকে।

৭ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নর ড. এম.এ. মালেক গভর্নর হাউসে সভা করে কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ডা এবং তার পিএসও মে. জে. রাও ফরমান আলীর সাথে। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতির গুরুত্বের সম্বন্ধে অবহিত করা। তারা সুপারিশ করতে চান যেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় যাতে আরো প্রাণহানী না ঘটে।

চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে একটি টেলেক্স ৭ ডিসেম্বরে ইসলাবাদস্থ প্রেসিডেন্ট হাউসে পাঠানো হয়। পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করা হয়। ড. মালিক বুঝতে পারলেন তাদের পরিণতি কি হবে।

ড. মালেকের কাছে জবাবে জেনারেল ইয়াহিয়া আশ্বাস দেন যে সে আন্তর্জাতিক মহলের মাধ্যমে একটা যুদ্ধ বিরতির জন্য চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন যে, জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল এমন সামরিক কৌশল গ্রহণ করা হয় যাতে আরো ভূ-খণ্ড হারাতে না হয়। তাকে খাদ্য রেশন করবার নির্দেশ দেয়া হয়। জবাবের শেষে গভর্ণর এবং পূর্ব পাকিস্তানের সবার নিরাপত্তা কামনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট গভর্ণরের কাছে ৮ ডিসেম্বরে আর একটি ম্যাসেজ পাঠান। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পর্যায়ে সব রকমের চেষ্টা চালানো হচ্ছিল।

৯ ডিসেম্বরে ঢাকার কাছের নদীসমূহের তীরে ভারত বাহিনী পৌছলো। উত্তরে তেমন কোন নদী ছিল না বাঁধা দেবার মতো। পাকিস্তান বাহিনীর একটি ব্রিগেড যুদ্ধরত হলেও তারা প্রচণ্ড চাপের অধীনে ছিল।

ড. মালিক বুঝতে পারলেন যে পাকিস্তান আর্মি আর বেশি দিন ভারত বাহিনীকে ঠেকাতে পারবে না। তিনি ৯ ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্টের কাছে আর একটি চিঠি পাঠান। তিনি বলেন যে সামরিক পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল এবং যে কোন সময় শত্রু বাহিনী ঢাকায় চলে আসবে। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেন যে, জাতিসংঘ ঢাকাকে ওপেন সিটি ঘোষণা করবার জন্য সে সুপারিশ করেছিল, তা গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, যে জেনারেল নিয়াজি এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন কারণ, তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতে। ড. মালিক

www.pathagar.com

আবার বলেন যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হওয়া উচিত এবং একটা রাজনৈতিক সমাধানে রাজি হওয়া উচিত। তার অর্থ ছিল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

ততদিনে জেনারেল ইয়াহিয়াও বুঝতে পারলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য লড়াই শিগগির শেষ হবে। তিনি ড. মালিককে বলেন, যে তিনি যেটা ভালো মনে করেন সেটা অনুযায়ী যেন সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, জেনারেল নিয়াজিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি গভর্ণরের সিদ্ধান্ত মেনে চলেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সে রাতেই ড. মালিক মুখ্য সচিবকে ডাকলেন। ঢাকায় জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রতিনিধি জনাব পল মার্ক হেনরীর কাছে তার চিঠি লিখে প্রস্তাব করেন যুদ্ধবিরতি করবার ব্যাপারে। তারা বলেন, সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ এবং অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানিদেরকে যেন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। তারা প্রস্তাব করেন যেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাছে যেন ক্ষমতা হস্তান্তর হয়।

গভর্ণর জেনারেল ফরমানকে বলেন চিঠিটা যেন জেনারেল নিয়াজিকে দেখানো হয় এবং তিনি যেন তা অনুমোদন করেন। মুজাফফর ও ফরমান ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টারে যান এবং জেনারেল নিয়াজিকে চিঠি দেখান। জেনারেল নিয়াজি জিজ্ঞেস করলেন কোন ক্ষমতাবলে মি. হেনরির কাছে লেখা এ চিঠিটাকে তাকে অনুমোদন দিতে বলা হচ্ছিল? তাকে বলা হয় তিনি কমান্ডার, ইস্টার্ন কমান্ড, এ জন্য তার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। এডমিরাল শরিফ ও জেনারেল জামশেদের সামনে নিয়াজি সম্মতি দিলেন ইউএন এ্যাসিসটেন্ট জেনারেল এর কাছে চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে।

পল মার্ক হেনরীকে গভর্ণর হাউসে আহ্বান করা হলো। গভর্ণর তার হাতে চিঠিটা দেন। জেনারেল ফরমানকে বলা হয় প্রেসিডেন্টকেও যেন চিঠিটা পাঠানো হয়।

প্রেসিডেন্ট খুশি হতে পারলেন না। তিনি তখনও আওয়ামী লীগের ছয় দফা গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। ১০ ডিসেম্বর তিনি গভর্ণরকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠালেন। তিনি বলেন যে তার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে রাজি নন। তিনি বলেন ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

জেনারেল ইয়াহিয়া ড. মালিককে বলেন যেন কয়েকটি প্রস্তাব ইউএন বা জাতিসংঘের প্রতিনিধিকে দেওয়া হয়: (১) তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি; (২) পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা যেন না নেয়া হয়; (৩) আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না।

www.pathagar.com

কোন বিদেশি শক্তি থেকে সামরিক সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে হয়ত ইয়াহিয়া আবার ১১ ডিসেম্বরে ড. মালিককে লেখেন যেন ১০ ডিসেম্বরের চিঠির নির্দেশকে যেন উপেক্ষা করা হয়। তিনি বলেন, কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। তিনি বলেন অন্তত আরো ৩৬ ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, এ খবর যেন জে. নিয়াজি ও জে. ফরমানকে দেয়া হয়।

চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল গুল হাসান ১২ ডিসেম্বরে নিয়াজিকে খবর দেন যে উত্তর দিক থেকে চীনরা এবং দক্ষিণ দিক থেকে মার্কিনরা আসছে। তখন নিয়াজির সাহস বেড়ে যায়। কিন্তু আসল কথা ছিল ভারতীয়রা সব দিক থেকে আসছিল। জেনারেল গুল হাসান এ ভুল তথ্য দিয়েছিলেন কারণ তাকে চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ এ খবরটা দেন।

খুব সাহস দেখিয়ে ১৩ ডিসেম্বরে নিয়াজি সদর দপ্তরে খবর পাঠান। তিনি বলতে চেষ্টা করেন যে তিনি ঢাকাকে ভালো ভাবে প্রস্তুত রেখেছেন এবং লড়াই করবার জন্য তৈরি ছিলেন। আট ঘণ্টা পরে আবার খবর পাঠান যে তিনি শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

সদর দপ্তর ও ইস্টার্ন কমান্ড উভয় ধোকাবাজি করছিল। তারা তাদের দুর্বলতা বা ব্যর্থতা স্বীকার করতে চাচ্ছিল না।

১৩ ডিসেম্বরে ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকায় গভর্মেন্ট হাউজের উপর গুলি বর্ষণ করে। অন্যান্য স্থান বোমা ফেলা হচ্ছিল। ভারতীয়রা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেও লিপ্ত ছিল। ড. মালিক অনুভব করলেন যে পূর্ব পাকিস্তান শিগগিরই বাংলাদেশে পরিণত হবে। গভর্মেন্ট হাউজে থাকলে, তার এবং তার পরিবারের জীবন নিরাপদ থাকবে না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সে দিনই পদত্যাগ করে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে যাওয়া।

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানে তার সেনাবাহিনীর পরাজয় মেনে নিলেন ইয়াহিয়া খান। ১৪ ডিসেম্বর তিনি ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার এবং গভর্ণরকে খবর পাঠান যেন তারা যুদ্ধ বন্ধ করার সব ব্যবস্থা নেন এবং সেনা সদস্যদের ও অনুগত পাকিস্তানিদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে, তার সরকার জাতিসংঘের কাছে আবেদন জানালেন যেন ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ বন্ধ করে।

১৪ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় ইস্টার্ন কমান্ড সদর দপ্তর প্রেসিডেন্টের মেসেজ বা বার্তা পায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এয়ার কমোডর ইনামুল হক, রিয়ার এডমিরাল

www.pathagar.com

মুহম্মদ শরিফ ও মেজর জেনারেল ফরমান। তারা লড়াই বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন। ঢাকায় এ প্রথম সর্বোচ্চ পর্যায়ে আত্মসমর্পণের কথা বলা হচ্ছিল।

জেনারেল নিয়াজি বললেন যে, প্রেসিডেন্টের কাছে তিনি ব্যাখ্যা চাইবেন আসলে আত্মসমর্পণ করবেন কি না। তাকে যোগাযোগ করা হলে, জেনারেল গুল হাসান রেগে বলেন, কিসের আত্মসমর্পণ? প্রেসিডেন্ট যেহেতু খবরটা দিলেন, প্রেসিডেন্টের সাথেই কথা বলেন।"

নিয়াজী প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ইয়াহিয়ার মেসেজ বা বার্তা পাবার ১৮ ঘন্টা পরে তিনি ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কনসোল জেনারেল হার্বার্ট ডি স্পিরাখের কাছে যান ফরমানের সাথে। নিয়াজি তাকে অনুরোধ করেন ভারতীয় চিফ অব স্টাফের কাছে বলবার জন্য যে (১) পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বিরতি হয়; (২) সব সামরিক ও প্যারা মিলিটারি ইউনিট-এর নিরাপত্তা যেন থাকে (৩) সব অবাঙালিরা যেন নিরাপদে থাকে; এবং (৪) অবাঙালিদের বিরুদ্ধে যেন আক্রমণ না করা হয়।

নয়া দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে খবরটি পৌছিয়ে দেবার জন্য স্পিরখি রাজি হলেন কিন্তু এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোন সহায়তা প্রদান করবে না। কেননা তারা পাকিস্তানকে আগে আবেদন জানিয়েছিল সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে। জেনারেল মানিক-এর কাছে ফরমান যে টেলেক্স তৈরি করলেন। তারা 'আত্মসমর্পণ' কথাটি ব্যবহার করল না। তিনি বললেন যে পাকিস্তান সেনা বাহিনী ও প্যারামিলেটারি বাহিনী সব রকম সামরিক তৎপরতা থেকে বিরত থাকবে।

কিন্তু ১৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় জেনারেল অরোরা ম্যাসেস প্রেরণ করেন জেনারেল নিয়াজির কাছে। তিনি বলেন, তারা আত্মসমর্পণ চায়, যুদ্ধ বিরতি নয়। কিন্তু, আবারো বলেন, নিয়াজি তখনও 'যুদ্ধবিরত কথাটি ব্যবহার করছিলেন। ১৫ ডিসেম্বর দুপুর ২:৩০ টায় মানিকশ নয়া দিল্লিস্থ্ মার্কিন দূতাবাস থেকে যুদ্ধ বিরতি (আত্মসমর্পণ নয়) সমন্ধীয় একটি ম্যাসেজ পান। রাত ১১"৩০টার মধ্যে মানিকশ নিয়াজিকে ম্যাসেজ দেন যেন তারা আত্মসমর্পণ করে। তিনি নিয়াজিকে আশ্বাস দেন যে তার সৈন্যদেরকে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

তিনি নিয়াজিকে সাবধান করে দেন যে আত্মসমর্পণ না করলে, সকাল ৯টার মধ্যে ভারতীয় বাহিনী পূর্ণ ক্ষমতায় আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

১৫ ডিসেম্বর রাত ১১:৩০ টায় নিয়াজীর কাছে ম্যাসেজ পৌছে যায়। নিয়াজি এর একটা কপি সদর দপ্তরে প্রেরণ করে। তার আগেও মানিকশ আত্মসমর্পণ সম্বন্ধীয় সংকেত নিয়াজিকে পাঠিয়েছিলেন, ফরমানকেও পাঠিয়েছিলেন। যারা আত্মসমর্পণ করবে, তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। এটি একটি পুরনো মনস্তাত্তিক যুদ্ধের কৌশল।

একদিকে নিয়াজি কি করবেন, তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন, অন্যদিকে টাঙ্গাইল থেকে ভারতীয় সৈন্যরা ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৬ ডিসেম্বর সূর্য্য যখন আকাশে উদয় হয়, ভারতীয় সৈন্যরা তখন ঢাকার দ্বারপ্রান্তে। জিওসি ১০১ কমিউনিকেশন জোন মে. জে. গানদার্ভ নাগরা তাদের সাথে ছিলেন। সকাল ৮টায় জেনারেল নিয়াজি জেনারেল নাগরা থেকে একটি সংক্ষিপ্ত কঠোর ম্যাসেস পান। ম্যাসেজটা জেনারেল নাগরার এডিসি নিয়ে আসেন সাদা পতাকা ধারী জিপ গাড়িতে করে। ম্যাসেজ-এ লেখা ছিল, মাই ডিয়ার আব্দুল্লাহ, আমি মিরপুর সেতু পর্যন্ত এসেছি। খেলা শেষ। লড়াই বন্ধ করে তুমি ভাল করেছ। আমার পরামর্শ হচ্ছে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ কর। আমাকে রিসিভ করার জন্য কাউকে পাঠাও।"

আত্মসমর্পণ করবার ম্যাসেজ টা যখন আসে, তখন এ্যাডমিরাল শরিফ, ফরমান, জামশেদ ও সিদ্দিকী সবাই উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই ম্যাসেজটি পড়লেন। নিস্তব্ধতা ভেঙে ফরমান নিয়াজিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার ক্ষমতা কতখানি? " কোন জবাবাব এল না, ফরমান আবার প্রশ্ন করলেন, কতক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে পারবেন? "আবার নিয়াজি নিশ্চুপ। এবার শরিফ প্রশ্ন করলেন, "কোন ক্ষমতা আছে?" নিয়াজি জামশেদের দিকে তাকালেন। জামশেদ মাথা নাড়িয়ে নেতিবাচক জবাব দিলেন।

নিয়াজি জেনারেল জামশেদকে জেনারেল নাগরার কাছে যেতে বলেন। কয়েক ঘন্টা পরে, দুপুর একটায় জেনারেল অরোরার চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জেকব আত্মসমর্পণের দলিল নিয়ে হেলিকপ্টার যোগে হাজির হন। ১:৩০ টায় জেনারেল অরোরা নিয়াজিকে ম্যাসেজ প্রেরণ করে জিজ্ঞাস করে জেকব আত্মসমর্পণের দলিলসহ পৌছলেন কিনা নিয়াজি বন্ধু সুলভ জবাব পাঠালেন, "অনেক সালাম। তিনি আমাদের সাথে লাঞ্চ করছেন।" মুক্তিবাহিনী দ্বারা নিহত বা আহত হবার আশঙ্কায় জেনারেল নিয়াজি ও তার সাথের অফিসারগণ এ কথায় আপত্তি জানালে "ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করবেন", জেনারেল জেকব জানালেন যে দলিলের কথাগুলোকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা

ছিল না তার। এ ইহুদী জেনারেল বলেন, "দিল্লি থেকে দলিলটা এভাবেই এসেছে। আমরা এর সংশোধন করতে পারবো না; দুপুর ৩টায় জেনারেল নাগরা তার সৈন্যকে নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করেন। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরের মধ্যে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী তাদের তীব্রতম শক্রর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

তার বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী প্রধানগণ সহকারে অরোরা আগরতলায় আসেন। তাদের সাথে ছিল কিছু বেসামরিক কর্মকর্তা ও সংবাদপত্র কর্মী। কোর কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন লে. জে. সাগাত সিং। আগরতলা থেকে হেলিকপ্টার যোগে তারা ঢাকায় বিকাল ৪টায় পৌছান।

জেনারেল নিয়াজি ও একজন স্টাফ অফিসার বিমান বন্দরে তাদের রিসিভ করেন। তারা হাত মিলান এবং ছবি তোলা হয়। জেনারেল নিয়াজির গাড়িতে বসেন জেনারেল অরোরা, মিসেস অরোরা এবং জেনারেল নিয়াজি। অরোরার এপিএস সামনে বসেন। তারা শহরে ঢুকলে চারদিক জনতা গাড়ি দেখে "জানোয়ার/জানোয়ার" চিৎকার করতে থাকে। অরোরা প্রথমে ভাবলেন যে তার প্রতি গালি দেওয়া হচ্ছিল, পরে বুঝলেন নিয়াজিকে গালি দেওয়া হচ্ছিল। তিনি গাড়ি থামিয়ে এডিসিকে দিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা নামিয়ে গাড়িতে ভারতীয় পতাকা লাগালেন।

গাড়ি সোজা তাদের নিয়ে গেল রমনা রেসকোর্সে যায় (যেখানে শেখ মুজিবর রহমান তার বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন) ২০ থেকে ২৫ জন ভারতীয় প্যারাট্রুপার সালাম দিল যখন অরোরা আর নিয়াজি আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি স্থানে আসলেন। এ্যাডমিরাল কৃষ্ণান, এয়ার চিফ মার্শাল দাবান, এবং লে. জে. সাগাত সিং পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সামনে লে. জে. আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। সময় তখন ছিল বিকাল ৪:৩১ মিনিট, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। শেষ বারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের দিগন্তে সূর্যাস্ত হলো; পরের দিন সূর্যদ্বয় হলো স্বাধীন বাংলাদেশের।

আত্মসমর্পণের রীতি অনুযায়ী নিয়াজি তার রিভলভার ও পদবীর ব্যাজসমূহ অরোরার কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি জাতীয় মর্যাদাকে আরো ক্ষুণ্ন করলেন যখন অরোরার কাছে তার আত্মসমর্পণের ছবি চাইলেন এবং পরবর্তীতে তাতে নিজ অটোগ্রাফ দিয়ে জেনারেল অরোরাকে দেন।

নিয়াজির অটোগ্রাফ করা আত্মসমর্পণের ছবি এবং তার সাক্ষরিত আত্মসমর্পণের দলিল একটি সুন্দর কাঁচের বাক্সে এখনও নয়া দিল্লীর ১০ ফিরোজ শাহ রোডে জেনারেল অরোরার ডাইনিং রুমে শোভা পাচ্ছে।

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখবার জন্য জেনারেল অরোরা তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এটি সামরিক রীতি নয়, তবে অরোরাকে দোষারোপ করা যায় না, এমন গৌরবময় মুহূর্ত তার জীবন সাথীর সাথে উপভোগ করতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর' কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন না। বাংলাদেশ হাই কমান্ডের চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকারও ছিলেন না। যে দেশের জন্য তারা সংগ্রাম করলেন, সে দেশের এ তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে তারা উপস্থিত ছিলেন না।

আহত ও নিহত

যুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে, পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল মিলিটারি ও প্যারা-মিলিটারির ১,৮৩৩ অফিসার, ৫০,২৩২ জেসিও এবং অন্যান্য পদবির। এদের মধ্যে ৩৫৪ অফিসার, ১৯২ জেসিও এবং ৫,২৩০ অন্য পদবী প্রাণ হারালেন, (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে Ijma প্রতিরক্ষায় ২৩,০০০ জাপানি সৈন্যের মধ্যে মাত্র ২৬০কে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারত ২৬,০০০ পোশাকধারি এবং ৬৫,০০০ সিভিলিয়ানকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতের প্রিসনের অব ওয়ার ক্যাম্প - এ ১৯৭৪ পর্যন্ত আটক রাখে। ব্রি. জাগদেব সিং অনুযায়ী এ যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ১,৫০০ মারা যান এবং ৪,২০০ আহত হন।

পাকিস্তানী, ভারতীয় মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ লোক মিলে আরো অনেক আহত ও নিহত হয়। বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী এ ক্রাজুয়ালিটিস-এর সংখ্যা কয়েক লাখ থেকে ১০০ লাখেরও বেশি হতে পারে।

খোলা হল দ্বিতীয় ফ্রন্ট

রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থানরত সামরিক নেতৃত্বের জন্য দুইটি বিকল্প ছিল : (১) পশ্চিম পাকিস্তানে ডিফেনসিভ (রক্ষার্থক) ভূমিকায় উত্তীর্ণ হওয়া; ব্যাপারটা জাতিসংঘে উপস্থাপন করা এবং তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির জন্য চেষ্টা করা; নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয়া। (বিজয় এত কাছে থাকতে ভারত অবশ্যই যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হতো না। এত বড় সুযোগ তারা হাতচাড়া করবে না। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করবরার জন্য রাশিয়া পাকিস্তানকে

www.pathagar.com

শান্তি দিতে প্রস্তুত ছিল। জাতিসংঘে যুদ্ধ বিরতির কথা উপস্থান হলে, রাশিয়া তা ভেটো করবেই।

দ্বিতীয় বিকল্প ছিল পাক-ভারত সীমান্তে আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণ করা। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে মোকাবেলা করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের এ পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানে সৈন্যরা নিশ্চুপ থাকলে, ইতিহাস সামরিক নেতৃবৃন্দকে ক্ষমা করবে না। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে হামলার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ। যেখানেই হামলা হোক না কেন, পাকিস্তান সরকার নিশ্চুপ থাকতে পারে না। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করলে, পূর্ব পাকিস্তানে চাপ কমতে পারে। আর সংঘর্ষ বেড়ে গেলে, জাতিসংঘ বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসবে।

কিছু পাকিস্তানি জেনারেলদের ভুল ধারণা ছিল সেকেন্ড ফ্রন্ট -এ যুদ্ধ আরম্ভ করলে ভারতের সেনাবাহিনীকে গুরুতর আঘাত করা যেতে পারে। এতে তারা যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হতে বাধ্য হবে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজবে। তখনকার তথ্য সচিব রোদাদ খান বললেন যে বেসামরিক কর্মকর্তাগণও পশ্চিম থিয়েটারে আক্রমণকরাকে সমর্থন করেন কারণ, তারা ভেবেছিলেন যে তারা ভারত ভূ-খণ্ডের অনেক খানি দখলে এনে ভারতকে তার ন্যাক্কারজনক তৎপরতা বন্ধ করতে বাধ্য করবে।

ওদিকে, মুক্তিবাহিনীকে সাথে নিয়ে ভারত বাহিনী গোপন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তখন যুদ্ধ ঘোষণা হয়নি আর ভারত বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে নামেনি। তারা সীমান্তেই অবস্থান করে, তারা জানে যে পাকিস্তানের বিদেশি মিত্রগণ আপত্তি তুলবে তারা সরাসরি আক্রমণে গেলে বা ঢাকাকে সরাসরি হুমকি করলে। ইস্টার্ন কমান্ড সফতার সহিত মুক্তিবাহিনীকে আট মাস ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ২১ নভেম্বরে ভারত সরাসরি আক্রমণ করলেও, তারা মাত্র সীমান্তেরি নিকটবর্তী কিছু স্থান দখল করতে পারলো। এদিকে পাকিস্তান পশ্চিম থিয়াটারে আক্রমণ আরম্ভ করলে, ভারত দেখতে পারবে যে যুদ্ধের উদ্যোগ পাকিস্তানই নিয়েছিল। পাকিস্তানের তখন প্রমাণ করতে হবে যে আসলে তা নয়।

চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দেয় সংঘাত বৃদ্ধি না করবার ব্যাপারে।

সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলে দেয়া তাই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। সদর দপ্তরে এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ৩০ নভেম্বরে জেনারেল আব্দুল হামিদ,

এয়ার মার্শাল রহিম এবং মেজর জেনারেল গুল হাসান বৈঠকে বসেন। নৌবাহিনী প্রধান বাইরে থাকতে তিনি উপস্থিত থাকতে পারলেন না। পরের দিন তাকে সাব বোঝানো হয়। কিন্তু কোন জয়েন্ট অপজিশন-এর পরিকল্পনা ছিল না। কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ডকে এ সম্বন্ধে অবহিত করা হয়নি।

নৌবাহিনীর নজর ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। কিন্তু অন্য দুই বাহিনীর সাথে কোন সমন্বয় ছিল না।

পাকিস্তান নৌবাহিনীর অফিসারগণ দাবি করেন যে যুদ্ধের প্রথম দিনেই তারা সাবমেরিন দ্বারা চার-পাঁচটা ভারতীয় জাহাজ ডুবাতে পারতো যা ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য অনেক ক্ষতিকর হতো।

কিছু সমালোচক বলেন, ২১ নভেম্বরেই পাকিস্তানের উচিত ছিল সেকেন্ড ফ্রন্ট খুলে দেয়া। যেদিন ভারত সরাসরি মুক্তিবাহিনীর সমর্থনে এগিয়ে আসলো। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভুল ছিল। ইস্টার্ন কমান্ড একমত পোষণ করেনি। তার মতে পুরোদমে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে, এ সুযোগে বারত পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক আক্রমণ করবে। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ নিশ্চয় সেনাবাহিনীকে ক্ষমা করতো না যদি ঢাকা দখলের সময়ে তারা পশ্চিম প্রদেশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতো।

মে. জে. ডি কে পালিত দাবি করেন যে ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করতে চায়নি। মাত্র ১৬ থেকে ২৫ কি. মি. ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিল। তিনি দাবি করেন ৩ ডিসেম্বর যখন পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করে, তখন মাত্র ভারত সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। তিনি তাদের তৎপরতা দেখলে তা মনে হয় না। এপ্রিলেই ভারত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করা। ৩ ডিসেম্বরে ভারত মাত্র ১৬ থেকে ২৫ কিলোমিটারের চেয়ে অনেক বেশি ভেতরে প্রবেশ করে ছিল।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়
নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অভিযান

নৌবাহিনীর অভিযান

ভৌগলিক দিক দিয়ে ভারতের সুবিধা ছিল দেশটির আকৃতি, যার জন্য পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে নৌ চলাচলে বাঁধা দেয়া খুব কঠিন ছিল না। প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে নৌ চলাচল বাঁধাপ্রাপ্ত হবে। এ জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে নৌবাহিনীর উপস্থিতি দরকার ছিল যাতে মিত্র দেশসমূহের জন্য নৌপথ খোলা রাখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত, পাকিস্তানে নৌবাহিনী তত বড় ছিল না যে তা দুই প্রদেশেই দুইটি নৌ বহর রাখতে সক্ষম হবে। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল- এ কথা বিশ্বাস করে কোন নৌ জাহাজ পূর্ব প্রদেশে রাখা হয়নি।

পাকিস্তান ও ভারত নৌবাহিনীর আপেক্ষিক ক্ষমতা (ডিসেম্বর ১৯৭১)

ইউনিট	পাকিস্তান নৌবাহিনী	ভারত নৌবাহিনী
এয়ারক্রাফট কেরিয়ার	-	১
ক্রুজার	১	২
ডেস্ট্রোয়ারস	৫	৩
ফ্রিগেট এ/এস	২	১৪
ট্যাঙ্কার	১	২
মিসাইল বোটস ওএসএ ক্লাশ	-	৬
সাবমেরিন	৪	৪
মিডগেট সাবমেরিন	৬	-
মিনি সুইপারস	৮	৮
রিপিল শিপ	-	-
ল্যান্ডিং শিপ	-	২

www.pathagar.com

ইস্টার্ন থিয়েটার

পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনী বলতে তেমন কিছুই ছিল না। সেখানে ছিল চারটি গানবোট, যার বিপরীতে ছিলো ভারতের একটি এয়ারক্রাফট কেরিয়ার, ডেস্ট্রিয়ারস এবং সাবমেরিন। চট্টগ্রাম বন্দরে যে জাহাজ পিএনএস বর্ডারে থাকতো, ১৯৭১ সালের তা ৩রা আগস্ট করাচি চলে যায়।

৯ জুন ১৯৭১ তারিখে রিয়ার এডমিরাল মুহম্মদ শরীফ পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার সদর দপ্তর ছিল ঢাকায়। আর নৌবাহিনীতে ছিল আটটি চায়নিস কোস্টারস, চারটি গানবোট এবং দুইটি ল্যান্ডিং ক্রাফট. অবশেষে, স্থানীয় সহায়তা নিয়ে তিনি এর সাথে যোগ দিলো ২৪টি বোট এবং ২০ কোস্টার। এ নিয়ে তাকে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হচ্ছিল।

রিয়ার এডমিরেল মুহম্মদ শরীফ ছিলেন ফ্ল্যাগ অফিসার কমান্ডিং ইস্ট পাকিস্তান (এফওসিইপি)। তার বাহিনীর দায়িত্ব ছিল: সমুদ্র ও নদী পথ টহল দেয়া শত্রু থেকে রক্ষা করবার জন্য; জলসীমানায় সেনাবাহিনীকে সাহায্য দেয়া এবং নেভাল গানফায়ার করা প্রয়োজনে সৈন্য ও মালামাল বহন করা; নৌবাহিনী অবকাঠামো ও বন্দর অবকাঠামো প্রতিরক্ষা দান; চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর চালু রাখা; সকল নৌ পরিবহন চলাচলকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ও সমুদ্র সীমানা সমস্যা সমন্ধে ইস্টার্ন কমান্ড ও মার্শাল 'ল সদর দপ্তরকে অভিহিত করা। অ্যাডমিরাল শরীফ কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে এসব দায়িত্ব তাদের সীমিত ক্ষমতা নিয়ে পালন করা সম্ভব নয়।

জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত, এফওসিইপি বেশির ভাগ নদী পথে টহল দিতে থাকে এবং মুক্তিবাহিনী দ্বারা পাতানো মাইন সরে ফেলতে থাকে। নদী পথে সৈন্য, অস্ত্র ও অন্যান্য মাল পরিবহনে তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ভারত, হংকং এবং সিঙ্গাপুর থেকে অস্ত্র চোরাচালানে তারা বাঁধা দেয়। জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এফওসিইপি তাদের গানবোট দিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালিয়ে যায়।

রাইফেল, অটোমেটিক অস্ত্র, মর্টার, স্টেনগান ও গ্রেনেড দ্বারা মুক্তিবাহিনী নদী, খাল, বিল থেকে নৌ বাহিনীর উপর হামলা করতে থাকে। নদী পথ যে চলাচলের জন্য নিরাপদ থাকে, নৌবাহিনী ১ জুন থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ৮০টি নৌ অভিযান পরিচালনা করে। এ অভিযানে তারা মুক্তি বাহিনীর স্ট্রংহোল্ডগুলো ধ্বংস করে, গ্রামে লুটপাট বন্ধ করে, নৌকায় দুষ্কৃতকারীদের আটকানো; মুক্তিবাহিনীকে বিভিন্ন স্থান থেকে অপসারণ ও আন্ডার ওয়াটার মাইন অপসারণ করে।

www.pathagar.com

যখন ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, অ্যাডমিরাল শরীফ তার গানবোট পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব সেক্টরে মোতায়েন করে। কিন্তু যুদ্ধ চলতে থাকলে, ভারতীয় বিমানবাহিনী পাকিস্তান নৌবাহিনীর অনেক ক্ষতিসাধন করে। ভারতীয় পাইপলটদের জন্য এটি বেশ সহজ ছিল।

৩৯ (অ্যাড হক) ডিভিশনকে ৮/৯ ডিসেম্বরে যখন প্রত্যাহার করে ঢাকায় আনা হয়, অ্যাডমিরাল শরীফ হতাশ হন। তিনি মনে করেন যে তাদের সাহসী প্রচেষ্টা এক সপ্তাহের বেশি টিকতে পারবে না এবং ঠিক ৭ দিন পর ১৯ ডিসেম্বরে যুদ্ধ শেষ হয়।

আত্মসমর্পণের পর পর অ্যাডমিরাল শরীফ তার একটা গানবোটকে চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। পিএনএস রাজশাহী নামক গানবোটটি মাইন ফিল্ডের ভেতর দিয়ে ভারত নৌবাহিনীর চোখের আড়ালে চলে। ৭ জন নৌবাহিনী অফিসার, দুই বিমানবাহিনী অফিসার, একজন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন নাবিক সহকারে পিএনএস রাজশাহী পেনাং মালয়েশিয়া নিরাপদে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

এয়ার অপারেশন

১ এপ্রিল ১৯৭১ এয়ার কমোডর ইনামুল হক ঢাকায় পৌঁছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডিং অফিসারের পদ গ্রহণ করেন, তিনি ঢাকার বেস কমান্ডারও ছিলেন। তিনি এয়ার কমডোর মাসুদ (মিত্তি)-র স্থানে আসেন। মাসুদকে সরানো হয়, কারণ তিনি বলেছিলেন যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলে পূর্ব পাকিস্তানে কোন সামরিক পদক্ষেপ নেয়া উচিত না। তিনি বলেন বিমান বাহিনীর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ভারতকে কিছুতেই মোকাবেলা করা যাবে না । যদিও এয়ার মার্শাল রহিম খান, তখন সি-ইন-সি, এ যুক্তির সাথে একমত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহকে আর পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না।

ইনামের হাতে তখন ছিল ফোর্টিনথ এয়ার ফোর্স স্ক্রোয়াড্রন- যার ছিল ১২টি এফএইটসিক্স ই জঙ্গি বিমান। ঢাকার বিমান বন্দর ছাড়া তার বিমানের জন্য অন্য কোন বিকল্প ছিল না। কুর্মিটোলা বিমান বন্দর প্রস্তুত ছিল না। ১২টি এয়ারক্রাফট-এর মধ্যে যুদ্ধের আগেই একটি নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের চারপাশে ভারত বিমান বাহিনীর ১১টি স্কোয়াড্রন মোতায়েন ছিল (১৭৬ এয়ারক্রাফট/বিমান)। আর বঙ্গোপসাগরে ছিল তাদের এয়ারক্রাফট কেরিয়ার পিএনএস ভিক্রান্ত। পাকিস্তান

www.pathagar.com

বিমান বাহিনীর ঘাঁটিতে ৪৫% ছিল বাঙালি- যার মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহ করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে যারা ছিল, তাদের উপর তাই প্রচণ্ড চাপ আসলো। তবে দুই বাঙালি অফিসার, চট্টগ্রামের স্কোয়াড্রন লিডার রাব্বানী এবং ফ্লাইট লে. আতাউর রহমান স্কোয়াড্রনের প্রতি অনুগত রাইলেন। ২১ নভেম্বরে ভারত বাহিনী পিএএফ -এর দুটি এফ-৮৬ গুলি করে আকাশে ধ্বংস করে। পাইলটরা বেইল আউট করলেও, মাটিতে নামার পর বাঙালিরা তাদেরকে ধরে ভারতীয়দের হাতে তুলে দেয়।

৪ ডিসেম্বরে ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএফএ) পূর্ণ আক্রমণে নেমে যায়। ঢাকা ও কুরমিটোলা বিমান বন্দরে শত্রুপক্ষ ২১ বার আক্রমণ করে। আকাশ যুদ্ধে পিএএফ ৯টি ভারত বিমানকে ধ্বংস করে এবং নিজেদের ৩টি হারায়। রাতেও আক্রমণ চলতে থাকে। দুই দিন ধরে শত্রুপক্ষ বিমান বন্দরে আক্রমণ চালাতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে পড়ে। যেহেতু বিমানগুলোকে আর উড়ানো যাচ্ছিল না, তাই কিছু পিআইএ কর্মকর্তাসহ ৯ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি পাইলটগণকে বার্মায় নিয়ে যাওয়া হয়।

৪ থেকে ৬ ডিসেম্বরে পিএএফ ২৫টি sortie fly করে, যেখানে ভারতের ছিল দুই হাজারটি sortie, পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয়রা ২৮টি এয়ার ক্রাফট হারায়। পিএএফ হারায় ৫টি।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

জাতিসংঘে

সামরিক তৎপরতা শুরু হবার পর, এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা তথাকথিত নির্যাতন শুরু হবার পর, বহির্বিশ্ব পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়। এ সুযোগে ভারত বিদ্রোহ দমনকে গণহত্যা বলে আখ্যায়িত করে। তাদের ভূ-খণ্ডে বহুসংখ্যক শরণার্থীর উপস্থিতিকে তারা এ অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে।

মে ১৯৭১-এ জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইসিওএসওসি সভায় এ তথাকথিত গণহত্যা প্রথম উপস্থাপিত হয়। জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব আগা শাহী এবং বেগম ভিকারুন নিসা নূনের পক্ষে মিলিটারি ক্রাকডাউনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে, কিন্তু তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ষড়যন্ত্র কিছুটা প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

যদিও এপ্রিল থেকে ভারত তার নিজ ভূ-খন্ডে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করছিল, পাকিস্তান এ বিষয়টি জাতিসংঘে উপস্থাপন করেনি। বহুসংখ্যক শরণার্থী যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে অবস্থান করছিল, তা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে জনাব আগা শাহীকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে শরণার্থী বিষয়টি উপস্থাপন না হয়। পাকিস্তান এ বিষয়টি যতক্ষণ সম্ভব ছিল, অস্বীকার করতেই থাকলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব ছিল না।

আগা শাহী বলেন, তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবকে অনুরোধ করেছিলেন যে, অভিযোগ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত যেন ভারতকে মানবিক সাহায্য না দেওয়া হয়, কিন্তু তার অনুরোধ অগ্রাহ্য হয়, জাতিসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি ইসমত টি খেতানী পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেন নিজ চোখে পরিস্থিতি দেখবার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণ চাহিদা সম্পর্কে তিনি প্রতিবেদন পেশ করেন এবং সুপারিশ করেন যেন ৪৫০ হাজার টন খাদ্য ১৫ উপকূলীয় নৌযান, ২৫ নৌকা এবং ১ হাজার ট্রাক প্রেরণ করা হয়। যার আর্থিক মূল্য ২৮ মিলিয়ন ডলার। ততদিনে ভারত আন্তর্জাতিক মহলের কাছে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য।

www.pathagar.com

মহাসচিব উথান্ট আগা শাহীকে প্রশ্ন করলেন যে ভারতকে মানবিক কারণে সাহায্য দেয়া হলে, পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া কি হবে? ইসলামাবাদ প্রস্তাবে রাজী হলো, শুধুমাত্র মানবিক কারণে সাহায্য দেয়া হলো। শাহীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন জাতিসংঘ গণহত্যা সম্বন্ধে ভারতীয় প্রচারণাকে বিবেচনায় না আনে।

৩ জুলাই জেনেভায় ইসিওএসওসি -এর আর আরেক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয় উপস্থাপন করা হয়। আগা শাহী স্বীকার করলেন যে ভারতের উপর শরণার্থীরা নিশ্চয় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সুপারিশ করেন জাতিসংঘ যেন পরিস্থিতির আসল রূপ নিরূপণ করে । ইউএনএইচসিআর -এর প্রতিনিধি হিসেবে জনকেলি ১৯ জুলাই ঢাকায় আসেন। তাকে ভারতে শরণার্থী দেখার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি। পাকিস্তানের, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসা কর্মকর্তা হোসেন আলী কলকাতায় বাংলাদেশ মিশনে ছিলেন। তিনি জাতিসংঘের তৎপরতাকে ঘৃণার চোখে দেখেন এবং বলেন জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। সেখানে জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে নিয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তান রাজি হলে, ভারত এ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। নভেম্বর ২২ তারিখে যখন খবর বের হয় যে ভারতীয় সৈন্য সীমান্ত পার হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে, তুর্কীসহ কিছু বন্ধু দেশ আগা শাহীকে উপদেশ দেয় যেন ভারতের আগ্রাসনের বিষয়টি জাতিসংঘে উপস্থাপন করা হয়। আগা শাহী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি প্রেরণ করে বলেন যে ভারতের আক্রমণের কারণে এখন আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের প্রতি যথেষ্ঠ সহানুভূতি জেগে উঠে। ইসলামাবাদ থেকে নির্দেশ আসলো, 'সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপনি নিরাপত্তা পরিষদে যাবেন না।' অস্থায়ী উপপ্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো একই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছিলেন, 'তাড়াহুড়ো করে নিরাপত্তা পরিষদে যাওয়া উচিত নয়'।

সরকার হয়ত চায়নি যে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে জাতিসংঘে আলোচনা হোক, কারণ এ সুযোগে ভারত তথাকথিত গণহত্যার বিষয়টি তুলে ধরবে এবং শরণার্থী বিষয়টিকে সামনে এনে বিশ্ব দরবারের সহানুভূতি আদায় করবে। নিরাপত্তা পরিষদে এ বিষয়টি উপস্থাপন না করে ভুট্টোর কি লাভ হয়েছিল, তা বোঝা মুশকিল। তিনি কি চেয়েছিলেন দেশ ভেঙে ভাগ হয়ে যাক, যাতে তিনি অবশিষ্ট অংশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন? তিনি কি সেনাবাহিনীকে অপমান করতে চেয়েছিলেন- যাতে তার উপরে তারা কর্তৃত্ব স্থাপন না করতে পারে?

www.pathagar.com

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার মৈত্রী চুক্তির তাৎপর্য সম্বন্ধে পাকিস্তান জাতিসংঘ সদস্যদের অবহিত করে। আগা শাহী তার বক্তব্যে বলেন যে, ভারত-সোভিয়েত চুক্তিটি যুদ্ধে বাঁধা না দিয়ে যুদ্ধকে প্ররোচিত করবে।

পরিহাসের বিষয়, আক্রমণকারী প্রথমে ডিসেম্বর ৩ তারিখে সরকারিভাবে অভিযোগ পেশ করে। তারা বলে যে, পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে। তারা ইউএন বা জাতিসংঘের মহাসচিবকে এ অভিযোগ জানায়। নয়া দিল্লী কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি পেশ করেনি। ৪ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি সভা আহ্বান করে আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্দি, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র।

নিরাপত্তা পরিষদ যখন পাক-ভারত যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় বসে পোলিশ প্রতিনিধি পরামর্শ দেন যেন বাংলাদেশের একজন প্রতিনিধিকে পরিষদে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। এ প্রস্তাবে চীনের প্রতিনিধি হুয়াং হা আপত্তি জানিয়ে বলেন, যেকোন বিদ্রোহী সংগঠনকে এরূপ সুযোগ দেয়ার অর্থ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। আগা শাহী ভারতের আক্রমণ সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলেন, যদি তথাকথিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে নিরাপত্তা পরিষদে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়। তাহলে নিরাপত্তা পরিষদকে এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতা করবার ব্যাপারে পাকিস্তান পুন-র্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে। ব্যাপারটা বাদ দেয়া হলো।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের মুখপাত্র সমর সেন বলেন যে, পাল্টা আক্রমণ হিসেবে ভারত পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল। তার মতে, ভারত বাংলাদেশের জনগণকে অত্যাচার থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছিল এবং এ প্রচেষ্টাকে নিষেধ করা হলে, ভারত তা মানবে না।

জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি জর্জ বুশ ৪ ডিসেম্বর আবেদন পেশ করেন এ মর্মে : (১) ভারত ও পাকিস্তান যেন সব ধরনের সংঘর্ষ বন্ধ করে (২) যার যার সৈন্যকে যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়- একে অপরের দেশ থেকে (৩) যুদ্ধবিরতি নিশ্চিৎ করবার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষককে ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তে মোতায়েন করা (৪) ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সহযোগিতা নিশ্চিৎ করা শরণার্থী ফেরত যাবার ব্যাপারে (৫) সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা যাতে এ অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট না হয় (৬) অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিৎ করার জন্য মহাসচিবের প্রস্তাব মেনে চলা।

www.pathagar.com

সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াকুব মালিক বলেন যে এটি একটি একতরফা প্রস্তাব কারণ সংঘর্ষের মূলে ছিল পূর্ব বাংলার উপর সামরিক দমন। তাদের খসড়া প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানায় যেন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী সব ধরনের সহিংসতা বন্ধ করে। আর্জেন্টিনা, বুরুন্দি, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন ও সোমালিয়ার খসড়া প্রস্তাব অনেকটা মার্কিনের প্রস্তাবের মতই ছিল। বেলজিয়াম, ইতালি ও জাপানের প্রস্তাবও মার্কিন প্রস্তাবের সাথে সাদৃশ্য ছিল। জনাব হুয়াং হুয়া নির্দেশ দেন যেন তাৎক্ষণিক পাকিস্তান থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান যেন সব বৈরীতার অবসান ঘটায়। তিনি সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান ভারতের আগ্রাসন থেকে যেন পাকিস্তানের জনগণকে সহায়তা দেয়া হয়।

আরো তিনটি খসড়া প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হয়। ৪ ডিসেম্বরে পেশকৃত সোভিয়েত প্রস্তাবে পাকিস্তানকে আহ্বান জানানো হয় সব ধরনের বৈরীতা বন্ধ করবার জন্য কারণ, তাদের মতে, পাকিস্তানের কারণে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছিল। তারা ভারতকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

৫ নভেম্বরে চীন তাদের প্রস্তাব পেশ করে। তারা বলেন যে ভারত পাকিস্তানের উপরে বৃহৎ পরিসরে হামলা চালায়। তারা ভারতের প্রতি আহ্বান জানায় সৈন্য প্রত্যাহার করবার জন্য। তারা ভারত ও পাকিস্তানকে সব বৈরীতা বন্ধ করবার জন্য আহ্বান জানায়। জাতিসংঘের সদস্যদের প্রতি চীন আহ্বান জানায় ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জনগণের পাশে দাঁড়াবার জন্য।

আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন ও সোমালিয় তৃতীয় খসড়া প্রস্তাব পেশ করে ৫ ডিসেম্বরে। তারা তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার এবং শরণার্থীর ফেরতের জন্য ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানান।

৬ ডিসেম্বর সোভিয়েতরা একটি খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করে, যার সমর্থনে ছিল বেলজিয়াম, ইতালী, জাপান, সিয়েরালিওন ও তিউনিসিয়া। প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানানো হয়। তারা প্রস্তাবের সংশোধনীতে বলা হয়, পাকিস্তান যেন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাধানে উত্তীর্ণ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়, যে আকাঙ্ক্ষা ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়।

৬ ডিসেম্বরে ফ্রান্স একটি প্রস্তাব পেশ করে। তারা তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বিরতি, দুই পক্ষের বৈরীতা বন্ধ, শরণার্থী ফেরতের জন্য পরিবেশ তৈরি করা- এ নিয়ে আহ্বান

www.pathagar.com

জানায়, তবে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের আপত্তির মুখে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ছাড়া সবগুলোই খসড়া ছিল মাত্র। তাই ওগুলোকে ভোটের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়া হয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এর ভেটো দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনে তা পেশ করবার জন্য সিদ্ধান্ত নিল। ৬ ডিসেম্বরে এ প্রস্তাব নিয়ে ভোট হয়। পনের দেশের মধ্যে এগারটি দেশ মার্কিন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করে। এ দেশগুলো ছিল আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্দি, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোলান্ড ও রাশিয়া ভোট দানে বিরত থাকে।

৭ ডিসেম্বরে ১৫টি দেশ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাব পেশ করে। এ দেশসমূহের মধ্যে ছিল আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, ক্যামারুন, ঘানা, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, স্পেন, সুদান এবং তিউনিসিয়া। তারা আহ্বান জানায় যেন ভারত ও পাকিস্তান তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বিরতিতে উপনীত হয়, সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ইয়াকুব মালিক তার দেশের অবস্থান পুনরায় ব্যক্ত করে বলেন, যুদ্ধ বিরতির সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দান করতে হবে। হুয়াং হুয়া ভারতের আগ্রাসনের নিন্দা জানান এবং ভারতকে সমর্থন করবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিও নিন্দা জানান। বুশ স্বীকার করেন যে পাকিস্তানের এ্যাকশন-এর কারণে সংকটের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তিনি পরিস্থিতির অবনতির জন্য ভারতকে দায়ী করেন।

যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি মি. ক্রো কোন মন্তব্য করেননি। তিনি মনে করেন যে নিরাপত্তা পরিষদের ভেতরে ও বাইরে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে। ফ্রান্সের মি. মরিজেট মনে করেন, একমাত্র বাস্তব সমাধান ছিল বৈরিতা বন্ধ করা, কোন রকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া। ১০৪:১১ ভোট অনুপাতে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১০ দেশ ভোট দান থেকে বিরত থাকে। সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব শুধুমাত্র সুপারিশ। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব পালন করা যেমন বাঞ্ছনীয়, সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের বেলায় তা নয়। যশোর পতনের খবর যখন

www.pathagar.com

জাতিসংঘ সদস্যদের কানে আসলো, তারা তখন বাস্তবতা স্বীকার করতে শুরু করে। তখন ভারতের সৈন্য প্রত্যাহারের থেকে বেশি তারা যুদ্ধবিরতির উপর জোর দিতে থাকে।

৮ ডিসেম্বর ভুট্টো, যিনি ততদিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন, বন থেকে আগা শাহীর সাথে কথা বলেন, তিনি আগা শাহীকে জানিয়ে দেন যে তখন থেকে জাতিসংঘে তিনিই পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলকে নেতৃত্ব দিবেন। ভুট্টো ও শাহীর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। কারণ, ভুট্টো মনে করতেন যে শাহী আইয়ুব খানকে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। শাহী যখন ভুট্টোকে পরিস্থিতি বুঝাতে চেষ্টা করেন, ভুট্টো কঠিন স্বরে জবাব দিলেন, 'দায়িত্ব এখন আমার কাধে, আমি পরিস্থিতি মোকাবেলা করবো'। মোস্ট ওয়েলকাম বলে জবাব দিলেন শাহী।

৯ ডিসেম্বর আগা শাহী জাতিসংঘের মহাসচিবকে জানিয়ে দেন সাধারণ অধিবেশনের আহ্বান অনুযায়ী সব বৈরিতা বন্ধে পাকিস্তান রাজি। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে জাতিসংঘ সব সৈন্য প্রত্যাহার নিশ্চিত করবে এবং সীমান্তের উভয় পাশে পর্যবেক্ষক স্থাপন করবে। জাতিসংঘে বক্তৃতা দানকালে আগা শাহী বলেন, 'যদিও জাতিসংঘে ৭ ডিসেম্বরে গৃহীত প্রস্তাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন উল্লেখ করা হয় নাই, তারপরও পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতিতে এবং সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হয়েছে।'

১০ ডিসেম্বর ভোরে জাতিসংঘের একজন কর্মকর্তা আগা শাহীকে ঘুম থেকে উঠালেন। জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে লেখা ঢাকায় অবস্থিত জাতিসংঘের প্রতিনিধি পল মার্ক হেনরির চিঠি তিনি পড়ে শুনান। চিঠিতে মে. জে. রাও ফরমান আলীরও স্বাক্ষর ছিল।

শাহী জাতিসংঘের কর্মকর্তাকে বলেন, চিঠিটা জাতিসংঘের মহাসচিবকে দেওয়া হলেও এটি যেন বিতরণ না করা হয় যতক্ষণ তিনি ইসলামাবাদ থেকে চিঠিটার সততা নিশ্চিত না হয়। আগাশাহী বলেন, 'যুদ্ধ বিরতি চাওয়ার কোন ক্ষমতা নেই জেনারেল ফরমানের,' তিনি ৪৮ ঘণ্টা সময় চান, এর মধ্যে তিনি সরকারি ভাষ্য পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সংকটময় মুহূর্তে ইসলামাবাদ ও নিউইয়র্কের মাঝে কোন সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। সত্যি, করুণ পরিস্থিতি!

১০ ডিসেম্বর ভুট্টো নিউইয়র্কে আসেন। এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে যাবার সময় তাকে ফরমানের কথা বলা হয়, তিনি বিস্মিত হন। তিনি বলেন, 'আমার সাথে

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে'। চিঠির কথা নিশ্চিৎ হবার আগ পর্যন্ত ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদের সভা বিলম্বিত করেন।

১১ ডিসেম্বরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উত্তর আসে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মেসেজকে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। আগা শাহী ম্যাসেজ বাতিল করেন। আগা শাহী একটি কঠিন অবস্থায় পড়েন; কি করবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

১২ ডিসেম্বর জজ বুশ ও হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে বৈঠক ঠিক হয়। কিসিঞ্জার ভুট্টো ও আগা শাহীকে বলেন যে তার কাছে খবর এসেছে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানকেও ধ্বংস করার জন্য তাদের সামরিক শক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম স্থানান্তর করবে। তিনি বলেন যে, এখন যে কোন প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হলে, তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেবে। তারা ভারতের পরিকল্পনাকে সফল করতে চাচ্ছিল। তিনি আভাষ দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ভারতকে বাঁধা দিবে। পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জেনারেল এন এ এম রাজাকে বলেন বঙ্গপোসাগরে যেয়ে যুদ্ধ বিরতির লক্ষ্যে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করবার জন্য পেন্টাগণ ইউএসএস ইন্টারপ্রাইজ কে নির্দেশ দিয়েছিল।

একই দিনে (১২ ডিসেম্বর) জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে চিঠি প্রেরণ করেন, তিনি বলেন যে যদিও যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারে জাতিসংঘের প্রস্তাবকে পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল, ভারত তা এখন করেনি। মার্কিন সরকার পরিষদের সভাপতিকে নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানায়।

১২ ডিসেম্বর ভারতও নিরাপত্তা পরিষদের কাছে চিঠি প্রেরণ করে। চিঠিতে ভারত সংকট সৃষ্টি ও যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য পাকিস্তানকে দায়ি করে। চিঠিতে বলা হয় ভারত যুদ্ধ বিরতি বিবেচনায় আনবে যদি দ্বন্দ্বের মূল কারণ সমাধান হয় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিরাপত্তা পরিষদ আবার বৈঠকে বসে। বুশ বলেন, যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারে ভারতকে তখনই রাজি হতে হবে। তিনি ভারতের প্রতি আহ্বান জানান যেন তারা পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডকে দখল না করে এবং কাশ্মীরের বিষয়ে কোন পরিবর্তন না আনে। ১৩ ডিসেম্বরে তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন, যা অনেকটা পূর্ববর্তী খসড়ার সামিল।

www.pathagar.com

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানকে আবার দোষারোপ করে পাকিস্তান আবার সংঘাতের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করছিল। তিনি পাকিস্তানকে দোষারোপ করেন ভারতের উপরে সর্বাত্মক আক্রমণ করবার জন্য। তিনি বলেন যে ভারত নয়, জেনারেল ইয়াহিয়া ভারতের উপর যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তিনি বলেন, ভারত যে কোন যুদ্ধবিরতি বা সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা করতে রাজি, যদি তা বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। একই দিনে উথান্ট-এর কাছে এক চিঠিতে মিসেস গান্ধী লেখেন : 'ভারত তার সৈন্যকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার সৈন্যকে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের প্রাক্তন নাগরিক যারা এখন বাংলাদেশের প্রতি আনুগত, তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসে।

তার উস্কানীমূলক ঢং-এ ভুট্টো দুই ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দান করেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে ভারত পাকিস্তানকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন, 'অস্ত্রের জোরে এক সদস্য রাষ্ট্রকে ভাঙতে দেয়া উচিত জাতিসংঘের? দরকার হলে আমরা এক হাজার বছর যুদ্ধ করব! একটি স্বাধীন রাষ্ট্রকে এভাবে ভাঙতে দেয়া যায় না। আজকে পাকিস্তান এ অবস্থায় আছে; কালকে আর এক দেশ এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। বাংলাদেশের মতো ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নতুন নতুন দেশের উদয় হবে!' তার কথা ভুল হয়নি। বিশ বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে আলাদা আলাদা দেশে পরিণত হলো। কিন্তু তার কথা কে শুনে?

১৩ ডিসেম্বর ইতালি ও জাপান আর একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করে। তারা ভারত ও পাকিস্তানকে সংঘর্ষের সমাপ্তি টানতে বলে। তাদের এ প্রস্তাব তেমন বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

১৩ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে ভোটের জন্য পেশ করা হয়। এগারটি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট প্রদান করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভোট থেকে বিরত থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোলান্ড প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

পোল্যান্ডের প্রস্তাব

পরের দিন, ডিসেম্বর ১৪, পোল্যান্ড আর একটি প্রস্তাব পেশ করে। এ প্রস্তাবে বলা যায় (ক) সংঘাতের ইস্টার্ন থিয়েটারে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় জনগণের নির্বাচিত

www.pathagar.com

প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে; (খ) ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক তৎপরতা বন্ধ করতে হবে এবং ৭২ ঘণ্টার জন্য প্রাথমিক যুদ্ধ বিরতি আরম্ভ হবে; (গ) যুদ্ধ বিরতি আরম্ভ হলে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ইস্টার্ন থিয়েটারের নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হবে, প্রত্যাহার হবার উদ্দেশ্যে; (ঘ) জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক লোকজনকে সুযোগ দেয়া হবে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত যাওয়া। আগা শাহী পোলান্ডের এ খসড়া প্রস্তাব ইসলামাবাদে প্রেরণ করেন। ইয়াহিয়া খান তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে যাতে পোলিশ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৪ ডিসেম্বর অনেকক্ষণ ভুট্টোকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে তাকে যখন পাওয়া গেল এবং টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট তাকে পোল্যান্ডের প্রস্তাবে রাজি হতে বলেন, তিনি জবাব দিলেন, 'আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না,' একটি মূল্যবান ছিল এভাবে নষ্ট হলো।

১৫ ডিসেম্বর যখন নিরাপত্তা পরিষদ আবার বৈঠকে বসে, জাতিসংঘে খবর আসতে থাকে যে ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্ম-সমর্পনেরর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছিল। ততক্ষণে ভুট্টোর মেজাজ গরম হয়ে উঠলো। তিনি পরিষদের বিরুদ্ধে বিলম্বের অভিযোগ এনে বলেন, জাতিসংঘ হচ্ছে 'ভণ্ড ও প্রহসনমূলক'। তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষ অবস্থানের ধিক্কার করেন এবং নিজের নোটস ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভা থেকে বের হয়ে আসেন। বের হবার সময় তিনি বলেন, 'আমার দেশের এ অপমানজনক আত্মসমর্পণের সাথে আমি জড়িত হবো না!' তিনি ১৬ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক ত্যাগ করে রোমে যান। তিনি সেখানে অপেক্ষা করেন, দেখবার জন্য যে প্যাকিস্তানে ফেরত গেলে তাকে কি গ্রেফতার করা হবে নাকি প্রধানমন্ত্রী করা হবে।

তার অবর্তমানে আরো দুইটি খসড়া প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হয় ১৫ ডিসেম্বরে। ব্রিটেন-ফ্রান্সের প্রস্তাব বৈরিতার অবসান আহ্বান করে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানের দাবি করে। সিরিয়া দাবি করে যেন পাকিস্তান সব রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্ত করে। তাদের প্রস্তাবে পোল্যান্ড সংশোধনী এনে বলে, যুদ্ধ বিরতির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সব ভারতীয় সৈন্যকে প্রত্যাহার করতে হবে। পরের দিন, ১৬ ডিসেম্বর, স্মরণ সিং জানিয়ে দেন যে পূর্ব পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়েছে। তিনি বলেন, পশ্চিম ফ্রন্টে ভারত সরকার ভারত সেনাবাহিনীর একতরফা যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ বার্তাকে স্বাগত জানিয়ে আশা ব্যক্ত করেন যেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়।

www.pathagar.com

জাতিসংঘে লিবিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি মাহমুদ সুলেমান মাগরিবী জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে ১৬ ডিসেম্বরে চিঠির মারফত বলেন যে পাকিস্তান তাদের ভুল স্বীকার করেছে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণ করবে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাকে অনুমোদন দেওয়া হলে, তবে তা অন্যান্য রাষ্ট্র দ্বারা অনুকরণীয় হয়ে দাঁড়াবে, নজির হয়ে দাঁড়াবে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যখন ভারতের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে রাজি হলেন, নিরাপত্তা পরিষদ তাদের সভা ডিসেম্বর ১৭ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করে। ২১ ডিসেম্বর পরিষদ আবার বৈঠকে বসে যেখানে আর্জেন্টনা, বুরুন্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরালিওন ও সোমালিয়া একটি দীর্ঘ প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। তারা দুইপক্ষকে জেনেভা কনভেনশন মেনে চলার আহ্বান জানায়। যুদ্ধবন্দিদের অধিকারের কথাও উল্লেখ থাকে। ১৩টি ভোটো প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। পোলান্ড ও রাশিয়া ভোট দান থেকে বিরত থাকে।

বিশ্লেষণ

পাকিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে যখন ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতার হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন উচিত ছিল (২২ নভেম্বর) নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ পেশ করা। আগে ভারত বাহিনী সীমান্তের ওপার থেকে মুক্তি বাহিনীকে সহায়তা দিতে থাকে, কিন্তু এখন তারা নিজেরাই পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে ঢুকে পড়ে।

সাংবাদিকরা ভারতের আগ্রাসনের কথা নিজেরাই দেখতে পারত। ইলেকট্রনিক মিডিয়া এ চিত্রগুলো দেখাতে পারত, তা হলে ২২ নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ভারত বাহিনীর প্রত্যাহার দাবি জানাতে পারত। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য ভেটো জানাতো। যেমন করেছিল ৫ ডিসেম্বর, কিন্তু তাও বন্ধুসুলভ দেশ ভারতের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারত।

কিন্তু অনেক দেরিতে, ৩ ডিসেম্বরে বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। যখন পূর্ব পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কারণে পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে যেতে থাকে, তখন পাকিস্তানের মিত্ররা নিস্তব্ধ হতে থাকে। এমনকি, ভারতের পক্ষে যেতে থাকে।

৫ ডিসেম্বর যখন রাশিয়ার প্রস্তাবকে পাকিস্তান নাকচ করে, তখন পাকিস্তান সম্মানজনকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করবার জন্য সুযোগ হারায়। সোভিয়েত প্রস্তাব

রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানায় এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান সব সহিংসতা বন্ধের জন্য আহ্বান জানায়। সে সময় একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে সম্ভব ছিল পাকিস্তানে ভারতে আগ্রাসন বন্ধ করা, ভারত এবং আওয়ামী লীগের জন্য একটাই রাজনৈতিক সমাধান ছিল, পূর্ণ স্বাধীনতা। এটা বাঁধা দেয়া সম্ভব ছিল না। তবে ৯৩,০০০ বন্দিকে ভারতে তিন বছর থাকার অপমান এড়ানো সম্ভব ছিল।

পোল্যান্ডের প্রস্তাবে তেমন কোন লাভ হলো না। যুদ্ধবিরতি নিয়ে ততক্ষণে আলোচনা শুরু হয়েছিল বিজয়ী ও পরাজিত শক্তির মধ্যে। জেনারেল ফরমান থেকে জেনারেল মাণিকশ ম্যাসেজ পেয়েছিলেন এবং আত্মসমর্পণের শর্ত আরোপ করলেন। তিনি তার শর্ত মানার জন্য ১৫ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে নটা পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন, তখন আর কিছু করবার ছিল না। ভারত সেনাবাহিনী ঢাকায় চলে এসেছিল প্রায়। তারা কেবলমাত্র শেষ বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। নিরাপত্তা পরিষদ যাই-ই বলুক না কেন, তাদেরকে তখন আর থামা সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া পোলিশ প্রস্তাব-এ শুধু দুই দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলেনি; তারা পূর্ব প্রদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যের প্রত্যাহারের কথাও বলে এবং ডিসেম্বর ১৯৭০ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাও বলে। নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলবল।

অনেকে মনে করেন, পোলিশ প্রস্তাব মেনে চললে, পাকিস্তানকে এত অপমান সহ্য করতে হতো না। কিন্তু তারা জাতিসংঘের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। যদি ইসলামাদ রাজী হতো শেখ মুজিবুরকে পূর্ব পাকিস্তান হস্তান্তর করা, তা ১২ ডিসেম্বর সম্ভব ছিল যখন ভারত নিরাপত্তা পরিষদের কাছে এক চিঠিতে যুদ্ধ বিরতিকে বিবেচনায় আনতে রাজি হয়, যদি সংঘাতের কারণগুলো সমাধান হয়।

মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি ছিলেন যদি পাকিস্তানও তাই করে। ১৩ ডিসেম্বরে উথান্ট-এর কাছে তার চিঠিতে তাই বলা হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া তাতে রাজি ছিলেন না।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
সামরিক পতনের কারণসমূহ (ইস্টার্ন থিয়েটার)

পাকিস্তান-ভারতের ১৯৭১ যুদ্ধের পরিণাম প্রথম থেকেই জানা ছিল। স্থলে অধিক সামরিক শক্তি, আকাশের দখল, স্থানীয় জনগণের বিপুল সমর্থন, আর আন্তর্জাতিক মহল অন্য দিকে তাকিয়ে থাকাতে, যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কোন চিন্তা ছিল না। ইস্টার্ন কমান্ড যে পরিস্থিতিতে ছিল, সে পরিস্থিতিতে পৃথিবীর যে কোন সেনাবাহিনী ভারতকে ঠেকাতে পারত না। জেনারেল অরোরা বলেছিলেন, 'স্বয়ং নেপোলিয়ানও পরাজয় এড়াতে পারতেন না।'

এটাও সত্য যে, রাজনৈতিক ও সামরিক পর্যায়ে পরিস্থিতি ঠিকমতো মোকাবেলা করা হলে, জাতির এ ট্র্যাজেডি এড়ানো যেত।

ভারতে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করার পরে, কি কি কারণে পাকিস্তানের এত দ্রুত পতন হলো?

অপারেশনের জন্য পরিবেশ

একদিকে ভারত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ পরিকল্পনা করেছিল, অন্যদিকে পাকিস্তান গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক মহল থেকে নিজেকে দূরে রাখলো এবং মিলিটারি ক্র্যাকডাউন-এর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর দূরত্ব বাড়িয়ে দিল।

ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির ফলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ট্যাঙ্ক, বিমান ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পেল। এতে তাদের অস্ত্রাগার আরো শক্তিশালী হয়। এমনিতেই অস্ত্র ভারসাম্যহীনতা ভারতের পক্ষে ছিল; ১৯৭১ সালের শেষে তা আরো প্রকট হয়ে উঠে। ভারত মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। একদিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব জাতিকে প্রস্তুত করছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া

www.pathagar.com

এবং আন্তর্জাতিক মহলে সমর্থন গড়ে তোলা; অন্যদিকে সামরিক বাহিনী শীতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। যখন তুষারপাত আরম্ভ হবে, তখন তারা পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করবে। নভেম্বরের মধ্যে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পুরো পরিকল্পনা ঠিক করে রাখলো। দক্ষ প্রচারণার মাধ্যমে, চীন ও আমেরিকা ছাড়া, ইন্দিরা গান্ধী জাতিসংঘের সব দেশের সমর্থন পেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কংগ্রেস ও মিডিয়া তার পক্ষে ছিল। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ দ্বারা তিনি পূর্ব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিলেন।

অন্যদিকে, ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতি এবং ডোমেস্টিক পলিসির কারণে, পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। পশ্চিমা দেশে থেকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহ বাড়তে থাকলো। পাকিস্তান সেনাবাহিনী দ্বারা কথিত গণহত্যার প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক মহল বিশ্বাস করল। সব দিক দিয়েই পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়ল।

যুদ্ধ যখন শুরু হলো, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সন্তোষজনক ছিল না। যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে সৈনিকদের ঠিক স্পষ্ট ধারণা ছিল না। জাতীয় সেনাবাহিনী থেকে তারা রাতারাতি 'দখলদার বাহিনী'তে পরিণত হলো।

১৯৭১-এ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল না এত বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, যেখানে দেশটি তিন দিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। ২০০০ কি. মি. সীমান্তের প্রতিরক্ষার জন্য বিরাট বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। শত্রুদের পক্ষে তাদেরকে ভেদ করে ঢুকে পড়া তেমন কঠিন কাজ ছিল না। মাত্র তিনটি পদাতিক বাহিনীর সমান লোকবল দিয়ে পাঁচটি প্রবেশ পথকে পাহারা দিতে হয়েছিল। সর্বনিম্ন প্রয়োজন ছিল এক এক প্রবেশ পথের জন্য এক একটি পদাতিক বাহিনী। কিন্তু বাস্তবে ইউনিটগুলোকে ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়ে, সেনাবাহিনী আরো দুর্বল হয়ে পড়ে।

পদাতিক বাহিনীতে অস্ত্রের অভাব ছিল কারণ, তাদের পর্যাপ্ত ফিল্ড এবং মিডিয়াম আর্টিলারি ছিল না। তারা পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র এক রেজিমেন্ট ট্যাঙ্ক পাঠালো যেখানে অন্তত তিন রেজিমেন্ট ট্যাঙ্কের প্রয়োজন ছিল। বিমান ক্ষমতা ছিল প্রায় শূন্য। বঙ্গপোসাগরে একটা পাকিস্তানি নৌবাহিনীর জাহাজও ছিল না। অবকাঠামো দুর্বলতার কারণে যোগাযোগও সীমিত ছিল।

www.pathagar.com

জাতীয় কৌশল

১৯৭১ সামরিক বাহিনীকে এমন পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যেখানে পরাজয় অনিবার্য। পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগলিক দূরত্বের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান ও তার উপদেষ্টারা যথার্থ গুরুত্ব দেননি। ভারত যে সামরিক ভাবে জড়িয়ে পড়বে, এনিয়েও তাদের যথাযথ বিশ্লেষণ ছিল না। মিত্র দেশের মনোভাবকেও ঠিক মতো নিরূপণ করা হয়নি।

'লুকায়িত' (হিন্দু শত্রু) শত্রুকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গুরুত্ব দেয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করবার ব্যাপারে ইস্টার্ন কমান্ডার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করলেন। সদর দপ্তর ও সিএমএলএ একইভাবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখালো। কোন উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তার সাহস ছিল না বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরা। তারা বলতে সাহস পায়নি যে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশ ঠিক না করলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মূখিন।

রাজনৈতিক নির্দেশ

এত সব দুর্বলতা সত্ত্বেও ইস্টার্ন কমান্ডের প্রতি রাজনৈতিক নির্দেশনা ছিল যে কোন ভাবেই যেন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের সরকার গঠন না করতে পারে। ভৌগলিক ও কৌশলগত কারণে এমন নির্দেশনা ছিল ভ্রান্ত। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে এ রাজনৈতিক নির্দেশনা পালন করতে যেয়ে, শত্রুদের কাছে দুর্বল হলো। ভারত বাহিনী চেয়েছিল যেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সীমান্তে এসে বিএসএফ ও মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেক খোঁচায় প্রতিক্রিয়া করে। এতে পাকিস্তানি বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু কিছু স্থান অরক্ষিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নির্দেশনা পালন করতে যেয়ে নিয়াজির দুর্বলতা প্রকাশ পেল। আর এ দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নিলেন জেনারেল অরোরা।

সামরিক সরকারের ভুল ধারণা ছিল যে ভারত মুক্তিবাহিনীকে সহায়তা দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যাতে মুক্তি বাহিনী সীমান্তের কাছাকাছি কিছু কিছু স্থান দখল করে স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করতে পারে। হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে ইয়াহিয়া বললেন, তিনি ও তার সহকর্মীরা ভাবতেই পারেননি যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু আগেই ১৯৭১-এ সামরিক গেয়েন্দারা ভারতের পরিকল্পনা হাতে পেয়েছিল, যেখানে উল্লেখ ছিল ভারত পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করবে।

www.pathagar.com

সামরিক নীতি

রাজনৈতিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবার জন্য সামরিক নীতি তৈরি হয়ে থাকে। তাই পাকিস্তান প্রতিরক্ষা থেকে সরে এসে বিদ্রোহী দমন বা কাউন্টার-ইন্সারজেন্সিতে বেশি নজর দেয়ার জন্য নিয়াজিকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলো হচ্ছে পরস্পর বিরোধী প্রয়োজনীয়তা। দেশ প্রতিরক্ষার জন্য দরকার হয় বিভিন্ন প্রবেশ পথে সৈন্য মোতায়েন করা; শত্রু যেন ভেদ না করতে পারে। সেরকম সেনা সমাবেশ রাখা; পাল্টা-আক্রমণ-এর জন্য প্রস্তুত থাকা; প্রয়োজন মতো সৈন্যকে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করা; আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জনগণের সমর্থন নিশ্চিত করা। কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে যেয়ে, ইউনিটগুলোকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করতে হয় এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে জনগণকে শত্রু বানানো হয়।

সবচাইতে বড় ভুল ছিল যে, যখন বুঝা যাচ্ছিল যে ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনও পাকিস্তান তাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি। হামদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সদর দপ্তর ইঙ্গিত দিয়েছিল, ভূ-খণ্ড ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চিফ অব জেনারেল স্টাফ এবং ভাইস চিফ অব জেনারেল স্টাফ এ ধরনের পরামর্শ দিয়ে ছিলেন।

যাই হোক না কেন, নিয়াজির উচিত ছিল তার সামরিক কৌশল সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা। নভেম্বর শেষ ভাগে সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল।

অপারেশনাল স্ট্র্যাটেজি

প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবার জন্য শক্তিশালী বাহিনী রাজধানী ঢাকায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা উচিত ছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক স্থানে শত্রুদের দুর্বল করবার জন্য সৈন্যদেরকে ব্যবহার করা উচিত ছিল। যেখানে দরকার, সৈন্যদেরকে প্রত্যাহার করে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা উচিত ছিল। যেমন, নির্দিষ্ট দুর্গে বা শক্তিশালী স্থানে।

সীমান্তের দিকে অতিরিক্ত দীর্ঘ সময় এগিয়ে থেকে নিয়াজি তার কৌশলগত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। শত্রু সামনের বাহিনীকে এড়িয়ে পিছনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে, প্রবেশ করে। তাতে পরাজয় আরো দ্রুত ঘটে।

www.pathagar.com

অপেরাশনের ধারণা

জুলাই ১৯৭১ এইচকিউ ইস্টার্ন কমান্ড থেকে সদর দপ্তরে যে কনসেপ্ট অব অপেরাশন এর ধারণা প্রেরণ করা হয়। তাতে সৈন্যদেরকে সীমান্ত বরাবর অবস্থান নেওয়ার কথা বলা হয় এবং আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালাতে বলা হয়। আসলে সদর দপ্তরের কর্মকর্তারা নিরাপত্তা পরিবেশের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

দুর্গ বা শক্তিশালী স্থানে অবস্থান নেয়া যে ভুল কৌশল ছিল, তা নয়। কিন্তু এ ধরনের কৌশল গ্রহণ করবার জন্য যে শর্তের দরকার হয়, সে শর্তগুলো ছিল অনুপস্থিত। যে সকল শর্ত এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন, তা হলো, বিশেষ স্থানগুলো প্রথম থেকে শক্তভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিজ দখলে রাখতে হয়; (২) মাইন ফিল্ড, কাঁটাতারের বেড়া, ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কার দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়; (৩) বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হয়; (৪) ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত টহল বজায় রাখতে হয়; এবং জনগণ যেন সেনাবাহিনী বিরোধী না হয়, তা নিশ্চিত করা। যেহেতু এ শর্তগুলো অনুপস্থিত ছিল, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। লে. জে. আফতাব আহমদ খান, স্পেশাল ডিব্রিফিং কমিটির চেয়ারম্যান, বলেন, এটা বাস্তব পরিস্থিতির সাথে অসামাঞ্জস্য ছিল। নভেম্বরের শেষের দিকে যখন বোঝা যাচ্ছিল, ভারত আক্রমণ করবে, তখনই পরিকল্পনা পরিবর্তন করা উচিত ছিল। আরো শক্তিমালী প্রতিরক্ষা গড়া উচিত ছিল। বিশেষ করে ঢাকার চারপাশে। যে সব স্থান রক্ষা করা কঠিন, সেগুলো বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজর দেওয়া উচিত ছিল।

ঢাকার অবস্থান

ঢাকাকে অরক্ষিত রাখা ছিল সবচাইতে বড় ভুল। ঢাকা ছিল সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, রাজনীতির কেন্দ্র, পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর কেন্দ্রস্থল। যে কোন শত্রুর শেষ লক্ষ্য। রাজধানীকে কিভাবে একজন কমান্ডার অরক্ষিত রাখতে পারে? তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। "যে কোন মূল্যে ঢাকাকে রক্ষা করতে হবে।"

নিয়াজী বলেন যে ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য তাকে আটটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, যা বাস্তবায়ন করা হয়নি। কিন্তু এটা কোন কৈফিয়ত হতে পারে না। সদর দপ্তর এ ধরনের কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কি না, তার কোন প্রমাণ নেই। তবে, ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বাকির

www.pathagar.com

সিদ্দিকী যিনি নভেম্বর ১৯৭১-এ রাওয়ালপিন্ডিতে এসেছিলেন ফাইনাল অপারেশন জানানোর জন্য, বলেন যে সদর দপ্তর বাস্তবেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আটটি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়ন পাঠানোর ব্যাপারে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না হলেও যখন ভারতের আক্রমণ নিশ্চিত ছিল, তখনই নিয়াজির উচিত ছিল অন্যান্য স্থান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে ঢাকায় এবং ঢাকার চারপাশে শক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলা।

শত্রুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারনা

দুর্ভাগ্যবশত, GHQ এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড, উভয়ই শত্রুর উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে নাই। তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে ওপারে থেকে ভারতীয় বাহিনী মুক্তি বাহিনীকে সহায়তা করতে থাকবে; বড় জোর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করবে। নভেম্বর ২১-এর পরেও GHQ ভাবলো যে সীমান্তের তৎপরতা ভারতের সাহায্যে মুক্তি বাহিনীই চালাচ্ছিল। তারা ভাবতে পারেনি যে কোন বড় শহর, বিশেষ করে ঢাকায় আক্রমণ হতে পারে।

ভারতের উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল প্রথমে নদী সীমানায় পৌছানো। প্রাথমিক অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য ঢাকায় আসা ছিল না হয়ত, কিন্তু ব্যাপারটা সর্বক্ষণ তাদের মনে ছিল।

নিয়াজি ভেবেছিলেন তিনি তার সৈন্যকে যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট থেকে এনে ঢাকায় মোতায়েন করবে, কিন্তু এ ভাবনা ছিল অবাস্তব। সে সব স্থান এবং ঢাকায় মাঝখানে ছিল অনেক নদী, মুক্তিবাহিনীর জন্য এটা ছিল সুবিধা। শেষ পর্যন্ত, অনেক বিলম্বে মাত্র একটি ব্যাটালিয়ন, তাও সম্পূর্ণ নয়, ঢাকায় আসতে পেরেছিল।

ঢাকা পতনের আগে নিয়াজির ২৬,২৫০ সৈন্য ছিল রাজধানীতে, তারা কেউ যুদ্ধের সৈন্য ছিল না, তারা আসছিল অন্যান্য বিভাগ থেকে- সিগন্যালস, রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন চালক, সাপ্লাই কোরস, ডাক্তার এবং ওডারলি। এরা ভারতীয় সেনাবাহিনী দূরের কথা, এ দলটি ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আসা মুক্তি বাহিনীকেও প্রতিরোধ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

নিয়াজিকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় সদর দপ্তর কিছুটা দায়ি হলেও পুরো দায়িত্ব পরবর্তীতে নিয়াজির উপর বর্তায়। তার অপারেশনে ছিল অনেক ভুলত্রুটি। তিনি সময়মতো পরিকল্পনা বদলাতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন।

সৈন্য মোতায়েন

শত্রুর উদ্দেশ্য ঠিক মতো আন্দাজ না করার ফলে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রে ঠিক মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়নি। ভারতীয় সৈন্যরা এক সময় ঢাকার বাইরে মিরপুর ব্রিজে চলে আসে।

ঢাকায় আসার দ্রুততম রাস্তা ছিল পূর্ব দিক থেকে। ভারতের আগরতলা থেকে ঢাকা মাত্র ৪৮ কি. মি.। ভারতের ডব্লিউ কোরস্ ছিল সবচাইতে শক্তিশালী। তাদের ছিল তিনটি ডিভিশন। বুঝা উচিত ছিল যে, শত্রুপক্ষ পূর্ব দিক থেকে আসবে। সদর দপ্তরে তৎকালীন মিলিটারি গোয়েন্দার পরিচালক/ডিরেক্টর দাবি করেন তারা ভারতের পরিকল্পনা হাতে পেয়েছিলেন, তা যদি হয়, তাহলে তা নিশ্চয় ইস্টার্ন কমান্ডের হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। নিয়াজির উচিত ছিল তখন কুমিল্লায় শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত রাখা। কিন্তু ১৪ ডিভিশন এবং ৩৯ (অ্যাড হক) ডিভিশনের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ছিল না শত্রুকে প্রতিরোধ করা। ভারত বাহিনী খুব দ্রুত চাঁদপুর, দাউদকান্দি ও ভৈরব বাজার পার হলো। যুদ্ধ শুরু হবার কিছু দিনের মধ্যেই তারা ঢাকার কাছাকাছি চলে আসে। জেনারেল সাগাত সিংকে কৃতিত্ব দিতেই হয়। তিনি একের পর এক বাধা অতিক্রম করে ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আর ইস্টার্ন কমান্ডের ব্যর্থতার কারণে তার পক্ষে কাজটা আরো সহজ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আরো দীর্ঘ সময় রক্ষা করা সম্ভব ছিল। সেখানে আরো সৈন্য মোতায়েন করলে ঢাকা পতনের পরেও সেখানে পাকিস্তানি পতাকা থাকতে পারত।

জরুরি প্রয়োজনে রিজার্ভ ফোর্স

একজন কমান্ডারকে কিছু সৈন্যকে রিজার্ভ-এ রাখতে হয় জরুরি প্রয়োজনের জন্য এবং এটা যুদ্ধের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু কোরস কমান্ডার এবং তার ডিভিশনাল ও ব্রিগেড কমান্ডারদের নীতি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক ইঞ্চি

জমিকে প্রতিরক্ষা করা, এ কাজে তাদের সব সৈন্য মোতায়েন থাকাতে, তারা কোন রিজার্ভ সৈন্য রাখতে পারেননি। এতে তারা শত্রুর আগমনকে বাঁধা দিতে পারেনি।

বা কিছু সৈন্য রিজার্ভ-এ ছিল, যুদ্ধের আগেই নিয়াজী তাদের দিয়ে অ্যাডহক ডিভিশন গড়ে তোলেন। রিজার্ভ সৈন্য না থাকাতে, ১৮ ঘন্টা ধরে শত্রুপক্ষ নরসিংদীতে হেলিকপ্টার নামাতে পারলো। তারপর টাঙ্গাইলেও শত্রু পক্ষ হেলিকপ্টার যোগে উপস্থিত হলো; রিজার্ভ সৈন্য থাকলে এটা সম্ভব হতো না। বরঞ্চ, বাঘা সিদ্দীকী সেখানে শত্রুদের স্বাগত জানিয়ে তাদের আশ্রয় দিলেন।

কাউন্টার ইন

যেহেতু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হন এবং জোর করে প্রতিবাদ দমন করতে চেষ্টা করে, পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণ বিদ্রোহে পরিণত হয়। জুন নাগাদ ইস্টার্ন কমান্ড সরকারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় এবং সীমান্তের নিকট সব পোস্ট তাদের দখলে আসে, আট মাস দীর্ঘ বিদ্রোহ এবং অপারেশন যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দায়িত্ব পালন করতে করতে সৈন্যরা হয়রান হয়ে যায়। এটি একটি ব্যর্থ যুদ্ধ বুঝতে পেরে, তাদের যুদ্ধ করবার ইচ্ছাও চলে যেতে থাকে।

নাশকতামূলক তৎপরতা

নাশকতামূলক তৎপরতা দ্বারা শক্তিশালী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর পতন ঘটানো সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বার্মায় জাপানি সৈন্যদেরকে পরাজিত করে। ফারসীরা ১৯৪৪ সালে জার্মান দখলদারদেরকে মুশকিলে ফেলে দেয়। মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ব্রিটিশদেরকে বিপদেই ফেলল। ষাটের দশকে ভিয়েতনাম একটা পরাশক্তিকে শিক্ষা দিয়েছিল। শ্রীলঙ্কায় তামিল টাইগাররা ৮০,০০০ ভারতীয় শান্তি রক্ষাকারীদের পিছে ঠেলে দিল। আফগানিস্তানের মুক্তিযোদ্ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করল। ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে কাশ্মীর বিদ্রোহীরা ৫০০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে বাঁধা দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭১-এর পাকিস্তান- ভারত যুদ্ধে পাকিস্তন সেনাবাহিনীকে শুধু গেরিলাদের তৎপরতা মোকাবেলা করতে হয় নাই। প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী সদস্যদেরকেও তাদের মোকাবেলা করতে হয়। এ সেনা সদস্য ভূ-খণ্ডের সাথে অতি পরিচিত ছিল। এটাত

www.pathagar.com

তাদেরই দেশ ছিল। সমগ্র জনগণ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ছিল। তারা শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দিল। ১০০,০০০ মুক্তি বাহিনী ছাড়া, পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকলেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিল। কোথাও মাইনফিল্ড ছিল, তা ভারতীয় সেনাদের জানিয়ে দিত, খাল বিল পার করতে তাদের সাহায্য করত। বিলের ভেতর দিয়ে তাদের যানবাহন ও অস্ত্র টেনে পার করে। তারা অস্ত্রাগারে বোমা ফেলে, ব্রিজ ধ্বংস করে, নৌকায় আগুন লাগিয়ে দেয়, ভারতীয়দের তথ্য প্রদান করে। পাকিস্তানিদের পক্ষের লোকজনকে মেরে ফেলে। প্রায় হাত ধরেই তারা ভারতীয়দের ঢাকায় আনে।

একটি গৌরবোজ্জ্বল সেনাবাহিনীকে এভাবে বৈরী পরিস্থিতিতে ফেলা রাজনৈতিক নেতৃত্বের অন্যায় ছিল বটে। অবশ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব তখন সামরিক শক্তির হাতে ছিল। সরকারের দায়িত্ব ছিল যতটা সম্ভব সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে সৈন্যদেরকে যুদ্ধে পাঠানো। ১৯৭১ যারা ক্ষমতায় ছিলেন, তারা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল।

যুদ্ধ পরিচালনা

যুদ্ধ পরিচালনা নিয়াজির জন্য নতুন কিছু ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি বার্মা ও আফ্রিকায় যুদ্ধের জয় পরাজয় দেখেছিলেন। ১৯৪৮ কাশ্মীর যুদ্ধে তিনি একটি ইউনিট কমান্ডার ছিলেন। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার মানসিকতা পদাতিক ইউনিট-এর কমান্ডার থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে না। Do or die ছাড়া তিনি কিছু বুঝতেন না। তা না হলে, ২৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তিনি কিভাবে পূর্ব পাকিস্তানে তার সৈন্যদেরকে প্রত্যাহারে বারণ করেছিলেন। এর ফলে তাদের ৭৫% আহত ও নিহত হয়?

সীমান্ত থেকে সরা যাবে না- এ ছিল নিয়াজির প্রতিজ্ঞা। তিনি সেটা থেকে সরে আসতে পারেননি। কিন্তু শেষ লক্ষ্য মাথায় রেখে অনেক পরিবর্তন, সংশোধন করতে হয়, কৌশল করতে হয়। ইস্টার্ন কমান্ডের নির্দেশ ছিল প্রত্যাহার না করার জন্য, কিন্তু তারা অন্যান্য বিষয় মাথায় আনেনি, যেমনঃ সময়, জলাশয়-এর প্রতিকূলতা, বিদ্রোহের প্রভাব, আকাশে তাদের দুর্বলতা ইত্যাদি।

যদি শত্রু একটি ইউনিটের এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে, সে ইউনিটের তেমন কোন ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় ইউনিটকে প্রত্যাহার করে আনা হয়। কিন্তু নিয়াজির

হুকুম ছিল একটি কোম্পানীও যেন সামনে থেকে সরে না আসে। ১০৭ ব্রিগেডকে সময় মতো ফেরত আসতে দেয়া হয় নাই বলে, যশোর সহজে শত্রুর দখলে চলে যায়। কমান্ডারগণ বার বার ঢাকায় আসার জন্য অনুমতি চান, কিন্তু তাদের অনুরোধ নাকচ করা হয়।

পূর্বে ১৪ ও ৩৭ ডিভিশনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসতে বলা উচিত ছিল এবং ৩ ডিসেম্বর-এ ঢাকার আরো কাছে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি বলে ব্রিগেডিয়ার রানা তার বিগ্রেডকে সিলেটে নিয়ে যান। কারণ প্রত্যাহারের অন্যান্য পথ ততক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়।

শীর্ষ সদর দপ্তরের ভূমিকা

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের উপর সদর দপ্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম দিন থেকে তারা যেন সরে গেছে, অথবা বিদেশি মিত্রদের দিকে তাকিয়ে ছিল তাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার জন্য। ইস্টার্ন কমান্ড বাস্তবে স্বতন্ত্র থিয়েটার ছিল। স্থানীয় কমান্ডারের হাতে সব অপারেশন ছিল। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোন অতিরিক্ত সামরিক জনবল প্রেরণ করা যাচ্ছিল না। কোন রকম সহায়তা দেওয়া যাচ্ছিল না, যদিও তা তখনও পাকিস্তানেরই অংশ ছিল। শত্রুর হাতে এভাবে ফেলে দেয়া যায় না। যুদ্ধের সময় নিয়াজীকে নির্দেশনা দেয়া যেত যাতে তিনি সৈন্যদেরকে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে রিজার্ভ করে রাখেন।

সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধকে ঠিকমতো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল না। ৩ ডিসেম্বর আক্রমণের আগে নিয়াজীকে নির্দেশনা দেয়া উচিত ছিল, বিশেষ বিশেষ স্থানে, বিশেষ করে ঢাকায়, সৈন্যদেরকে মোতায়েন করা। ৩ ডিসেম্বরের পর বোঝাই যাচ্ছিল যে ভারত তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়েই পূর্ব পাকিস্তানে নেমে পড়বে।

কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ

ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কারণে দেশটির বেসামরিক নেতৃত্ব সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম ছিল। সে অনুযায়ী তাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

যুদ্ধের বিষয়ে বেসামরিক ব্যবস্থাপনা ও মিলিটারি পরিকল্পনার মধ্যে স্পষ্ট কোন ভাগ ছিল না। ভারতে জয়েন্ট স্টাফ হেডকোয়ার্টার্স বলতে কিছু না থাকলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিফ অব স্টাফ কমিটি প্রায়ই বৈঠকে বসে এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর কমান্ড হেডাকোয়ার্টারে বিমান বাহিনীর সাথে সমন্বয় চলতে থাকে।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট সদর দপ্তরের মিলিটারী অপারেশনস কক্ষে বসে থাকেন, হাজার মাইল দূরের যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য, যে যুদ্ধে তার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে ইস্টার্ন কমান্ড প্রেসিডেন্ট এবং সিএমএলএ এইচকিউ'র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা কররে, তাদেরকে পাওয়া যেত না। চিফ অব স্টাফ ও পিএসও- কেও পাওয়া যেত না। জানা যায়, চিফ অব স্টাফ এবং সিজিএস পরস্পরের সাথে কথা বলতেন না। অন্যান্য পিএসওদের সাথেও সিজিএস-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না। দেশের এ ক্রান্তিলগ্নে সদর দপ্তরে এ রকম পরিস্থিতি বিরাজ করবে, তা ক্ষমা করা যায় না।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে সফলতার জন্য বাহিনীর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য।

পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতির এ অবস্থার কারণ ছিল সৈন্যদেরকে সীমান্তের বরাবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে মোতায়েন করা হয়, বিদ্রোহীদের তৎপরতা এবং উচ্চতর কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের অভাব, এ সব কারণে প্রথম দিন থেকেই যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য্য ছিল। এক একটা ইউনিটকে কোম্পানি ও প্ল্যাটুনে ভাগ করে ফেলা হয়। আলাদা আলাদাভাবে লড়াই করবার জন্য। ঐক্যবদ্ধ শক্তি আর রইল না। ব্রিগেড কমান্ডাররা যখন সুযোগ পেতেন তারা তাদের সৈন্যদের নিয়ে সাহসের সাথে লড়াই করে গেলেন। তাদের শত্রুরাও তাদের সাহসকে প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে, অনেক কমান্ডার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজিও তার নিম্ন সদর দপ্তরগুলো পরিদর্শনে যেতে ব্যর্থ হন।

পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পরাজয়ের উপর স্পেশাল ডিব্রিফিং কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় যে জেনারেল নিয়াজি পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তিনি নিজে বিচলিত হয়ে পড়ে, মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যান। কমিটির প্রধান জেনারেল আফতাব প্রতিবেদনে বলেন যে যুদ্ধের প্রাথমিক দিকে যখন সৈন্য প্রত্যাহার করে ঢাকায় আনা সম্ভব ছিল, নিয়াজি তখন তা করেননি। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে দায়ি করেন প্যারালাইজ হবার

www.pathagar.com

কারণে। তারা কোন সামরিক বা রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেননি এ ট্র্যাজেডি এড়ানোর জন্য।

সমন্বয়ের অভাব

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া ছিলেন এ সঙ্গে প্রেসিডেন্ট, চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিএমএলএ) এবং সেনাবাহিনীর প্রধান। তার এবং তার স্টাফের উপর সব রাজনৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব ছিল।

তিনটি সংস্থা ইস্টার্ন কমান্ডকে নির্দেশনা দিতে থাকে: রাষ্ট্রপতির সচিবালয়; সিএমএলএ হেডকোয়ার্টস এবং সেনা সদর দপ্তর। এ তিন সংস্থা একে অপরের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেক সময় সচেতন ছিল না। সিজিএস মেজর জেনারেল গুল হাসান জানতেন না যে সিএমএলএ এইচকিউ ইস্টার্ন কমান্ডকে ১৪ ডিসেম্বর তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে নির্দেশ দিয়েছিল। অথচ ভারতীয়রাই এ নির্দেশটি ইন্টারসেপ্ট করে জানতে পারল।

আমি হামুদুর রহমান কমিশনের সাথে একমত পোষণ করি যে যদিও ইস্টার্ন কমান্ডের উপর দায়িত্ব বর্তায়, এ পরিণতির জন্য সদর দপ্তর দায় এড়াতে পারে না। কারণ পরিকল্পনায় তাদের অনুমোদন ছিল। ইস্টার্ন থিয়েটারের যুদ্ধে সদর দপ্তর নির্দেশনায়, পরিচালনায় ও প্রভাব বিস্তারে তৎপর থাকা উচিত ছিল। কমিশন যথার্থভাবে মন্তব্য করে যে সদরদপ্তর এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

মনোবল

জেনারেল ইয়াহিয়া ন্যাশনাল অ্যামেম্বলি স্থগিত ঘোষণার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য বাহিনী চাপের মুখে ছিল। ২৬ মার্চ ছাড়া পাবার আগ পর্যন্ত তারা ঘেরাও, সড়ক অবরোধ, অপমান, বিচ্ছিন্ন খুনের ঘটনায় সম্মুখীন হয়ে ক্যান্টনমেন্টে সীমাবদ্ধ তাকে। তারপর থেকে শুরু হয় সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষ। সেনাবাহিনীকে সুবিধাজনক অবস্থানে মনে হলেও, তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাদের যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হয় এবং মনোবল ভেঙে পড়ে। নিজের দেশের জনগণের বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের মনোবলে আঘাত হানে।

www.pathagar.com

আট মাস লুকায়িত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবার পর, আসল যুদ্ধ আরম্ভ হয় নভেম্বর মাসে। ততদিনে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগণ তাদের বিপক্ষে চলে যাওয়াতে, তাদের মনোবল আরো ভেঙে পড়ে। দিন অতিবাহিত হচ্ছিল কিন্তু কোন অতিরিক্ত সৈন্য বা স্বস্তি আসছিল না। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গেরিলা তৎপরতার কারণে এক ইউনিটের সাথে অন্য ইউনিটের যোগাযোগও ক্ষীণ হয়ে যায়। বিচারপতি হামুদুর রহমান বলেন, '৭ ডিসেম্বর নাগাদ, জেনারেল নিয়াজি যুদ্ধ করবার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেন।'

যে সেনাবাহিনী নিজের জনগণ দ্বারা ঘৃণার শিকার, তা কোন ক্রমেই মনোবল দৃঢ় রাখতে পারে না। শৃঙ্খলা ভেঙে যেতে বাধ্য। ১৯৭১সালের নেতৃত্বের খামখেয়ালির জন্য সেনাবাহিনীকে ঠিক এ পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। সৈন্যদের বিরুদ্ধে মনস্তাত্বিক যুদ্ধের অংশ হিসেবে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া মুক্তিবাহিনীর সাফল্যকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করতে থাকে। এতে যুদ্ধরত সৈন্যরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়।

বিমানবাহিনীর অনুপস্থিতি

আধুনিক যুদ্ধে বিমান শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিমান বাহিনীর শক্তি দ্বারা শত্রুকে ঘায়েল করা সহজতর হয়। স্থলে সৈন্য, বিভিন্ন স্থাপনা এবং কমান্ড হেডকোয়ার্টার আঘাত হানতে পারে। পূর্ব পাকিস্তানে বিমান বাহিনীর অবস্থা ছিল দুর্বল। পশ্চিম প্রদেশে যখন যুদ্ধ শুরু হয়, পূর্বে একমাত্র বিমান বাহিনী স্কোয়াড্রনকে অকার্যকর করে ফেলে ভারত। একটাই বিমান বন্দর ছিল এবং এটাকেও অকার্যকর করে ফেলা হয়। যুদ্ধের সময় যখন অবশিষ্ট কয়েকজন পাইলটকে বিমান যোগে নিয়ে যাওয়া হয়, আকাশ তখন ভারত বিমান বাহিনীর দখলে। এতে ঢাকার পতন আরো দ্রুত হয়।

নৌ অবরোধ

লাহোরে 'গঙ্গা' ঘটনার পরে মিসেস গান্ধী ভারতের ভূ-খণ্ডের উপর বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় অস্ত্র, পণ্য, সৈন্য সরবরাহ করতে হলে, শ্রীলঙ্কা হয়ে আসতে হয়। তারপর ভারতীয় নৌ অবরোধ আরোপ করলে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

এতে অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ হয়। আর যখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সৈন্যরা বুঝতে পারে যে তারা এখানে আটকে পড়েছে, তখন তাদের মনোবল আরো ভেঙে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তান তিন পাশে ভারত দ্বারা বেষ্টিত ছিল, ছোট এক অংশে ছিল বার্মা। সাহায্য আসার একমাত্র পথ ছিল সমুদ্র। কিন্তু নৌ অবরোধ দ্বারা তাও বন্ধ হয়ে যায়।

সমুদ্র বা স্থলপথে সৈন্য প্রত্যাহার করবার পরিকল্পনা না থাকার অভিযোগ ইস্টার্ন কামান্ডের বিরুদ্ধে করেছিলেন বিচারপতি হামুদুর রহমান, কিন্তু তা যথাযথ ছিল না। ভারত সম্পূর্ণ বিমান ও নৌ সুপারক্রিয়েট শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। দূর সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে আনা তখন আর সম্ভব ছিল না। তারা এক স্থানে জমা হতে পারলেও পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধের ময়দানে দক্ষতা কার্য সম্পাদন

স্পেশাল ডিব্রিফ্রিং কমিটির মতে, একটি ডিভিশন ছাড়া, সব কটি ডিভিশনের পারফরমেন্স খারাপ ছিল। দশটি ব্রিগেডের মধ্যে ছয়টি কাজের মান ছিল দুর্বল। ২৮টি যুদ্ধরত ব্যাটালিয়নের মেধ্য ১৫টির মান ছিল নিম্ন পর্যায়ে।

এ অভিযোগ ঠিক যৌক্তিক নয়। যে পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে, তা অনুযায়ী ইউনিট ও সাব-ইউনিট পর্যায়ে তাদের যুদ্ধের মান ছিল প্রশংসনীয়। সাহসী কমান্ডারদের নেতৃত্বে ইউনিটগুলো বীরত্বের পরিচয় দেয়। যেখানে নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। সে সব ইউনিট ভাল ভূমিকা রাখতে পারেনি তারা শত্রুকে কার্যকর ভাবে বাঁধা দিতে পারেনি কারণ- ভারতীয়রা মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে তাদের অতিক্রম করে ফেলে এবং প্রত্যাহার করে আসতে বাঁধা দেয়।

যশোর ছাড়া অন্য কোন বড় শহর শত্রুর দখলে যায়নি। ইস্টার্ন কমান্ড যখন আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়, তখন সব বড় বড় শহর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঢাকা যদি সৈন্য শূন্য না থাকতো, তাহলে যুদ্ধ আরো কিছুদিন চলত। জাতিসংঘের যে সকল দেশ পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল, তারা অপেক্ষাকৃত কম অপমানমূলক প্রক্রিয়ায় যুদ্ধবিরতির আয়োজন করবার সুযোগ পেত।

দ্বাদশ অধ্যায়
দেশ ভাঙ্গার কারণ

দেশ ভাঙার জন্য কোন এক ব্যক্তি বা কর্মকে এককভাবে দোষ দেওয়া যায় না। দুর্বল নের্তৃত্ব এবং ভ্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির কারণে দেশটি বিপদের মুখোমুখি হয়। আর ১৯৭১ সালে ভুল সিদ্ধান্ত দেশটির ভাঙনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক কারণসমূহ

দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের প্রতিষ্ঠাতারা পাকিস্তানের জটিল প্রকৃতির ভূগোলের প্রভাবটা বুঝতে সক্ষম হননি। তাদের বোঝা উচিত ছিল, যেহেতু পূর্ব পাকিস্তান ১,৬০০ কি. মি. দূরে অবস্থিত ছিল এবং দুই প্রদেশের মাঝখানে ছিল ভারত, সেহেতু বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কৌশল দরকার ছিল।

প্রথম কন্সটিটিউয়েন্সি এ্যাসেমব্লি যখন দুই প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন নিয়ে ঐক্যমতে পৌছতে পারেনি, তখনই অসন্তোষ, সন্দেহ ও তিক্ততার বীজ বুনা হয় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। দীর্ঘ নয় বছর ধরে তারা এ কর্তৃত্বের ভারসাম্যে এক বিতর্ক তৈরি করে। যখন তারা ঐক্যমতে পৌছলো, তখন অসাংবিধানিক উপায়ে এ ঐক্যমতকে বিনষ্ট করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রতি, বিশেষ করে পাঞ্জাবিদের প্রতি, বাঙালিদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পায়।

১৯৬৬ সালে সংবিধানকে সরিয়ে ফেলা হলে, ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে শুধুমাত্র ফিল্ড মার্শালের ভক্তরা খুশি হয়। ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে।

এ ক্ষোভ বৃদ্ধি পায় যখন একটি অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বদলে দ্বিতীয় সামরিক শাসন ক্ষমতায় আসে।

www.pathagar.com

বাঙালির আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলা হয়। তারা প্রথমবারের মতো ক্ষমতা হাতে নেওয়ার আশা করে। কিন্তু ইয়াহিয়া এ স্বপ্নে আঘাত করে এবং এতে তাদের ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়। তাদেরকে আশা দিয়ে, তারপরে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা না দিয়ে ইয়াহিয়া বড় ভুল করলেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে, তা মাঝ পথে থামানো উচিত ছিল না। বোঝা উচিত ছিল, কেন্দ্রে সরকার গঠন করার ন্যায্য অধিকার বাঙালিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ঐক্য বজায় রাখা আর সম্ভব হবে না।

পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়ার সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত ঘোষণা করা। অন্যদিকে, শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয় মানসিকতার কারণে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো যখন পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ৩ রা মার্চ ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যোগ দিতে রাজি হলেন না।

বিশ্লেষণ করতে গেলে, মনে হয় ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত করলে আওয়ামী লীগের কি প্রতিক্রিয়া হবে তা ভুট্টো ঠিক বুঝতে পারেননি, অথবা তিনি নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে উল্টিয়ে দিলেন। দুই প্রধান চরিত্র কোন সহযোগিতা করছিলেন না, তবুও ইয়াহিয়াকে দায়ভার নিতে হবে। যতই কঠিন পরিস্থিতি হোক না কেন, যার মাথায় মুকুট, সব কৃতিত্ব যেমন তার, সব দোষও তেমন তার।

পররাষ্ট্রনীতি

নিরাপত্তা চিন্তা থেকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি রচনা হয়। শক্তিশালী ও বৈরী প্রতিবেশী থাকার কারণ, পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান বাধ্য হয়ে কম্যুনিস্ট বিরোধী সামরিক সমঝোতায় যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক মিত্রতা তাদের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে বটে। কিন্তু এতে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আরো ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করে এবং এ পরাশক্তিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে সমঝোতা করায়, প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইয়াহিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সময়, কিছুটা হলেও, নিক্সন পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান করে। যদিও মার্কিন কংগ্রেস ও মার্কিন মিডিয়া সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

ভারতপন্থী ছিল। ইসলামাবাদ থেকে পিকিং-এ জুলাই ১৯৭১-এ কিসিঞ্জারের গোপন সফর সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরো পাকিস্তান বিরোধী করে। এ সফরের ফলে পরবর্তীতে নিক্সন চীন সফর করেন। পাকিস্তানের এ মধ্যস্থকারী ভূমিকার কারণে আগস্ট ১৯৭১ সালে ভারত সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালাতে সাহস পান। কারণ, হিমালয়ের ওপার থেকে সম্ভাব্য হুমকিকে স্তিমিত করা হয়।

পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধিকে নির্দেশ দিলো যেন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক আগ্রাসনের ব্যাপারটি উপস্থাপন না করা হয়। এ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের কারণে ভারতের আগ্রাসন বিশ্বের সামনে তুলে ধরার সুযোগটি হাত ছাড়া হয়। পক্ষান্তরে পাকিস্তানকে যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্য দায়ী করা হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

এ বইয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিষয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য প্রমাণ করার জন্য রাজনীতিবিদগণ একপেশে অর্থনৈতিক সূচক ব্যবহার করেছেন। এটি এমনই এক দেশ দুই প্রদেশ দুই অঞ্চলে অবস্থানের কারণে আসলেও দুই রকমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল।

এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষ ঠিকমতো বিবেচনায় না আনায়; আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের ঐক্যের বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী অবস্থান নেবার সুযোগ পায়।

সামাজিক মনস্তত্ব

আবার বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অসম্মানজনক মনোভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন বলে, তাদেরকে দেখা হতো 'সংখ্যালঘু মুসলমান' হিসেবে, তাদের 'শুদ্ধিকরণের' প্রয়োজন ছিল। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে বর্ণ, পোষাক, খাদ্য অভ্যাস এবং সাংস্কৃতি মূল্যবোধকে দেশের প্রতি আনুগত্যের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

আভ্যন্তরীণ ভুল ভ্রান্তি থেকে একটা দেশের পররাষ্ট্রনীতি কিছুটা হলেও প্রভাবিত হয়। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিকে দক্ষভাবে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারলে, শত্রুর প্রচারণাকে দুর্বল করা যায়। সামরিক হস্তক্ষেপের আগে ঢাকা থেকে বিদেশি সাংবাদিক বের করে দেওয়া পাকিস্তানকে নেতিবাচক অবস্থানে ফেলল। আগস্টে সংবাদ সম্মেলনে ইয়াহিয়া এ ভুল সংশোধন করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু যা ক্ষতি হবার তা হয়েই গেল। ততক্ষণে সাংবাদিক মহল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রচারণা হাতে পেয়ে গিয়েছিল। মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সাথে সাথেই মার্চ মাসেই শ্বেতপত্রটি প্রকাশ করা উচিত ছিল এবং তা নিরাপত্তা পরিষদসহ বিদেশি সংবাদ মাধ্যমে সরবরাহ করা উচিত ছিল। এতে সামরিক হস্তক্ষেপের কিছু যুক্তি দেওয়া যেত।

রাজনৈতিক ভিন্নতার দূরত্ব এতটা প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল যে ২৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনটারই জাতীয় চরিত্র ছিল না। দলগুলো আঞ্চলিক স্বার্থের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় এবং এর ফলে দুই প্রদেশের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরো বৃদ্ধি পায়।

গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা

পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ খুব কম নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন প্রেরণ করতে সক্ষম ছিল। কেননা, তাদের বেশিরভাগ জনবল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। তারা বাংলা ভাষাও বুঝতেন না, আবার বাঙালিদের মন মানসিকতাও বুঝতেন না। তাই ওরা সঠিকভাবে বাঙালিদের মনোভাব নিরূপণ করতে ব্যর্থ ছিল। যারা নিরূপণ করতে সক্ষম ছিলেন, তারা সাহস করে সঠিক পরিস্থিতি প্রকাশ করতে ভয় পায়। কর্তৃপক্ষ যা শুনতে চায়, তাদের প্রতিবেদনে তাই থাকতো।

ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা সমন্ধে তারা অনেক বাড়িয়ে অতিরঞ্জিত করে প্রতিবেদন রচনা করেন। নির্বাচন ফলাফলের বিষয়ে তাদের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এর ফলে সামরিক সরকারের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভন্ডুল হয়ে যায়। ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত করলে জনগণের কি প্রতিক্রিয়া হবে, তারা সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেনি। তারা সিএমএলএ -কে সতর্ক করেনি যে, ৩ রা মার্চের পরে দেশটা এতটা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাইরে সামরিক হস্তক্ষেপ সমন্ধে কি প্রতিক্রিয়া হয় তাও তারা সঠিকভাবে অনুমান করেনি। আইএসআই সামরিক সরকারকে বুঝাতে সক্ষম হয়নি যে লাখ লাখ শরণার্থী ভারতে চলে গেলে এর কি প্রভাব পড়বে। তারা ভাবতেই পারেনি যে ভারত বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

সামরিক হস্তক্ষেপ

২৫ মার্চ নাগাদ পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। অল্প সংখ্যক বিহারী ছাড়া, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, সড়ক, রেল ও নৌপরিবহন, ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান, সরকারি বিভাগ, স্থানীয় দোকানদার সবাই শেখ মুজিবুরের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল। সেনাবাহিনীকে অপমান করা হচ্ছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের জঙ্গিরা কিছু সেনা সদস্যকে খুনও করেছিল।

সরকারের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় স্থাপনের জন্য এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে একটা নিয়মতান্ত্রিক বাহিনী উন্মাদ হয়ে দুষ্কৃতকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করতে থাকবে, তা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য না। এ নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ, বাঙালিদের 'শুদ্ধিকরণের' মনোভাবের পরে, জনগণের বিশ্বাস ফিরে পাওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। এ সামরিক তৎপরতার কারণে লাখ লাখ বাঙালি যারা পালিয়ে যায়, ভারত তাদের আশ্রয় দেয় এবং এর রাজনৈতিক ফায়দা নেয়।

সামরিক হস্তক্ষেপের দিনে ভূট্টো বক্তব্য রাখেন যে 'পাকিস্তান হ্যাজ বিন সেভড' এতে বুঝা যায় যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণই করতে পারেননি। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াও তিনি নিরূপণ করতে পারেননি। তাই পাকিস্তানের ভাঙন ও পূর্ব প্রদেশে সেনাবাহিনীর অপমানের দায়ভার তাকেও নিতে হবে।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে পুনরুদ্ধার ও বাই-ইলেকশনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে একটি সরকার গঠনের জন্য ইয়াহিয়া যে প্রচেষ্টা হাতে নিলেন, তা ছিল নিষ্ফল। মুজিবকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করে তিনি সমাধানের পথ রুদ্ধ করে দিলেন।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র ও মিডিয়া

গণমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করাতে এবং স্বতন্ত্র অনুসন্ধানী মিডিয়ার অভাবে, পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে জনগণ সচেতন ছিল না। সরকার যা যা পদক্ষেপ নেয়, তা প্রসংশিত হয়। অন্যদিকের চিত্রটি তুলে ধরা হয়নি। কেউ ছিল না সরকারের বিরুদ্ধে কিছু প্রকাশ করার।

মিত্রদের উপর নির্ভরশীলতা

ভারতের সাথে যুদ্ধ যাওয়ার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের উপর নির্ভর করা ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। নিজের ভুলের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করবার পরে, ইয়াহিয়া খান ও তার উপদেষ্টাগণের আশা করা উচিত হয়নি যে অন্যরা এসে তাদের সমস্যা সমাধান করে দেবে।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট

দীর্ঘকাল ধরে পাকিস্তানের জনগণ হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সরকার, তা সিভিল হোক বা সামরিক হোক, তা অপ্রতিনিধিশীল হোক বা নির্বাচিত হোক, এ রিপোর্টের তথ্য প্রকাশ করবার সাহস পায়নি। নিশ্চয় এ রিপোর্টের সুপারিশ তাদের জন্য ক্ষতিকর বা তাদের রাজনৈতিক দলের ইমেজের জন্য ক্ষতিকর।

মাঝে মধ্যে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করবার জন্য জনগণের কাছ থেকে দাবি উঠে। কিন্তু কোন সরকার তা করে নাই। অনেক কমসংখ্যক ব্যক্তি সম্পূর্ণ এ প্রতিবেদন দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। কোন সরকার বা সংস্থা স্বীকারই করে না যে তাদের হাতে প্রতিবেদনটি রয়েছে। তবে প্রমাণ ছাড়া প্রতিবেদনের ফটোকপি পাওয়া যায়। অনেক লেখক এগুলো থেকে তথ্য তুলে ধরেছেন, বিশেষ করে যারা তাদের প্রতিপক্ষকে সমালোচনা ও ক্ষতি করতে চায়।

প্রেসিডেন্ট ও চিফ মার্শাল ল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর, জনাব ভুট্টো নিশ্চিত করেন যে সেনাবাহিনী থেকে কেউ তাদের দেশ ভাঙ্গার জন্য দায়ি করে না। এ জন্য তিনি ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই একটি ইনকোয়ারি কমিশন গঠন

করেন ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ কি পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে গ্লানিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়, তা নিরূপনের জন্য।

এ কমিশনের সভাপতি করা হয় একজন বাঙালি ভদ্রলোক, বিচারপতি হামুদুর রহমানকে। অন্য দুইজন সদস্য ছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি আনোয়ারুল হক এবং বিচারপতি তোফায়েল আলী এ. রহমান। ঢাকা হাইকোর্ট-এর প্রাক্তণ প্রধান বিচারপতি। কমিশনের সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন মে. জে. আলতাফ কাদির। কমিশন ২১৩ জনের সাক্ষ গ্রহণ করে এবং জুলাই ১৯৭১-এ রিপোর্ট পেশ করে। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা ফেরত আসলে, আরো ৭২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন লে. জে. আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি। মেজর জেনারেল ও বিগ্রেডিয়ারগণ। মুখ্য সচিব, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং দুইজন বিভাগীয় কমিশনার। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর প্রতিবেদনের উপসংহার পরিবর্তিত হয়নি।

জনাব ভুট্টো ইচ্ছাকৃতভাবে ফোকাস রাখলেন সামরিক পরাজয়ের উপর। পূর্ব পাকিস্তানিদের কিভাবে দূরে সরানো হয়। তা নিয়ে কমিশনকে দেখতে বলেননি কারণ, এতে তিনি নিজেও দোষী প্রমাণিত হতেন।

উপসংহারে কমিশন বলেন যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পেছনে কেবলমাত্র সামরিক কারণ ছিল না। এর পেছনে ছিল রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, নৈতিক ও সামরিক কারণ। রাজনৈতিক কারণ হিসেবে তা ১৪৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে দায়ি করা হয়। কমিশন মনে করেন যে দীর্ঘকালের জন্য দুইবার সামরিক শাসন বলবৎ থাকায়, তা দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর চরম প্রভাব ফেলে। এতে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শাসকরা জনগণের থেকে অনেক দূরে সরে যায়। কমিশন ইয়াহিয়া খানকে কুটিল ও অসৎ বলে আখ্যায়িত করে। বলা হয় যে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য ও গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেননি। তিনি তা করেছিলেন নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের জন্য। যারা তাকে সহায়তা করেছিল, তারাও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

প্রতিবেদনটি স্পষ্টভাবে আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি, উভয়কে দায়ি করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্য, যাতে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এতে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানে যারা ক্ষমতায় ছিলেন, তাদের মধ্যে তিক্ততার

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। কমিশন বলে যে পিপিপির চেয়ারম্যান ও নিরূপণ করতে ব্যর্থ হন যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লি স্থগিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে যেমন তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। শেখ মুজিব ও পিপিপি-র নেতা উভয় অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন।

কথিত আছে যে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে ৩ মার্চ-এ ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে যোগদানে অসম্মতির কারণ সমন্ধে পিপিপির চেয়ারম্যান-এর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক ছিল না।

বিচারপতি হামুদুর রহমান ও তার সহকর্মীগণ মনে করেন যে ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতেই একটা সমঝোতায় আসা যেত, বা কমিটির বৈঠকে সমঝোতায় আসা সম্ভব ছিল। তারা বলে, শেখ মুজিবও অনড় অবস্থান গ্রহণ করাতে দেশটি অবশেষে ভেঙে যায়। জাস্টিস হামুদুর রহমান মনে করেন যে ঢাকায় ১৫-২৫ মার্চ পর্যন্ত যে আলোচনা চলতে থাকে, তা আসলে সময় ক্ষেপণের জন্য করা হয় যাতে এ সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক উপস্থিতি আরো শক্তিশালী করা যায় এবং আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা যায়। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য কোন রাজনৈতিক ফর্মুলা তৈরি করা হচ্ছিল না।

সামরিক হস্তক্ষেপের আগে যারা সরকার ও আওয়ামী লীগের মধ্যকার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, তারা কমিশনের এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, শেখ মুজিব ও তার নিকট সহযোগীরা একের পর এক শর্ত দিতে থাকেন, যাতে ধীরে ধীরে পাকিস্তান থেকে তারা আলাদা হয়ে যায়।

সামরিক হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে কমিশন মনে করেন যে মিলিটারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে রেখে আওয়ামী লীগ পুরো নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিল। কমিশন মনে করেন সামরিক হস্তক্ষেপের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমঝোতা সম্ভব ছিল।

শেখ মুজিব ও কামাল হোসেনকে যে গ্রেফতার করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যান্যরা যে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, কমিশন এ সমন্ধে কিছুই জানতেন না। তারা স্বীকার করেন যে আগস্ট ১৯৭১ ইয়াহিয়া খান যে সাধারণ ক্ষমার কথা বলেন, তা ছিল অকার্যকর। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতের হাতে ছিল। তাদেরকে ফেরত আসতে দেওয়া হচ্ছিল না। তাছাড়া অনেকে হিন্দু ছিল বলে, তারা ফেরত আসতে ভয় পায়।

www.pathagar.com

এ পরিস্থিতিতে কমিশন কিভাবে মনে করলেন যে কোন রাজনৈতিক সমঝোতা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? বাই ইলেকশন ছিল সম্পূর্ণ প্রহসনমূলক এবং যারা নির্বাচিত হচ্ছিলেন, তারা সরকারের লোক ছিলেন। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার নির্বাচিত হচ্ছিল। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে একপেশে নির্বাচনকে বিদেশি সাংবাদিকরা ও বুদ্ধিজীবীরা কোন গুরুত্বই দেননি। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত স্কলার লি রোজ এই নির্বাচনকে যথার্থভাবে ঘৃণার চোখে দেখেন।

তবে বিচারপতি হামুদুর রহমান সঠিকভাবে বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে সংকট সৃষ্টি করার জন্য ভারত ছিল উদগ্রীব।'

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতের উপর পাকিস্তানের ভাঙনের প্রভাব

১৬ ডিসেম্বরে যখন বোঝা গেলো যে কায়েদ-ই-আযমের গড়া দেশটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে, সমগ্র জাতি শোকাহত হয়ে পড়ে। চাম্বে অবস্থিত একজন মেজর জেনারেল সবার সামনে কাঁদলেন। অন্যরা চোখের জল না ফেললেও, তাদের মাঝেও গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সামরিক নেতৃত্বের ভুলের কারণে সেনাবাহিনীকে অপমান সহ্য করতে হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে অল্প বয়সী অফিসার তাদের সিনিয়রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা প্রেসিডেন্টের বহিষ্কার এবং বিচার দাবি করে।

পাকিস্তানে সবখানে নৈরাজ্য, হতাশা বিরাজ করছিল। নতুন রাষ্ট্রপতি টেলিভিশন ঘোষণার মাধ্যমে এগারজন সিনিয়র জেনারেলকে চাকরিচ্যুত করলেন। নৌবাহিনীর সম্পূর্ণ কমান্ডকে বরখাস্ত করা হয়। সেনাবাহিনী অফিসারদেরকে ধিক্কার দেয়া হয়। সৈন্যরা সেনা পোষাক পরে বের হতে দ্বিধাবোধ করে। অবশ্য সব রাজনীতিবিদদের স্বার্থে কমিশন গঠনের মাধ্যমে তদন্ত করা হয়। সামরিক পরাজয়কে রাজনীতিবিদরা পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে।

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি উন্নতি হতে থাকলো। সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক ও স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসলো। পাকিস্তান আবার জেগে উঠলো নতুন উদ্যোমে। লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সামিট পাকিস্তানকে পুনরায় বিশ্ব দরবারে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করল।

আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত ভারতীয় সামরিক বিশ্লেষক কে. সুব্রামানিয়াম ১৯৭২-এর গোড়ার দিকে বলেছিলেন, পাকিস্তান দুর্বল হয়ে গেছে। দেশটি এতবড় সেনাবাহিনী আর পালতে পারবে না এবং ভারতের জন্য পাকিস্তান আর কোন হুমকি হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু ঠিক তার বিপরীত প্রমাণিত হলো। পাকিস্তানের নেতৃত্ব পারমানবিক অস্ত্র তৈরি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো দরকার হলে, জুলফিকার আলী

www.pathagar.com

ভুট্টো ভারতের সাথে ১০০০ বছর যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। সামরিক বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি হলো আর নতুন নতুন আধুনিক অস্ত্র যোগ হলো। ভারতের প্রতি হুমকি হিসেবে পাকিস্তানের ক্ষমতা মোটেও কমেনি; বরং তা বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

সুব্রামানিয়ামের কথা ভুল প্রমাণিত হয়। আজ পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের ক্রম বর্ধমান সামরিক শক্তি নিয়ে আতঙ্কিত। পূর্ব প্রদেশ হারানোর পরেও, প্রতিরক্ষা খাতে পাকিস্তান যথেষ্ট ব্যয় করতে সক্ষম ছিল।

সুব্রামনিয়াম মনে করেন পাকিস্তানের আয়তন অর্ধেক হয়েছে বলে, পারমানবিক শক্তি হিসেবে তার বিকাশ করার সম্ভাবনা নেই। তার পরও, সুব্রামানিয়াম, অন্যান্য নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও ভারতীয় নেতৃত্ব ইসলামিক বোমার প্রতি তাদের আশঙ্কা ব্যক্ত করতে থাকলেন।

পাকিস্তানের অর্থনীতি বৃদ্ধি হতে থাকলো। ১৯৭৯ সালে জিডিপি ছিল ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯১/১৯৯২ সালে বেড়ে ৪৮.০৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। পূর্ব পাকিস্তানের পাট ছাড়াই পাকিস্তানের রফতানি আয় ১,২৬২ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৯৯২-এ ৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ালো। যা ছিল ভারতের রফতানি আয়ের এক তৃতীয়াংশ, সুব্রামানিয়াম বলেছিলেন, এটা ভারতের ছয় ভাগের এক ভাগ হবে। কিন্তু তার কথা ভুল প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানে মাথা পিছু আয় ১৯৭২ সালে ৯০ ডলার ছিল; ১৯৯০ সালে তা বেড়ে ৪০৯ ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। একই বছর দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এক বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌছায়। পূর্ব পাকিস্তানকে হারানো ভুলবার নয়, তবে তা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি।

সুব্রামানিয়াম আরো বলেছিলেন, যে পাকিস্তানের রাজনীতি ধর্মনিরপেক্ষ হবে। কিন্তু যা ঘটেছে, তা উল্টো। পাকিস্তান আরো বেশি ইসলামী হয়ে ওঠে। নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের উপর প্রভাব

অনেক ত্যাগের পরে বাংলাদেশিরা তাদের স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার জন্য এক মিলিয়নের বেশি প্রাণ দিয়েছিলো। নিজের পতাকাকে সালাম দেওয়া, নিজের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া, নিশ্চয় তাদের গর্বের বিষয় ছিল। দ্বিজাতি তত্ত্ব তাদেরকে

www.pathagar.com

নিজ স্বাধীন দেশ পেতে সহায়ক ছিল। পাকিস্তান না হলে, বাংলাদেশের সৃষ্টি হতো না।

১৯৭০ সালে যেভাবে বৈষম্যের বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তা দুর্বল যুক্তি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

মুজিব বলেছিলেন, স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের চাইতে চালের দাম অর্ধেক হবে। কিন্তু ১৯৭৫ তা বিক্রি হচ্ছিল দশগুণ বেশি দামে। বাংলাদেশ ছিল দরিদ্রতম দেশসমূহের একটি। তার মাথা পিছু আয় ১৯৭১-এ ৪৭ ডলার থেকে ১৯৯২ সালে ২০২ ডলারে উন্নীত হলেও তা ছিল পাকিস্তানের চেয়ে কম। ১৯৭১-এ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মাথা পিছু আয়ের অনুপাত ছিল ২:১। সে অনুপাতই বজায় থাকলো। বর্তমানে প্রায় পাঁচলাখ বাংলাদেশী পাকিস্তানে কর্মরত রয়েছে। তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পরিবারের কাছে পাঠাচ্ছে। বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন সিমেন্ট, কম্বল ও সামরিক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ করে, যদিও এসব ভারতেও উৎপাদিত হয়।

সুব্রামানিয়াম বলেছিলেন, যে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ হবে, কিন্তু তাও ভুল প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশ তার ইসলামী চরিত্র বজায় রাখলো এবং ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা দেয়। ওআইসি-র ৪০তম সদস্য বাংলাদেশ। সার্কে এখন দুইটি নয়, তিনটি মুসলমান দেশ রয়েছে।

ভারতের উপর প্রভাব

সুব্রামানিয়াম বিশ্বাস করতেন- ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। কিন্তু তার উল্টো প্রমাণিত হয়েছে। এল. কে. আদভানির নেতৃত্বে বিজেপি ধ্বংসের দেবী কালিকে পুনর্জীবিত করলো। তিনি সব মসজিদ ভাঙ্গতে বদ্ধ পরিকর, যদি তা হিন্দুদের পূণ্য স্থানে অবস্থিত হয়। তার সমর্থকরা হিন্দু রাষ্ট্র চায়। এখন সাম্প্রদায়িক টেনশন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি ভারতের পূর্ব দিকে নিরাপত্তা সমস্যা সমাধানের জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে কৃতিত্ব দেন। তিনি খুশি ছিলেন যে এখন মিজো বা নাগা গোষ্ঠী আর পূর্ব পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র গ্রহণ করবে না। ২০ বছর পরেও ভারত মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেবার জন্য বাংলাদেশকে দোষারোপ করে। ভারতের নিরাপত্তা

www.pathagar.com

সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বাংলাদেশ একটি সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী রয়েছে পাঁচ ডিভিশনসহ। তাদের বিমান বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ভারতের পক্ষে ১১টি সেকায়াড্রন ও তিন দিন দরকার হবে।

সুব্রামানিয়াম ভেবেছিলেন মালামাল পরিবহনের খরচ কমানোর জন্য বাংলাদেশের নদী পথে ভারতীয় নৌযান আসাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরায় যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন মুসলিম প্রধান দেশ। তারা একটি যুক্তিসঙ্গত চুক্তি ছাড়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রকে এ সুবিধা দেবে না। পদ্মা নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে এখনও দু'দেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ পাটের দাম নিয়েও কোন সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছায়নি। ভারত ও ব্যাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বেড়েছে, তবে ইসলামাবাদ-ঢাকার মধ্যেও বাণিজ্য বেড়েছে।

সুব্রামানিয়াম লিখেছিলেন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী বিরোধী, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় লিপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশে গণতন্ত্র আসলেও বেশির ভাগ সময় তা সামরিক শাসনের আওতায় ছিল।

বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ভারতকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। পাকিস্তানে ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাব বৃদ্ধি পেল। আর ভারতের প্রতি বাংলাদেশের কৃতজ্ঞ কয়েক মাসে অদৃশ্য হয়ে যায়, ইউনিভার্সিটি কিছু ছাত্র বললো, 'আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঘৃণা করি কিন্তু আমরা হিন্দুদের আরো বেশি ঘৃণা করি।' পাশ্চাতের লেখক ডন মোরেস বলেন, '১৯৭৪ সালে জনগণের মাঝে ভারত-বিদ্বেষ জেগে উঠলো। কারণ, তারা মুজিবকে ভারতের লোক হিসেবে দেখে।'

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটলো কারণ, প্রয়োজনের বেশি সময় ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করে। ভারতের সেনাবাহিনী তাদের সব অস্ত্র, যন্ত্রপাতি নিয়ে যায়। তাদের বেসামরিক সংস্থাগুলো শিল্প ইউনিট নিয়ে যায়। ভারত তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীকে হত্যা করে। ডিসেম্বর ১৬ তারিখে ভারতীয় সেনাদের গলায় মালা পরানো হলেও টাইম ম্যাগাজিনের ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হলো। পত্রিকাটি লিখেছিল, ভারতীয় বাহিনী হিন্দু দখলদার বাহিনীর রূপ গ্রহণ করবে।

সুব্রামানিয়ান বলেছিলেন অঞ্চলে এ মার্কিন ও চীনের প্রভাব কমে যাবে। কিন্তু এ অঞ্চলে আমেরিকার প্রভাব এখন অনেকে বেড়েছে। পাকিস্তানের সাথে তাদের যৌথ অনুশীলন ও প্রযুক্তিগত বিনিময় হচ্ছে, আর ভারতকে অবরোধ-এর হুমকি দিচ্ছে।

www.pathagar.com

ভারতের অভ্যন্তরে তখন বিদ্রোহ চলতে থাকে। শিখরা তাদের স্বাধীন খালিস্তানের জন্য আন্দোলন করছে। শ্রীনগরে স্লোগান শোনা যায়, 'কাশ্মীরিদের জন্য কাশ্মীর!' মিসেস গান্ধী যে ক্যান্সার পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকিয়েছিলেন, তা নিজ দেশে বৃদ্ধি পেতে থাকলো।

সুব্রামানিয়ামের একটি কথা সঠিক ছিল। ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষী চরিত্র বৃদ্ধি পেল। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ছোট দেশসমূহ ভারতকে খুব সাবধানী চোখে দেখে। মিসেস গান্ধীর জীবনী লিখতে যেয়ে, ডন মোরেয়েস লেখেন, পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য এত টাকা খরচ হয়েছিল যে মিসেস গান্ধী তার 'গরীবী হটাও' শ্লোগান বাস্তবায়ন করতে পারেননি। পাকিস্তান ভাঙার একুশ বছর পর ভারতীয় নেতৃত্বকে তাদের ১৯৭১-এর তৎপরতা পূনর্মূল্যায়ন করা উচিত। তাদের বোঝা উচিত, কারা আসলে জিতলো; কারা হারলো।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, যারা পাকিস্তানের ভাঙনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেননি। মুজিবকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাজউদ্দিন বেয়নেট বিদ্ধ হন। ভুট্টোকে ফাঁসি দেয়া হয়। জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। ইয়াহিয়া খান মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজ ঘরে বন্দি রইলেন। খন্দকারকে পাঁচ বছর কারাবরণ করতে হয়।

শেষ কথা

ইতিহাসে এটাই প্রথম দেশ ভাঙার ঘটনা নয়। অন্যান্য দেশে আরো বড় বড় সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। রাজনৈতিক সীমানা বদলেছে। শক্তিশালী দেশের বিভিন্ন নীতির কারণে প্রতিবেশী দেশে অস্থিতিশীলতার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের ভুল ভ্রান্তিকে সমর্থন দেওয়া যায় না। এদের ভুলের পরিণতি হচ্ছে দেশ ভাঙার ট্র্যাজেডি।

ডিসেম্বর ১৯৭১-এর বেদনা, দুঃখ ধীরে ধীরে মুছে যায়। কিন্তু ইতিহাসের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়, ভুল যেন পুনরায় না হয়। আমরা পাকিস্তানের ভাঙার ইতিহাস থেকে কি শিখতে পারি?

এক. একটি বহুজাতিক ও বহুভাষী সমাজ যদি একটি মাত্র সূতা দিয়ে বুনা হয়, সমাজের সে বস্ত্র বিভিন্ন চাপে ছিঁড়ে যাবে। এতে আরো শক্তিশালী মূল্যবোধের সংযোজন করতে হয়।

www.pathagar.com

দুই. বিশেষ সম্প্রদায়ের জাতীয়তার দাবি অস্বাভাবিক কিছু নয়। বহুজাতিক সমাজে এটি বিদ্যমান থাকে। তাতে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু এ ব্যাপারে সব গোষ্ঠীকে খুব সহনশীল থাকতে হয়। বহুসংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করতে হয়। চাপিয়ে দেয়া সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হওয়া অনিবার্য।

তৃতীয়. দেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকার জন্য একটি সরকারের আইনি বৈধ্যতা থাকতে হয়। ক্যু, সামরিক শাসন, দীর্ঘ সেনা শাসন এবং অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে কেবল অসন্তোষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। তখন জনগণ রাজপথে নেমে যায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে।

চতুর্থ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। একটি দেশের প্রত্যেক এলাকায় সমান উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়া না গেলেও সরকারের প্রচেষ্টা থাকা উচিত; যতটা সম্ভব একটা ভারসাম্য রক্ষা করা। বিকেন্দ্রীকরণ বিস্তার করতে হয় এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

পঞ্চম. একটি আন্দোলনকে সামরিকবাহিনী দিয়ে জোরপূর্বক দমন করলে, পরিস্থিতির অবনতি অনিবার্য।

ছয়. বল বা শক্তি প্রয়োগে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যায় না। এটি সাময়িক সমাধান মাত্র। বিদ্রোহের মূল কারণ খুঁজে বের করতে হয়।

সাত. আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে শক্তিশালী প্রতিবেশী তার নিজ স্বার্থ আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি নীতি নির্ধারককে পরিস্থিতির বাস্তব রূপ সম্বন্ধে তথ্য দেয়, তাহলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সমাধান করা সম্ভব।

আট. যখন সরকারের নীতির কারণে দেশে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি হয়, তখন মিত্রদের কাছ থেকে সহায়তা আশা করা বোকামি নয়। কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বা আয়তনের উপর একটি দেশের ঐক্য নির্ভর করে না। একটি দেশের নিরাপত্তার জন্য অর্থনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানি নতুন প্রজন্ম এসব ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে। তবে প্রশ্নটি রয়ে যায়– এ ট্র্যাজেডির জন্য কে দায়ী?

মুজিব কি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দায়ী? নাকি ইয়াহিয়া, যিনি যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চাইলেন? ভুট্টো কি দায়ি ছিলেন? তার ক্ষমতার প্রতি লোভের

www.pathagar.com

কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাথে আলোচনা অসম্ভব হয়ে যায়। নির্বাচনী প্রচারণার সময় জেনারেল ইয়াকুব ও এডমিরাল এহসানের দুর্বলতার কারণে কি ট্র্যাজেডি ঘটলো? জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান দিতে যেয়ে টিক্কা খান কি দায়ী? সামরিক অদক্ষতার জন্য লে. জে. নিয়াজিকে কি দায়ী করা যায়? নাকি ভারত এ সুযোগে তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালায়?

পাকিস্তানের ভাঙনের জন্য এককভাবে কোন ব্যক্তি, ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা যায় না। এর পেছনে ছিল ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ভুল সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান ভাঙনের ট্রাজেডির পেছনে ছিল বাঙালিদের আশা পূরণে মুসলিম লীগের ব্যর্থতা; গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনার ব্যর্থতা; বাংলা ভাষা আন্দোলনকে ভুলভাবে মোকাবেলা করা; গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করা; বারবার সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করা; অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে দুর্বল নীতি, জনগণের অসন্তোষের সুযোগ আওয়ামী লীগের লুফে নেয়া ও ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে যোগদান না করবার সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ।

www.pathagar.com

Appendix

Signals exchanged between President of Pakistan/GHQ and Governor East Pakistan/Commander Eastern Command

17 Oct. 1971
COS Army Signal G1 130 dated 17 Oct to Eastern Command.

> Crushing rebels with response does have direct bearing on your ops against India (.) reserves at level including your comd reserves and other available be used against rebels (.) meanwhile your request for addltps under consideration.

29 Nov
C-in-C to Eastern Command.

> For Comd from C-in-C (.) I am most impressed by the wonderful job done by you and all ranks under your command in meeting the challenge posed by the enemy in East Pak(.) the whole nation is proud of you and you have their full support (.) the gallant deeds of our soldiers in thwarting the en evil designs have earned the gratitude of all countrymen (.) keep up the noble work till the enemy spirit is crushed and they are completely wiped out from our sacred soil (.) may Allah be with you

3 Dec
Eastern Command to GHQ

> Since India is likely to launch an offensive against East Pakistan I should re deploy my force with due regard to existing op sit..... I have issued instrs and re-emphasised occupation of fortresses after causing max attrition to the enemy.

3 Dec
Flash signal From C-in-C to Eastern Command

> Jago Jago Hoshiar Amritsar Pathankot struck

www.pathagar.com

5 Dec
COS army signal No. 0233 to Eastern Command

The enemy has stepped up pressure against you and is likely to increase to max extent (.) He will attempt to capture East Pakistan as swiftly as possible and shift max forces to West Pakistan (.) This must not be allowed to happen (.) Losing of some territory is insignificant but you must continue to concentrate on operational deployment in vital areas aiming at keeping the max en force involved in East Pakistan (.) every hope of Chinese activities very soon (.) good luck and keep your magnificent work against such hy odds (.)

6 Dec
Eastern Command to PAKARMY December 6

resorting to fortress/strong pts basis (.) will fight it out last man last round (.)

7Dec
CGS Signal G 0907 dt 7 Dec 71 to Eastern Command.

approved this concept.

7 Dec
Flash
Governor A M Malik to President A- 6905 DTG 07 ...

it is imperative that correct situation in East Pakistan is brought to your notice (.) I discussed with General Niazi who tells me that troops are fighting heroically but against hy odds w/o adequate armour and air sp (.) rebels cutting their rear and losses in equipment and men are heavy and cannot be replaced (.) The front in Eastern and Western sectors has collapsed (.) loss of whole corridor east of Meghna river cannot be avoided (.) Jessore has already fallen which will be a terrible blow to the morale of the pro Pakistan elms (.) civil admin ineffective (.) food and other sups running out (.) Dacca city will be w/o food in 7 days (.) thousands of pro-Pakistan elm being butchered (.) million of non-Bengalis await death (.) No amount of lip service except physical

www.pathagar.com

intervention by world power will help (.) If any country is expected to help it should be within 18 hours (.) If no help is expected I beseech you to negotiate so that a civilised and peaceful transfer of power takes place and millions of lives are saved

7 Dec
President vide his signal of 7 December 71 replied:
Flash DTG.....
President to Governor East Pakistan, Eastern Command

TOPSEC (.) your flash signal A - 6905 refers. All possible steps in hand (.) world
powers are very seriously attempting to bring about ceasefire (.) a very high
powered delegation rushed to NY (.) COS being directed by me to instruct
General Niazi regarding mil strategy to be adopted (.) you should adopt stringent
measures to ration food supplies and prevent collapse (.) Allah be with you (.) we are all praying (.)

8 Dec
Flash
From : GHQ to Comd Eastern Command DTG 08 ......
TOPSEC (.) G0910 (.) Am very proud of your boys (.) hold defensive positions where possible regardless of loss of territory (.) all possible efforts being exerted on pol level (.)

9 Dec
Signal No. G - 1255 dated 9 December 1971, From Eastern Comd to GHQ.

One (.) regrouping readjustment is not possible due to enemy mastery pf skies (.) population getting extremely hostile and providing all out help to enemy (.) No move possible during night due intensive rebel ambushes (.) rebels guiding enemy through gaps and to rear (.) Air field damaged extensively cmm No mission last three days and not possible in future (.) all jetties cmm ferries and river crafts destroyed due en air action (.) bridge demolished by rebels (.) even extrication

www.pathagar.com

most difficult (.) two (.) extensive damage to heavy weapons and equipment due enemy air action (.) troops fighting extremely well but stress and strain now telling hard (.) NOT slept for last 20 days (.) are under constant fire air artillery and tanks (.) three (.) situation extremely critical cmm we go on fighting and do our best (.) four (.) request following (.) immediate strike all enemy air bases this theatre (.) if possible rft airborne troops for protection Dacca: (because of lack of tps in Dacca).

9 Dec
DTG 09 1825Z
CTP GR 400
FOCEP Signal to C-in-C PN

With Indian having complete air superiority and free sky to themselves since 5th December, our land defences regrettably has collapsed sooner than expected (.) In Eastern Sector en troops have reached Chandpur (.) In Western Sector enemy has pushed alongside upto Faridpur. Barisal completely under Rebel control (.) From north en has penetrated upto Bogra through Rangpur (60% naval force rendered non operational) Eastern Command is in process of pulling back troops from various sectors to redeploy at Dacca as a last strong hold if mobility so permits .... my personal optimistically assessed situation is that ..... our heroic effort may not last more than a week

9 Dec
Governor to President DTG 092300...

FLASH TOPSEC (.) A 4660 (.) Mil sit desperate (.) en approaching Faridpur in the West and has come up to river Meghna, in the East by passing our troops in Comilla, to Lakshan (.) Chandpur has fallen (.) En likely to be on outskirts of Dacca any day SG UN has proposed that Dacca city be declared open city (.) strongly recommend this be approved (.) General Niazi does not agree as he considers his orders are to fight to last man last round these actions may result in massacre (.) no regular troops in reserve (.) once again urge you to consider immediate cease fire and pol settlement.

www.pathagar.com

9 Dec
FLASH
HQ CMLA to Governor East Pakistan Eastern Command DTG: 092300

TOPSEC (.) G001 (.) from President to Governor repeated to Eastern Command (.) your flash message A 4660 of 9 December received and thoroughly understood (.) you have my permission to take decision of your proposals to me (.) I have and am continuing to take all measures internationally but in view of our complete isolation from each other decision about EAST PAKISTAN I leave entirely to your good sense and judgment (.) I will approve of any decision you take and I am instructing General Niazi simultaneously to accept your decision and arrange things accordingly (.) whatever efforts you take in your decision to save senseless destruction of the kind of civ you have mentioned in particular the safety of our armed forces, you may go ahead and ensure safety of armed forces by all political means that you will adopt with our opponent.

10 Dec
PAK ARMY to EASTERN COMMAND DTG 100910 FLASH TOPSECRET G 0237

for Comd from COS Army (.) President's signal message to Governor copy to you refers (.) President has left the decision to the Governor in close consultation with you (.) as no signal can correctly convey the degree of seriousness of the situation I can only leave it to you to take the correct decision on the spot (.) It is however apparent that it is now only a question of time before the enemy with its great superiority in numbers and material and the active cooperation of rebels will dominate East Pakistan completely (.) meanwhile a lot of damage is being done to the civil population and the army in suffering heavy casualties (.) you will have to assess the value of fighting on if you can, and weigh it, based on this you should give your frank advice to the Governor who will give his final decision as delegated to him by the president (.) whenever you feel it is necessary to do so you should attempt to destroy maximum military equipment so that it does not fall into enemy hands (.) keep us informed (.) Allah bless you.

www.pathagar.com

10 Dec
Governor to President DTG 10 A 7107
Your G001 of 092300 Dec refers.

For President of Pakistan (.) your G-001 of 092300 Dec (.) As the responsibility of taking the final and fateful decision has been given to me I am handing over the following note to Assistance Secretary General Mr. Paul Mark Henry after your approval. Note begins (.) It was never the intention of the Armed Forces of Pakistan to involve themselves in an all out war on the soil of East Pakistan (.) However a situation arose which compelled the Armed Forces to take defensive action (.) The intention of the Government of Pakistan was always to decide the issues in East Pakistan by means of a political solution for which negotiations were a foot (.) The armed forces have fought heroically against heavy odds and can still continue to do so but in order to avoid further bloodshed and loss of innocent lives I am making the following proposals (.) As the conflict arose as a result of political causes, it must end with a political solution (.) I therefore having been authorised by the President of Pakistan do hereby call upon the elected representatives of East Pakistan to arrange for the peaceful formation of the Government in Dacca (.) In making this offer I feel duty bound to say the will of the people of East Pakistan would demand the immediate vacation of their land by the Indian forces as well (.) I therefore call upon the United Nations to arrange for a peaceful transfer of power and request (.) one (.) an immediate ceasefire (.) two (.) Repatriation with honour of the Armed Forces of Pakistan to West Pakistan (.) three (.) repatriation of all West Pakistan personnel desirous of returning to West Pakistan (.) four (.) The safety of all persons settled in East Pakistan since 1947 (.) five (.) Guarantee of no reprisals against any person in East Pakistan (.) In making this offer, I want to make it clear that this is a definite proposal for peaceful transfer of power (.) The question of surrender of Armed Forces would not be considered and does not arise and if this proposal is not accepted the Armed forces will continue to fight to the last man (.) Note ends (.) General Niazi has been consulted and submits himself to you command.

www.pathagar.com

10 Dec
General Niazi to Pak Army G 1265 10 Dec

"One (.) alfa (.) all formations this command in every sector this theatre under extreme pressure (.) bravo (.) formations/troops mostly isolated in fortresses which initially invested by en cmm now under heavy attacks and may be liquidated due overwhelming strength of enemy (.) charlie (.) enemy possess mastery of air and freedom to destroy all vehicles at will and with full cone of effort (.) delta (.) local population and rebels not only hostile but all out to destroy own troops in entire area (.) echo (.) all communication road/river cut (.) orders to own troops issued to hold on last man last round which may not be too long due very prolonged operation and fighting cmm troops totally tired (.) any way will be difficult to hold on when weapons/ammunition exhaust in the next few days (.) supplies/ammunition also continue to be destroyed by enemy/rebels actions besides intense rate battle expenditure (.) submitted for information and advice".

10 Dec
President to Governor East Pakistan G 0002 of 10 Dec
Your flash message A 7107 of 10 December.

The proposed draft of your message has gone much beyond what you had suggested and I had approved (.) it gives the impression that you are taking decisions on behalf of Pakistan when you have mentioned the subject of the transfer of power, political solution and repatriation or transfer from East West Pakistan etc (.) This virtually means the acceptance of an indep East Pakistan (.) the existing situation in your area requires a limited action by you to end hostilities in East Pakistan therefore suggest a draft which you are authorised to issue (.) In view of complete blockade of East Pakistan by air and sea by overwhelming Indian armed forces and the resultant indiscriminate and senseless bloodshed of civilian population has introduced new dimension, to the sit in East Pakistan (.) The President of Pakistan has authorised me to take whatever measures I may decide (.) I have therefore decided that although Pakistan armed force have fought heroically against hy odds and can still continue to do so yet in order to avoid further bloodshed and loss of human lives I am making the following proposals (.) one (.) an immediate cease fire in East Pakistan to end hostilities (.) two (.)

www.pathagar.com

guarantee of personnel settled in East Pakistan since 1947 (.) three (.) guarantee of no reprisals against any person in East Pakistan (.) I want to make it clear that this is a definite proposal of ending all hostilities and the question of surrender of armed forces would not be considered and does not arise (.) within this framework you may make any additions or changes as you may desire (.) The question of transfer of power will be done at national level which is being done (.)

11 Dec
President to Governor East Pakistan signal 11 0130 Dec

"Do not repeat not take any action on my last message to you (.) important diplomatic and military moves are taking place by our friends (.) It is essential that we hold for another 36 hours at all costs (.) please also pass this message to General Niazi and General Farman.

13 Dec
Command Eastern Command to PAKARMY G 131500

"Dacca fortress def well organised and determined to fight it out"

For Command Eastern Command to PAKARMY G 1286 132300

"Moving to built up area for final battle".

11 Dec
PAKARMY TO Governor Eastern Command 11 1332 E

For Governor and General Niazi from President (.) Governors flash message to me refers (.) you have fought a heroic battle against overwhelming odd (.) The nation is proud of you and the world full of admiration (.) I have done all that is humanly possible to find an acceptable solution to the problem (.) you have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible nor will it serve any useful purpose (.) It will only lead to further loss of life and destruction (.) you should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of all armed forces personnel all those from West Pakistan and loyal elements (.) meanwhile I have moved

www.pathagar.com

UN to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and guarantee the safety of the armed forces and all other people who may be likely largest of miscreants.

Sd/xx
Brig
14 Dec

14 Dec

Lieutenant General A.A.K. Niazi
Dacca, East Pakistan
December 11, 1971

Mr. Herbert D. Spirach,
Counsel General of the USA
American Consulate General,
Dacca, East Pakistan.

Dear,

In order to save further loss of innocent human lives which would inevitably result from further hostilities in big cities like Dacca, I request you to arrange for an immediate cease fire under the following conditions:

a) Regrouping of Pakistani Armed Forces in designated area to be mutually agreed upon between commanders of the opposing forces.
b) To guarantee the safety of all military and paramilitary forces.
c) Safety of all those who had settled in East Pakistan since 1947
d) No reprisal against those who helped the administration since March, 1971

2. In those conditions, the Pakistani Armed Forces and paramilitary forces would immediately cease all military operations.
3. I would further abide by any resolution which the Security Council of the United Nations may pass for the permanent settlement of the present dispute.
4. I make this proposal with full authority vested in me by virtue of my position as Martial Law Administrator of Zone 'B' (East Pakistan) & Commander, East Pakistan, exercising final authority over all Pakistani military and para-military forces in the area.

www.pathagar.com

15 Dec
For Lt. Gen. Niazi from S.A.M Maneckshaw, Chief of the Army Staff India - 15 Dec, 1971.

FIRSTLY - I have received your communication regarding a cease fire in Bangladesh at 1430 hours today through the American Embassy at New Delhi (.) SECONDLY. I had previously informed General Farman Ali in two messages that I would guarantee (A) The safety of all your military and para military forces who surrender to me in Bangladesh. (B) Complete protection to foreign national, ethnic minorities and personnel of West Pakistan origin no matter who they may be (.) Since you have indicated your desire to stop fighting I expect you to issue orders to all forces under your command in Bangladesh to cease fire immediately and surrender to my advancing forces wherever they are located (.) THIRDLY. I give you my solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with the dignity and respect that soldiers are entitled to and I shall abide by the provisions of the Geneva Convention (.) Further as you have many wounded I shall ensure that they are well cared for and the dead given proper burial (.) No one need have any fear for their safety no matter where they come from (.) Nor shall there be any reprisal by forces operating under my command (.) FOURTHLY. Immediately I receive a positive response from you I shall direct General Aurora the Commander of the Indian & Bangladesh Forces in the Eastern Theatre to refrain from all air and ground action against your forces (.) As a token of my good faith I have ordered that no air action shall take place over Dacca from 1700 hours today (.) FIFTHLY. I assure you I have no desire to inflict unnecessary casualties on your troops as I abhor loss of human lives (.) Should however you not comply with what I have stated you will leave me with no other alternatives but to resume my offensive with the utmost vigour at 0900 hours Indian Standard Time on 16 December (.) SIXTHLY. In order to be able to discuss and finalise all matters quickly I have arranged for a radio link on listening watch from 1700 hours I.S.T. today 15 December (.) The frequency will be 6605 (6605) KHZ by day and 3216 (3216) KHZ by night (.) Callsign will be CAL (Calcutta) and DAC (Dacca) (.) I would suggest you instruct your signaller to restore microwave communications immediately.

(Above message received for transmission to General Niazi 2300 hrs 15 December).

www.pathagar.com